উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি.
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

গবেষক

পিয়ালী দাস

পিএইচ.ডি. নিবন্ধীকরণ - Ph.D/Beng.(1440)/1245/R-2021

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সূর্য লামা

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

DECLARATION

I declare that the thesis entitled "বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ" has been prepared by me under the guidance of Dr. Surya Lama, Assistant Professor of 'Department of Bengali', University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Piyali Das

....

PIYALI DAS
Department of Bengali,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur, Darjeeling,
West Bengal, Pin. 734013.
Date: 13.10.2023

ড. সূর্য লামা
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী"
Accredited by NAAC With grade B++

রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
www.nbu.ac.in
suryalamanbu@gmail.com
৯৭৪৯৭৯৯৬৪১

স্মারক সংখ্যা

তারিখ 13.10.2023

CERTIFICATE

I certify that **piyali Das** has prepared the thesis entitled **"বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ"**, for the award of Ph.D. degree of the 'University of North Bengal', under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

....

(Supervisor)
Dr. SURYA LAMA
Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language Bangla

Submission Information

Author Name	Piyali Das
Title	Bangla sahitye malo jati o sanskriti prosongo
Paper/Submission ID	1011003
Submission Date	2023-10-09 13:42:15
Document type	Thesis

Result Information

Similarity **1%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

Piyali Das
13.10.2023

13/10/2023

Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

সারসংক্ষেপ (Abstract)

আদিম যুগ থেকে আজও মানুষের সঙ্গে মাছের সম্পর্ক শুধু দর্শন স্পর্শন ও ভক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানব জাতির মাছ শিকার বা মাছ ধরার ইতিহাস সুপ্রাচীন। আদিম প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ মাছকে খাদ্য হিসাবে যে ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ম্যাগলেমোশিয়ান সভ্যতার নিদর্শন থেকে জানা যায় মেগালিথিক যুগে (খ্রি.পূ. ১০০০০-৬০০০) মানুষের মাছ ধরার কৌশল জানা ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শুরু করে মাছচাষ। আনুমানিক ২৫০০ খ্রি.পূ. মিশর ও রোমে যে মাছচাষের প্রচলন ছিল তা জানা যায়।

‘মালো’ একটি প্রাচীন আর্যেতর জাতি। ‘মহাভারত’ বলে ধীবর সম্প্রদায়ের দাস রাজার কন্যা সত্যবতী-পুত্র ‘দ্বৈপায়ন ব্যাস’ মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবকুলের পিতা। এ সত্য অপ্রিয় হলেও সর্বজনজ্ঞাত। মালোরাও দাবি করেন ‘রাজ রক্ত’ তাদের শরীরে। বর্তমানে পিছিয়ে পড়া জাতি হিসাবে চিহ্নিত হলেও ইতিহাস বলে- মালো সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল।

রিসলে মালোদের আদিম অধিবাসী হিসেবে ধরেছেন। একথা দাবি করা হয় যে, তারা আসলে রাজপুতানার মল্লগড়ের ঝালো। যার ফলাফল হল তারা ক্ষত্রিয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় মহাভারতে মল্লদের ‘বাহুযোধিনঃ’ এবং ঝালোদের লকু(অ)যোধিনঃ বলা হয়েছে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে মাল্ল এবং মালোর মধ্যে পার্থক্য আছে।

জলের প্রধান উৎস সমুদ্র এবং সুলভ উৎস নদী। নদী একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা এবং জীবনব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নদীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বাঙালির সমাজমনস্তত্ত্বে নদীর প্রভাব অনস্বীকার্য। নদী বাঙালির জীবনধারা ও সমাজপ্রবাহকে বৈচিত্র্যময় করেছে। বাঙালির জীবনে নদীর ভূমিকা প্রায়শ ইতিবাচক কিন্তু কখনো কখনো নেতিবাচকও বটে।

বাংলা সাহিত্যে নদীভিত্তিক বা নদীকেন্দ্রিক অথবা নদীর দ্বারা প্রভাবিত উপন্যাসের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কল্লোল-পরবর্তী সার্থক এবং বহুল আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে নদীপ্রধান উপন্যাসের সংখ্যা বেশ উৎসাহজনক। এসব উপন্যাসের কোনো কোনোটিতে নদী নিয়ামক শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে, কোথাও নদী হয়েছে পটভূমি। বাংলার অধিকাংশ খ্যাতিমান

কথাসাহিত্যিক নদীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখেছেন। কারো কারো রচনায় নদী শুধু পটভূমি হয়ে থাকেনি, এক একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে। মানুষের মতোই তারা বহুমাত্রিক আচরণ করেছে, ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে, কাহিনির মোড় ঘুরিয়েছে এবং পরিণতি রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

ভারত বিভাগের পূর্ব থেকেই নদী ও নদীতীরবর্তী মানুষজনকে নিয়ে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয় বাংলা ভাষায়। বিভাগোত্তর পর্বেও নদীসংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তার জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে উপন্যাস রচনা অব্যাহত থাকে। এই ধরনের উপন্যাসের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু মণ্ডনকলায় ও জীবনবাস্তবতায় উজ্জ্বল।

ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হওয়ার পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। ইংরেজি শিক্ষা এবং সেই সূত্রে আগত পাশ্চাত্য চিন্তাধারা প্রচলিত অনেক মূল্যবোধের প্রতি সংশয়ের জন্ম দেয়। মানুষ, সমাজ ও তার ধারা হয় অস্থির, আন্দোলিত।

মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে বাংলা গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচার, দেশীয় সাময়িক পত্রের প্রকাশ, ইংরেজদের নিজেদের স্বার্থে এদেশীয় ভাষার প্রতি আগ্রহ, কোনো কোনো বিশিষ্ট ইংরেজের বাংলাভাষার প্রতি সপ্রশংস মনোভাব, মিশনারিদের বাংলাভাষা সম্বন্ধে আগ্রহ ইত্যাদি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে মাতৃভাষার অনুকূল করে তুলল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অস্থির এবং নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল। বাঙালি যেন এই পর্বে জীবনকে পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী। এ পর্ব বাঙালির আত্মরক্ষার এবং আত্মআবিষ্কারের পর্ব। ধর্ম ও সমাজজীবনের ভাঙাগড়ায় অস্থির এই পরিবর্তমান পর্ব আক্ষরিক অর্থেই সাহিত্যসৃষ্টির পর্ব নয়। অন্যদিকে, বাঙালি তার মধ্যযুগীয় নির্বিকারত্ব এইসময় কিছুটা কাটিয়ে ওঠে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামার, পলাশীর যুদ্ধের বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন সমকালীন বাংলাসাহিত্যে প্রায় না থাকলেও, উনিশ শতকে নবজিজ্ঞাসার সূচনায় ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনাবলী সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যে ছাপ রাখল, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের উপন্যাস সাহিত্য। জীবনের রূপ বর্ণনা করতে গেলে তার পটভূমি প্রয়োজন। এই পটভূমির প্রধান উপাদান মানুষ ও সমাজ। উপন্যাসের স্বরূপ-সন্ধানের ক্ষেত্রেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবান।

মানবসভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই আচার-অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে প্রাচীন কিংবা আধুনিক মানবসভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আচার-অনুষ্ঠান আমাদের সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির বলিষ্ঠ প্রকাশ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। তাই কোনো সম্প্রদায়ের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গেলে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকা দরকার। সমস্ত পেশার মানুষ কিছু আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। চাষবাস, জীবজন্তু শিকার, মাছ ধরা ইত্যাদি পেশার সঙ্গে আচার অনুষ্ঠান অঙ্গাঙ্গী বা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে-পেশায় অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি যত বেশি, সেই পেশায় নিয়মনিষ্ঠার প্রাধান্য তত বেশি। সমুদ্রে বা নদীতে মাছ শিকারের অনিশ্চয়তা এবং জীবনের ঝুঁকি দুইই আছে। ফলে জেলেদের মধ্যে সংস্কার মেনে চলার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বেশি।

'বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে চর্যাপদ থেকে বর্তমান ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত মালোদের জীবন ও প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং বাংলা সাহিত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মালো জাতির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ কোন কোন দিকে বিশ্লেষিত হয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিম্নলিখিত পাঁচটি অধ্যায়ে সজ্জিত করা হয়েছে-

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : **মালো জাতির উৎস ও বিকাশ**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **মালোদের সমাজজীবন**

তৃতীয় অধ্যায় : **সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ**

চতুর্থ অধ্যায় : **সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ**

পঞ্চম অধ্যায় : **মালো জাতি ও বিশ্বায়ন**

উপসংহার

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে মালো জাতি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে ভূমিকায়। এর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ কোথায় এবং কীভাবে এসেছে এবং মালো জাতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণাগার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সবশেষে এই গবেষণাকর্মটিতে অনুসৃত গবেষণা-পদ্ধতি (Research-Method) সম্পর্কে উল্লেখ করে 'ভূমিকা' সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ কীভাবে নদীতীরে বসতি গড়ে তুলল, বাঙালি জাতির উদ্ভব কীভাবে হল, আর্যজাতি বাংলায় প্রবেশের পর কীভাবে আর্যজাতি আর অনার্যজাতির সংমিশ্রণ ঘটল, মিশ্রবর্ণ বা বর্ণসংকরের শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এই অধ্যায়ে কৈবর্ত, মালো, মৎস্যজীবী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। ঝালো মালো জাতি রাজপুতানার ক্ষত্রিয় জাতি। তারা স্থানান্তরিত হয়ে বাংলার নদীতীরে বসতি স্থাপন করে এবং মাছ ধরা এবং চাষের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। মালোরা উত্তর পশ্চিম ভারতের আর্যবংশোদ্ভব দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি। মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণ তার 'ঝাল-মাল তত্ত্ব' গ্রন্থটিতে জাতি বা বর্ণ, বর্ণ ও বর্ণসংকর, মালোরা বর্ণসংকর নহে, ব্রাত্য নিন্দনীয় নহে, বর্ণ, বৃত্তি ও উপাধি এই পাঁচটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে ঝালো মালো কে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মালোদের বর্ণসংকর মানতে রাজি নন। তিনি নানা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মালোরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। এই অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাজব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নদী যেমন লালন করে তেমনি আবার তার রুদ্ররোষে মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়, জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়। সেই বিপর্যস্ত জেলে জীবনের ছবি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। নদী এবং সমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত জেলেজীবনের পরিচয় রয়েছে এই অধ্যায়ে। মালোদের বৃত্তিজীবন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, মহাজনী শোষণের কথা, উচ্চবর্গীয় ও নিম্নবর্গীয়দের দ্বন্দ্বের কথা, বৃত্তিবদলের কথা, প্রধান জীবিকার পাশাপাশি উপজীবিকা, শ্রেণিবৈষম্য, বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার, মালোদের রাজনীতি, প্রতিবাদস্পৃহা, আত্মসচেতনতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। জেলেদের শিক্ষাবিরূপ মনোভাবের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তার পাশাপাশি শিক্ষিত জেলেসমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে মালোদের তাদের জীবিকাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যা তাদের সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে যা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রান্তবর্গীয়দের অন্যতম উল্লেখ্য জনগোষ্ঠী হল মালো বা জেলে। চর্যাপদ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনীগ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রন্থগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং বাংলা সাহিত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মালো জাতির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পাঁচটি উপ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাছ, মালো, মল্লযুদ্ধ, মল্লবীরদের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ (খ্রিস্টীয় ১৪শ-১৫শ শতাব্দী), 'পদ্মাপুরাণ' (১৪৯৪ খ্রি.), চণ্ডীমঙ্গল (১৫৪৪ খ্রি.), কাশীদাসী মহাভারত (১৬০৪ খ্রি.), শিবায়ন (১৭১১ খ্রি.), ধর্মমঙ্গল (১৭১১খ্রি.), অন্নদামঙ্গলে (১৭৫২ খ্রি.) কীভাবে এদের প্রসঙ্গ এসেছে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মালোরা মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত তার পরিচয় পাওয়া যায়। মালোদের নিয়ে বাংলায় যে উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছে সেগুলি হল- 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'গহিন গাঙ' (১৯৮০), 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৮৭), 'মুক্তামাছ' (১৯৯৫), 'ইলিশ জোড়' (১৯৯৭), 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪), 'জাল থেকে জালে' (২০১৫) 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১), 'মিঠেজল : রুপোলী ইলিশ' (১৩৭১), 'শামদ্দি জেলে এবং সমুদ্র' (১৩৭১), 'সৌদামিনী মালো' (২০০৯), 'কালোনৌকা (১৯৯৭), 'গোত্রান্তর' (ভাসমান ২০০০), 'প্রতিবাদ' (ভাসমান ২০০২), 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' (২০০৩), 'চোর' (১৪১৫), 'বস্ত্রহরণ' (২০১২) । এই উপন্যাস এবং গল্পগুলোতে মালোদের জীবনযাত্রা, জীবনসংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাস এবং গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। মালো জাতিকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন কবিতা যেমন জসীম উদ্‌দীন এর 'রাখালী' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়', পরিতোষ বিশ্বাসের 'ঠিকানার খোঁজে' (১৪০৯) কাব্যগ্রন্থের 'একটি নদীর সাথে দেখা', বিধান রায়ের 'অমাবস্যায় জ্যোৎস্নার আল্পনা' (২০০৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সনাতন মাঝি', লিলি হালদারের 'গহীন জলে মৎস্যকন্যা' (২০১২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'চলেছি দূর সাগরে' 'স্বপ্ন', 'প্রকৃতির খেলা', 'মেঘের আলোর উৎসব' ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'মালো পাড়ার মা' (১৯৮৩) উৎপল দত্তের রচিত আরেকটি নাটক। নাটকটি মালদহের রতুয়া থানার হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। এই নাটকদুটি আলোচিত হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং তার 'তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস' নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সুকুমার বর্মনের 'রুদিজলার মানুষ' (১৯৯৭), লক্ষ্মণ কুমার হালদারের 'গঙ্গার ইলিশ ও নদনদীর ইতিকথা' (ভাসমান ২০০২), পরিতোষ বিশ্বাসের 'খুলনার মৎস্যজীবীদের সন্ধানে' (ভাসমান ২০০৩), ঝর্ণা বর্মণ তার 'চেম্মিন ও তিতাস' (ভাসমান ২০০৬), দিগেন বর্মণ রচিত 'সালতামামি মাছ ও মৎস্যজীবীদের কথা' (২০১৭) প্রবন্ধে মালোদের জীবনের

নানা সমস্যার দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। বেবী হালদার নিজেও একজন মালো। মেধা পাটেকর তাকে বলেছেন 'মেহনতী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী। তার জীবনসংগ্রামের কথা উঠে এসেছে তার লেখা আত্মজীবনী 'আলো আধাঁরি'তে। শৈশবেই মাকে হারিয়েছিলেন, ১৩ বছর বয়সে বিয়ের পর ঘরছাড়া। থাকতে পারেননি নিপীড়ক স্বামীর সংসারেও। তারপর বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে ট্রেনে চেপে রাজধানীতে চলে যান। নয়াদিল্লিতে গৃহকর্মীর কাজ দিয়ে জীবনের শুরু করেছিলেন দুর্গাপুরের মেয়ে বেবী হালদার, আজ তিনি পৌঁছে গিয়েছেন জগতসভায়, নিজের গল্প বলতে। শুধু মুখের কথায় নয়, লেখনী দিয়ে। বেবী হালদারের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, জাপানি প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 'আলো আঁধারি'-র পরবর্তী গ্রন্থ হল- 'ঈষৎ রূপান্তর' (২০০৮)। ২০০২-তে 'আলো আঁধারি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বেবীর যে আত্মপ্রকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০১৪-তে এসে তা ঘরে ফেরার পথ এর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়। শ্রীযুক্ত বিপদভঞ্জন সরকার মহাশয় তার জীবনীগ্রন্থ 'জলঙ্গির পদ্মা' (২০২১) রচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে এই গ্রন্থগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, ক্ষেত্রসমীক্ষা বলতে কী বোঝায় সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, কেন দক্ষিণ দিনাজপুর নামকরণ হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়কে দুটি উপ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি ও মালো সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কীভাবে ঘটেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বোলান, ভগবতী পূজা, গোপালের আরতি বা গান, হোলির গান, শীতলা মার গান, নাম গান বা আগমনী গান, লক্ষ্মীর গান, মনসা, চড়ক ইত্যাদি এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মালোদের লোকসংস্কৃতি উপ অধ্যায়ে গম্ভীরা, নৌকা বাইচের গান, ত্রিনাথের গান, সোনা রায়ের গান, নাউবরন্যা বা নাউভাসানী, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বারোমাসি গান ইত্যাদি লোকসংগীত বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্য, লোকসংস্কার, মাকাল ব্রত, নাটাইব্রত, ক্ষেত্রব্রত ইত্যাদি ব্রত, বিভিন্ন ধরনের লোকউৎসব, লোকদেবতা যেমন মাকাল, দক্ষিণরায়, মঙ্গলা, সান্ঝা, সোনা রায়, নৌকা বরণ, ডালা পুজো, ত্রিনাথের পুজো, গলুই পুজো, গঙ্গা পুজো, মালোদের ব্যবহৃত মন্ত্র, হেঁয়ালি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তার পাশাপাশি উপন্যাস থেকেও সংস্কৃতির অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন কী, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থা, গণমাধ্যমে বিশ্বায়নের প্রভাব, বিশ্বায়নের সুফল কুফল কীভাবে

মৎস্যজীবীদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে যেমন মাছের উৎপাদন বাড়ছে, মুনাফা বাড়ছে তেমনি পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। জাতিগতভাবে যারা মালো নয় তারাও বর্তমানে এই পেশায় অংশ নিচ্ছে। আবার মালোদের এই পেশা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। এই অধ্যায়ে এই সব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সবশেষে প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলিকে উপসংহারে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা করতে গিয়ে এই বিষয় সংলগ্ন পরবর্তী গবেষণার সূত্র-নির্দেশ করা হয়েছে এখানে।

এছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানচিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মালোদের ব্যবহৃত জাল, নৌকা, তাদের ঘরবাড়ি, গঙ্গাপুজো, হ্যাচারি, মালোদের পত্রিকা ভাসমান এর প্রচ্ছদ, সূচিপত্র ইত্যাদির চিত্রাদি ‘পরিশিষ্ট-ক’ অংশে সংযোজন করা হয়েছে। ‘পরিশিষ্ট-খ’ অংশে মৎস্য বিভাগের ২০১৬-২০১৭ সালের মৎস্য পরিসংখ্যানের হাতের বই থেকে সংগৃহীত মৎস্য ও মৎস্যজীবী সংক্রান্ত তথ্য যেমন মৎস্য পরিসংখ্যান, মৎস্য সম্পদের অভ্যন্তরীণ খাত, সামুদ্রিক খাত, জেলা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধ জলের এলাকা, পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ নদীর দৈর্ঘ্য, ২০১৭-২০১৮, ২০২০-২০২১ সালের জেলা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্লক অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ জলক্ষেত্র, বছর অনুযায়ী মাছের চাহিদা ও উৎপাদন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হ্যাচারির সংখ্যা, মৎস্যজীবীদের জাতি অনুযায়ী জনসংখ্যা এবং ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মোট, গ্রামীণ এবং শহুরে জনসংখ্যার তালিকা সংযুক্ত হয়েছে। এরপরে ‘গ্রন্থপঞ্জি’ এবং ‘নির্ঘণ্ট’ সংযোজন করে অভিসন্দর্ভটি সমাপন করা হয়েছে।

মুখবন্ধ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতোকোত্তর পাঠক্রমে বিশেষ পত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে কেবল বিস্মিত হয়েছিলাম সেই প্রথম পাঠে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালোদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন রকমের লোকাচার প্রথম থেকেই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরপর এম.ফিল. করার সময় আমার গবেষণার বিষয় ছিল নির্বাচিত তিনটি বাংলা উপন্যাসে পদ্মা : একটি সমীক্ষা। এরপর এম.ফিল. শেষ হওয়ার পরে যখন গবেষণা-কাজের বিষয় নিয়ে ভাবছি, সেই সময় মালো জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার পরামর্শ দেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনয় ভবনের অধ্যাপক ড. প্রহ্লাদ রায়। মালো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন, লেখকদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে, তাদের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং প্রাথমিক পড়াশোনা করে এবং তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনা করে মালো জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

'বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' শীর্ষক এই গবেষণাকর্মটি যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিরত আদেশ-উপদেশ দান করে সম্পাদন করিয়েছেন, তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তথা এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. সূর্য লামা মহাশয়। প্রতিটি অধ্যায়ের খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তি বারংবার শুধরে দিয়েছেন তিনি। তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও এই গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকগণ। এই গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অতনু শাশমল মহাশয়। নানা উপদেশ, সুপরামর্শ, বইপত্র, পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন রণবীর সিংহ বর্মণ, দিগেন বর্মণ, সূর্যেন্দু দে, প্রহ্লাদ রায়। এইসব ব্যক্তিরা এমন কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, যেগুলি তাদের সহায়তা ছাড়া আমার নাগালে কোনোভাবেই আসত না। আমার গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার বিষয়ে ঝন্টু হালদার, প্রভাস বিশ্বাস, সূর্য হালদার প্রমূখ ব্যক্তিরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মৎস্যজীবী বিভাগের সহ পরিচালক অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন সহ পরিচালক অশোক সরকার বিভিন্ন তথ্য ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সৌজন্যমূলক কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরিবর্তে এঁদের সকলের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা অর্পণ করি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বেশ কিছু বই সংগ্রহ করেছি। কলেজ স্ট্রিটের অনেক

পুরনো দোকান থেকে পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষক-বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বইপত্রের জোগান দিয়েছেন। প্রত্যেকে তাদের নিজেদের মতো করে আন্তরিক সাহায্য করেছেন। এছাড়া বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব, পরিজনবর্গ প্রত্যেকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করি।

অক্টোবর, ২০২৩ পিয়ালী দাস

সূচি

ভূমিকা ১-১২

প্রথম অধ্যায় ১৩-৭২

মালো জাতির উৎস ও বিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৩-১১০

মালোদের সমাজজীবন

তৃতীয় অধ্যায় ১১১-২০৪

সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায় ২০৫-২৬৫

সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ

পঞ্চম অধ্যায় ২৬৬-৩০৫

মালো জাতি ও বিশ্বায়ন

উপসংহার ৩০৬-৩১০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট – ক ৩১১-৩২২

পরিশিষ্ট – খ ৩২৩-৩৩১

গ্রন্থপঞ্জি ৩৩২-৩৫৮

নির্ঘণ্ট ৩৫৯-৩৬২

ভূমিকা

ভূমিকা

(১)

মানব জাতি সমূহের উদ্ভব ও ঠিকানা পদ্ধতি অতি জটিল। তারপর বহুযুগ পার হয়ে সৃষ্ট হয়েছে সমাজ। এই সমাজ এমনই এক পদ্ধতি যার মধ্যে মানুষের শ্রেণিবিভাগ, তার উপবিভাগ, তার কার্যপদ্ধতি, তার কর্তৃত্ব, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কথার সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরিবর্তনশীল এক জটিল পদ্ধতিই সমাজ নামে অভিহিত। এই সমাজব্যবস্থাতেই শ্রেণিবিভাজন স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে- যে কোনো পুরাতন সমাজব্যবস্থাতেই শ্রেণিবিভাজন অর্থাৎ প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিভাগ লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর নিদর্শন মেলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঋগ্‌বেদের পুরুষসূত্রে চতুর্বর্ণের কথা থাকলেও সে সূত্রের বক্তব্যের যুক্তির অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন বিনয় সরকার। সেখানে শ্রেণি অথবা জাতির জন্মকথা বা সামাজিক উচ্চ-নীচের কথা কিন্তু মেলে না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে জন্মগত পার্থক্য সে যুগে ছিল না তারও সমর্থন আছে পুরাণে। কারণ প্রচেতস দক্ষের কন্যাত্রয়ী কাশ্যপপত্নী দিতি, অদিতি ও দনুর গর্ভে যথাক্রমে দৈত্য, দেবতা ও দানবের জন্ম। মহাত্মা ভৃগু দৈত্য হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যাকে এবং দনুর পুত্র পুলোমার কন্যা পৌলমীকে বিবাহ করেন। এই পুলোমার অপর কন্যা দানব-নন্দিনী শচীই দেবরাজ ইন্দ্রপত্নী।

ভাষায় উচ্চবর্ণজাত হলেই যে উচ্চবর্ণই লাভ করা যায় না, তা পুরাণেই লিপিবদ্ধ। তপস্যার বলেই ক্ষত্রিয়েরাও মহর্ষিবাদ লাভ করেছেন। যেমন, বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সত্য, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান, ঋথু, আষ্টিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রমুখেরা ক্ষত্রিয় বংশজাত হলেও তপস্যা বলে ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ চারুশিল্পী, কারুশিল্পী এবং অন্যান্য পেশাদার গোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অন্-আর্য, অনার্য শ্রেণিতে ভাগ করেছে এবং তাদেরই শূদ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু মধ্যযুগে শূদ্রদের অবস্থা মেধাতিথির সময় থেকে উন্নত হয়েছে। এদের সংহিতাগুলিতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে মালো জাতি বিশ্বের দুটি দেশে অবস্থান করে যা হল ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ আবার তাদের সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। মালোদের জনসংখ্যা প্রায় ৬৯০০০০ এদের মধ্যে ভারতবর্ষে বসবাস করে ৪৪৩০০০ জন এবং বাংলাদেশে বসবাস করে ২৪৭০০০ জন। ভারতবর্ষে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই এদের জনসংখ্যা সর্বাধিক প্রায় ৩১৬০০০। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় যার মধ্যে নদীয়া জেলায় এদের সংখ্যা সর্বাধিক। এই জেলায় প্রায় ৯০০০০ মালো বসবাস করেন। অপর দিকে বাংলাদেশে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঢাকা ডিভিসনে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। এখানে প্রায় ১১৩০০০ জন মালো বসবাস করেন।

অতিথি আপ্যায়নে মালো জাতির জুড়ি মেলা ভার। সাবেকী মালো জাতির বসবাস বিভিন্ন নদী জলাশয়, হ্রদ বা সমুদ্রের ধারে, তাই তাদের বৎসরের সবসময়-ই একটা ভয় কাজ করে। বিশেষ করে যে সমস্ত মালো গ্রাম সমুদ্রের ধারে অবস্থিত তাদের শঙ্কা একটু বেশি, নদী বা হ্রদ তীরবর্তী অঞ্চলের মালো সম্প্রদায়ের থেকে।

মালো জাতির প্রধান পেশা হয় মাছ ধরা, মাছই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র উৎস, মাছ ছাড়া তাদের জীবন চলে না, তারা সারাদিন ও রাত্রি নিজেদেরকে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত রাখে, এবং দিনের শেষে যে পরিমাণ মাছ তারা ধরতে পারে তাই বিক্রি করে যেটুকু অর্থ উপার্জন হয় তা দিয়ে তাদের সংসার চলে। যদিও এই রোজগার এর পরিমাণ সবসময় সমান হয় না তাই তাদের জীবন শঙ্কায় ভরা তারা সবসময়ই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ভোগে, কোনও দিন তাদের জালে মাছ কেমন আসবে, কোনও দিন বেশি আসবে বা কোনও দিন আবার কম এই ভাবে মাছ ধরার পরিমাণের যেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই সেই জন্য তাদের সংসারের স্বচ্ছলতাও তেমনি অনিশ্চয়তায় ভরপুর। আবার ঋতু ভেদে তাদের আয়ও কমা বাড়া করে থাকে কারণ বিভিন্ন ঋতুতে নদীতে জলের পরিমাণও ভিন্ন হয় এবং তাদের জালে ধরা মাছের পরিমাণও হয় ভিন্ন। এই আশঙ্কাপূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি লাভের জন্য অনেক মালো পরিবার তাদের পেশার পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা একটি নির্ভরযোগ্য আয়যুক্ত পেশায় অনেকেই যোগদান করেছেন, কিন্তু এখনও অনেক মালো জাতির লোক

আছে যারা তাদের পূর্বতন পেশার পরিবর্তন করেননি তারা তাদের সাবেকী পেশাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে।

মালোরা অর্থনৈতিক ভাবে একটু পিছনের দিকে অবস্থান করায় তাদের সংসার স্বচ্ছলভাবে চালাতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এমত অবস্থায় তারা তাদের ছেলেমেয়েকে অনেক সময় নিজেদের কাজের সহযোগিতার জন্য তাদের পরিবারের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে থাকেন। তাই বলা চলে মালোদের ছেলেমেয়েদের খুব অল্প বয়স থেকে নিজেদেরকে পরিবারের আয়ের উৎস হিসেবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। এই অল্প বয়স থেকে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম তাদের গড় আয়ুকে অনেকটাই কমিয়ে দেয়। তাই বলা চলে অল্প বয়স থেকে শারীরিক পরিশ্রম তাদেরকে নিষ্ঠাবান ও শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখায়। আবার আমরা সামগ্রিক ভাবে মালো ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে একটি ভালো অভ্যাসের কথা পেয়ে থাকি তা হল তাদের নেশা বিমুখতা। প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই আমরা এই অভ্যাসের প্রতিফলন দেখতে পাই। বর্তমান যুগে এই ধরনের আচরণ বিশ্বের দরবারে মালো সমাজের মুখ উজ্জ্বল করে।

(২)

সাহিত্যে মালো জাতির কথা বললে প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তার 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো জাতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাছ, মালো, মল্লযুদ্ধ, মল্লবীরদের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গলে কীভাবে এদের প্রসঙ্গ এসেছে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণায়। বাংলা উপন্যাস প্রথমদিকে তার অভিজাত পরিমণ্ডল ছেড়ে কল্লোলযুগ বা তার কিছু পরে মাটিকেন্দ্রিক জীবনধারা, বিশেষত নানা শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথাকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছিল, সেই প্রয়াসেরই পথ ধরে গল্প-উপন্যাসে জায়গা করে নিল বিশেষ বৃত্তিজীবী মানুষজন। মালোদের নিয়ে বাংলায় যে উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছে সেগুলি হল- 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'গহিন গাঙ' (১৯৮০), 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৮৭), 'মুক্তামাছ' (১৯৯৫), 'ইলিশ জোড়' (১৯৯৭), 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪), 'জাল থেকে জালে' (২০১৫)।

গল্পগুলি হল 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১), 'মিঠেজল : রুপোলী ইলিশ' (১৩৭১), 'শামদ্দি জেলে এবং সমুদ্র' (১৩৭১) 'সৌদামিনী মালো' (২০০৯) 'কালোনৌকা' (১৯৯৭) ইত্যাদি।

মালো মানে যে জাল হাতে শুধু মাছ ধরবে এমন নয় বাংলা সাহিত্যে মালোদের প্রসঙ্গ, জীবনযাত্রা, সংগ্রাম নানাভাবে এসেছে। লিলি হালদারের লেখা 'স্বপ্ন' কবিতাটি তে যেমন মালোদের স্বপ্ন দেখার কথা বলা হয়েছে। তারা ঘর ছেড়ে প্রবাসে গিয়েছে। জগৎ যেমন মহাশূন্যে স্বপ্ন তেমনি তলে ভাসে। পুটি, খলসে প্রভৃতি মাছের কথা পাওয়া যায়। মালোরা জলের শব্দের ডাকে ভেসে চলে একা একা। তারা মৎস্যকন্যা অর্থাৎ মাছের সন্ধান করে। মাছের গন্ধ আজন্মকাল তার গায়ে লেগে থাকে। উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। অসামান্য নাট্যকার উৎপল দত্ত, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ও সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। 'মালো পাড়ার মা' উৎপল দত্তের রচিত আরেকটি নাটক। নাটকটি মালদহ জেলার রতুয়া থানার বিধ্বংসী হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে রচিত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং তার 'তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস' নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। 'ভাসমান' পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তার উপন্যাস নিয়ে যারা প্রবন্ধ লিখেছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই নিজেরা মালো। ফলে তাদের প্রবন্ধে মালোদের প্রসঙ্গ, জীবনযাত্রা তারা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বেবী হালদার নিজেও একজন মালো। তার জীবনসংগ্রামের কথা উঠে এসেছে তার লেখা আত্মজীবনী 'আলো আধাঁরি'তে। 'আলো আঁধারি' - র পরবর্তী গ্রন্থ হল- 'ঈষৎ রূপান্তর' (২০০৮) এবং ঘরে ফেরার পথ (২০১৪)।

মানুষের জীবন নানারকম সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংস্কারের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। সংস্কারাদি মানুষের বাঁচার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে তোলে বা বাঁচতে উদ্ধুদ্ধ করে। জাতি হিসাবে বাঙালি অন্যদের চেয়েও বিশিষ্ট। আমাদের আছে নিজস্ব খাবার, সাহিত্য, সংগীত, পোশাক, এমনকি মাছও। তাই বাঙালিদের যে কোন শুভ কাজে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মাছ চাই। এর সাথে জড়িয়ে থাকে গৃহস্থ সংসারের কল্যাণ ও মঙ্গলের সংস্কার। মালোদের মধ্যে চড়ক পুজো, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, মনসাপুজো হয় যা বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত। বাংলাদেশে দুর্গাপুজো বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয় যা পশ্চিমবাংলায় সাধারণত দেখা যায় না। মালোদের লোকসংস্কৃতির নানা উপবিভাগ- ধর্মীয় পূজা এবং তৎসংক্রান্ত ব্রত, পৌষপার্বণাদি, বারোমাসি গান, বরজের গান, পালা গানের অংশ, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, কৃষ্ণযাত্রা, নামগান, হরি বংশ, ভাটিয়ালি, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, শ্লোক, ছড়া, লোক সংস্কার, জন্ম মৃত্যু বিবাহের উৎসব, সংস্কার, ধর্মীয় সার্বজনীন দোল

উৎসব, সামাজিক উৎসব নৌকা বাইচ, লোক গল্প ইত্যাদি। গান ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান মালোরা ভাবতে পারে না। মালোদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গান। মাছ ধরার জন্য বেঁউদি জাল, ছান্দি জাল, ঢাঁই জাল, সারেং জাল, কৈলে জাল, হাজালি জাল ইত্যাদি জালের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩)

মালো জাতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা যাক। মালো জাতি নিয়ে গবেষণামূলক কাজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সাম্প্রতিককালের হাতে গোনা দু'একটি গবেষণা-মূলক কাজের কথা বাদ দিলে, এই মালো জাতি নিয়ে যারা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন মালো জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক। মালো সম্প্রদায় বহির্ভূত লেখকের সংখ্যা খুবই কম যারা মালোদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। মালো জাতি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ ও তিনটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। গ্রন্থগুলি হল-

- মিলনকান্তি বিশ্বাসের 'প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ' (২০১৪)
- সূর্য্যেন্দু দের 'মাছ-জল-মৎস্যজীবী ১ম খণ্ড' (২৫ বৈশাখ, ১৪২৪)
- দিগেন বর্মণের 'মল্ল-গীতিমাল্য' (ডিসেম্বর, ২০১৮)
- কিরীটি ভূষণ মণ্ডলের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মালো জাতির জীবন প্রবাহ' (মার্চ, ২০১৯)

অদ্বৈত মল্লবর্মণের এ পর্যন্ত মোট ছাব্বিশটি প্রবন্ধ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনোরকম আধুনিক যন্ত্র-সামগ্রীর সাহায্য ছাড়াই গ্রাম-বাংলা থেকে লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির উপকরণ সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে নবশক্তি, আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। উৎপল মণ্ডল ও রীতা মোদক সম্পাদিত 'বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধচর্যা' (১৯০১-১৯৪৭) গ্রন্থে বিশ শতকের প্রাবন্ধিকদের ধরা হলেও উনিশ শতকে যেসব প্রাবন্ধিকরা জন্মেছেন যাদের প্রতিভা বিশ শতকে বিকশিত হয়েছে তাদের প্রবন্ধের আলোচনাও এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমালোচক মিলনকান্তি বিশ্বাস গ্রাম-বাংলায় জন্মগ্রহণ করে বড়ো হয়ে ওঠার সূত্রে নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং সময়

অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে বিলীয়মান হয়ে যেতে দেখেছেন। এর ফলে অদ্বৈতের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক আত্মিক নৈকট্য অনুভব করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে লোকসংস্কৃতি বিষয়টি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন যার অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। এছাড়াও চিত্রকলা, অভিনয়, জীবনী, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উপরিউক্ত প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ' প্রবন্ধে তাঁর লোকসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধগুলি হল ত্রিপুরার একটি বারোমাসি গান (নবশক্তি, ৩ জানুয়ারি, ১৯৩৬), দুইটি বারোমাসি গান (নবশক্তি, ১০ জানুয়ারি, ১৯৩৬), পল্লীসঙ্গীতে পালাগান (নবশক্তি, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬) ইত্যাদি। বারোমাসি গানগুলি পল্লীর নিরক্ষর সমাজের প্রাণস্বরূপ। এই প্রবন্ধগুলিতে বারোমাসি গানের শ্রেণিবিভাগ, ভাটিয়ালি গানের সঙ্গে বারোমাসি গানের তুলনা, বিভিন্ন ধরনের পালাগান প্রভৃতি বিষয়ে প্রাবন্ধিক সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়া আনুষ্ঠানিক গান হিসেবে 'নাইওরের গান' (নবশক্তি, ৪ নভেম্বর ১৯৩৮) ও 'ভাইফোঁটার গান' (নবশক্তি, ২৮ অক্টোবর, ১৯৩৮) উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতের 'মাঘ মণ্ডল' (নবশক্তি, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৩৮) প্রবন্ধে মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া, কথা, আলপনা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'পুতুল বিয়ের ছড়া' (নবশক্তি, ২১ অক্টোবর, ১৯৩৮) তে পুতুলের রূপকের মধ্য দিয়ে বালিকাদের খেলার আসর থেকে কীভাবে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হত, সেই ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে পল্লিসম্পদ, এদেশে ভিখারী সম্প্রদায়, পাখির গান ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

সূর্যেন্দু দের 'মাছ-জল-মৎস্যজীবী ১ম খণ্ড' বইটি তথাকথিত অর্থে মাছ চাষের বা মৎস্যপালনের গতানুগতিক বই নয়। দীর্ঘ অনুশীলন ও গবেষণায় প্রায় অজ্ঞাত একটি সমাজ জীবনের অন্ধকারময় গভীর সঙ্কটের বিবিধ ভাবনা গেঁথেছেন একান্ত ভালোবাসায় নিপুণ তথ্যরাজির সমারোহে ও বিশ্লেষণে। এখানে জলের সমস্যা, মাছের সমস্যা যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বিধৃত, তেমনি মৎস্যজীবী মানুষের জীবনক্রন্দন উঠে এসেছে জীবিকা হারানোর হাহাকারের সমাজ বিশ্লেষণে। সমুদ্রে মাছ ধরার পরিবেশগত সঙ্কট ও অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও গ্রন্থকার উপস্থাপিত করেছেন দীর্ঘ তথ্যের সমারোহে। প্রতিবেশী দেশ- বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মাছ ধরা প্রতিযোগিতার অসুস্থ রেষারেষি ও অনাবশ্যক-অনভিপ্রেত রাজনৈতিক সঙ্কটও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বিষয়ের ও ভাবনার গভীরতায়।

দিগেন বর্মণের 'মল্ল-গীতিমাল্য' গ্রন্থে ধরা পড়েছে মালোদের নানা গান। মালোদের গানে গৌরের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে, মালোরা কোন কোন দেবদেবীর পুজো করতেন, কোন কোন ব্রত পালন করতেন সেগুলো নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। বাংলার লোকজীবনে 'বারোমাসি' গীত এক সময় ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। এর জন্য মঞ্চ যেমন ব্যবহৃত হত, তেমনি গায়কদের মুখে মুখেও এই সংগীত গীত হত। এই বারোমাসি গানগুলিও তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন। গানের মতই ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, মন্ত্র, ব্রতকথা, পরস্তাব, ঝড় হওয়ার জন্য গালি ইত্যাদি। ফলে গ্রন্থটি অভিনবত্বের দাবি রাখে।

কিরীটি ভূষণ মণ্ডলের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মালো জাতির জীবন প্রবাহ' গ্রন্থে সামগ্রিক মালো জাতির বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মালোদের জীবনপ্রবাহ অর্থাৎ সকলের খাদ্যাভাস, মাছ ধরার ক্রিয়া কৌশল, সমাজ পরিচালন ব্যবস্থা, ভাষার প্রয়োগ প্রায় একই রকম। বাংলাদশের খুলনা জেলা, নরাইল জেলার মালোদের জীবনপ্রবাহ, তাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন জাল ও জাল তৈরির কৌশল তুলে ধরেছেন। এখানে লেখক ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রামে মালোদের ঘরবাড়ি, তাদের খাওয়া দাওয়া, অতিথিপরায়ণতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা এক কথায় অনবদ্য।

'ভাসমান' পত্রিকার (সম্পাদক- সুশান্ত হালদার, খগেন হালদার, দিগেন বর্মণ) – বিভিন্ন সংখ্যায় প্রধানত অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সাহিত্য কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' কেন্দ্রিক লেখাই বেশি করে আলোচিত হয়েছে পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম শতবর্ষে প্রকাশিত 'ভাসমান'-এর সংখ্যাটিতেও বিষয় অদ্বৈত ও তার সাহিত্যের বিভিন্ন দিক। মৎস্যজীবী মালো পরিবারের সন্তান অদ্বৈতের লেখা গ্রন্থটিতে মালো সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতির বেশ কিছু দিক সূক্ষ্ম ভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি নিয়ে বা অদ্বৈত মল্লবর্মণ কেন্দ্রিক গবেষণা গ্রন্থের তালিকা নেহাত ছোট নয়।

'Fisheries and Fishermen'- Rup Kumar Barman গ্রন্থটিতে ঔপনিবেশিক বঙ্গের এবং পরবর্তী সময়ের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং তাদের জীবিকা সংক্রান্ত আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

কথাসাহিত্যে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থগুলিতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও মালো সম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থার কথা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি।

এপ্রসঙ্গে গবেষক বাসুদেব সরকারের 'মালদহ জেলার মালো সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা-কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা কাজটি মূলত ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা- ১। গবেষণার উদ্দেশ্য গবেষণার যৌক্তিকতা গবেষণার প্রশ্ন গবেষণার পদ্ধতি গবেষণার সীমাবদ্ধতা গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পর্যালোচনা, ২। মালদহ জেলার পরিচয়, ৩। মালো জাতি-গোষ্ঠীর সমাজ-ইতিহাস, ৪। মালো জাতি-গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার নানা অনুষঙ্গ, ৫। সংস্কৃতির চাল-চিত্র, ৬। ভাষা। এছাড়া কিছু দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংযোজন করেছেন গবেষক।

প্রথম অধ্যায়ে বাসুদেব সরকার গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গবেষণা কর্মটি করেছেন। মূলত ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, জনগোষ্ঠীগত তথ্যকে প্রধান্য দিয়ে।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক। ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে মালো জনজাতি, বিভিন্ন শ্রেণির মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক দপ্তরের (মীন ভবন, মৎস্য দপ্তর) মানুষজনের কাছে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই জনজাতির (মালো) সামগ্রিক পরিচয় সন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলি রচিত। গবেষণা পদ্ধতি মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর হলেও পাশাপাশি গবেষক বেশ কিছু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের সংগ্রহকেও কাজে লাগিয়েছেন। গবেষক গবেষণার জন্য মালদহ জেলার সমস্ত ব্লকে যেতে পারেননি। মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িতে এবং কর্মস্থলেও (নদ-নদী-জলাশয়ে) গিয়েছেন, এছাড়া বিভিন্ন সমবায় সমিতিতেও গিয়েছেন। মৎস্যজীবীদের সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। মৎস্যজীবীদের নিয়ে আয়োজিত রাজ্য সম্মেলনেও অংশ নিয়েছেন। গবেষণা সম্পর্কিত নানা গবেষণা পত্র, পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা করা গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ পূর্বে কী ধরনের কাজ হয়েছে এবং গবেষকরা কোন কোন দিকে কী ভাবে আলোকপাত করেছেন সে

বিষয়ে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের অনালোচিত দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষক মালদহ জেলার ঐতিহাসিক পরিচয় অর্থাৎ মালদহ জেলা গঠনের ইতিহাস, মালদহের নামকরণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। মালদহ নামকরণের উৎস নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বহুদিন থেকেই হয়ে আসছে। পাল রাজবংশের প্রভাব, সেন বংশ, বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগ, মুঘল রাজত্বে মালদহ কেমন ছিল তার কথা জানা যায়। আধুনিক যুগে আর্মেনিয়ান, ডাচ, পোর্তুগীজ, ফরাসী বণিকেরা মধ্য ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে মালদহে ব্যবসা বাণিজ্য করত। মালদহ জেলার জন্মলগ্ন থেকে ভৌগোলিক অবস্থান ক্রম পরিবর্তনশীল।এই পরিবর্তনের কারণ প্রধানত দুটি- রাজনৈতিক কারণ, প্রাকৃতিক কারণ। মালদহ জেলার সীমানার কথা গবেষক উল্লেখ করেছেন। গঙ্গা মালদহ জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তের সীমানা। গঙ্গার অপর তীরে (পশ্চিমে) ঝাড়খণ্ড রাজ্য। উত্তর-পশ্চিমে বিহার রাজ্য, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে উত্তর দিনাজপুর জেলা, পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণ পূর্বে বাংলাদেশ। ভূপ্রকৃতিগত দিক থেকে মালদহ জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়- বরিন্দ, টাল, দিয়ারা। মালদহ জেলার জল জলাশয়, নদ-নদী এবং জলাভূমির পরিমাণ বেশি থাকায় 'লেক ডিস্ট্রিক্ট অব্ বেঙ্গল' নামে মালদহ পরিচিত ছিল। প্রচুর পরিমাণে খাল-বিল, খানা-খন্দ বাস্তবে এবং নথিতে-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ছোট বড় পুকুর দিঘিও এই জেলায় কম নেই। মহানন্দা, গঙ্গা, কালিন্দী, ফুলহার, ভাগীরথী, তুলসী গঙ্গা, পাগলা, বেহুলা, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, ব্রাহ্মণী, আইসেনি প্রভৃতি নদীর উল্লেখ করেছেন। জলাশয় এক ধরনের আদ্রভূমি। মনুষ্য খনিত, প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট জলাভূমিকে ভূপ্রকৃতি অনুসারে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। টাল অঞ্চলের জলভূমি, বরেন্দ্র বা বরিন্দ অঞ্চলের জলাভূমি, দিয়ারা অঞ্চলের জলাভূমির বিবরণ দিয়েছেন এই অধ্যায়ে। মালদহে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন এই অধ্যায়ে। মালদহে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য যেমন ধর্ম, জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মালো জনজাতির পরিচয় ইত্যাদি তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে মালো জাতি-গোষ্ঠীর সমাজ-ইতিহাস, উৎস সম্পর্কিত পৌরাণিক তথ্য, ঐতিহাসিক তথ্য, সমাজ-ইতিহাস, মালো শব্দের উদ্ভব, মালো সম্প্রদায়ের শ্রেণিবিভাগ, আদি বাসভূমি, মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের বর্তমান বসবাস স্থান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষক।

চতুর্থ অধ্যায়ে মালো জাতি-গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার নানা অনুষঙ্গ পারিবারিক সূত্রে মালো সম্প্রদায়ের পারিবারিক সম্পর্ক, প্রচলিত রীতিনীতি, গুরুবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন আধিভৌতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক সূত্রে মহাজনী শোষণ, মহাজনী শোষণের রকমফের, অন্ত্যজ জাতি বলে মালোদের কোণঠাসা জীবন, শিক্ষালাভের সুযোগের অভাব, তাদের বেহিসেবী স্বভাব, নদীর ভাঙাগড়া, জলাশয়ের চরিত্র বদল, মালোদের পেশাগত সমস্যা, পেশা পরিবর্তন, পদবি পরিবর্তনের কিছু কারণ, পোশাক, অলঙ্কার, ঘরবাড়ি, খেলাধূলা, শিশুদের খেলাধূলা, মাছ ধরার প্রাসঙ্গিক উপকরণ, মাছ ধরার অন্যান্য উপকরণ, বিভিন্ন প্রকার জালের নাম ও বর্ণনা, মাছ ধরার সময় নানা বিপদ-আপদের পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে সংস্কৃতির চাল-চিত্র, উৎস ও ভিত্তি, মালদহ জেলার সংস্কৃতি, মালো সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ, তিন নাথের মেলা/আসর, গঙ্গা পূজা, মনসা পূজা, নৌকা পূজা, দুর্গা পূজা, কালীপূজা, অন্যান্য, বিভিন্ন ধরনের ব্রত/পূজা, বিভিন্ন উৎসবের গান, চড়ক পূজা, নীল পূজা, হাজরা পূজা, বিভিন্ন ধরনের কর্মসংগীত, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, প্রচলিত লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, হ্যাঁচকা জাঁক ইত্যাদি এই অধ্যায়ে গবেষক আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভাষা অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি, শব্দভাণ্ডারের কথা তুলে ধরেছেন।

এরপর গবেষক শেষে পরিশিষ্ট অংশে সাবেক মালো এবং অভিবাসিত মালো এদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য তুলে ধরেছেন। এছাড়া মালদহ জেলা এবং মালো সম্প্রদায় সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন গবেষক।

(৪)

এবারে আসা যাক গবেষণা পদ্ধতির কথায়। গবেষণা পদ্ধতির জন্য বেশ কিছু অপরিহার্য গ্রন্থের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। সেই গ্রন্থগুলি সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের সাহায্য নিয়েছি। এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব সংগ্রহও কাজে লাগিয়েছি। এই গবেষণায় মালো সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষাও করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণায় অগ্রসর হয়ে

ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য প্রশ্ন তৈরি করে নিয়ে তার উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

এরপরে এই গবেষণাকর্মের তথ্যসংগ্রহের কথায় আসা যাক। মালোদের নিয়ে লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, মালোদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাবলী নিয়ে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধাবলী ও প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভাসমান পত্রিকার সংখ্যাগুলি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল কালচারাল সোসাইটির বর্তমান সভাপতি রণবীর সিংহ বর্মণের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। এছাড়া মালোদের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস সংক্রান্ত বেশ কিছু বইপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ভাসমান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও লেখক দিগেন বর্মণ, সূর্য্যেন্দু দে, রূপকুমার বর্মণ, রণবীর সিংহ বর্মণের কাছ থেকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বেশ কিছু বই সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মের জন্য সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য-উপাদানগুলিকে আকর ও সহায়ক উৎসভেদে এবং বিষয়ভেদে সুবিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে মালো সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই মৌখিক তথ্য-উপাদান (oral Data) সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা ‘পরিশিষ্ট ক’ অংশে সংযোজন করা হয়েছে। মালোদের ব্যবহৃত নৌকা, জাল, ঘরবাড়ি এবং হ্যাচারির চিত্রাদিও ‘পরিশিষ্ট ক’ অংশে সংযুক্ত করা হয়েছে। মাছের উৎপাদন, মৎস্যজীবী সংক্রান্ত নানা রিপোর্ট ‘পরিশিষ্ট খ’ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মালো জাতির উৎস ও বিকাশ

প্রথম অধ্যায়

মালো জাতির উৎস ও বিকাশ

খাদ্য, প্রজনন এবং সংরক্ষণ- এই তিনটি মৌলিক জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ গড়ে উঠেছে। সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে নদীবর্তী এলাকা। আদি সংস্থাপনগুলোই তার প্রমাণ। এই অধ্যায়ে অনার্যজাতি, আর্যজাতি, ব্রাত্য, কৈবর্ত, মালো এদের উদ্ভব, লোককাহিনি, বিকাশ এবং তৎকালীন বর্ণভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে পাওয়া তথ্যসমূহ তুলে ধরা হবে। কৈবর্ত, মালো, মৎস্যজীবী এরা একই না আলাদা সেই সম্পর্কে অধ্যায়ের শেষে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ ছিল শুধুই খাদ্যসংগ্রাহক। সংগ্রহ তালিকায় পশু ও অন্যান্য প্রাণীই ছিল প্রধান। প্রসঙ্গত, মৎস্যশিকার বা মৎস্যাহরণ তার অন্তর্গত। পরবর্তীকালে (আনুমানিক খ্রি. পূ. ৫০০০-১৩০০ অব্দ) কৃষিকৌশল আবিষ্কারের ফলে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল জমির ওপর। আমরা জানি, উর্বরা জমির অবস্থান সাধারণত নদীতীরে। এই কারণে আহরণজীবী ও কর্ষণজীবী- উভয়শ্রেণির মানুষরা নদীতীরবর্তী অঞ্চলকে বসবাসের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেয়। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে সিন্ধুনদ ও গঙ্গার অবদানের কথা বহুবিদিত সত্য। ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, পরবর্তীকালের বাঙালি সভ্যতাও প্রধানত নদী-প্রভাবিত।

সর্বপ্রথম কোন সময়ে বাংলাদেশে মানুষের বসতি আরম্ভ হয় তা জানবার কোন উপায় নেই। বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যগণ যখন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন তখন ও তার বহুদিন পরেও বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। বৈদিক সূক্তে বাংলার কোন উল্লেখ নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য ও দস্যু বলে যে সমুদয় জাতির উল্লেখ আছে তার মধ্যে পুণ্ড্রেরও নাম দেখতে পাওয়া যায়। এই পুণ্ড্র জাতি উত্তরবঙ্গে বাস করত। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের লোকের নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত বলে বর্ণিত হয়েছে এবং এই দুই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এইরূপ বিধান আছে।

এই সমুদয় উক্তি হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হবে যে বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্যজাতির বংশসম্ভূত নহেন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আর্যগণ এদেশে আসবার পূর্বে বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করত। নৃতত্ত্ববিদ্গণও বর্তমান বাঙালির দৈহিক গঠন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করেছেন।

বাংলার প্রাচীন অধিবাসী এই সমুদয় অনার্যজাতির শ্রেণিবিভাগ ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুধীগণ একমত নন। বাংলাদেশে কোল, শবর পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়। এরাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাইরেও এই জাতীয় লোক দেখতে পাওয়া যায়। ভাষার ঐক্য থেকে এদের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই মানব গোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' অথবা 'অস্ট্রিক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ এদেরকে 'নিষাদ জাতি' আখ্যা দিয়েছেন। ভারতবর্ষের বাইরে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় এই জাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশি।

নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। এদের একটির ভাষা দ্রাবিড় এবং আর একটির ভাষা ব্রহ্ম-তিব্বতীয়। এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

এই সকল জাতিকে পরাজিত করে বাংলাদেশে যারা বাস স্থাপন করেন, এবং যাদের বংশধরেরাই প্রধানত বর্তমানে বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সকল বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তারা যে বৈদিক আর্যগণ হতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। রিসলি সাহেবের মতে মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীন বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোনো কোনো মোঙ্গলীয় পার্বত্যজাতি বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে বাস স্থাপন করেছে কিন্তু এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বাঙালি জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নেই তা সর্বজনসম্মত। আর দ্রাবিড় নামে কোনো পৃথক জাতির অস্তিত্বই পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন না।

নিষাদ জাতির পরে দ্রাবিড়ভাষাভাষী শ্রেণিভুক্ত এক জাতি বাংলাদেশে বাস ও বাঙালি জাতির সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে তারা নবাগত আর্যগণের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিল যে তাদের পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। কিন্তু আর্য উপনিবেশের পূর্বে ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার ফলে এই বাঙালি জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কয়েকটি

বিশিষ্ট অঙ্গ- যেমন কর্ম ও জন্মান্তরবাদ, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজাপ্রণালী এবং শিব, শক্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা, এবং পুরাণবর্ণিত অনেক কথা ও কাহিনি- তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লৌকিক ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ ক্রিয়ায় হলুদ, সিন্দূর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প, ধুতি শাড়ি প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলেই মনে হয়। আর্যজাতির সংস্পর্শে আসবার পূর্বে বর্তমান বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত।

বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক ধর্মসূত্রে বাংলাদেশ আর্যাবর্তের বাইরে বলে গণ্য হলেও মানবধর্মশাস্ত্রে এটি আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত এবং পুণ্ড্র জাতি পতিত ক্ষত্রিয় বলে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে কিন্তু পুণ্ড্র ও বঙ্গ এই উভয় জাতিই 'সুজাত' ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত হয়েছে। পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে যে দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি যযাতির বংশজাত পূর্বদেশের রাজা মহাধার্ম্মিক পণ্ডিতপ্রবর সংগ্রামে অজেয় বলির আশ্রয় লাভ করেন এবং তার অনুরোধে তার রানি সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। এদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ। তাদের বংশধরেরা ও তাদের বাসস্থানও একই নামে পরিচিত।

আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাচীন অনার্যভাষা লুপ্ত হল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হল, বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠিত হল,- এক কথায় সভ্যতার দিক দিয়েও বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশ রূপে পরিণত হল। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে যখন কোন প্রবল উন্নত সভ্যজাতি দুর্বল অনুন্নত জাতির সংস্পর্শে আসে তখন এই শেষোক্ত জাতি নিজের সত্তা হারিয়ে একেবারে প্রথমোক্ত জাতির মধ্যে মিশে যায়। তবে পুরাতন ভাষা, ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় না- নূতনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশেও এই নীতির অন্যথা হয়নি। বাংলার প্রাচীন অনার্য জাতি আর্য সমাজে মিশে গিয়েছে। বাংলার গ্রাম ও নগরীর নামেও যথেষ্ট আর্য-প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী, চণ্ডগ্রাম, কর্ম্মান্তবাসক, স্বচ্ছন্দপাটক, শীলকুণ্ড, নব্যাবকাশিকা, পলাশবৃন্দক প্রভৃতি বিশুদ্ধ আর্য নাম।

আদিপর্যায়ে জাতিভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত ছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগে একই পরিবারের কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য বা কেউ শূদ্রের কাজ করত। এই সময়ের সামাজিক রীতি-নীতি, লোকের বৃত্তি-ব্যবসা, ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কোথাও জাতিভেদের অস্তিত্বের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগে জাতিভেদ বংশগত হয়ে পড়ে। এ সময় আর্যসমাজের মূলভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়- বর্ণপ্রথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই চারবর্ণের ওপর ভিত্তি করে আর্যসমাজ সংগঠিত হয়ে ওঠে।

বঙ্গবাসীর প্রতি বৈদিক আর্যদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়ে আর্যরা পঞ্চনদের উপত্যকা থেকে যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে, অনার্য জাতিগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে তাদের ততই সংমিশ্রণ ঘটেছে। অতুল সুর তার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে, এ মিশ্রণ ঘটেছে মূলত বিয়ের মাধ্যমে। তিনি লিখেছেন-

> 'তাঁরা (আর্যরা) এদেশে অনার্যদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছিলেন। তাঁরা বহুক্ষেত্রে যে শুধু অনার্য মেয়েদের বিবাহ করেছিলেন তা নয়, তাঁরা অজ্ঞাতকুলশীল বহু ব্যক্তিকে- যেমন সত্যকাম, জবাল, মহীদাস, ঐতরেয় ইত্যাদিকে নিজের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছিলেন।'[১]

আর্য সমাজ আদিতে চার বর্ণে বিভক্ত হলেও ক্রমে বহু সংখ্যক বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়। যে সময় বাংলায় আর্যপ্রভাব বিস্তৃত হয় সে সময় আর্য সমাজে এরূপ বহু জাতির উদ্ভব হয়েছে। মনুসংহিতাতে উক্ত হয়েছে যে বিভিন্ন বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীর সন্তান থেকেই এই সকল মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন কোন বর্ণ অথবা জাতির মিশ্রণের ফলে কোন কোন মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হল তার সুদীর্ঘ তালিকা আছে। এই তালিকাগুলির মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা যায়।

বল্লাল সেনের প্ররোচনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালির প্রকৃত জীবনধারা নির্মম কাঠামো বা ছকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের প্রবল আগ্রহে এবং বল্লাল সেনের উৎকট পৃষ্ঠপোষকতায় সে সময় বাংলাদেশে নানা জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি করা হয়। সেন রাজত্বের অব্যবহিত পরেই 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' রচিত হয়েছিল। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তার অব্যবহিত পরে রচিত হয়েছে। এতে ব্রাহ্মণের মাছ মাংস খাওয়ার বিধি আছে এবং ব্রাহ্মণেতর সকল লোককে ৩৬ টি শূদ্র জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। আর্যাবর্তের অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী, এবং বাংলায়

চলিত কথায় এখনও ছত্রিশ জাতির উল্লেখ আছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত হয়েছে যে রাজা বেন বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করবার অভিপ্রায়ে বলপূর্বক বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন করেন এবং এর ফলে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই মিশ্রবর্ণগুলি সবই শূদ্র জাতীয় এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন সংকর শ্রেণিতে বিভক্ত।

উত্তম-সংকর বিভাগ:

করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গান্ধিক-বণিক, নাপিত, গোপ (লেখক), কর্মকার, তৌলিক (সুপারি-ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খিক, দাস (কৃষিজীবী), বারজীবী, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বুলী এই কুড়িটি উত্তম সংকর।

মধ্যম-সংকর বিভাগ:

তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক- এই বারটি মধ্যম সংকর।

অন্ত্যজ বা অধম-সংকর (বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত) বিভাগ:

মলেগ্রহী (মলেগৃহি), কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘন্টজীবী বা ঘট্টজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল এই নয়টি অধম সংকর; এরা অন্ত্যজ ও বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নয়।

গ্রন্থে ৩৬ টি জাতির উল্লেখ আছে- কিন্তু এই তালিকায় আছে ৪১ টি; সুতরাং ৫ টি পরবর্তীকালে যোজিত হয়েছে। যাদের পিতা মাতা উভয়ই চতুর্বর্ণভুক্ত তারা উত্তম সংকর, যাদের মাতা চতুর্বর্ণভভুক্ত কিন্তু পিতা উত্তম সংকর তারা মধ্যম সংকর এবং যাদের পিতামাতা উভয়ই সংকর তারা অধম সংকর, এই সাধারণ বিধি অনুসারে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণি বিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে। উত্তম ও মধ্যম সংকরভুক্ত বর্ণের অধিকাংশই এখনও বাংলায় সুপরিচিত জাতি। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' অনুসারে করণ ও অম্বষ্ঠ সংকর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা ব্যবসা করত বলে বৈদ্য নামেও অভিহিত হয়েছে। করণেরা লিপিকর ও রাজকার্যে অভিজ্ঞ এবং সৎশূদ্র বলে কথিত হয়েছে। এই করণই পরে বাংলায় কায়স্থ জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্য ও কায়স্থ উচ্চ জাতি বলে

পরিগণিত হয়। শঙ্খকার, দাস (কৃষিজীবী), তন্তুবায়, মোদক, কর্মকার ও সুবর্ণবণিক জাতি বাংলায় সুপরিচিত, কিন্তু বাংলার বাইরে বড় একটা দেখা যায় না।

তত্ত্বগতভাবে বর্ণ মাত্র চার রকমের- ব্রাহ্মণ- পুরোহিত, ধর্মজগতের গুরু, ক্ষত্রিয়- রাজা, যোদ্ধা, আর অভিজাতবর্গ, বৈশ্য-ব্যবসায়ী, বণিক, অন্যান্য কাজে যুক্ত মানুষ এবং শূদ্র- চাষি, দাস ইত্যাদি। এই ভেদ-প্রথার যে একটা জাতিগত উৎস আছে এই তত্ত্বকে সমর্থন করে জাতি আর বর্ণের অনুষঙ্গের যোগ। মহাভারতে যেখানে ভৃগু ভরদ্বাজকে জাতির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যগণের বর্ণ পীত আর শূদ্রগণের বর্ণ কৃষ্ণ হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে জাতিগুলো কোনোভাবেই বিশুদ্ধ বা অমিশ্র ছিল না। ভরদ্বাজের মতে যদি বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন জাতি নির্দেশ করে তবে বলতে হয় সব জাতিই মিশ্র জাতি (মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৮,৬)। ভরদ্বাজ এই বিভাগ নিয়ে বেশ অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। ভরদ্বাজ প্রশ্ন করলেন যে সকলেই কাম, ক্রোধ, ভয়, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা আর শ্রম এই সকলের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে আমাদের সকলের জাতির মধ্যে তফাত কোথায়। চার বর্ণে সমাজের এই বিভাগ খুব সম্ভব সব সময় তত্ত্বগতভাবেই ছিল। প্রাচীনতম কাল থেকেই আমরা অনেক বেশি জটিল শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই। আর নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও ভারতের মতো প্রাচীন, বহুজাতিক সমাজে এটাই প্রত্যাশিত। জাতিগত উপাদান ছাড়া অর্থনৈতিক উপাদানও আছে যেহেতু এর মধ্যে শ্রম-বিভাগের, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কথা রয়েছে। গায়ের রং বা বর্ণ দিয়ে জাতি বিভাগ বস্তুত প্রাচীনতম সাহিত্যেও বিরল এবং ভরদ্বাজ যেমন বলেছেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে মিশ্রবর্ণের প্রতিনিধি রয়েছে।

বংশানুক্রমিক জাতিবিন্যাস বহু হিন্দুশাস্ত্রেই স্বীকৃত নয়। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণত্বের বিচার করতেন তাদের আচরণ দিয়েই (সত্যাশ্রয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু ইত্যাদি) এবং জানিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না, তেমনি পিতা-মাতা শূদ্র হলেই একজনকে শূদ্র বলা সংগত নয় (মহাভারত, বনপর্ব)। সংস্কৃত সাহিত্যের আরও নানা গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত হয়েছে। তাই যখন কোনও গোঁড়া হিন্দু বলেন, বর্ণ-বিভাগ বা জাতিভেদ হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তখন তিনি ভারতের ধর্মীয় সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকেই উপেক্ষা করে বসেন। জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন হিন্দু ইতিহাসের নানান পর্বেই দেখা গেছে। জ্ঞানমার্গের লোকেরা মোটের ওপর বর্ণবিভাগের সমর্থক। কারণ এই পন্থাটি তার প্রকৃতিগত কারণে উচ্চশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বর্ণভেদ যে ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে বিশেষ এক সামাজিক সমঝোতা বা আপস ছাড়া আর কিছু নয় প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণে এই

কথাটি বলা হয়েছে। ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে যে চতুর্বর্ণের সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান সেইজন্য তারা সকলেই এক বর্ণের। সমস্ত মানুষের জনক এক আর একই জনকের সন্তানদের কখনো ভিন্ন জাত হতে পারে না।

আর্যরা ভারতবর্ষে আসার অনেক আগে থেকেই অনার্যভূমি ও আর্যেতর জাতিগুলোর মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার তীব্র ছিল। উচ্চজাতির লোকেদের তুলনায় নিম্নজাতির লোকের মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের তীব্রতা অধিক ছিল। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ব্যাপারটি আর্যরা ভারতে আমদানি করেনি। বরং এখানে এসে এই প্রথাটি তারা অনার্যদের কাছ থেকে পেয়েছে। হয়তো বা তাদের আগমনের পর ভারতে এই প্রথাটি মৃদু থেকে তীব্রতর হয়েছে। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিষয়ে লিখতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন-

> ‘এই প্রথাটি খুব সম্ভব আর্যেরা ভারতে লইয়া আসেন নাই। এখানে আসিলে আর্যদের মধ্যে এদেশীয় নানা জাতির লোকের মধ্যে পূর্ব হইতে ভেদ-বিভেদ চলিতেছিল তাহার প্রভাব আসিল। তাঁহারা তাহা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। খুব সম্ভব বহুকাল পর্যন্ত তাঁহারা ইহা স্বীকার না করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে সংখ্যার বাহুল্যের কাছে তাঁহাদের হার মানিতে হইয়াছে। এখন তাঁহাদের মনেও এই জিনিসটা এমন গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা ইহাকেই তাঁহাদের বর্ণগত শ্রেষ্ঠতর প্রধান প্রতিষ্ঠা মনে করেন।’[২]

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণরা রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চন্ডাল, পুক্কশ, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক জাতির লোকদেরকে স্পর্শ করত না এবং তাদের তৈরি খাবারও খেতো না। এই বিধান লঙ্ঘনকারীদের প্রায়শ্চিত্ত করে শুচি হতে হতো।

বঙ্গদেশেও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিধিনিষেধ কালক্রমে ভয়ানক আকার ধারণ করে। এখানে এই ব্যাপারটি ছিল অনেকটা জল ও অন্নকেন্দ্রিক। মূলত, জলকে ঘিরেই বাংলাদেশে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ব্যাপারটি ভয়াবহভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সবাইকে চণ্ডাল ও অন্যান্য অন্ত্যজশ্রেণি-স্পর্শিত জলপান করলে প্রায়শ্চিত্ত করে পানীয়দোষ স্খলন

করতে হতো। অন্ত্যজ-জাতরা এখনকার মতো তখনও অস্পৃশ্য ছিল। ১০ নং চর্যাগীতি এর উদাহরণ বহন করছে-

'নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ ।'[৩]

বাংলাদেশে যে-সমস্ত জাতের হাত থেকে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করত না তারা হল মুচি, ভুঁইমালী, ফুলমালী, রাজবংশী, ভড়, মাল, কোনাই, বাউরি, ডোম, কোরা সাঁওতাল, ধোপা ও জেলে। বর্ণবিভাজনের যাঁতাকলে পড়ে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষরা তখন নিষ্পেষিত। প্রথাদীর্ণ বর্ণবৈষম্যের দমবন্ধ করা পরিবেশে এই সময় নিম্নবর্গের মানুষরা মুক্তির পথ খুঁজছিল। তুর্কিবিজয় এই মুক্তিকামী মানুষের সামনে স্বস্তির দ্বার খুলে দিল। তুর্কিবিজয়ের ফলে সামাজিকের মধ্যে, সমাজব্যবস্থায়, জনজীবনপ্রবাহে নতুন করে ভাঙাগড়া শুরু হলো। এই সময় ব্রাহ্মণদের আত্মশ্লাঘা এবং নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি বর্ণহিন্দুদের আন্তরিক অবহেলা-অবিচারের ফলে বাংলায় মুসলমানদের ইসলাম প্রচার সহজতর হয়।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' য় রয়েছে

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ।।'[৪] (অধ্যায়-৪, শ্লোক-১৩)

অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) মানব-সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

ভগবানই সব কিছুর স্রষ্টা। তার থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই সব কিছু রক্ষা করেন, আবার প্রলয়ের পরে সব কিছু তারই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সমাজের চারটি বর্ণও তারই সৃষ্টি। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে, তাদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তারা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এর পরের স্তর হচ্ছে শাসক সম্প্রদায়, এদের বলা হয় ক্ষত্রিয় এবং এরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে ব্যবসায়ী

সম্প্রদায়, এদের বলা হয় বৈশ্য এবং এরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র, এরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এভাবে গুণানুসারে কর্মবিভাগ করে চারবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

ঋগ্‌বেদের পুরুষ সূক্তের একটি মন্ত্রে বলা আছে, বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুস্বরূপ ছিলেন, ঊরু বৈশ্য এবং পদদ্বয় হতে শূদ্র জাত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এগুলি বর্ণ, জাতি নয়। ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটির সরল অর্থ করলে মনে হয় চারটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বিভিন্ন কর্মবিশিষ্ট বর্ণের সমাবেশের দ্বারা সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হয়েছে।

'হরিবংশে' বর্ণিত হয়েছে যে অক্ষর হতে ব্রাহ্মণরা, ক্ষর হতে ক্ষত্রিয়রা, বিকার হতে বৈশ্যরা, ধুমবিকার হতে শূদ্ররা উৎপন্ন।

'মহাভারতে' শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, নারায়ণের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ থেকে অন্যান্য বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

'পদ্মাপুরাণে' বর্ণিত হয়েছে যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে আগে ব্রাহ্মণকেই সৃজন করেছিলেন, পরে পৃথক পৃথক সমস্ত বর্ণ তাদেরই বংশে উৎপন্ন হয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরেই ভারতবর্ষীয় সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, সেটা মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত। একদিকে সেবাগ্রাহী, অন্যদিকে সেবাদাস। সেবাদাসরাই প্রধানত সমাজে প্রাণশক্তির যোগান দিয়েছে। উৎপাদনশীলতার মৌলিকস্তরেই তাদের অবস্থান। কিন্তু তাদের অবস্থা বরাবরই ছিল শোচনীয়। এদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

> 'চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরি সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন। তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।'[৫]

এই ‘পিলসুজ’ রাই উৎপাদকশ্রেণি; অথচ তারাই উচ্ছিষ্টজীবী এবং সর্বাধিক অসম্মানিত। তারা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বর্ণাভিমান তাদেরকে করেছে দলিত। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে- এইসব শূদ্রের পবিত্র কাজ হলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য- এই তিন উচ্চবর্ণের সেবা করা। বিনিময়ে খাবে উচ্ছিষ্ট, পরবে ছিন্নবস্ত্র, ভূমিতলই তাদের নিদ্রাস্থল। দাসত্বেই তাদের পুণ্য, তাদের অধিকার মানেই দাসত্ব। বিদ্যার্জন, অস্ত্রধারণ ও অর্থসংগ্রহ তাদের জন্য পাপ। ‘রামায়ণ’ এর শূদ্র-উপাসক শম্বুকমুনি এইসব অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেছেন অর্থাৎ বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন বলে রাঘব শ্রীরামচন্দ্র তাকে হত্যা করেছেন। ‘মহাভারতে’ দেখা যায়, দ্রোণাচার্যের ব্রাহ্মণ্যপ্রতাপে অনার্য একলব্যকে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করতে হয়েছে গুরুদক্ষিণার নামে।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশের জনসমাজে দাস বা নীচু শ্রেণিরূপে একটা শ্রেণি ছিল এবং আছেও। যেমন- রোমানদের ছিল ক্রীতদাস, স্পার্টানদের সেবাদাস, ইংরেজদের ভূমিদাস, আমেরিকানদের নিগ্রো, জার্মানদের ইহুদি আর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অস্পৃশ্য। আচার-সর্বস্ব হিন্দুধর্মের অনুশাসনের ফলে এই অস্পৃশ্যরা অন্ত্যজ, মন্ত্রহীন, ব্রাত্য। অথচ, ব্রতে নিষ্ঠাবান যারা তারাই ব্রাত্য। পাণিনির মতে, ‘ব্রাত্য’ শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে ‘ব্রাত+ন্যহ্’ থেকে। ‘ন্যহ্’-এর অর্থ ‘তজ্জাত’ অর্থাৎ তার অন্তর্গত। সহজ কথায় ‘ব্রাত্য’ শব্দের অর্থ হল- জনসমূহের অন্তর্ভুক্ত বা সমাজের সদস্য অথবা সামাজিক। সুকুমার সেন লিখেছেন যে প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্য-ভাষীরা সমাজরীতির দিক দিয়ে দুই দলে বিভক্ত ছিল। প্রধান দল গ্রাম্য বা গ্রাম্যবাসী গ্রাম নিয়ে বাস করত এবং সেই গ্রাম যাযাবর ছিল। কৃষিকার্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হওয়ার পরে গ্রামের যাযাবরত্ব ঘুচে যায়। আধুনিক কালের অর্থে কুলপতি আর্যরা জমিদার বা জোতদার অর্থাৎ চাষি গৃহস্থ হয়। গ্রামের তুলনায় যাদের মর্যাদা কম তারা ব্রাত্য বলে পরিচিত হয়। পরে এর অর্থ আর্যসংস্কৃতিচ্যুত হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দলে সামাজিক ইউনিট ‘গ্রাম’ যেখানে একজন কর্তা আর সকলে তার পোষা হয়। দ্বিতীয় দলের সামাজিক ইউনিট ‘ব্রাত্য’ যেখানে সকলের সমান অধিকার এবং একজন ব্যক্তি প্রধান বলে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক কালে যেমন শাক্য বজ্জি নিচ্ছবি এরা সব এক একটি ব্রাত্য বা গণ বলে পরিচিত ছিল।

মনুসংহিতা এই উজ্জ্বল পুরুষ ‘ব্রাত্য’ দের বলেছে- সংস্কার-বর্জিত, গায়ত্রীভ্রষ্ট। মনু লিখেছেন-

‘অতঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালম সংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ।’[৬]

(দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৯ নং শ্লোক)

অর্থাৎ, এর পরে যথাকালে সংস্কারপ্রাপ্ত না হয়ে এই তিন বর্ণই গায়ত্রীভ্রষ্ট হয়ে আর্যগণের নিন্দনীয় ব্রাত্য হয়।

মনু-পরবর্তীকালে (আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের পরে) ‘ব্রাত্য’ শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে অবনতিবাচক বা নেতিমূলক। ব্রাত্য শব্দ দ্বারা বোঝানো হয় তাদের, যারা ব্রত থেকে চ্যুত বা ভ্রষ্ট। বৈদিকসাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারতে যারা পতিত ব্রাত্যশ্রেণি, আজকের দৃষ্টিতে তারা কোণঠাসা নিম্নবর্গ, হরিজন, দলিত, ছোটলোক ইত্যাদি। প্রাচীন সাহিত্যে রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, মেদ, ভিল্ল ও কৈবর্ত- এই সাতটি শ্রেণি অন্ত্যজ বা ব্রাত্যরূপে উল্লিখিত।

আমাদের দেশের সামাজিক বিভাজনের মূল ভিত্তি চতুরাশ্রম- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই সামাজিক ক্রমের শ্রেণি বিভাগে মৎস্যজীবী বা কৈবর্তদের অবস্থান নির্ধারণ করা দুরুহ। মহাভারতে যে সূত্র পাওয়া যায় তাতে মৎস্যজীবীদের ‘দাস’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের ‘নাবোপজীবী’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে নৌচালক বা মাঝি বলতে জেলেদের কথাই বোঝাত। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত সূত্রের উদাহরণ থেকে বলা যায় কৈবর্তরা দাস শ্রেণিভুক্ত। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্তদের স্থানগত, পেশাগত এবং শ্রেণিগত এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হাটন সাহেবের অভিমতে এই পরিবর্তনের কারণ হল শিক্ষার উচ্চমান এবং পার্থিব উন্নতি একটি গোষ্ঠীকে প্রথমে নিজেদের চোখে এবং পরে ধীরে ধীরে অন্য জাতির সাধারণ ধারণায় উন্নত প্রতিপন্ন করে। যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে নিঃসন্দেহে অনিচ্ছাসহ স্বীকৃতি পেতে সক্ষম হয়। কিন্তু অবশেষে সেই গোষ্ঠী যে গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তার থেকে উন্নত গোষ্ঠী হিসাবে হয়তো কমবেশি সাধারণ স্বীকৃতি পায়।

কৈবর্তের একাধিক অভিধা রয়েছে। যেমন মৎস্যঘাতী, মৎস্যজীবী, মাছধরা, মাছমারা, মল্লবর্মণ, জেলে, জলদাস, পাতর, ধীবর, রাজবংশী, কেওট, দাশ, মালো, গাবর, মেছো, মাউছ্যা, জাউল্যা, জাইল্যা ইত্যাদি।

পুরাণে 'কৈবর্ত' অর্থাৎ 'ধীবর' এর অর্থ 'মৎস্যঘাতী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রায় দুহাজার বছর আগে যীশুখ্রিস্ট যাকে সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তার নাম ছিল পিটার। পিটার ছিলেন মৎস্যজীবী। পরবর্তীকালে সেই খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী ব্রিটিশরাই এদেশে পেশাভিত্তিক আদমসুমারী করার সময় বাউরী, চর্মকার, জেলে, মেথর প্রভৃতিকে তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত করল। এই সময় ব্রিটিশরা মৎস্যজীবীদের পদবী লিখল-পিটার। 'পিটার' শব্দটি পরে অপভ্রংশ হয়ে 'পাতর'-এ পরিণত হল। ব্রিটিশ আমলের জেলেদের জায়গাজমির দলিলে 'পাতর' পদবীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমনঃ চন্দ্রমণি পাতর, যুধিষ্ঠির পাতর ইত্যাদি। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব' গ্রন্থে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন-

> 'কৈবর্ত ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। কিন্তু কলিযুগে তীবরদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ইঁহারা ধীবর নামে পরিচিত হন এবং ধীবরবৃত্তি গ্রহণ করেন।'[৭]

'ভারতকোষ' এ বলা আছে-

> 'ধীবর মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী। পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ধীবর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, সেখানে ধীবরের অর্থ 'মৎস্যঘাতী'। কৈবর্ত বলিতে কেহ কেহ জালিক বা জালিয়া অর্থাৎ মৎস্যজীবী বলিয়া মনে করিলেও অনেকের মতে কৈবর্ত অর্থে 'কর্ণধার বা নৌকর্মজীবী'। ধীবর পূর্বে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা 'তীবর' নামে অভিহিত। রাজবংশীরা মৎস্যজীবী। মালো, ঝালোমালো, হালদারদের অনেকে মৎস্যজীবী। কেওট, বাগদিদেরও মৎস্যনির্ভর সম্প্রদায় বলা হয়। আদিবাসী-উদ্ভূত মাঝিরা মৎস্যজীবী। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় তাহাদিগকে দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার দুই-একটি প্রসিদ্ধ শীতলা বা চণ্ডী মন্দিরের প্রধান পূজক ধীবর।'[৮]

'রাজবংশী'রা ধীবর শ্রেণিভুক্ত। এদের মূল পেশা মাছধরা এবং মাছ বিক্রি করা। নির্মলকুমার বসু তার 'হিন্দুসমাজের গড়ন' গ্রন্থে রাজবংশী সম্প্রদায়কে মজুরশ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

হীরালাল বালা লিখেছেন-

> ‘ধীবর হিন্দুদের চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত একটি উপবর্ণ। এরা মূলত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। বৈদিকযুগে ভারতে কৃষিজীবী, পশুপালনকারী, শিকারী প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষের পাশাপাশি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকজনও ছিল। ‘বৃহদ্ধর্মপুরাণে’ বারোটি মধ্যম-সংকর শূদ্রবর্ণের মধ্যে ধীবর ও জালিক নামে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে’ উল্লিখিত ঊনত্রিশটি শূদ্রজাতির মধ্যে ধীবর একটি। প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল থাকায় দেশটি মাছে ভরা। তাই এই দেশে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল।... ধীবর সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী গঙ্গাপুত্র নামে অভিহিত।’[৯]

‘মহাভারত’এ ধীবরবংশীয় রাজাকে ‘দাশ’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘দাশ’ শব্দের অর্থ লিখেছেন-

> ‘যে মৎস্য হিংসা করে; যাহাকে (মৎস্যের মূল্য) দেয়; কৈবর্ত, ধীবর। (আয়োগবীতে নিষাদ হইতে জাত জাতি দাশ বা মার্গব। ইহারা নৌকর্ম্মজীবী। আর্য্যাবর্ত্তে ইহাদের নাম কৈবর্ত্ত।’[১০]

লোকেশ্বর বসু লিখেছেন-

> ‘বহুবিধ প্রয়োগের কথা বাদ দিলে ‘দাস’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘ভৃত্য’, ‘দাশ’ শব্দের সরলার্থ ধীবর।’[১১]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কৈবর্ত’ শব্দের অর্থ লিখেছেন-

> ‘কৈবর্ত্ত পুং [কেবর্ত্ত+ অ (অণ্) স্বার্থে]-
>
> ক) দাশ, ধীবর, কেওট, জেলে।
>
> খ) কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ী জাতি বিশেষ, জেলে কৈবর্ত্ত।’

অর্থ সন্নিবেশ করার পর তিনি টীকাকারে লিখেছেন-

"উভয় জাতির মূল নাম এক হইলেও, বৃত্তি অনুসারে মৎস্যজীবী 'কৈবর্ত্ত' কেওট বা 'জেলে কৈবর্ত' এবং কৃষিজীবী কৈবর্ত্ত 'হেলে কৈবর্ত্ত'।"[১২]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন-

'কৈবর্ত্ত [কেবর্ত্ত + অ (স্বার্থে)], বিশেষ্য, ১) ধীবর ২) দাস, ৩)

জাতিবিশেষ।'[১৩]

রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য় বলেছেন-

'কৈবর্ত- হিন্দুজাতি বিশেষ। জেলে।'[১৪]

কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন-

'কৈবর্ত- [যে জলে বাস করে, জলের সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত] বি. কেয়ট, জেলে, হিন্দুজাতি বিশেষ।'[১৫]

আবু ইসহাক লিখেছেন-

'কৈবর্ত [সং. কেবর্ত + অ (স্বার্থে)] বি.

ক) জেলে, ধীবর, মেছো।

খ) কৃষিজীবী হিন্দুজাতি বিশেষ।'[১৬]

বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'-এ লেখা হয়েছে-

'কৈবর্ত= বি. জেলে। <কৈবর্ত সং।' [১৭]

উল্লিখিত তথ্যাবলী থেকে আমরা ‘কৈবর্ত’ শব্দের দুটো প্রধান অর্থ পাই-

ক) ধীবর বা জেলে ও

খ) কৃষিনির্ভর হিন্দুজাতি।

শাস্ত্রেও দুই প্রকার কৈবর্তজাতির উল্লেখ আছে। যথা-

ক) হালিক বা চাষী কৈবর্ত এবং

খ) জালিক বা আদি কৈবর্ত।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে পৃথিবীতে যত সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে তার প্রায় সবকটিই কোন না কোন জলাশয়ের ধারে, অর্থাৎ নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের ধারে সকল সভ্যতা উৎপত্তি লাভ করেছিল। এই সকল জলাশয়ের তীরবর্তী অঞ্চলে যারা বসবাস করত তারা ছিল কৈবর্ত। কৈ-অর্থ জল। বর্ত-অর্থ আবর্তিত হওয়া বা ঘোরাফেরা করা। জলে বা জল নিয়ে যারা আবর্তিত হয় তারা হল কৈবর্ত। কৈবর্তদের দুটি শাখা একটি জলের মৎস্য শিকার, জলযান নির্মাণ ও জল নির্ভর জীবন ধারণ করত। অপরটি জলের পাড়ে পলি কাদায় জন্মানো গাছ পালা দেখে চাষাবাদ শিখল এরাও কৈবর্ত তবে হেলে কৈবর্ত বা চাষা মাহিষ্য। মনুসংহিতা’য় বলা হয়েছে যে-

‘নিষাদো মার্গবং সুতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনং।
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ।।’[১৮]

নিষাদ জাতির পুরুষ আয়োগবী জাতির নারীর শারীর মিলনে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তাকে ‘মার্গব’ বা ‘দাশ’ বলে। আয়োগবী অর্থাৎ লৌহের ন্যায় কঠিন বাক্য যার। শূদ্র জাতির মধ্যে যারা লৌহদ্রব্য নির্মাণ করে এবং সেই শূদ্রের পুরুষের সহিত বৈশ্যের কন্যার শারীরিক মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হয় সেই সন্তান হল আয়োগবী। শাস্ত্রানুসারে বৈশ্য ও শূদ্রের সংমিশ্রণে জন্ম বলে এরা জলচর, স্পর্শ করা যায় সেই অর্থে অস্পৃশ্য নয়। আবার জলপথে

যারা শিকার অনুসন্ধান করে বা সংগ্রহ করে তারা হল মার্গব। মার্গব জাতিই জেলে বা ধীবর বা মৎস্যজীবী বা কৈবর্ত। নিষাদ হল প্রাচীন খাদ্য সংগ্রহকারী আদিম জাতি যাদের মধ্যে চণ্ডাল, মালো, ধীবর, ব্যাধ অন্যতম নিষাদ জাতি। এরা সংকরায়ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কঠিন কঠোর নিয়ম মেনে চলত। সমমর্যাদা সম্পন্ন সব জাতির মধ্যেই বৈবাহিক কর্ম সম্পন্ন হত। বৈদিক চতুর্বর্ণের সঙ্গে তাদের সামাজিক কর্ম হত না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়ে বলা আছে-

'ক্ষত্রবীর্যেণ বৈশ্যায়ং কৈবর্তঃ পরিকীর্তিতঃ।'[১৯]

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়ের পরিণীতা বৈশ্যা পত্নীর সন্তানের নাম কৈবর্ত বলে পরিকীর্তিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ক্ষত্রবৈশ্যাজাত কৈবর্ত একই জাতি।

মনুসংহিতার অপর একটি শ্লোকে রয়েছে

'মৎস্যাঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্গূ নামারণ্য পশুহিংসনম্।।'[২০]

অর্থাৎ নিষাদজাতি মৎস্যবধবৃত্তি, আয়োগবজাতি কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তি, ব্রাহ্মণ হতে বৈদেহক স্ত্রীতে জাত চুঞ্চু নামক জাতি এবং ব্রাহ্মণ হতে বন্দিস্ত্রীতে উৎপন্ন জাতির এবং মেদজাতি ও আন্ধ জাতির আরণ্যক পশুহিংসাবৃত্তি জানবে, ক্ষত্রিয় হতে শূদ্রাতে জাত বন্দিস্ত্রী জানবে।

'কৈবর্ত' নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। কারো কারো মতে, এই কথাটি 'ক' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'জল' এবং 'বর্ত' কথার অর্থ জীবিকা। কিন্তু লেসেন বলেছেন যে, সেই অর্থে 'ক' এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আদি সংস্কৃততে কিছুটা অস্বাভাবিক এবং এর প্রকৃত উৎপত্তি 'কৈবর্ত' যা কিমবর্তের বিকৃতরূপ এবং যার অর্থ একজন ব্যক্তি যে মর্যাদাহীন বা মর্যাদাচ্যুত পতিতের পেশা অবলম্বন করেছে। লেসেন অন্যত্র একটি গল্পের উল্লেখ করেছেন যা একজন গ্রিক লেখকের, যার সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা নেই। অর্থাগোরাস তার 'অন থিংস ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে কৈথস গ্রামের অধিবাসীরা মাছের উপর তাদের ছাগলকে খাওয়াতো এবং বলেই যেতো। ঐ জনপ্রিয় উক্তি শুনে ঐ মিশ্র জাতির নাম হয় কৈবর্ত, যাদের মাছ ধরা এবং নৌকা চালান বৃত্তি অনুমোদিত

হয়েছিল এবং যারা হয়ে উঠেছিল কেবত্ত। গ্রিক ভাষায় 'ব' লুপ্ত হয়েছিল। এই গ্রামটি নিঃসন্দেহে সমুদ্র অথবা নদীর তীরে অবস্থিত। যে নামটি এই কারণের জন্য উৎপত্তি লাভ করেছিল, সেখানে নিশ্চয়ই কৈবর্তদের বসবাস ছিল। কৈবর্ত হল সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দ যা বাংলাতেও অক্ষুন্ন আছে। সাধারণভাবে তাদের ঐ একই নাম ব্যবহার করা হয়। যার সংক্ষিপ্ত গঠন 'কেওট'। এই দুটি শ্রেণির বিভাজন সম্পর্কে অনেকগুলি লোককাহিনি আছে। রিসলের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বাংলায় কেওট বলে একটি শক্তিশালী উপজাতি ছিল। যাদের বল্লাল সেন বিশুদ্ধ শূদ্রের মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। তাদের কৈবর্ত খেতাব দিয়েছিলেন। তাদের আদিপেশা মাছধরা তারা ছেড়ে দিয়েছিল। বৈশ্যক্ত ব্রাহ্মণদের তাদের পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। এই ব্রাহ্মণেরা তাদের বংশধর। অন্য একটি গল্পে তারা ব্যাস কর্তৃক নিযুক্ত। এই ব্যাসদেব হলেন বসুরাজের ঔরসে ও মৎস্যরূপা অপ্সরা আদ্রিকার গর্ভে মৎস্যকন্যার জন্ম হয়। মৎসের উদরে জন্ম তাই গায়ে মাছের গন্ধ। বসুরাজ তাকে দশরাজের হস্তে অর্পণ করেন এবং তাঁর দ্বারাই লালিতপালিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তা হলে নৌচালনা কার্যে নিযুক্ত হন। একদিন পরাশর মুনি তার নৌকায় যমুনা পার হওয়ার সময় এতে উপগত হবার অভিলাষী হয়ে মৎস্যগন্ধ দূর করে পদ্মগন্ধময় করেন। নাম হয় সত্যবতী। এই মুনির ঔরসে তার বিখ্যাত পুত্র বেদব্যাসের জন্ম হয়।

প্রাচীন ভারতে শূদ্রপীড়ক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যই শ্রেণিবৈষম্যের বিষময় উৎস। সমাজকে এর কুফল ভোগ করতে হয়েছে, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। বাঙালি জাতির মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের প্রতি, অর্থাৎ সেই নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ ব্রাত্যশ্রেণির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টি দিয়েছেন। হাড়ি, কাওরা, ডোম, মুচি, কৈবর্ত, কোচ প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্গীয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর অনুসন্ধানপরতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, 'কোল-বংশীয় অনার্য্য', পরে 'দ্রাবিড়-বংশীয় অনার্য্য' ও শেষে 'আর্য্য'- এই তিন রক্তের মিশ্রণে 'আধুনিক বাঙালী জাতি' র উৎপত্তি ঘটেছে। তবে, আর্যের সঙ্গে আর্যের অথবা আর্যের সঙ্গে অনার্যের বৈধ ও অবৈধ সংসর্গে বিভিন্ন সংকর জাতির উৎপত্তি হয়েছে এবং সংকরে সংকরে মিলে জাতিভেদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন। বাংলার শূদ্রদের অধিকাংশই যে অনার্যবংশসম্ভূত- এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল-

জাতি	উৎপত্তি
১) মালপাহাড়িয়া থেকে বাঙালি মাল ও মালো	অনার্য
২) ডম থেকে বাংলার ডোমজাতি	অনার্য
৩) হাড়ি (সাঁওতালী ভাষায় 'হাড়' শব্দ থেকে 'হাড়ি' শব্দের উৎপত্তি)	অনার্য
৪) 'নিষাদাখ্য' থেকে নিষাদ	অনার্য
৫) নিষাদ ও ধীবর	অনার্য
৬) মার্গব বা দাস	আয়োগবী অর্থাৎ শূদ্র থেকে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ঔরসজাত অনার্য
৭) কৈবর্ত (চাষা কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত)	

মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। জীবনধারণের তাগিদে মানুষকে কোনো না কোনো কাজকে অবলম্বন করতে হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস মানে শ্রমজীবী তথা পেশাজীবী মানুষের ইতিহাস। জীবনের জন্যই জীবিকা। আর এই জীবিকা হিসেবে মানুষ গ্রহণ করেছে নানা রকম পেশা। এর প্রাসঙ্গিক উদাহরণ মৎস্যশিকার, মাছধরা বা মৎস্যব্যবসা।

নীহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব' গ্রন্থে লিখেছেন-

> 'এই ৪১ টি জাত ছাড়া ম্লেচ্ছ পর্যায়ে আরও কয়েকটি দেশি ও ভিনপ্রদেশি আদিবাসি কোমের নাম পাওয়া যায়, স্থানীয় বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদেরও কোনো স্থান ছিল না, যথা, পুক্কশ, পুলিন্দ, খস, থর, কম্বোজ, যবন, সূহ্ম, শবর ইত্যাদি।'[২১]

কালো শূদ্রদের দেশে গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণরা পঞ্চম শতক থেকে বাস করা শুরু করে। কালো মাটির কালো মানুষরা, যারা 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' –এ শূদ্র নামে অভিহিত, তারা আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা:

সৎ (উচ্চ) শূদ্রের তালিকা:

১) করণ, ২) অম্বষ্ঠ (দ্বিজ পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তান), ৩) বৈদ্য (জনৈক ব্রাহ্মণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জাত সন্তান; বৃত্তি : চিকিৎসা), ৪) গোপ, ৫) নাপিত, ৬) ভিল্ল (এরা আদিবাসি কোম), ৭) মোদক, ৮) কুবর, ৯) তাম্বুলী, ১০) স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক (এরা পরে ব্রাহ্মণের অভিশাপে পতিত হয়ে 'অসৎ-শূদ্রে' অবনমিত হয়), ১১) মালাকার, ১২) কর্মকার, ১৩) শঙ্খকার, ১৪) তন্তুবায়, ১৫) কুম্ভকার, ১৬) কাংসকার, ১৭) সূত্রধার, ১৮) চিত্রকার (পটুয়া) ও ১৯) স্বর্ণকার।

পর্যায়ে আরও একটা শ্রেণি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই অন্ত্যজশ্রেণি ভুক্তরা হল-

অসৎ (নিম্ন) শূদ্রের তালিকা:

১) অট্টালিকাকার, ২) কোটক (যাদের বৃত্তি ঘরবাড়ি তৈরি করা), ৩) তীবর, ৪) তৈলকার, ৫) লেট, ৬) মল্ল, ৭) চর্মকার, ৮) শুঁড়ি, ৯) পৌণ্ড্রক, ১০) কসাই, ১১) রাজপুত্র (রাউত), ১২) কৈবর্ত (ধীবর), ১৩) রজক, ১৪) কৌয়ালী, ১৫) গঙ্গাপুত্র, ১৬) যুগী ও আগরী।

বর্ণবিন্যস্ত হিন্দুসমাজে অসৎ শূদ্রেরও নিচে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য ব্যাধ, ভড়, কাপালী, কোল, কোঞ্চ (কোচ), হাড়ি, ডোম, জোলা, বাগতীত, শরাক, ব্যালগ্রাহী, চণ্ডাল ইত্যাদি।

মুস্তফা পান্না -র 'বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উচ্চশ্রেণিভুক্ত। আর যারা বর্ণাধম, তারা মেহনতী বা শ্রমজীবী মানুষ। এদের কোন বর্ণ নেই, পাণ্ডুর বর্ণই এদের রং, পেশা বা জীবিকাই এদের বর্ণ। এই শ্রমজীবী মানুষ সমাজের দাস, কৃষি-উৎপাদন ও শিল্পের জন্য এরা অপরিহার্য উপাদান। মুস্তফা পান্না শূদ্র তথা এই পেশাজীবী মানুষদের তালিকা করেছেন। এই তালিকায় তিনি ৬৪ টি শ্রেণি নির্দেশ করেছেন।

তালিকাটি নিম্নরূপ-

১. বাউরী	২. চামার	৩. ধোপা	৪. ডোম	৫. দোসাধ
৬. ঘাসি	৭. লালবেগী	৮. মুসাহার	৯. পান	১০. পাশি
১১. রাজওয়ার	১২. তুরি	১৩. বাগদি	১৪. বাহেলিয়া	১৫. বাইতি
১৬. বেদিয়া	১৭. বেলদার	১৮. ভুঁইমালি	১৯. তুইয়া	২০. বিন্দ
২১. দামাই	২২. দোয়াই	২৩. গোঁড়ি	২৪. হাড়ি	২৫. জেলেকৈবর্ত
২৬. ঝালোমালো	২৭. কাদার	২৮. কামি	২৯. কান্দ্রা	৩০. কেওরা
৩১. করেংগা	৩২. কাউর	৩৩. কেওট	৩৪. ঘটিক	৩৫. কোচ
৩৬. কোনাই	৩৭. কোঁয়ার	৩৮. কোটাল	৩৯. লোহার	৪০. মাহার
৪১. মাল	৪২. মাল্লা	৪৩. মেথর	৪৪. নমঃশূদ্র	৪৫. নুনিয়া
৪৬. পলিয়া	৪৭. পাটনি	৪৮. পোদ	৪৯. রাজবংশী	৫০. সরকি
৫১. শুঁড়ি	৫২. তিয়র	৫৩. বানটান	৫৪. চৌপল	৫৫. ভোগতা
৫৬. দাবগর	৫৭. হালালখোর,	৫৮. কানজর	৫৯. কুরারিয়ার	৬০. নট
৬১. ভূমিক	৬২. ভঙ্গি	৬৩. খয়রা	৬৪ পৌণ্ড্র (পোদ)	

উল্লিখিত দুটো তালিকা থেকে একথা স্পষ্ট যে, কৈবর্তরা অসৎ- শূদ্রান্তর্গত নিম্নবর্ণের মানুষ।

লোককাহিনি অনুযায়ী কৈবর্তেরা মেদিনীপুরে স্থায়ী বসবাস শুরু করে তখন একজন কৈবর্ত-বণিক পরগণা কেশিজোড়ায় একটি বড়ো পুষ্করিণী খনন করেন। এই পুকুরটিকে উৎসর্গ করার জন্য একজন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যে তার নিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র আগুন জ্বালাতে পারবে। বৈশ্যক্তেরা এ বিষয়ে অক্ষম, কিন্তু একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ একাজে সমর্থ হয়েছিল। তার স্বজাতি ভায়েরা তাকে বিতাড়িত করেছিল। কারণ সে নিম্নবর্গের লোকেদের পুরোহিত হয়ে পূজা করেছিল। পরে সে মেদিনীপুরে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। ধীবরদের অন্য এক গোষ্ঠী, রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কে কে.সি.দে উল্লেখ করেছেন রাজবংশীরা মনে করে যে, একদা এক রাজার স্বর্ণ যুগে তিনি একজন মুনির রোষানলের মুখোমুখি হন। মুনির অভিশাপেই তিনি মৎস্যজীবীতে পরিণত হন। তাদের এই ধারণার জন্য প্রামাণিক কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণেও তার উল্লেখ নেই। তবুও এই

সব গ্রন্থে মৎস্যদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। যার রাজাকে মৎস্যরাজ বলে। বিহারের কিছু রাজবংশী পবিত্র সুতার পরিধান ব্যবহার করে এবং দাবি করে যে তারা ক্ষত্রিয় হতে উদ্ভূত। যদিও এই ধারাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবুও রাজবংশীদের এ বিষয়ে উদ্ধৃতি একেবারে নির্দিষ্ট। একথা বলার সময় তাদের মধ্যে গর্বের অনুভূতি লক্ষ করা যায় এই কারণেই যে মাছধরা অন্যান্য জাতির চেয়ে সামাজিক মর্যাদায় তারা অনেক বেশি উচ্চ। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন যে রাজবংশী না কৈবর্ত কাদের স্থান উচ্চে। এই রাজবংশীরা উত্তর বাংলার কোচ রাজবংশীদের চেয়ে আলাদা। এমনকি কিছু বাগদি-জেলে নিজেদের রাজবংশী বলে দাবি করে। তিওর ও রাজবংশী উভয় সম্প্রদায়ই গোড়া হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের অনুশাসন ও অনুষ্ঠানাদি মেনে চলে। তাদের নিজেদের পুরোহিত আছে, যারা পতিত ব্রাহ্মণ। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের হাতের জল খায় না। তাদের নির্দিষ্ট ধোপা-নাপিত নেই। তাদের অশৌচের সময়কাল ৩০ দিন। তারা বিল লিজ নেয়। বাঁশ নির্মিত সরঞ্জাম দিয়ে তারা মাছ ধরে।

ও'ম্যালি ১৯ শতকের প্রথম দশকের সমীক্ষা অনুসারে লেখেন যে স্থানীয় প্রথা অনুসারে শোনা যায় কৈবর্তরা প্রকৃতপক্ষে সরযূ বা আয়ুধের গগরীর তীরে বসবাস শুরু করে। পাঁচজন প্রধানের অনুসরণ করা রাস্তায় তারা মেদিনীপুরে আসে। তারা তা জয় করে নেয়। তখনকার দিনে ময়নার রাজা শ্রীধা হুই গোবর্ধন নন্দের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি তার রাজত্ব দখল করে নিয়ে সেখানে একটি পরিবার স্থাপন করেছিলেন। এই ময়নার রাজার পরাজয়ের কথা একটি কবিতায় শোনা যেত যেটি সেই সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। প্রথা অনুসারে পাঁচটি প্রধান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারি বা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যার মধ্যে আছে তমলুক বা তাম্রলিপ্ত, বলিসিটা, তুর্ক, সুজামাথা এবং কুতুবপুর। সুজামাথা পরিবার এখন লুপ্তপ্রায়। রাজাদের বংশপরম্পরায় আগত শেষ বংশধর ২০ বছর আগেই মৃত্যুর কবলে পড়েছিলেন। তমলুক এবং কুতুবপুর রাজবংশ এখনও বিরাজমান কিন্তু বর্তমানে চরম দারিদ্রের মুখোমুখি। আর তুর্ক পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে খাণ্ডারীর মহাপাত্রেরা। এই ধারা থেকে সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে মেদিনীপুর হল উপজাতি অধ্যুষিত অতিপ্রাচীন স্থান যেখানে এক সময় তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। ড. গিয়ারসনের ধারণা তারা মেদিনীপুরে এসেছিল উড়িষ্যা থেকে। তার মতে-তাদের এই জেলায় আগমনের ইতিহাস সম্পর্কে বলা যায় যে, তারা যেরকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন তার বৈশিষ্ট্য ছিল অতি অদ্ভুত। প্রকৃতপক্ষে কিছু অনার্য ভাষা পুঁজি করে তারা মেদিনীপুরে এসে উড়িষ্যার

বিকৃত-অমার্জিত প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলতে থাকেন। এরই ভিত্তিতে তারা বাংলার একটি আঞ্চলিক ভাষা তৈরি করেন এবং সে ভাষায় তারা নিজগৃহে কথাবার্তা বলতেন।

আদিকালে কৈবর্তদের 'কৈবর্ত' বলে ব্যাজসন্যায় সংহিতাতে উল্লেখ আছে। যেমন, মহাকাব্য এবং মনুসংহিতায় 'কৈবর্ত' এবং অশোকের শিলালিপির অনুশাসনে 'কৈবর্ত' বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। একথা অমূলক নয় যে তাম্রলিপ্ততে তারা একটি প্রাচীন রাজত্ব অধিকার করত। মূলত তাদের সম্পর্কে মনে করা হয় যে তারা একটি গোষ্ঠীর আদিরূপ। যে দলের সমষ্টি একই রকমের কাজ করত। যখন অকর্ষিত বা পতিত জমিগুলি ধীরে ধীরে উদ্ধার হয়ে স্থায়ী কৃষিকার্য শুরু হয়েছিল তখন তারা অনেকেই এই কৃষিকার্যে অংশ নিয়েছিল। কৃষিকার্যে অংশগ্রহণকারীরা বাকিদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়ে তাদের পূজার জন্য নিম্নশ্রেণির পূজারি ব্রাহ্মণসহ তারা অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণে স্থান করে নিয়েছিল। তাদের ক্ষমতা, বৈভব এবং সংখ্যার পরিণাম হয়েছিল তাদের উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা। এছাড়াও তারা 'জলচরানি'তে উন্নীত হয়েছিল। যার অর্থ তাদের জল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চজাতির লোকেরা ব্যবহার করতে পারবে।

ও ম্যালির গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায় যে বাংলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অঞ্চল ভিত্তিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের কৈবর্তদের নিজেদের একখণ্ড জমি আছে। আবার তারাই পূর্ব বাংলার অনুরূপ অংশ সম্পূর্ণরূপে জলের ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণে তাদের সামাজিক রীতিও আলাদা ধরনের। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কৈবর্ত সম্পর্কে ও'ম্যালি লিখেছেন-

> 'জেলার সর্বোত্তম কৃষকদের তুলনায় সামাজিক ভাবে কৈবর্তরা মিতব্যয়ী এবং শ্রমশীল। জমিদার, তালুকদার এবং বেশিরভাগ রায়তদের মধ্যে একটি বড়ো সংখ্যক এই কৈবর্ত সম্প্রদায় ভুক্ত। তাদের মালিক থেকে কৃষক পর্যন্ত সকলেই জমিকে গুরুত্ব দেয়। ধর্মীয় দিক থেকে তাদের বেশিরভাগ অংশই বৈষ্ণব। একথা বলা হয়ে থাকে যে, একজন ব্রাহ্মণের চেয়েও একজন বৈষ্ণবকে তারা বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।'[২২]

হান্টার ২৪ পরগণার কৈবর্ত সম্পর্কে বলেছেন যে মহামুনি ব্যাস নিজেই কৈবর্ত স্ত্রীলোকের সন্তান। তাই কৈবর্ত রাজের সমর্থনে কয়েকজনকে ঐ কৈবর্তদের মধ্যেই ব্রাহ্মণে

পরিণত করেন এবং সেই ব্রাহ্মণদের বাকি অংশের পূজারি নামে নিয়োগ করেন। তারা এখনও কৈবর্ত-ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। এদের অনেক সংখ্যক হুগলি জেলায় বাস করে। একথা ধরে নেওয়া যায় যে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের আদিম উপজাতিরা যখন সমতলে স্থায়ী বসবাস শুরু করে, তখন তারা কৈবর্ত নাম ধারণ করে হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ, প্রথা-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে। এখনও তাদের কেউ কেউ আদিম উপজাতির পদবি যেমন ভুঁইয়া বয়ে চলেছে। তমলুকের রাজা ছিলেন একজন কৈবর্ত। একথা সম্ভবত সত্য যে এই কৈবর্তদের সকল সদস্য যারা ২৪ পরগণায় বসবাস করে তারা হুগলি জেলার পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ২৪ পরগণায় এসেছে। কৈবর্তদের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- উত্তর রাঢ়ি বা চাষা কৈবর্ত, এরা কৃষিজীবী এবং সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, পূর্বদেশি কৈবর্ত, চাষি, তাঁতি বা দঃ রাঢ়ি কৈবর্ত, যারা পলুচাষের সাথে কৃষিকার্য করে, সিউলি, খেজুর গাছের রস সংগ্রহকারী এবং মালো বা জেলে মৎস্যজীবী এবং নৌকাজীবী। এই শ্রেণি বিভাগের মধ্যে প্রথম দু'টি উচ্চ শ্রেণিভুক্ত যাদের হাতে ব্রাহ্মণেরা জল গ্রহণ করতে পারে। শেষ তিনটি শ্রেণি অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণিভুক্ত এদের মধ্যে মালো বা মৎস্যজীবীরা এখন নিজেরা আলাদা একটি সম্প্রদায় তৈরি করেছে। এইভাবে শ্রেণির মধ্যে শ্রেণির উদ্ভব শুরু হল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন-

> "কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে বল্লাল চরিতে অনেক কথা আছে, কিন্তু এ সমুদয় বিশ্বাসযোগ্য নহে।...দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিনজন কৈবর্ত্ত রাজা বরেন্দ্রে রাজত্ব করেন, সুতরাং রাজ্যে ও সমাজে কৈবর্ত্ত জাতির যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।...কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্ভবতঃ একই জাতি, কারণ উভয়েরই স্মৃতি ও পুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের চাষী কৈবর্ত্ত এক জাতি বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদের মধ্যে অনেক জমিদার ও তালুকদার আছেন এবং মেদিনীপুর জিলায় ইঁহারা খুব সম্ভ্রান্ত শ্রেণী। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কৈবর্ত্ত ধীবর বলিয়া পরিচিত এবং মৎস্য বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসা।...সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালের ন্যায় প্রাচীন কালেও কৈবর্ত্ত জাতি হালিক ও জালিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।...বাঙ্গালার আরও অনেক জাতির মধ্যে ঐরূপ উচ্চ নীচ শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।"[২৩]

এই মতের সঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা- র মতের খুব বেশি পার্থক্য নেই। শাস্ত্রানুসারে পুত্র পিতার বর্ণভুক্ত হয়। সুতরাং মাহিষ্য-কৈবর্ত সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় বলেই স্বীকার্য। সুতরাং মাহিষ্য-কৈবর্ত সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় বলেই স্বীকার্য। তার মতে

> 'বৈদ্য কায়স্থরাও ব্রাহ্মণ; মাহিষ্য-কৈবর্ত্তদের স্থান তার পরেই এবং এঁরা বাংলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলিরই বংশধর। প্রাচীনকালে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য ছিল।'[২৪]

গ্রন্থকারের মত থেকে আরো জানা যায় যে কৈবর্ত কে (জলে)+বৃৎ (থাকা) থেকে উৎপন্ন। অর্থাৎ যে জলে বর্তমান সে কেবর্ত। মূলত কৈবর্ত মানে জেলেও নয়, চাষিও নয়, কারণ কৈবর্ত শব্দ বৃত্তিবাচক নয়, অবস্থান বাচক- যারা জলে থেকে কাজ করে তারাই কৈবর্ত। জেলেরা জাল নিয়ে, মাঝিরা নৌকা নিয়ে এবং চাষি হাল নিয়ে জলে গমন করে। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে, যথা চাষি কৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত, মাঝি কৈবর্ত। গ্রন্থকারের মতে যারা "মহীকর্ষণ" করে তারা মাহিষ্য, অর্থাৎ মহী+কৃষ থেকে মাহিষ্য। বলা বাহুল্য এটি ব্যাকরণ সংগত নয় ।

প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে,

> 'মহিষ শব্দ মূলতঃ মহৎ শব্দ থেকে উৎপন্ন। মহিষ শব্দের মৌলিক অর্থ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। যেমন 'মহিষী' মানে প্রধানা রাজপত্নী। মহিষাসুর কথার আসল মানে শ্রেষ্ঠাসুর। এমন কি পশু অর্থে মহিষ ও কথারও আসল মানে বৃহৎ বা প্রধান পশু। সুতরাং মাহিষ্য শব্দ সমাজের মুখ্য বা প্রধান সম্প্রদায় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় থেকে উৎপন্ন ।'[২৫]

রমেশচন্দ্র সেনের মত থেকে জানা যায় যে বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য-কৈবর্ত ও নবশাখ সম্প্রদায় সকলেই মূলতঃ আর্যবংশ সম্ভূত। ব্রাহ্মণ, মাহিষ্যরা ক্ষত্রিয় এবং নবশাখরা বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত। বর্তমান মাহিষ্য-কৈবর্তরা বাংলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশধর। বাংলার ক্ষত্রিয়দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ করার ফলে শূদ্র বলে গণ্য হয়েছেন আবার কৃষিতে আত্মনিয়োগ করার ফলে কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছেন।

প্রাচীন বাংলার সবগুলি ক্ষত্রিয় রাজবংশই বর্তমান মাহিষ্য-কৈবর্তদের পূর্বপুরুষ তা দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন। তার গ্রন্থের লক্ষ্য আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র।

সূর্য্যেন্দু দে-র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১৮৬৪ তে চাষি কৈবর্তেরা জাতি হিসাবে বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ যেমন, সতীকান্ত বাচস্পতি, শিবনাথ বাচস্পতি প্রমুখের দ্বারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান পেয়েছিল। কৈবর্তেরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। যার ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় রামপালের সময় দিব্যক ও ভীমের নেতৃত্বে বাংলায় 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' দেখা যায়। তখন সেখানে 'কৈবর্তরাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে মেদিনীপুরের স্থানীয় প্রথা অনুসারে দেখা যায় যে কৈবর্তেরা তাদের নিজের রাজত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। ১৯৩১ সালে বাংলার জেলে বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়েরা কৈবর্ত হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছিল। কৃষিজীবী বা হেলে কৈবর্তেরা কেবলমাত্র মাহিষ্য এবং মৎস্যজীবীরা জেলে কৈবর্ত হিসাবে গণ্য হয়েছিল।

রাজশেখর বসুর অনুদিত ব্যাসদেবের মহাভারত থেকে ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত জানা যায়। উপরিচরের রাজধানীর নিকট শুক্তিমতী নদী ছিল। রাজা তার স্খলিত শুক্র শ্যেনপক্ষীকে দিয়ে তার পত্নীর কাছে দিতে বলেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণের ফলে তা যমুনার জলে পড়ে যায়। আদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎসী হয়েছিল, সে শুক্র গ্রহণ করে গর্ভিণী হল এবং দশম মাসে ধীবরের জালে ধরা পড়ল। সে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী সন্তান পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে এলে অপ্সরা শাপমুক্ত হয়ে আকাশ-পথে চলে গেল। ধীবর সেই কন্যাসন্তানটি কে পালন করেন। সেই রূপগুণবতী কন্যার নাম সত্যবতী, কিন্তু সে মৎস্যজীবীদের কাছে থাকত সেজন্য তার অন্য নাম মৎস্যগন্ধা। পরাশর আর সত্যবতীর মিলনে জাত পুত্রের নাম দ্বৈপায়ন। পরে ইনি বেদ বিভক্ত করে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন।

চার বৎসর পরে শান্তনু সত্যবতীকে বিয়ে করতে চাইলে সত্যবতীর পিতা দাসরাজ তার কাছে প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র তার পরে রাজা হবে। শান্তনু এরকম প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলে তার পুত্র গাঙ্গেয় দেবব্রত দাসরাজাকে বলেন তার কন্যার গর্ভে যে পুত্র হবে সেই রাজত্ব পাবে আর সে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে। এরপর শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে হয়।

সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র হল, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য রাজপদে বসলেন। কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হয়। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর সত্যবতী বংশরক্ষার জন্য ভীষ্মের কাছে সাহায্য চাইলে ভীষ্ম তাকে ক্ষত্রধর্মসম্মত উপায় বলেন-

> ‘পুরাকালে জামদগ্ন্য পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হ’লে ক্ষত্রিয়নারীগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, কারণ বেদে বলা আছে যে ক্ষেত্রজ, পুত্র বিবাহকারীরই পুত্র হয়।’[২৬]

ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য সত্যবতীকে কোন গুণবান ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করার কথা বলেন। সত্যবতী ভীষ্মকে নিজের পূর্ব ইতিহাস জানাতে গিয়ে বললেন-

> ‘কন্যাবস্থায় আমার যে পুত্র হয়েছিল তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, তিনি মহাযোগী মহর্ষি, চতুর্বেদ বিভক্ত ক’রে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য তাঁর অন্য নাম কৃষ্ণ। আমার এই পুত্র জন্মগ্রহণ ক’রেই পিতা পরাশরের সঙ্গে চ’লে যান এবং যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হ’লে আমি ডাকলেই তিনি আসবেন।’[২৭]

ভীষ্ম এই প্রস্তাব সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করেন। ব্যাস অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে সম্ভোগ করে দুই পুত্রের জন্ম দেয়। তারা হলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। পরে সত্যবতী অম্বিকাকে পুনর্বার ব্যাসের কাছে যেতে বললে অম্বিকা অসম্মত হন। অম্বিকার পরিবর্তে এক দাসীকে পাঠালেন। এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপের ফলেই ধর্মরাজ শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মরাজ দাসীর গর্ভে বিদুররূপে জন্মেছিলেন।

অরণ্যকাণ্ডে রাম এবং লক্ষ্মণ যখন আশ্রমের পম্পা হ্রদের পশ্চিমতীরে পৌঁছান তখন তাদের মাছ আর ভাত, লবণ ও ঝাল (গোলমরিচ) দিয়ে রান্না করার কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত পথ্যের বিচারে মাছ ও ভাতের সংযোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আশ্চর্যের বিষয় যে

মাছ ধরা এবং খাওয়া কাজ দুটি অনার্যদের। লক্ষ্মণকে বলা হয়েছিল বল্লম দিয়ে মাছ ধরতে। রাম-লক্ষ্মণ দুজনেই মাছ-ভাত রান্না করেন। যদিও তাদের আর্য বলেই ধরা হয়।

চার বর্ণের স্ব স্ব ধর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হলে কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা কর্তব্য তার বিবরণ রয়েছে বিষ্ণুপুরাণে।

> 'ব্রাহ্মণ নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে কিন্তু শূদ্রেরা ব্যবসায়ে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকিলে দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে।'[২৮]

'বিষ্ণুপুরাণ' এ ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণহোত্র, তার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, এই ভার্গভূমি থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের উদ্ভব হয়।

'মালো' বা 'ঝালো-মালো' নদীমাতৃক বাংলার প্রথাগত মৎস্যজীবীদের মধ্যে একটি অন্যতম কৌমগোষ্ঠী যারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সহ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতে বংশ পরম্পরায় বসবাস করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এদের সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও তাদের জনসংখ্যা বা জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ ধরন সম্পর্কে তথ্যবহুল পর্যবেক্ষণ ঔপনিবেশিক শাসনকালের পূর্বে পাওয়া যায় না। ঔপনিবেশিক শাসক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যারা মালোসহ বাংলার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে তাদের ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেন বুকানন হ্যামিলটন। আসাম, বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমীক্ষা চালানোর কালে (১৮০৭-১৮১৪ খ্রিঃ), কলকাতা, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও গোয়ালপাড়া সহ বাংলার ঝালো-মালো সম্প্রদায়ের জীবন ধারা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন বুকানন। মৎস্যজীবীদের জাল, নৌকা ও মাছ ধরার প্রচলিত সরঞ্জামের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সুযোগ বুকানন সাহেবের ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকের গোড়ার বাংলার ঝালো-মালোদের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা খুব কঠিন।

স্থান ও বৃত্তি অনুসারে বৃহদ্ধর্মপুরাণে অধম-সংকরের বা অন্ত্যজ শ্রেণির শেষতম হল 'মল্ল' বর্তমানে 'মালো'। নীহাররঞ্জন রায় তার গ্রন্থে আদিবাসী কৌমের তালিকায় ব্যাধ, হাড়ি-

ডোম, জোলা, বাগদী, চণ্ডাল-এড় সঙ্গে 'মল্ল'-র উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সমস্ত সংকর বা মিশ্র উপবর্ণগুলিকে 'সৎ' ও 'অসৎ' এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণি বিভাগের 'অসৎ' শূদ্র পর্যায়ে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে 'মল্ল' বা 'মালো'- রা। নীহাররঞ্জন রায়ের গ্রন্থে 'অসৎ' শূদ্র পর্যায়ে 'মল্ল' শব্দটি তালিকার ২৫ নং এ আছে যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

বিনয় ঘোষ রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির মৎস্যজীবী, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য বেশি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ়দেশে। সাম্প্রতিক লোকগণনাতেও দেখা গেছে যে, এই সব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর অঞ্চলে (অর্থাৎ রাঢ়দেশে) প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কেবল রাঢ় অঞ্চলেই মোট নয় লক্ষের মধ্যে আট লক্ষের বেশি ধীবরশ্রেণির লোকের বাস। ধীবররা সকলেই যে মৎস্যজীবী বা মৎস্যব্যবসায়ী, তা নয়। অনেকে কৃষিজীবীও। সকলেই সাধারণভাবে 'ব্যগ্রক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত।

বিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী আছে। পরবর্তীকালে মল্লরাজারা যখন সভাপণ্ডিতকে দিয়ে বংশবৃত্তান্ত রচনা করিয়েছিলেন তখন তার ভেতর থেকে ধীবর ও আদিবাসীদের সঙ্গে আদিমল্লের সম্পর্কের সমস্ত কাহিনি ছেটে ফেলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের কথা যোগ করেছেন এবং তারা যে উত্তরভারতের রাজপুত বংশজাত তাও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

> 'বিষ্ণুপুরের রাজাদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী, স্বাধীনতা-প্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদান্যতা, ধর্মানুরাগ ও উদারতার কাহিনী আজ রূপকথার মতন অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এককালে ঐতিহাসিক সত্য ছিল। সুবিস্তৃত মল্লভূমের স্বাধীন রাজা ছিলেন তাঁরা, 'মল্লাবনীনাথ' বলে পরিচিত। মল্লভূমের সীমানা তখন উত্তরে সাঁওতাল-পরগণার দামিন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশ, পূর্বে বর্ধমানের একাংশ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অনেকটা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা যে মল্লবীর ছিলেন তা তাঁদের আদিমল্ল, জয়মল্ল, কালুমল্ল, বীর হাম্বীর প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায়। হিন্দুযুগে মল্লরাজাদের সঠিক কোন ইতিহাস জানা যায় না।...আজও মধ্যে মধ্যে বীরভূম বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ডোমদের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে পথে বেরুতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে যুদ্ধযাত্রার

চমৎকার বর্ণণা আছে। এই সব বর্ণণা থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী ও তারও আগেকার যোদ্ধা বীর বাঙালীর ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।'[২৯]

মল্লভূম রাজবংশাশ্রিত অনেক কিংবদন্তী ও কাহিনি আছে। স্বাধীন রাজার সুদীর্ঘ বীরত্বের ঐতিহ্য এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

রাজশেখর বসু-র 'মহাভারত'-র সারানুবাদে বিরাটপর্বে মল্লগণের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। মৎস্যরাজধানীতে ব্রহ্মার উদ্দেশে মহাসমারোহে এক জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন করা হলে সেই মহোৎসবে নানা দিক থেকে বলবান বহুবিজয়ী মল্লগণ বিরাট রাজার রঙ্গস্থলে উপস্থিত হল। ভীম রাজা বিরাটের আদেশে জীমূতকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় দুজনের ঘোর বাহুযুদ্ধ হতে লাগল। অবশেষে ভীম জীমূতকে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং তাকে পেষণ করে বধ করলেন। বিরাট আনন্দিত হয়ে ভীমকে প্রচুর অর্থ দিলেন। এরপর আরো অনেক মল্লযোদ্ধাকে হারিয়ে শেষে বাঘ ও হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

মনুসংহিতায় আছে-

'ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরের চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এব চ।।'[৩০]
(মনু-১০। ২২ শ্লোক)

ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা সবর্ণা গর্ভজ সন্তানদিগকেই কোন দেশে ঝাল, কোন দেশে মাল, কোন দেশে নিচ্ছিবি, কোন দেশে নট, কোন দেশে করণ, কোন দেশে খস, কোন দেশে দ্রাবিড় ইত্যাদি বলে। এরা সকলেই জাতিতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। দেশভেদে নামভেদ মাত্র। ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) ইত্যাদি এদের উপাধি।

রণবীর সিংহ বর্মণের কথা থেকে জানা যায়-

'Colonel Tod ভারতবর্ষের সমগ্র আদিম জাতিগুলির একটি ইতিহাস লিখেছিলেন। সেখানে ঝালো জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। মল্লবীরদের মধ্যে যুদ্ধের কথাও জানা যায়। ঝালো মালো দের উৎপত্তি গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়

থেকে। তারা রাজস্থানের কোটা স্টেটে এসে ওঠে। বীরমান্না ঝালো মহারাণা প্রতাপ সিংহের Commander-in-chief ছিলেন। ইনি যুদ্ধ করেন আকবরের সঙ্গে। অনেকে বলেন তাদের উপাধি ছিল ঝালো। Zalim Singh কোটা রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। কোটা রাজ্যের রাজা তার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তার রাজ্যের কিছুটা অংশ zalim Singh Jhala কে দেন। এই অংশটি CHHAWANI নামে পরিচিত ছিল এবং একটি আলাদা রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর নাম হয় Jhalawar. ১৮১৮ সময়কালে Zalim Singh Jhalawar রাজ্যের প্রথম রাজা হন।'[৩১]

'উত্তর ভারতে বিশেষ করে রাজপুতনা বর্তমান রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশগুলিতেই ক্ষত্রিয়দের প্রভাব ছিল। রামায়ণে যেমন রাবণের সাথে রামের যুদ্ধ হয়েছিল ঠিক এই সময়ে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজা বা বীরদের মধ্যে কার্তবীর্য অর্জুনের নামটিও জানা যায়। তিনি মল্লযোদ্ধা ছিলেন এবং রাবণের মতো একজন শক্তিশালী বীরকেও মল্লযুদ্ধে কয়েকবার পরাজিত করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব ছিল রাজপুতনার মল্লতাত ঝালুমার ইত্যাদি জায়গায়। এই ঝালুমার কথা থেকে 'ঝালো' শব্দটি এসেছে।'[৩২]

'মহামান্য আকবরের সময়ে বাংলায় বারভুঁইয়াদের দমন করার জন্য মানসিংহের নেতৃত্বে যে সৈন্য বাহিনী গঠিত হয় তাতেও মল্লযোদ্ধারা ছিলেন এবং তাঁরা রাজস্থানের মাড়োয়াড় বা (মালোয়াড়) ও ঝালোয়াড় ঝালুমার থেকেই এসেছিলেন। মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করার পর এই ক্ষত্রিয়দের বেশিরভাগই বাংলায় থেকে যান এবং তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় জমি চাষ ও মৎস্য ধরার কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়েন। তখন বড় বড় নদী ও বিলে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক মাছ পাওয়া যেত এবং তারা বংশপরম্পরায় ৫/৬ মাস মাছ ধরত এবং ৫/৬ মাস নানা রকম খেলাধূলা, গান-বাজনা ইত্যাদি সংস্কৃতি নিয়ে সকলে সময় কাটাতো এবং এইভাবে তাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সেই সংস্কৃতির কথা অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ উল্লেখও হয়েছে। বৃটিশ রাজত্বকালে পুনরায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে যেহেতু নদী নালার জলে দূষণ দেখা দেয়। তার পূর্বে এই সমাজ বিশেষ করে মল্লক্ষত্রিয় সমাজের কিছু শিক্ষিত লোকের মনে হয়

১৯০০ সালের পরে যখন সমস্ত ক্ষত্রিয় সমাজই তাঁরা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা প্রমাণ করার জন্য পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের উপরে কোন কারণ বশত রাগান্বিত হয়ে কুঠার নিয়ে ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করতে আরম্ভ করলেন তাই ক্ষত্রিয়গণ বাঁচার তাগিদে তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন এবং তাঁরা ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় না দিয়ে শূদ্র বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন এবং বাঁচার তাগিদে তাঁরা যুদ্ধবিদ্যা পরিত্যাগ করে চাষবাস ও বড় বড় নদী ও বিলেতে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ জন্মায় সেইসব জলায় মাছ ধরতে আরম্ভ করলেন। এমনিভাবে তাঁরা বংশপরম্পরায় জীবনধারণের নিমিত্তে চাষবাস ও মৎস্য ব্যবসাকে গ্রহণ করেন। প্রকৃত মৎস্যজীবী যারা তাদের সঙ্গে ওদের পার্থক্য আছে, তাঁদের জাল বোনার কায়দাও আলাদা এবং তাঁরাই আবিষ্কার করেছেন কিংবা রাজস্থানের লোকেরা যে ভাবে জাল বোনে হয়তো সেই ভাবেই জাল বোনেন। তাছাড়া তাদের বাসস্থান অর্থাৎ বেশিরভাগ এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বড় বড় ছোট স্রোতস্বিনী নদীর পাড়ে বসবাস করত। যে সব নদী খুবই গভীর সেই সব নদীতে মাছ ধরত অথবা বড় বড় বিল যেখানে প্রচুর গভীরতা আছে এবং বড় বড় মাছ থাকে সেখানেই তারা মাছ ধরতো- সঙ্গে জমিও চাষ করত। এরা চাষী হিসেবে খুবই উন্নত মানের। পরশুরামের এই তাণ্ডব শেষ হওয়ার পর হয়তো ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের রাজত্বে ফিরে আসেন এবং পুনরায় রাজত্বও করতে থাকেন। রাজস্থানে এখনও ক্ষত্রিয় প্রজাদের রাজত্ব ও তাদের বংশধরেরা জমির মালিক। এখন রাজস্থানে যে সব জেলায় জমি চাষ হয় তার বেশিরভাগ জমির মালিকই ক্ষত্রিয় জাতির।’[৩৩]

‘অনেকেই বেদ গ্রন্থ পাঠ করে ব্রাহ্মণদের বোঝাতে পারলেন তারাও শিক্ষিত। তখন ব্রাহ্মণগণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষত্রিয় বলে গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্যাগ্রক্ষত্রিয় (বাগদি), পণ্ডক্ষত্রিয় (পোদ), ঝল্লমল্ল ক্ষত্রিয় (ঝালো/মালো) ইত্যাদিগণকে ব্রাহ্মণরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে পৈতা নেওয়ার অনুমতি দিলেন। আমাদের ঝল্লমল্লমালোদের এই পৈতা নেওয়ার ব্যাপারে যে সব লোকেরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়া জেলার বগুড়া জমিদারই বলা চলে- অনন্তদাস বর্মণ, মুক্তার, ব্রজমোহন দাস, এবং

তারা আরো অনেকে একটি সমিতি গড়ে তুললেন তার নাম ছিল ঝল্লমল্লক্ষত্রিয় সমিতি। সেই সমিতি সমস্ত বাংলা এবং আসাম উড়িষ্যা ইত্যাদি জায়গায় যেখানে যেখানে ঝল্লমল্লক্ষত্রিয়গণ বাস করতেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তার মধ্যে ব্রজমোহন দাস, ধর্মচাঁদ মল্লবর্মণও ময়মনসিংহের আচার গাঁওয়ের বড় ধনী ব্যবসায়ী দীননাথ বর্‌মণ। তিনি ঝল্লমল্ল ক্ষত্রিয়তত্ত্ব নামে ২/৩ টি গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে পৈতা কিভাবে আমাদের এই সমাজ ব্যবহারের অনুমতি পেল ও জাতির ইতিহাসে হিন্দুশাস্ত্রের বেদ ইত্যাদি বইগুলি থেকে তারা যে ভাবে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করলেন তার উল্লেখ ঐ সব গ্রন্থে আছে।'[৩৪]

'Jhalawar- a state in Rajputana-the ruling family of Jhalwar belonging to the Jhalla clan of Rajputs and their ancestor are pretty chiefs of Halwad in the district of Jhalawar in Kathiwar.'[৩৫]

Jhalwar, "Division of Pranth of Kathiawar, Guzarat (Guzrat) Bombay presidency, takes its name from the Jhala Rajputs, who won the principal estates. It includes, the States of Dharangadra, the chief of which is the recognized head of the Jhala clan, Wankaner, Limbdi, Wadhwan and Minor State."[৩৬]

'Malagarh-village in Balandshar District, North-Western provinces, belonging to the Nawab of Chhatri. Distant from Delhi-38 miles South-East, formerly known a Rathora, and owned by Gaur Rajput.'[৩৭]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' থেকে জানা যায় যে ঝালো মালো ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, রাজপুতানায় ঝালা নামে প্রসিদ্ধ। আলাউদ্দিন চিতোরাধিকার সময়ে সর্বাগ্রে সেই

ঝল্লবংশীয় ঝালার প্রদেশীয় রাজা মল্লদেবকে হস্তগত করে চিতোরের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত করে যায়।

ঝালো মালোদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি গল্প আছে-

> 'ঝালো আর মালো দুই সহোদর ভাই, জন্ম ভগবানের গলার মালা থেকে। ভগবানের বিধানে দুই ভাইই মাছমারা। এক জায়গা থেকে জন্ম নিলেও দুজনের একজন হল পতিত। বহুদিন আগের কথা। ঝালো-মালোদের ঘরে এসেছেন তাদের গুরুদেব। গুরুদেব বলে কথা। সাক্ষাৎ ভগবান তুল্য। দুই ভাই ভক্তি করে সেবা করল গুরুদেবের। গুরুদেব ভোজন সেরে নিদ্রা দিয়ে গেলেন পায়খানায়। বললেন মালোরে মালো, একটু জল নিয়ে আয়। একদিকে গুরুদেবের আদেশ অন্যদিকে মালোর গোঁ, আমার দ্বারা হবে না। গুরুর আদেশ অমান্য, পতিত হবে মালো। এমন সময় ঝালো তাড়াতাড়ি গিয়ে জল এগিয়ে দিল গুরুদেবকে। গুরুদেব খুব খুশি। সেই থেকে মালো গেল পতিত হয়ে। পাঁজি পুথির কথা না জানলেও একথা ঝালো-মালোর বাপ ঠাকুরদার মুখে শুনেছে। তখন থেকে ঝালোরা 'জলচল' অর্থাৎ তাদের জল গ্রহণযোগ্য হল এবং মালোরা স্থায়ীভাবে পতিত বা নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকল।'[৩৮]

> মালোদের ঘরের প্রথম পুরুষের কথাঃ

> 'মালো জাতের নয়। সে কালের বাদার মালোদের প্রথম পুরুষেরা। সে অনেক দিনের কথা, চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরুষ আগে। ওঁর কল্যাণেই সমুদ্রপারের মালো বংশ বড়ো হয়েছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল। মালোরা তখন দেশের রাজা হয়েছিল। শোনা যায় দক্ষিণদিক থেকে হেঁটে এসেছিলেন। সমুদ্রের (জল) উপর দিব্যি পা ফেলে হেঁটে এসেছিলেন দিগম্বর কালো কুচকুচে এক পুরুষ, কোঁচকানো চুল, ফণা ধরে আছে কপালের উপর। খালি গা, হাতে এক মস্ত ক্যাঁচা। ডাঙায় এসে ওঁর বড়ো বিপদ হল। দক্ষিণরায়ের রাজ্য। সে কি ছেড়ে দেয়। তখন ধলতিতেও (মালোদের বাসভূমি) বাদা। ওঁর সাথে দক্ষিণরায়ের চেলাদের যুদ্ধ হল। জিতলেন উনি।

দক্ষিণরায় খুশি হয়ে মস্ত একখানা গায়ের ছাল ওঁর আসল মূর্তি বাঘের ছাল পরা। ক্যাঁচাহাতে কালো কুচকুচে পুরুষ। গোটা সমুদ্রের পার ধরেই উনার রাজ্য ছিল।'[৩৯]

১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহের পর তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সুশৃঙ্খলভাবে ভারত শাসন করার জন্য ভারতের মানুষ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের যে প্রয়াস শুরু করেছিল তার ফলশ্রুতিতে শুরু হয় আদমসুমারী ও জাতি ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে ভারতীয়দের সামাজিক পরিচিতির নির্মাণ। ব্রিটিশ সরকারের এই প্রচেষ্টা ভারতের তথাকথিত জাতিব্যবস্থার অর্ন্তভুক্ত উঁচু, নীচু সকলকেই নাড়া দিয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম আদমসুমারী থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক যুগের সমস্ত আদমসুমারী গুলিতে হিন্দু সমাজের ব্রাত্য হিসাবে পরিগণিত জাতিগুলি আবেদন জানিয়েছিল অন্ততঃ আদমসুমারীতে সম্মানজনক স্থান দেওয়ার জন্য। এমনকি ব্রাহ্মণেরাও তাদের শ্রেণিবিভাজন নিয়ে আদমসুমারী পরিচালনাকারীগণের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। দলিত জাতিগুলির মধ্যে উত্তর বাংলার রাজবংশী সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী জানিয়েছিল। পূর্ব বাংলার চণ্ডাল সম্প্রদায় তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে 'নমঃশূদ্র' মর্যাদা লাভ করে। কোচরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, বাগদি সম্প্রদায় ব্যঘ্র ক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্র সম্প্রদায় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় পরিচিতি নির্মাণের আন্দোলনে প্রয়াসী হন। মালোরাও এই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তারাও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীতে আদমসুমারীর দ্বারস্থ হন বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। আদমসুমারী থেকে জেলে মালোদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পূর্ব বাংলার নদীবহুল অঞ্চলগুলোতে মালো ও ঝালোদের উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা, পাবনা, যশোহর, খুলনা, নদীয়া, মূর্শিদাবাদ, হুগলী, রংপুর, রাজশাহী, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, প্রভৃতি জেলায় ছিল ঝালো-মালোদের মূল বসতি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের জন্মের অত্যাবশকীয় শর্ত হিসাবে বাংলা বিভাজনের পরবর্তীকালে ঝালো-মালোদের একটা বড় অংশ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মেঘালয়, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ২০১১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মালোদের (ঝালো-মালো) সংখ্যা হল ২,৯৩,৭১৪। আসাম ও মেঘালয়ে এই সংখ্যা হল যথাক্রমে ৭৭,৫৩৩ ও ১৪৬৯। ত্রিপুরায় মালোদের আলাদা কোন পরিচিতি নেই। তারা জালিয়া কৈবর্তের সঙ্গে একসঙ্গে কৈবর্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে চলেছেন। পাশাপাশি মালোদের একটা বড় অংশ বাংলাদেশের মূল বাসভূমিতেই বসবাস করে চলেছেন। ফলে মালোদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

মালোদের নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত পরিচয় নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক পর্যবেক্ষকগণ বিশেষ করে ড. জেমস ওয়াইজ, ও এইচ এইচ রিসলি তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। জেমস ওয়াইজ তাঁর বিখ্যাত রচনায় [Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal (1883)] বাংলার জেলেদের সম্পর্কে লিখেছেন যে তারা

> "Remarkable for strength, nerve, and independent bearing. The finest, examples of Bengali manhood are found among them, and their muscular figures astonish those inhabitants of towns"[৪০]

অর্থাৎ বাংলার সাহসী পুরুষ ও পৌরুষত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল এই মৎস্যজীবীগণ। মালোদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে ওয়াইজ মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তারা বাংলায় বসবাস করছেন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। রিসলির মতে:

> 'They are the remnants of a distinct aboriginal tribe, and not merely an occupational group.'[৪১]

অর্থাৎ মালোরা বাংলারই মূলনিবাসী, শুধুমাত্র একটি পেশাগত সম্প্রদায় নয়।

ঝালো-মালোগণ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে নদী, নৌকা, জাল ও মাছ ধরায় বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন। সারা বছর ধরে মাছধরা বা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য জলের প্রকৃতি অনুযায়ী তারা বিভিন্ন ধরনের জাল ও সরঞ্জাম তৈরি করতেন। 'সমবেতভাবে' মাছ ধরার প্রথা এই মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছন্দা, উতোর, ঝাঁকি, সাংলা, গুলটি, বুটি, কোনা, তেউরি, বাইল্লা, ভেসাল, তবশে, মালাইয়া, সোনা ও খইড়কা, গরমা, হালা, ছান্দি, ফাঁসি ছান্দি, কাইছাল ছান্দি, ধালি ছান্দি, খড়া, ফাঁসি, মৈজাল, ঠেলা জাল, উড়াল জাল, চাপ জাল, ঝাঁটি জাল, ছুপনি জাল, নাপি জাল ও বেড়া জাল দিয়ে মাছ ধরার প্রথাগত ব্যবস্থা মালোদের করে তুলেছিল জলের ওপর নির্ভরশীল একটি জনগোষ্ঠী। যেখানে সারা বছর মাছ ধরা বা মাছের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হত না, সেখানে তারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হতেন বা নৌকা চালানোর কাজ করতেন। ঔপনিবেশিক আমলের সরকারি বিবরণে তাই দেখা যায়-

‘Under the Muhamedan Government, they served as boatmen, chaprasis, mace-bearer (asabardar), and staff bearer (sonte-bordar) in procession. They were also employed in conveying tressure from Dacca to Murshidabad.’[৪২]

ব্রাত্য জাতিগুলির ক্ষত্রিয় মর্যাদা আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়- ১। ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি হিসাবে (কাল্পনিক) তথ্যের সৃষ্টি ও বিরামহীন প্রচার, ২। ব্রাত্যত্বমোচন করে উপবীত ধারণ, ৩। ক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ ও উপাধি গ্রহণ, ৪। আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জাতি-সভা ও সমিতি স্থাপন ও নিয়মিত অধিবেশন এবং ৫। রাজনৈতিক অধিকারের সাহায্যে ও সরকারী সহযোগীতায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ক্ষত্রিয়ত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণির আত্মচেতনার প্রয়াস একটা আলাদা মাত্রা প্রদান করেছিল। রাজবংশীদের ক্ষেত্রে এই চেতনা বিকশিত হয়েছিল হরমোহন খাজাঞ্চী, পঞ্চানন বর্মা, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। এদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী ও জাতীয়তাবাদের প্রচারকারীগণের মধ্যে বেশীরভাগই ছিলেন আইন-আদালত ও সরকারী চাকুরির সঙ্গে যুক্ত, তেমনি মালোদের আত্মচেতনা বিকাশে উকিলদের ভূমিকাও ব্যতিক্রমী ছিল না।

রূপকুমার বর্মণ রচিত ‘জাতিপরিচিতি গঠন’ থেকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন সম্পর্কে জানা যায় যে কাল্পনিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ত্বের বৈধতা অর্জন শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দী নয়, এর আগেও এই ধরনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় ভারত ইতিহাসে। বিশেষত উপজাতি স্তর থেকে রাজ্য তৈরি করে রাজা হওয়ার সময় শাসকগোষ্ঠী হিসাবে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ তৈরি করতেন কাল্পনিক বংশলতা। তাই দেখা যায় উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের কোচ রাজাদের বংশলতায় তাদের পৌরাণিক হৈহয় বংশ ও হিন্দু দেবতা মহাদেবের সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে কোচ রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে বৈধ করে তোলার জন্য পরশুরামের ভয়ে ভীত পলাতক রাজা বর্ধণের সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপন করা হয়। বিংশ শতকের গোড়ায় প্রকাশিত শ্রীহরিকিশোর অধিকারীর রাজবংশী কূলপ্রদীপ ও শ্রীঅভয় নারায়ণ বর্মার রাজবংশী কূলকারিকা ও কূলদীপন রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রমাণ করে শাস্ত্রীয় সূত্রের সাহায্যে। পরবর্তীকালে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ তার রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস এ এই ধরনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। মালোদের

মল্লক্ষত্রিয়ত্বের দাবি ও আত্মচেতনা বৃদ্ধি তে একই রকম ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণ ও শ্রীমহিমচন্দ্র মল্লবর্মণ।

মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণ পৌরাণিক সূত্র ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে মালোদের ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তিনি প্রকাশ করেন ঝালমাল তত্ত্ব ও সংক্ষিপ্ত ঝল্লমল্ল তত্ত্ব (ঢাকা, ১৯২৩) নামে পুস্তিকা। এখানে তিনি মালোদের উত্তর পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তার মতে মালোরা ক্ষত্রিয় নিধনকারী পরশুরামের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ক্ষত্রিয়দেরই বংশধর। অনুরূপভাবে মহিমচন্দ্র মল্লবর্মণ, মৈমনসিংহের শ্রীদীননাথ মল্লবর্মণের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশ করেন ঝল্লমল্ল পরিচয় (মৈমনসিংহ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। এখানেও ঝালোমালো বা মালোদের ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রমাণ করা হয়। মালোদের শিক্ষিত শ্রেণির এই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র পুস্তিকা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা স্থাপন করেন 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি' বা 'ঝালমাল বান্ধব' নামে মালোদের জাতি সভা। এই সমিতির মাসিক পত্রিকা ঝালমাল বান্ধব প্রকাশিত হতে থাকে নিয়মিত যেখানে মালোদের সমাজের সমস্যা ও তার প্রতিকারের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা থাকত। এই পত্রিকা ও ঝালমাল বান্ধব সমিতি মালো সমাজের আত্মচেতনা বৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকা, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, পাবনা, নদীয়া, কুমিল্লা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঝালমাল বান্ধব এর শাখা। তবে ঐ সমিতির প্রথম অধিবেশন ঠিক কোথায় হয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণের 'ঝাল-মাল তত্ত্ব' গ্রন্থটি বিভিন্ন কারণে অভিনবত্বের দাবিদার। সাধু ভাষায় লেখা এই গ্রন্থটির অধ্যায়গুলি প্রসঙ্গ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। লেখক এখানে পাঁচটি প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে 'ঝাল-মাল তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ তিনি এই গ্রন্থে নিম্নবর্ণীয় জাতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত ঝাল-মালগণকে বর্ণসংকর জাতির মধ্যে তালিকাভুক্ত না করে 'ক্ষত্রিয়' অভিধায় অভিহিত করেছেন। পাঁচটি প্রসঙ্গ হল জাতি বা বর্ণ, মূল বর্ণ ও বর্ণ সংকর, ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) বর্ণসংকর নহে, ব্রাত্য নিন্দনীয় নহে, বর্ণ-বৃত্তি ও উপাধি।

প্রথম প্রসঙ্গে তিনি জাতি ও বর্ণের স্বরূপ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি 'জাতি' বা 'বর্ণ' কে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র স্বরূপ বেদ, সংহিতা, তন্ত্র, গীতা, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, লোকপ্রবাদ, প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তবে অন্য অনেক পণ্ডিতদের মতো তিনি 'বেদে'-র উপর আস্থা রেখেছেন। জাতি বা বর্ণের প্রসঙ্গে তিনি ঋগ্‌বেদের চর্চিত শ্লোকের সাহায্য নিয়েছেন। তবে

এই শ্লোকের বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যার পরিবর্তে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি জানিয়েছেন –

> "মানব মণ্ডলীকে একটি বিরাট পুরুষ কল্পনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে সেই বিরাট পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়কে সেই বিরাট পুরুষের বাহু, বৈশ্যকে সেই বিরাট পুরুষের ঊরূ এবং শূদ্রকে সেই বিরাট পুরুষের পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।"[৪৩]

অর্থাৎ 'প্রকৃতি পুরুষ' কোন একজন ব্যক্তি নন। তিনি হলেন সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সমাহার। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি সুবিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকায় উল্লেখিত ঋক্ সম্বন্ধে লিখিত পদব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন:

> "সমস্ত অঙ্গের শ্রেষ্ঠ যেমন মুখ, সেইমত সমস্ত বর্ণের শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে উল্লেখ করতঃ ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে। যুদ্ধ প্রভৃতি শক্তি সঞ্চালনার কার্য্যই বাহুদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এই জন্যই সমাজের (মানব মণ্ডলীর) যুদ্ধ প্রভৃতির কার্য্য ক্ষত্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হইত বলিয়াই, ক্ষত্রিয়কে বাহু হইতে উৎপন্ন কল্পনা করিয়াছেন। পশুরক্ষা, গো-চারণ জন্য ভ্রমণ এবং বাণিজ্য জন্য স্থলপথ ও জলপথে গমন অর্থাৎ গমনাগমন যেমন ঊরুর কার্য্য, সেই মত মানব সমাজেরই কৃষি, বাণিজ্য পশুপালন প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য, তদ্বেতু বৈশ্যকে ঊরু হইতে উদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা হইয়েছে। আর 'শূদ্রস্য পাদ কর্ম শুশ্রূষা।' শূদ্রের উক্ত তিন শ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর দাস্যতা কর্ম, এই জন্যই শূদ্রকে পাদোদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।"[৪৪]

বৈদিক সাহিত্যের সূত্রধরে মহেন্দ্রনাথ তার ব্যাখ্যায় আরো লিখেছেন

> "পূজ্যপাদ ও পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য নির্মলানন্দ ভারতী, পণ্ডিত সামাধ্যয়ী সরস্বতী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সকল মহাত্মই মানব সমাজকে একটি বিরাট পুরুষ কল্পনা করিয়া- ইঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য (ক্ষত্রিয়) হইল, ইঁহার ঊরু যুগল বৈশ্য হইল, 'পড্যাং শূদ্রো অজায়ত', "পড্যাং

শূদ্রো অজায়ত শূদ্রঃ পাদরূপেন কল্পিত নৃত্যর্থঃ" শূদ্রকে পদ রূপে কল্পনা করা হইয়াছিল" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।"[৪৫]

মনু সংহিতাতে আবার অন্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ আছে যে-সৃষ্টিকর্তা প্রজাবৃদ্ধি করবার জন্য তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরূ থেকে বৈশ্য এবং পদ থেকে শূদ্র সৃষ্টি করলেন। যদিও মহেন্দ্রনাথ এই ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই মনে করেছেন। তার মতে উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হল জগতের লোকবৃদ্ধির জন্য কাজকর্মের সুবিধা অনুযায়ী গুণকর্মানুযায়ী উচ্চ-নীচ ভেদে ক্রমে মুখ, বাহু, ঊরূ ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র এই চারবর্ণের পত্তন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ আছে-

> "পূর্বে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি বা বর্ণ ছিল। কিন্তু একটি জাতি সব বিষয়ে সমান কার্য্যকরী নহে বলিয়া, সেই ব্রাহ্মণ হইতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের সৃষ্টি হইল। ক্ষত্রিয় দ্বারাও বিবিধ কার্য্যের প্রচুর সুবিধা না হওয়ায়, তাহা হইতেই বৈশ্য বর্ণের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতেও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হওয়াতে শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করিলেন।"[৪৬]

মহেন্দ্রনাথের মতে মানব মণ্ডলী যে পূর্বে একজাতি বা একবর্ণ ছিল তা গীতার এই ভাষ্যে প্রতীয়মান। পঞ্চমবেদ মহাভারতে উল্লেখ আছে বর্ণ বা জাতির কোন ভেদ নেই, জগৎ ব্রহ্মময়, পূর্বে সকল মানুষই ব্রাহ্মণ নামে সৃষ্ট হয়েছে। তারপর কর্মানুসারে বর্ণবিভাগ হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণহোত্র, তার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, এই ভার্গভূমি থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের উদ্ভব হয়। আবার মহাভারতীয় হরিবংশ থেকে জানা যায় বৎস থেকে বৎসভূমি এবং ভার্গব থেকে ভার্গভূমি জন্মে। এরা মহর্ষি অংগিরার অনন্তর বংশ। এই ভার্গব কুল থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল। অন্যদিকে বায়ুপুরাণ অনুযায়ী গৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, শুনকের পুত্র শৌনক, সেই শৌনক থেকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হয়। মহেন্দ্রনাথ এই সমস্ত শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে- মানুষের জন্ম কারোর মুখ, বাহু, ঊরূ ও পদ থেকে হয়নি। পূর্বে কোন জাতি বা বর্ণ বিভাগ ছিল না। সকল মানুষই একজাতি বা এক বর্ণ ছিল। এরপর বহুদিন পরে কাজের সুবিধার একই মানবমণ্ডলী গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারভাগে বিভক্ত হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে

'মালো' জাতির মত তথাকথিত নিম্নবর্ণের এক পণ্ডিতের কলমে প্রথিতযশা ও বহুপঠিত 'শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা' নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা যায়।

ঝালমাল তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রসঙ্গের শিরোনাম 'মূল বর্ণ ও বর্ণ সঙ্কর।' এখানে মহেন্দ্রনাথ কতগুলি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস করেছিলেন। যেমন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের বা শ্রেণির মধ্যে ঝাল মাল কোন শ্রেণির অন্তর্গত অথবা এরা নতুন জাতিরূপে কোন স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে এসেছিল অথবা তাদের অস্তিত্ব বৈদিককাল বা সাংহিতিককাল থেকে কি বর্তমান আছে অথবা এই ঝালমালগণ মূলতঃ বা জন্মতঃ আর্য বংশোদ্ভব কিনা তা মনুসংহিতার বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সংহিতার আশ্রয় নিয়ে মহেন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন ঝাল-মালগণ আর্যবংশোদ্ভব 'দ্বিতীয় বর্ণক্ষত্রিয় জাতি'। তবে তারা 'ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়'। এই ব্রাত্যত্বের কারণও মনু স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। দ্বিজাতিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, তারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানগণ 'ব্রাত্য' বলে পরিগণিত হয়। ঝাল-মালগণ এই উপনয়ন সংস্কার বিহীন বা উপবীত বিহীন ক্ষত্রিয় বলে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' নামে নির্দেশিত। মহেন্দ্রনাথের মতে 'কুলতন্ত্র' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ তাদের মূল বাসভূমি থেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করেন। প্রথমে রাঢ়ে, তারপর বঙ্গদেশে, তারপর দক্ষিণ রাঢ়ে ও ওড্রদেশে গমন করেছিলেন। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান হওয়ায়, তাদের আখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। এমনকি তাদের সন্তানদের আখ্যাও সেই সেই দেশের নামানুসারে হয়েছিল বলে মহেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মহেন্দ্রনাথ তার গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লিখেছেন:

> "ঝাল ও মাল (ঝল্ল ও মল্ল) কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন জাতির নাম নহে। "ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণই" দেশ বিশেষে ঝাল মাল ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থগণের মধ্যে যেমন বহু সম্প্রদায় আছে- ঝাল ও মাল সেইরূপ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সম্প্রদায় বিশেষ। কেবল, দেশ ভেদিক আখ্যা মাত্র। অর্থাৎ 'মালবার' ও 'ঝালরকোট' হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এই বঙ্গভূমিতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় নামের পরিবর্তে পূর্বদেশানুযায়ী আখ্যায় 'ঝাল' ও 'মাল' জাতি নামে পরিচিতি হইয়া আসিয়াছে; এবং শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় জাতির পরিবর্তে ঝাল-মাল জাতি বলিয়াই ধারণা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু যে যে দেশ হইতে ক্ষত্রিয়গণ এই বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাঁহাদের আদিম বাসস্থানের নাম হইতেই যে তাঁহারা

জাতি পদবাচ্য হইয়াছে নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ ঝালরকোট হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ ঝাল জাতি ও মালবার হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ মাল জাতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ ঝাল ও মালগণ ভিন্ন জাতি নহে- জাতি একই "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়"। ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) কর্মানুযায়ী ও দেশভেদিক আখ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মাত্র।"[৪৭]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলা হয় কারণ, এই তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার থাকলেও, পরস্পর পৃথক বোঝাবার জন্য উপবীতের শ্রেণি বিভাগ ছিল। এবং কোন বর্ণের কত বৎসর পর্যন্ত উপনয়নকাল নির্দিষ্ট তাও নিরূপিত আছে। মনুসংহিতা থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণের ১৬ বছর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বছর পর্যন্ত, বৈশ্যের ২৪ বছর পর্যন্ত উপনয়নকাল নির্দিষ্ট। যদি উক্ত নির্দিষ্ট সময় মধ্যে উপনয়ন সংস্কার না হয়, তবে তাদেরকে "ব্রাত্য" বলা যায়। উপবীতের শ্রেণি বিভাগ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে কার্পাস নির্মিত উপবীত ব্রাহ্মণেরা ধারণ করবে, শণ সূত্রের নির্মিত উপবীত ক্ষত্রিয়েরা ধারণ করবে, এবং মেষলোমের নির্মিত উপবীত বৈশ্যরা ধারণ করবে। ঝাল-মালগণ যে সংকর জন্মা বা বর্ণসংকর নয় বা বর্ণসংকরত্ব প্রাপ্ত হয় নি। যে দ্বিতীয় বর্ণ আর্যকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় জাতি হতে উদ্ভব সেই ক্ষত্রিয় জাতিতেই অটল অচলভাবে বিরাজমান্তাতে সন্দেহ নেই। ঝাল-মালগণ কোন নবাগত জাতিরূপে উড়ে এসে জুড়ে বসে নি। ঝাল-মালগণ মূলতঃ বা জন্মতঃ আর্য বংশোদ্ভব দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি আর বৈদিককাল বা সাংহিতিক কাল থেকেই বর্তমান আছে হিন্দু-ধর্মের শীর্ষস্থানীয় মানব-ধর্মশাস্ত্র মনু সংহিতা ও ইতিহাস তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ঝাল-মাল তত্ত্বের তৃতীয় প্রসঙ্গের মূল বক্তব্য হল বাংলার ঝালো-মালোগণ কোন বর্ণসংকর জাতির বংশধর নন। উনিশ ও বিশ শতকের বৌদ্ধিক ও সামাজিক পরিসরে মালোদের সম্পর্কে প্রচলিত প্রথাগত মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী এই প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। তিনি মহেশচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন সংগৃহীত ও অনুবাদিত 'জাতিমালা', 'জাতি কৌমুদী' ও 'জাতি সঙ্কর' [বেণীমাধব ন্যায়রত্ন] এবং কালীবর বেদান্ত বাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত মূল সংস্কৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গ্রন্থের সাহায্যে দেখিয়েছেন 'বর্ণসঙ্কর জাতির' তালিকায় 'মাল' জাতির নাম নেই। সেখানে আছে 'মান্ন' জাতি। তিনি 'জাতি কৌমুদী' ও 'জাতি সঙ্কর' গ্রন্থে উল্লেখিত বিবৃতি (লেটাৎতীবর কন্যায়াং জায়ন্তে ষটচ জাতয়ঃ।/মালো মল্লঃ মাতবশ্চ ভড়ঃ কোলঃ কলন্দরঃ।।) ও পঞ্চানন কৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখিত বিবৃতিকে (লেট স্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস ষন্নরান্।/ মান্নবন্বং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলং

কলন্দরম্।।) পাশাপাশি উল্লেখ করে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে এক পিতা ও মাতা থেকে কেমন করে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হতে পারে। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুবাদের সময় অনুবাদক কৃত ভুল ব্যাখ্যা পরিবেশন হতে পারে বলেও তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন বল্লালচরিতের লেখক মহাশয় বল্লালচরিতের ভূমিকায় লিখেছেন-

> 'সঙ্কর জাতিদিগের উৎপত্তি প্রক্রিয়া নির্ণয় বিষয়ে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্কর' হইতে প্রায় সম্পূর্ণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং জাতিমালা হইতে কোন কোন সঙ্কর জাতির আধুনিক প্রচলিত নাম সংগৃহীত হইয়াছে।'[৪৮]

তার মতানুযায়ী বল্লালচরিতের শ্লোক, অন্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সঙ্গে জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্কর পুস্তকের সঙ্গেও পাঠান্তর দেখা যায়। এতে বোঝা যায় বল্লালচরিতের শ্লোক, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তাও অন্য একজন ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত হওয়াই সম্ভব। সুতরাং এর রচনাবলী কারো হিত বা অহিতসাধনে প্রমাণ হতে পারে না।

এ বিষয়ে সর্বশেষ বক্তব্য হিসেবে তিনি অনুবাদকারীদেরই দায়ী করেছেন। তিনি জানিয়েছেন মূল সংস্কৃত গ্রন্থে মাল, বা মল্ল শব্দের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে সেই শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার ভাষায় এটা অনেকটা

> 'উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।'[৪৯]

লোকসমাজে প্রচলিত এই প্রবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি উচ্চকোটির জনমানসের বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন তথা তাদের নীচ মানসিকতার পরিচয়কে তুলে ধরেছেন।

মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থটির চতুর্থ প্রসঙ্গ 'ব্রাত্য-নিন্দনীয় নহে'। মনুসংহিতার সূত্র ধরে ব্রাত্যত্ব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> "দ্বিজাতিরা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে "ব্রাত্য" বলে। "ব্রাত্য" ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, ইঁহাদিগকে দেশ

বিশেষে ভূর্জকন্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, ও শৈখ বলে। আর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, তাহারা দেশ বিশেষে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রাবিড় নামে অভিহিত। এবং ব্রাত্য বৈশ্য পুরুষ হইতে সবর্ণা গর্ভজ সন্তান দেশবিশেষে সুধন্বাচার্য্য, কারূষ, বিজন্ম, মৈত্র এবং সাত্বত আখ্যা প্রাপ্ত হয়।"[৫০]

এই বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে ব্রাত্য নিন্দার পাত্র নয়। সুতরাং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে ঝাল-মালগণের সামাজিক সম্মান রয়েছে বলে তিনিও সদর্পে ঘোষণা করেছেন।

প্রাচীন শাস্ত্রাদির বক্তব্যের ব্যাখ্যার দ্বারা মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন- ব্রাত্যা সংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্র-প্রায়া অর্থাৎ উপয়নের পূর্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শ্রাদ্ধীয় মন্তব্যতিরেকে অন্য কোন বেদ পাঠ করতে পারে না। কারণ এরা উপনীত হয়ে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম ধারণ না করিলে শূদ্রের ন্যায় থাকেন।

উপনয়নের পূর্বে দ্বিজগণ শূদ্রতুল্য থাকেন। কিন্তু ব্রাত্যগণ শূদ্র হয়ে যায় এমন নয়। ব্রাত্যগণ মূলত দ্বিজ, দ্বিজের উচিৎ ক্রিয়া লোপ হওয়ায় তাদেরকে শূদ্র বলা হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন নির্দিষ্ট সময়ে উপনয়ন না হলে এবং ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ না হওয়া পর্যন্ত দ্বিজাতিগণ দ্বিজোচিত কাজ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এক্ষেত্রে বিষ্ণু সংহিতা থেকে তিনি তার বক্তব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বিষ্ণুসংহিতায় বলা হয়েছে যে ব্রাত্যগণ ব্রাহ্মণের ন্যায় দৈবকার্যে সম্পূর্ণ অধিকারী শূদ্রের ন্যায় অনধিকারী নয়। ব্যাস সংহিতা থেকে জানা যায় যে দ্বিজাতিগণের উপনয়ন কাল অতীত হলে বেদ-পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত হয়ে তারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হয় এবং ব্রাত্যস্তোম নামক প্রায়শ্চিত্ত করে পুনঃ বেদ পাঠ ও উপনয়নের অধিকারী হবে।

শঙ্খ সংহিতা থেকে জানা যায়-

"যথাকালে উপনয়নাদি সংস্কার না হইলে-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য- এই তিন বর্ণ সাবিত্রী পতিত ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়, এবং ব্রাহ্মণাদির কর্তব্য গায়ত্রীজপাদি কার্য্যে অধিকার থাকে না।"[৫১]

বসিষ্ঠ সংহিতায় সময়কাল হিসেবে ব্রাহ্মণের জন্য ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর, বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্যন্ত উপনয়নকাল স্থির আছে। এই সমস্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে সংহিতা প্রণেতাগণ কেউই ব্রাত্যগণকে বর্ণসংকর, অন্ত্যজ, জারজ বা শূদ্র বলে উল্লেখ করে নি। 'বেদ' ও ব্রাত্যগণ সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে ব্রাত্য দেবপ্রতিম, এমনকি পরম পিতার অনুকল্প। এবং এদের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভুত হয়েছিল। অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটি ব্রাত্য মহিমাতে পরিপূর্ণ:

> "ব্রাত্যবৈদিক কার্য্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূজ্য; অধিককথা কি; ব্রাত্য স্বয়ং দেবাদিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগত ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে, তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।"[৫২]

সামবেদেও ব্রাত্য শব্দের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে না যাইয়া এই মর্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন। এরাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়েছিলেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে লেখক জানিয়েছেন যে ব্রাত্যগণ বা ব্রাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কখনও কোনরূপ নিন্দনীয় নয় বরং পূজনীয়।

ঝাল-মাল তত্ত্বের পঞ্চম প্রসঙ্গের শিরোনাম "বর্ণ-বৃত্তি ও উপাধি"। তার মতে গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি বা বর্ণ প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। তদানুযায়ী মানব সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণে বিভক্ত হয়। এর বাইরে পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না। মহেন্দ্রনাথের মতে উক্ত চতুর্বর্ণ ব্যতীত পরবর্তীকালে যেসব জাতির সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি সবই মিশ্রবর্ণ বা সংকর জাতি। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্মই ব্রাহ্মণের বৃত্তি। প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, নৃত্যগীত ক্ষত্রিয়ের কর্ম। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ এবং কৃষি কর্ম বৈশ্যর বৃত্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষাই শূদ্রের

> বৃত্তি। ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে আরো জ্ঞাতব্য আছে যে তারা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ঝালমালগণের শস্ত্র বৃত্তির কথা উল্লেখ আছে।।... অত্রি সংহিতার সূত্র থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ ষট কর্মা, ক্ষত্রিয় পঞ্চকর্মা, বৈশ্য সপ্ত কর্মা এবং শূদ্র দ্বিকর্মা বিশিষ্ট।"[৫৩]

এরপরেই মহেন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন কোন বর্ণই শাস্ত্র নির্ধারিত বৃত্তির উপর নির্ভরশীল নয় বা শুধুমাত্র প্রথাগত জীবিকার দ্বারা জীবনধারণে সক্ষম নয়। তাই তিনি লিখেছেন:

> "এই শাস্ত্র নির্দিষ্ট দ্বিকর্মা, সপ্তকর্মা, পঞ্চকর্মা এবং ষষ্টকর্মার স্থলে সকলেই বাইশকর্মা হইয়া বিশ্বকর্মা হয়েছেন। যখন কোন বর্ণই বর্তমানে শাস্ত্রোল্লিখিত উক্ত নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত নহে, তখন নব্য পণ্ডিত বিশেষের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যায়... সকলেই 'বর্ণসঙ্কর' পদবাচ্য হতে পারে।"[৫৪]

কিন্তু বর্ণোচিত বৃত্তি পরিহার করলেই তিনি ঘৃণিত বা নিন্দনীয় হবেন এমন হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। সামাজিক ব্যাভিচারের যে ধরনের বর্ণসংকরের জন্ম তা ঘৃণিত হলেও 'স্বকর্ম ত্যাগ' বা পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণসংকরগণ কখনই সেভাবে নিন্দনীয় হন না। স্বাভাবিকভাবেই ঝালো-মালোগণ তাদের ক্ষত্রিয় সুলভ কর্ম ত্যাগ করেছেন বলে যারা নিন্দা করেন তাদেরও একবার ভেবে দেখা উচিৎ তারা প্রকৃতপক্ষে কি প্রচার করছেন। তাই মহেন্দ্রনাথ মনুসংহিতার সূত্র ধরে লিখেছেন যে অনার্য যদি আর্য কর্ম করে এবং আর্যগণও যদি অনার্যগণের কর্ম করে, তবে উভয়ে সমান নয়। অনার্যগণ আর্যগণের কর্ম করিলেও আর্যগণের সমান হইতে পারে না। কারণ নিন্দিত কাজে জাতি নাশ হয় না। অর্থাৎ শূদ্র কিংবা যেকোন অন্ত্যজ বর্ণসংকর দ্বিজাতিগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) কার্য করে এবং দ্বিজাতিগণ যদি শূদ্র কিংবা যেকোন অন্ত্যজ বর্ণসংকরের কার্য করে, তবে উভয়েই সমান নয়। শূদ্র কিংবা যেখানে অন্ত্যজ বর্ণসংকর দ্বিজাতির সমান হইতে পারে না, এবং দ্বিজাতিগণও ইহাদের সমান হইতে পারে না, কেননা নিন্দিত কাজে জাতি নাশ হয় না।

স্বকর্মত্যাগে যে, বর্ণসংকর আখ্যা প্রাপ্ত হবে বা একেবারেই মানুষের অধম হয়ে যাবে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এমন নয়। ব্যভিচারজনিত সন্তানই যে বর্ণসংকর অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দনীয় তার সন্দেহ নেই। ফলতঃ আজকাল যে বর্ণেরই (জাতিরই) ব্যভিচার (জারজ) সন্তান

জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তান আর সেই বর্ণে বা জাতিতে স্থান পায় না, একেবারে জন্মের মতো জাতি (শ্রেণি) থেকে বের হয়ে যায়। সংকর জাতি সম্বন্ধে মনু সংহিতায় বলা হয়েছে যে বর্ণসংকর বিষয়ে পিতামাতার নাম উল্লিখিত জাতি, পিতা মাতার জাতিই প্রাপ্ত হয়। যাদের পিতা মাতার নাম জানা যায় না, তাদের গোপনীয় বা প্রকাশিত মনুষ্যের কর্ম দ্বারা জাতি নির্ণয় করা যায়।

যাদের পিতা মাতার নাম জানা যায় না তাদের কর্ম অর্থাৎ ব্যবসা দ্বারা জাতির নির্ণয় করতে হবে এবং এরাও সংকর শ্রেণিভুক্ত। মহেন্দ্রনাথ তার গ্রন্থে আরো বলেছেন যে স্বকর্ম ত্যাগ করলে বর্ণসংকর হয় এই বলে ব্রাত্যগণকে বা আলোচিত দ্বিতীয় বর্ণ বিবাহিতা সবর্ণা গর্ভজ ক্ষত্রিয় ঝাল মালগণকে যারা বর্ণসংকর নির্দেশিত করেছিলেন বা করেন পূর্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা তাদের ভ্রম দূর হবে। ব্রাত্যগণ বা আলোচিত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ঝাল মালগণের পিতা মাতার নাম উল্লেখ করেই ভগবান মনু তদীয় সংহিতায় জাতি ও বৃত্তি নির্ণয় করে গিয়েছেন এবং কোন বর্ণের কোন উপাধি তাও যথাস্থানে উল্লেখ করেছেন।

মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণের শর্ম উপাধি, ক্ষত্রিয়ের বর্ম উপাধি, বৈশ্যর ভূতি এবং শূদ্রের দাস উপাধি। এই অনুযায়ী মহেন্দ্রনাথ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ঝল্ল সম্প্রদায়ের “ঝাল বর্মা বা ঝল্ল বর্মণঃ” এবং মল্ল সম্প্রদায়ের “মাল বর্মা বা মল্লবর্মণঃ” উপাধি শাস্ত্রসম্মত। তবে অনেক জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তি বলেন ঝাল-মালগণ প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় জাতি হলেও, মৎস্যের ব্যবসা করেই তারা জাতিভ্রষ্ট হয়েছেন। তবে মহেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে জানিয়েছেন শাস্ত্র অবগত না হওয়া লোকেরাই ওসব কথা বলেছেন। কারণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ‘ব্যবসায় জাতি নষ্ট হয় না’। তিনি জানিয়েছেন সমাজবিপ্লব, যুদ্ধবিপ্লব প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে হীন হয়ে তাঁদের নিজ বাসভূমি পশ্চিম ভারত ত্যাগ করে জলাপূর্ণ বঙ্গভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জল প্লাবিত বা জলাভূমিতে মৎস্য সহজ প্রাপ্য হওয়ায় তারা মৎস্য ব্যবসাতে (রজঃগুণ স্বরূপ মৎস্য মারণ) মনোনিবেশ করেন। আর মৎস্য মারণ তথা মৎস্য ব্যবসা যে দোষের নয় এবং ক্ষত্রিয়রা যে মৎস্য ব্যবসাতে লিপ্ত হতে পারেন তা মহাভারতের অনুষঙ্গ থেকে সহজেই অনুমেয়। শাস্ত্রবিশারদ মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:

> “ব্যাসদেব ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত হইয়াও সমগ্র হিন্দু সমাজের পূজনীয়। হিন্দু সমাজের পুরাণ, ইতিহাস, ভাগবতাদি রচনা করিয়া, জগতে তিনি

> অমর হইয়া আছেন। তিনিই একাত্রববদ্ধ বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নাম ধারণ করেন। যদি তিনি ধীবর কন্যার গর্ভজাত বলিয়া নীচ হইতেন, তবে হিন্দু সমাজের নেতাকর্তা তাঁর চরণে গড়াগড়ি যাইতেন না। এবং ব্যাসদেবও শাস্ত্র প্রণয়নে অধিকারী হইতেন না। কেননা, দ্বিজাতি ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের শাস্ত্র প্রণয়ণের পূর্বে অধিকার ছিল না; অধিক কি, পাঠ পর্য্যন্তও নিষেধ ছিল। আবার মহারাজ শান্তনু সত্যবতীকে (মৎস্যগন্ধাকে) বিবাহ করিতে মনন করিয়া, তাঁহার (মৎস্যগন্ধার) পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার পিতা একেবারে অস্বীকার করেন, পরে ভীষ্মদেবের অনুরোধে নিজ কন্যা সত্যবতীকে মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজা শান্তনু ক্ষত্রিয় – সত্যবতী ধীবর কন্যা; যদি মৎস্য মারণে জাতিনষ্ট হইত বা রজঃগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে মৎস্য মারণ প্রচলিত না থাকিত, তবে মৎস্যজীবীর কন্যাকে মহারাজ শান্তনু কখনই নিজ মহিষী করিতে পারিতেন না। ইহাতে প্রমাণ হয়, সত্যবতীর পিতা জাতিতে ধীবর না হইয়া হয়তঃ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, তাঁহার হয়ত ধীবরের ব্যবসা মৎস্য মারণ প্রভৃতি ছিল। সত্যবতীর পিতা ক্ষত্রিয় না হইলে, একজন মহান রাজা কখনই এরূপ দার গ্রহণে সমর্থ হইতেন না। আর যদি সত্যবতীর পিতা ক্ষত্রিয় না হইয়া অন্য নীচ জাতি হইত, তবে নিশ্চয়ই রাজাকে জাত্যন্তরিত হইতে হইত; এবং তাঁহার পুত্রাদিও ক্ষত্রিয় না হইয়া, অন্য উপজাতিতে পরিণত হইত। এবং মৎস কর্তন করিয়াই দ্রোপদীর স্বয়ম্বর কার্য্যও সম্পন্ন হয়।”[৫৫]

দ্বিজ বংশী দাস ও নারায়ণ দেব কৃত ‘পদ্মপুরাণ’ বা ‘বিষহরির পাঁচালী’ নামক পুস্তক থেকে জানা যায় চাঁদ সদাগর ভরদ্বাজ গোত্র ও গন্ধ বণিক কুলোদ্ভব হয়েও স্বধর্ম বাণিজ্যের সাথে সাথে মৎস্য ব্যবসাতেও লিপ্ত ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ সবশেষে বর্তমান দিনের সাথে প্রাসঙ্গিক একটি তুলনা করে দেখিয়েছেন যে ব্যবসাতে জাতি নষ্ট হয় না। তিনি খুব প্রাঞ্জলভাবে লিখেছেন:

> “বর্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়, হোটেল ওয়ালা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ হোটেলে রান্না করিয়া পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। রেলগাড়ি বা জাহাজ হইতে নামিলেই তন্নিকটবর্তী হোটেল ওয়ালা ব্রাহ্মণ মহোদয় দৌড়ে এসে বলে, “আমার হোটেলে চলুন, ডাল মাছ সকলই পাবেন। যদি ডাল

ভাত খান, তবে বার পয়সা, - আর মাছ ভাত খেলে (খাইলে) চারি আনা।"- এই সব মহাশয়গণ কি মৎস্য বিক্রয়ী নয়? আর সম্ভবতঃ হোটেল ওয়ালা ব্রাহ্মণগণ অন্ন, মৎস্য, তৈল, লবণ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াই, অন্যান্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা বিশুদ্ধ বিবেচনায় – "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল" বলিয়া সর্বসাধারণের বিদিতার্থে যথাস্থানে বিজ্ঞাপনী করেন; ইহা সর্বজন বিদিত। আবার 'পুষ্করিণী বিক্রয়' সকল দেশেই ও সকল জাতিই করিয়া থাকেন। কিন্তু পুষ্করিণীর নাম দিয়া মৎস্য ভিন্ন কেহই পুষ্করিণীর জায়গা বা জল বিক্রয় করে না। দেখিতে গেলে সকলেই এইরূপ প্রকারন্তরে মৎস্য বিক্রয়-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এবং বড়শী বা জালদ্বারা মাছ ধরিতেও প্রায় কেউই (কোন জাতিই) ত্রুটি করেন না- করিলেও মুষ্টিমেয়। ইহা সর্ববিদিত।"[৫৬]

সবশেষে মহেন্দ্রনাথ দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

"আমাদের দেশের ব্যবস্থা এই,- মৎস্য খাওয়াটা যেন দোষের নয়, মৎস্য ধরাটাই দোষের; মাংস খাওয়াটা যেন দোষের নয়, পশু সংহার করাটাই যেন দোষের; তাই এসকল কার্য্য যাহারা করে, তাহারা নীচশ্রেণীস্থ হইয়া আছে। কিন্তু এ প্রভেদ ক্রমে অদৃশ্য হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের সন্তানও আর বস্ত্র-বয়নে পশ্চাৎপদ নহেন। ব্যবসায়ের মহত্ব নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে হেয় বা অবমাননার কিছুই নাই, তাহা সকলেই আদরের ও সসম্মানের বস্তু। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণেরই যে ব্যবসায়ে অধিকার আছে, তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে আর জাতিপাত বা সামাজিক অবনতির কোন আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ পরের দাসত্ব না করিয়া পরাধীন বৃত্তিতে আপনার স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব না হারাইয়া, আপন যত্নে আপন চেষ্টায় ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন পূর্বক ধনী মানী হওয়া সর্ববিধায়ে শ্রেয়ঃ।"[৫৭]

গ্রন্থ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় গ্রন্থটির নামকরণ 'দ্বিতীয় বর্ণ (ক্ষত্রিয়) বা ঝাল-মাল তত্ত্ব' যথোপযুক্ত। গ্রন্থাকার এখানে সুনিপুণভাবে তাত্ত্বিক যুক্তিনির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে জাতি বর্ণের উৎপত্তির সাথে সাথে ঝাল-মাল (ঝালো-মালো) জাতির উৎপত্তি বিবরণ,

জাতিকাঠামোয় তাদের অবস্থান, তাদের ক্রিয়া, সংস্ক্রিয়া সবকিছুই লিপিবদ্ধ করেছেন। সেইদিক থেকে গ্রন্থটি জাতপাত সংক্রান্ত চর্চায় আকরগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে।

মল্লক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণের ঝালমাল তত্ত্বের অনুপূরক হিসাবে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীমহিমচন্দ্র মল্লবর্মণের 'ঝল্ল-মল্ল পরিচয়' (নিকলি, ঝালমাল সমিতি, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) পুস্তকটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পুস্তিকায় মহিমচন্দ্র মল্লবর্মণ ঝালো-মালোদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রসঙ্গে মোট ষোলটি সংযোজনী একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন। ঝাল-মালগণ যে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করে সংস্কৃত হতে পারেন তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি নয়টি শাস্ত্রীয় বিবৃতিকে একত্রিত করে পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থে। এককথায়, এই সংযোজনীগুলিতে মূলতঃ ঝালো-মালোদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে জোড়ালোভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন শ্রীমহিমচন্দ্র মল্লবর্মণ।

তত্ত্বগতভাবে মালোরা ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রমাণিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে পৈতাধারণ ও ব্রাহ্মণদের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার চেষ্টা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মতো মালোরা ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় ১৯২০-র দশকে পৈতাধারণ আন্দোলন শুরু করেন। মালোদের এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি মূলত নেতৃত্বের অভাবে।

ঔপনিবেশিক যুগে জাতি সচলতা ও আত্মচেতনার আরেকটি উল্লেখ্য বিষয় ছিল আর্থ সামাজিক উন্নয়ন। নমঃশূদ্র আন্দোলন, রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলন, মাহিষ্য আন্দোলন, ও বাংলার অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় বা জাতির জাতি আন্দোলনে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইশ্যুগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল কারণ কোন জাতির সামাজিক অবস্থানের অন্যতম সূচক হিসাবে শিক্ষার স্তরকে দেখা হয়েছে। কিন্তু মালোদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনে এই ধরনের প্রয়াস খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে অদ্বৈত মল্লবর্মণের উদ্বেগের শেষ ছিল না। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রভৃতি কেনার জন্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংক স্থাপনের প্রয়াস এদের মধ্যে ছিল না যদিও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজন সমবায় আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথমভাগে নদীমাতৃক বাংলার বড় বড় নদী বা জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীদের জন্য ছিল উন্মুক্ত। অবশ্য জমিদারদের 'জলকরের' অধীন ছোট নদী বা ছোট

বিল সমূহে মাছ ধরার জন্য তাদের ‘সর্দার’ বা ‘মাতব্বর’ দের মাধ্যমে। অর্থাৎ যৌথভাবে মাছ ধরার পাশাপাশি যৌথ প্রক্রিয়ায় মৎস্যাধার ইজারা নেওয়ার ব্যবস্থা সমবেত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মালোদের গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনাকে সজীব রেখেছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সব মালোর অবস্থা একরকম ছিল না। জাল ও নৌকার মালিক হিসাবে চুক্তি বা লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে যারা অন্য মালোদের নিয়োগ করতেন তারা ছিলেন প্রথম শ্রেণির মৎস্যজীবী। মূলধনী সামগ্রীর মালিক হিসাবে তাদের লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তাছাড়া আড়ৎদার ও নিকারিদের প্রথম শ্রেণির মৎস্যজীবী বলা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণির মৎস্যজীবী হলেন তারাই যারা নিজের জাল ও নৌকার দ্বারা নিজে বা পারিবারিক শ্রমের ভিত্তিতে মাছ ধরার কাজ করেন। অর্থাৎ এরা স্বাধীন মৎস্যজীবী কিন্তু প্রান্তিক নন। জাল-নৌকাবিহীন মৎস্যজীবী যারা অন্য মালোর অধীনে মাছ ধরার কাজ করতেন তারা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির মৎস্যজীবী। সাধারণ মাছ বিক্রেতা বা খুচরো বিপননকারীগণও তৃতীয় শ্রেণির মৎস্যজীবী। এদেরও নিজস্ব মূলধন নেই। যা আছে তা হল তাদের দাড়িপাল্লা, বটি বা হাড়ি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়ংকর শীত বা গরম ও সাপ-কুমিরের মত ভয়ংকর জলজ প্রাণীর ভয় উপেক্ষা করে ধরে আনা ‘রূপালী ফসল’ ভোজনরসিক বাঙালিদের রসনা তৃপ্ত করলেও মালোরা ছিলেন সামাজিকভাবে অপাঙ্ক্তেয়। অর্থাৎ মালোদের পরিশ্রমের ফসলের স্থান মুখ ও উদরের ভেতরে এবং হৃদয়ের গভীরে। কিন্তু তারা সামাজিকভাবে ছিলেন অন্ত্যজ, অধম বা প্রায় অচ্ছ্যুত। ঢাকায় বসবাসকারী একজন ব্রিটিশ ডাক্তার হিসেবে জেমস ওয়াইজ যখন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৎস্যজীবীদের ‘বাঙালি জাতির পৌরষত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ’ বলে বর্ণনা করেছেন সেই সময় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলে পরিবারের মহিলাদের ‘জেলেমাগী’ হিসাবে সম্বোধন করেছেন। মালোরা ছিলেন প্রায় অন্ত্যজ জাতি, যাদের থেকে ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উঁচু জাতির মানুষেরা অন্নজল গ্রহণ করতেন না। এদের পরিবারের কারোর মৃত্যুর পর ৩১ দিন ধরে অশৌচ পালন করতে হতো যেখানে উচ্চবর্ণীয়রা ১১-১৩ দিনের মধ্যে মৃত্যু পরবর্তী অশৌচ ও শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করতেন। তবে পতিত ব্রাহ্মণগণ এদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতেন। মালোদের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাবার্ট হোপ রিসলি লিখেছেন:

> 'Malos as a rule belong to the Vaishnava sect. Their Purohit is a Palit-Brahman, and their Guru a Gossain. The dead are usually burned on the bank of a river- and the ashes caste into the water. Sraddh is performed on the thirty first day after death. The social rank of the Malos is low, and Brahmans will not take water their hands. The only titles met with among Malos are Majhi, Patra, and Bepari.'[৫৮]

বিশ শতকের গোড়ায় মালোদের সামাজিক অবস্থান ও সামাজিক চিন্তাচেতনায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। ঔপনিবেশিক সরকার, দেশীয় শিক্ষানুরাগী ও খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পেলেন মালোরা। আইন-আদালত, বিচার ব্যবস্থা ও যুক্তিবাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন মালোদের শিক্ষিত অংশ।

শ্রী ব্রজনাথ দাস, শ্রী অনন্ত চন্দ্র দাস, শ্রী উদ্ভব চন্দ্র মল্লবর্মণ, শ্রীদীননাথ তালুকদার, প্রভৃতি অগ্রগণ্য মালো 'ঝাল-মাল বান্ধব' বা 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি' স্থাপন করে মালোদের ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর হিসাবে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মালো শাস্ত্রবিদ শ্রী মহেন্দ্র নাথ মল্লবর্মণ, শ্রীধর্মচাঁদ মল্লবর্মণ ও শ্রী মহিমচন্দ্র মল্লবর্মণ তাদের লেখার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে বাংলার ঝালো-মালোরা প্রকৃতপক্ষে রাজস্থানের ঝালোয়ার ও মল্লরাজ্যের রাজবংশের বংশধর। ঐ অঞ্চলে রাজ বিপ্লব ও সঙ্কটের জন্য তারা বহির্গমনে বাধ্য হয়েছিলেন।

শাস্ত্রীয় সূত্র উদ্ধৃত করে স্বরচিত ইতিহাস রচনার দ্বারা ক্ষত্রিয় প্রমাণিত হলেও তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের থেকে মালোরা ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেননি। তাই মালোরা ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ১৯২১ ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। পাশাপাশি ক্ষত্রিয়-সুলভ আচার আচরণ গ্রহণ করে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন মালোরা। মালোদের জাতি পত্রিকা 'ঝালমাল বান্ধব' এ প্রকাশিত সংখ্যাগুলি থেকে জানা যায় যে ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে মালোরা বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্র, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরিবিদ্যা, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন বিহার, বাংলা, আসাম এমনকি ব্রহ্মদেশেও উচ্চশিক্ষিত মালোরা কর্মরত ছিলেন। এই শিক্ষিত শ্রেণি ও তাদের দ্বারা

অনুপ্রাণিত মালোগণ ৩০ দিনের অশৌচ পালনের পরিবর্তে ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ সমাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একইসাথে প্রথাগত পদবীর (মালো, ঝালো, বেপারী, পাত্রর) পাশাপাশি পূর্ব বাংলার মালোরা মল্লবর্মণ, ঝল্লবর্মণ, সিংহবর্মণ, দাসবর্মণ, হালদার, বিশ্বাস, সরকার, ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করতে শুরু করেন।

কিরীটি ভূষণ মন্ডল এর গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে অনেক সময় প্রভুত্বকারী জাতি এবং শক্তিশালী শাসক গোষ্ঠীর লোকেরা জোর পূর্বক অপহরণ, ধর্ষণ, দাসী, উপপত্নী হিসেবে অধঃস্তন শাসিত জাতির মানুষকে করতে চাইলেও নিষাদ গোষ্ঠীভুক্ত এই জাতি কোন দিন তা মেনে নেয়নি। নিষাদের মধ্যে চণ্ডাল, ধীবর, মালো, কৈবর্ত ও ব্যাধ সম্প্রদায় বহুবার পরিবার পরিজন নিয়ে বাসভূমি ত্যাগ করেছে, স্থানান্তরিত হয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে কিংবা যাযাবর এর মত জীবনযাপন করেছেন তবু অন্য সম্প্রদায় অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে দৈহিক বা মানসিক সম্পর্কের মত সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করেনি। যাযাবর বৃত্তিতে জীবন কাটালেও নারী পুরুষ কখনো দাসত্ব মেনে নেয়নি। জটিল সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে আত্ম অভিমানে এই সকল জাতি দূরে জলাশয়ে, জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এই গেল ভারতবর্ষের নিষাদ গোষ্ঠীভুক্ত জাতিদের কথা। সারা পৃথিবীতে জলাশয় কেন্দ্রিক যত মৎস্যজীবী আছে তাদের জাতিসত্ত্বা, ধর্মসত্ত্বা বিপন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। সেই কারণে মিশরের নীল নদের তীরে এবং মিসিসিপী নদীর তীরে বসবাসকারী মৎস্যজীবীরা কখনও ইহুদী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত। চীনের ইয়াং সি কিয়াং, হোয়াং হো ও চীন সমুদ্রের তীরে যারা বসবাস করে সেই সব মৎস্যজীবীদের পরিচয় হয়ে উঠেছে কখনও মঙ্গলীয় কখনও বা শুধু চীনা নামেই পরিচিত। আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার আদিম মৎস্য শিকারীদের বেশির ভাগ হত্যা করা হয়েছে। রাশিয়ার ভল্গা নদীর তীরে যারা বসবাস করতেন তাদের ততটা খাদ্য সংকট দেখা দেয়নি বলে তারা দেশান্তরিত হননি। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি অঞ্চলে বসবাসকারীরা খাদ্য সংকটে পড়ে একদিন ভারতবর্ষ ও পারস্যে যাত্রা করেছিল। ক্যাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলের মানুষেরা কখনো তাদের জীবন জীবিকা ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি। ভারতবর্ষের সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, কাবেরী, গোদাবরী বিভিন্ন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে সকল মৎস্যজীবী মৎস্য শিকার করে জীবন ধারণ করত তারা যাযাবর বৃত্তি নিলেও এক নদী থেকে আরেক নদীর পাড়েই তাদের আশ্রয় হত। তিব্বতের মানস সরোবরের তীরে যেসকল মৎস্যজীবীরা বসবাস করত তাদের বেশিরভাগ লোকেরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, একভাগ নেপালের মধ্যে দিয়ে যে নদীটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার তীরে বসবাস শুরু করে তিব্বতের রাক্ষসতাল হ্রদের এই

মানস সরোবরের মৎস্যজীবীরা 'মেচ' নামে পরিচিত এবং নেপালের মধ্যে দিয়ে যে নদীটি এসেছে সেই নদীটির নামকরণ এই মেচ জাতির নামেই হয়েছে বলে একে মেচী নদী বলে আর ব্রহ্মপুত্র বা সাংপো দিয়ে তার তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে আসতে আসতে অরুণাচলে এর নাম হয় দিহং ও আসামে এসে ব্রহ্মপুত্র এবং বাংলাদেশে প্রবাহিত হওয়ার সময় এর নাম হয় যমুনা এই নদীর পাড় ধরে আসা মেচ বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় আসামে বোরো নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বোরো সম্প্রদায়কে বহিরাগত বলে অহমীয়রা বঞ্চিত করে কিন্তু অহমীয়রা কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড ও মায়ানমারের মূল অধিবাসী তারা উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার দিয়ে অসমে এসে বসবাস করে ও রাজত্ব করে।

বর্তমানে মালোরা মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় রয়েছে। দিল্লীর নয়ডা-র অশোকনগর, নিঠারী গ্রাম, হরিজন বস্তি, বুড়ি গঙ্গা, বড় গঙ্গা, রাজস্থানের গান্ধীনগর, ওড়িষ্যার চিল্কায়, ভুবনেশ্বরে মালোরা অর্থনৈতিক কারণে বা পেশা পরিবর্তন করে বসবাস করছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে জলের সাথে যারা যুক্ত তাদের কৈবর্ত বলে। ঝালোয়ার থেকে ঝালোরা এখানে এসে নদীতীরে বসতি স্থাপন করে। জীবিকা হিসেবে মৎস্য শিকার ও তার পাশাপাশি কৃষিকাজকে বেছে নেয় । এদের ঝালো মালো বলা হয়। এছাড়া আমরা মল্লযোদ্ধাদের পরিচয় পাই। মালোদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তারাও হয়তো মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে যে মালোরা এসেছিল তারা হালদার, বর্মণ, বিশ্বাস, সরকার ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেছে। 'মনুসংহিতা'- য় বলা হয়েছে যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় থেকে সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে তারা দেশ বিদেশে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস এবং দ্রাবিড় নামে অভিহিত। নিষাদজাতির মধ্যে মৎস্যশিকারী মালোরা বর্তমান। মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণ তার গ্রন্থে বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করেন ঝাল-মালগণ অন্ত্যজ বা বর্ণসংকর জাতি নয়। তিনি এদের আর্যবংশোদ্ভব দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি বলে চিহ্নিত করেন। ভারতীয় সমাজে এইরকম চেষ্টা আধুনিকতার অবদান। একে দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ ড. এম এন শ্রীনিবাস বলেছেন সংস্কৃত্যায়ন। শান্তনু কায়সার এর লেখা থেকে জানা যায় যে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী স্ব স্ব পেশায় আচ্ছন্ন থাকতে বাধ্যতার কারণগুলি সনাক্ত করেছেন, অন্য সুবিধাজনক পেশায় যাবার চেষ্টা করেছেন। আর সেই সময় তারা ভারতীয় চতুর্বর্ণাত্মক কাঠামোর মধ্যে উচ্চতর অবস্থান পেতে চেয়েছেন। শূদ্ররা চেয়েছেন ক্ষত্রিয় বা নিদেনে বৈশ্যের স্তরে উন্নীত হতে। বাস্তব উন্নতির সঙ্গে এর

বিন্দুমাত্র যোগ নেই। কিন্তু এই আত্মোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ‘দক্ষিণ ভারতের মধ্যস্তরের জাতি ভানিয়ার, ভোক্কলিগ্গা’ –দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিংবা জাঠ বা ত্যাগীদের যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ স্তরে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষাকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণের দাবি মানা হয় নি, যেমন মানা হয় নি রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, মাহিষ্যদের দাবিও। তাদের সামাজিক অবস্থাও খুব বদলায় নি। পেশাগত বা অর্থনৈতিক কারণে বাংলার বাইরেও বিভিন্ন রাজ্যে মালোরা ছড়িয়ে রয়েছে। পরিশেষে বলা যায় এই আলোচনা থেকে মালো জাতির উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে আমরা একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।

তথ্যসূত্র

১। সুর, অতুল : *ভারতের বিবাহের ইতিহাস,* কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮

২। সেন, ক্ষিতিমোহন : *জাতিভেদ,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫৩, পৃ. ৯৬

৩। সেন, সুকুমার : *চর্যাগীতি পদাবলী,* কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫,

৪। স্বামী, প্রভুপাদ : *শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ,* শ্রীমায়াপুর ৭৪১৩১৩ নদীয়া, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০, পৃ. ১৭০

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *রাশিয়ার চিঠি,* শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী শতবর্ষপূর্তি মুদ্রণ ১৩৭৬, পৃ. ১

৬। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) : *বৃহৎ মনুসংহিতা,* কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৩২, পৃ. ৯০

৭। রায়, নীহাররঞ্জন : *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ২৪৯

৮। মিত্র, অমরেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার সেন, সুকুমার প্রমুখ (সম্পাদনা) : *ভারতকোষ,* কলকাতা-৬, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পৃ. ১৩৩

৯। বালা, হীরালাল : *বাংলা পিডিয়া,* চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৪৪৬

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সাহিত্য আকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮

১১। বসু, লোকেশ্বর : *আমাদের পদবীর ইতিহাস,* কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৩

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সাহিত্য আকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃ. ৬৮০

১৩। দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন : *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* প্রথম ভাগ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ৫৭৩

১৪। বসু, রাজশেখর : *চলন্তিকা,* কলিকাতা-৭৩, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৩৮৯, পৃ. ১৫৭

১৫। ওদুদ, আব্দুল : *ব্যবহারিক শব্দকোষ,* কলিকাতা-৭৩, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, নূতন সংস্করণ ৩ রা আশ্বিন ১৩৬৯, পৃ. ২০৯

১৬। ইসহাক, আবু : *সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান,* ২য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭৬

১৭। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০০০, পৃ. ১০৪

১৮। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) : *বৃহৎ মনুসংহিতা,* কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৩২, পৃ. ৮৭৩

১৯। তর্করত্ন, পঞ্চানন : *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্,* কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮২৭ শকাব্দ, পৃ. ২১

২০। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) : *বৃহৎ মনুসংহিতা,* কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৩২, পৃ. ৮৭৩

২১। রায়, নীহাররঞ্জন : *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ২৪৭

২২। O'Malley, L.S.S : *Bengal districts Gezetter- Midnapore,* Calcutta, 1911, p.58

২৩। মজুমদার, রমেশচন্দ্র : *বাংলাদেশের ইতিহাস,* কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃ. ১৭৮

২৪। সাঁতরা, প্রবোধচন্দ্র : *রাণী রাসমণি,* গ্রন্থপরিচয়-৪, কলিকাতা, ললিত প্রেস, প্রথম সংস্করণ ১৩২০ বঙ্গাব্দ

২৫। তদেব : গ্রন্থপরিচয়-৫

২৬। বসু, রাজশেখর : *মহাভারত সারানুবাদ,* আদিপর্ব, কলকাতা ৭৩, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৪১৮, পৃ. ৪৪

২৭। তদেব : পৃ. ৪৪-৪৫

২৮। বসাক, ভুবনচন্দ্র : *বিষ্ণুপুরাণ,* তৃতীয় অংশ অষ্টম অধ্যায়, কলিকাতা, নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট, ১৮৮৬, পৃ. ১২৮

২৯। ঘোষ, বিনয় : *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* কলিকাতা ১২, পুস্তক প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০, পৃ. ৭৬

৩০। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) : *বৃহৎ মনুসংহিতা,* কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৩২, পৃ. ৮৬৮

৩১। সিংহ বর্মণ, রণবীর : *ক্ষেত্রসমীক্ষা,* জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটির সভাপতি

৩২। তদেব : *ক্ষেত্রসমীক্ষা*

৩৩। তদেব : *ক্ষেত্রসমীক্ষা*

৩৪। তদেব : *ক্ষেত্রসমীক্ষা*

৩৫। BLACK ADAM, BLACK CHARLES : *Encyclopaedia Britannica,* Vol. XIII P. 689

৩৬। Hunter, William Wilson : *Imperial Gazetteer of India,* Vol. VII P. 202

৩৭। তদেব : Vol. IX, P. 235-236

৩৮। বসু, সমরেশ : *গঙ্গা,* কলকাতা-৯, মৌসুমী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মে-১৯৭৪, পৃ. ৩২

৩৯। তদেব : পৃ. ১৪

৪০। Wise, James : *Notes on the Races, Castes And Trades of Eastern Bengal,* (London Harrison and sons, 1833) p. 337

৪১। Risley, H.H : *The Tribes and Castes of Bengal* (1891), reprint edn, (Calcutta, Firma Mukhopadhyay, 1981), Vol. II, পৃ. ৬৫

৪২। তদেব : Vol. II, পৃ. ৬৫

৪৩। মল্লবর্মণ, মহেন্দ্রনাথ : *দ্বিতীয় বর্ণ (ক্ষত্রিয়) বা ঝাল-মাল তত্ত্ব* ময়মনসিংহ, সেন ব্রাদার্স প্রেস, প্রথম সংস্করণ কার্ত্তিক ১৩২১, পৃ. ৪

৪৪। তদেব : পৃ. ৭-৮

৪৫। তদেব : পৃ. ৯

৪৬। তদেব : পৃ. ১৪

৪৭। তদেব : পৃ. ৩৭-৩৮

৪৮। তদেব : পৃ. ৫৬-৫৭

৪৯। তদেব : পৃ. ৫৭

৫০। তদেব : পৃ. ৬৫-৬৬

৫১। তদেব : পৃ. ৭১

৫২। তদেব : পৃ. ৭৪

৫৩। তদেব : পৃ. ৮০-৮১

৫৪। তদেব : পৃ. ৮১-৮২

৫৫। তদেব : পৃ. ৯৬-৯৭

৫৬। তদেব : পৃ. ১০১-১০২

৫৭। তদেব : পৃ. ১০১-১০২

৫৮। Risley, H.H : *The Tribes and Castes of Bengal* (1891), reprint edn, (Calcutta, Firma Mukhopadhyay, 1981),Vol.II পৃ.৬৪-৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মালোদের সমাজজীবন

দ্বিতীয় অধ্যায়

মালোদের সমাজজীবন

প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রকৃতি আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছিল। পরিবেশের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য প্রকৃতির অবদান হিসাবে মানুষ যে সব সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী হয়েছিল সেগুলির মধ্যে দলবদ্ধ অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবার প্রবণতা অন্যতম। ক্রমশ, সেই আদিম মানুষের বংশধর সহ-স্থানে বসবাস করতে শেখে। স্থানটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে, সদলবলে তারা অন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে শেখে। এই সন্ধিক্ষণে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ধীর গতিতে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে একত্রে গমন, ভোজন, শয়ন, খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রজন্মগত আবর্তনের সূত্রপাত হয়। এই বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি নিষ্পন্নের তাগিদেই শুরু হয় সমাজের ইতিকথা। অনুকরণ এবং অনুসরণ পদ্ধতির সহায়তায় একটি প্রজন্মের মানুষের কাছ থেকে পরের প্রজন্মের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ক্রমে গড়ে উঠে একটি সুবোধ্য কিন্তু অদৃশ্য সহাবস্থানের ও সহযোগিতার রূপরেখা। তৎসঙ্গে প্রকাশ পায় একটি সহজ ও সরল দায়বদ্ধতার মনোভাব। এইগুলির সমন্বিত জীবনযাপন প্রণালীর ফলশ্রুতি সমাজ বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে যা বোঝায়।

মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি করেছে। তাই সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। মানুষ যখনই সমাজের আইন-কানুন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস মেনে চলেনা তখনই সে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। সমাজের মূল্যবোধগুলোর ভেতর দেশ ভেদে পার্থক্য থাকতে পারে। তাছাড়া, প্রতিটি সমাজে কতগুলো সাধারণ নিয়মকানুন রয়েছে, যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। সাধারণত সমাজ বলতে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝি। ম্যাকাইভার বলেন, সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপই হল সমাজ। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস বলেন মানুষকে নিয়েই সমাজ, মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যৌথভাবে মিলেমিশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একত্রিত হয় বা কোন সংগঠন গড়ে তোলে তবে তাকে সমাজ বলে। কিন্তু আমরা মানুষের সঙ্গে মানুষের সবরকম সম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্ক বলতে পারি না। কারণ সে সম্পর্ক যদি পারস্পরিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে তবে তাকে সমাজ বলা যায় না। ম্যাকাইভার সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝিয়েছেন- যার মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। এরিষ্টটল বলেছেন

মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবিহীন মানুষ হয় দেবতা না হয় পশু। সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজে বাস করে আসছে। সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান।

ম্যাকাইভার সমাজ বলতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যখন একাধিক ব্যক্তি একত্রে বসবাস করে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ঐক্যবোধ না থাকলে সমাজ গঠিত হতে পারে না। ম্যাকাইভার সমাজের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন যে সমাজ হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রথা-প্রণালী, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য, বিভিন্ন দল ও শ্রেণি, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে ও রক্ষিত হয়। তাঁর মতে এ ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল ও জটিল। আর ঐ জটিল পরিবর্তনশীল ও জটিল ব্যবস্থারই অপর নাম সমাজ। সমাজ বলতে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বোঝায় যার মাধ্যমে তাদের সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ যে সম্পর্কের মধ্যে তারা জন্মগ্রহণ করে ও জীবন যাপন করে তার সংগঠিত রূপই সমাজ। এই অধ্যায়ে ভৌগোলিক অবস্থান, প্রতীকরূপে নদী, অর্থনৈতিক জীবনের কথা, বৃত্তি বদল, উপজীবিকা, শিক্ষা, শ্রেণিবৈষম্য, রাজনীতি, দেশান্তরিত হওয়া, লোকজ সংস্কার, মোড়ল শাসন, জেলেনারীদের ভূমিকা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে মালো জাতির সমাজজীবন আলোচনা করা হবে।

জলজ মানুষের জীবনকাব্য নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকেরা নদীকে ভোলেননি। শুধু নদী নয় সমুদ্র এবং সামুদ্রিক জেলে জীবনকেও ঔপন্যাসিকরা তাদের উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কারণ তারা জানতেন জেলেজীবন নদী ও সমুদ্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নদীকেন্দ্রিক সকল উপন্যাসে নদী কেবল পটভূমিতে আবদ্ধ থাকেনি। চরিত্র, সময় ও সমাজের প্রতীকরূপেও সে চিত্রিত হয়েছে। নদী হয়ে উঠেছে মানুষের আশ্রয়-বিপর্যয়ের সাক্ষী। সে কখনো লালনকর্ত্রী, কখনো লাঞ্ছনার ক্রূর মূর্তিমতী আধার। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬) তে পদ্মা জলশস্যের ভাণ্ডার। তারই বুকে মাছ ধরে জেলেরা বেঁচে থাকে। আবার এই পদ্মাই জেলেজীবনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ঝড়-বন্যায় নদীস্থ জেলেনৌকাগুলো ও নদীতীরস্থ জেলেপাড়াগুলো ভেঙ্গে-ভেসে একাকার হয়ে যায়। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) -এ তিতাস শান্ত, নিরীহ, অশেষ মৎস্য বুকে নিয়ে বহুকাল পূর্ব থেকে সে মালোদের জীবন-জীবিকাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে আসছে। কিন্তু, এই নদীরই বুকে একদিন চর জেগে উঠার

কারণে রুদ্ধ হল মালোদের জীবিকার পথ। জেলেরা দুর্ভিক্ষপীড়িত হল, দেশান্তরিত হল। তিতাস নদী এই উপন্যাসে উন্মত্ত ধ্বংসে মেতে ওঠেনি, কিন্তু তার প্রতিকূলতা জেলেদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে একেবারে ধসিয়ে দেয়। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) তেও গঙ্গার দুটো রূপ- কল্যাণময়ী ও রুদ্র। গঙ্গার চলন্তা জল জেলেদের নৌকার পাটাতন মাছে-মাছে ভরিয়ে দেয়, আর বন্যা-টোটা তাদের সব কেড়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত করে। 'অবগাহন' (১৯৬২) এবং 'গহিন গাঙ' (১৯৮০) উপন্যাসে নদী একই রূপে চিত্রিত। ভাগীরথী ও বেতনা মালোদের মাছ জোগায়, আবার রুদ্ররূপ ধারণ করে জেলেদের বাস্তুভিটে পর্যন্ত কেড়ে নেয়। 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০২) উপন্যাসে গঙ্গায় মাছ ধরার ওপর নির্ভর করেই জেলেদের জীবন অতিবাহিত হয়। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হাজরা হালদার গঙ্গার ওপর নির্ভর করেই পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪) উপন্যাসে বলেশ্বর নদীতে মাছ ধরে গণেশ ও অন্যান্য জেলেরা জীবনধারণ করে। বলেশ্বরের জল ওপরে শান্ত আর স্থির। বর্ষাকাল আসলে বোঝা যায় আগের চাইতে নদী শুকিয়ে গেছে, স্রোত কমে গেছে। ওপরে জলে জোয়ারের চাপ না থাকলেও নীচে জলের স্রোতের রাগ ঠিকই আছে। নীচে চোরা স্রোত আছে। সেইখানে জাল ফেলতে গিয়ে গণেশ নদীতে পড়ে যায়।

সমুদ্রের জেলে আর নদীর জেলেদের মধ্যে শারীরিক ক্ষমতার পার্থক্য থাকে। সমুদ্রের জেলেরা সাধারণত মেশিনযুক্ত নৌকা ব্যবহার করে। আগে দেশি নৌকার জেলে আর মেশিন নৌকার জেলে উভয়ের মধ্যে একটি অলক্ষ্য রেষারেষি কাজ করত। এখন মেশিন নৌকার জেলেদের সাথে ট্রলারের রেষারেষি দেখা যায়। এছাড়া সামুদ্রিক ঝড়ের কথাও জানা যায়। মুক্তামাছ (১৯৯৫), ইলিশজোড় (১৯৯৭), জলপুত্র (২০০৮), দহনকাল (২০০৯) ইত্যাদি উপন্যাসে সমুদ্রের প্রসঙ্গ এসেছে। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে জেলেদের দুঃখ দুর্দশা জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে এই সকল উপন্যাসে।

এই উপন্যাসগুলোতে মালোদের বৃত্তিজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে কয়েকটি সামাজিক সত্য স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মালোদের অর্থনৈতিক জীবনের কথা। এদের জীবন মহাজন-দালাল-আড়তদার নিয়ন্ত্রিত, শোষণ-বঞ্চনা-দারিদ্র-অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) তে শীতলবাবু, চালানবাবু, ধনঞ্জয়রা শোষকের ভূমিকা পালন করে। শীতলবাবুর কথায় কুবের চুরি করে তাকে মাছ দেয়। কিন্তু শীতলবাবু তাকে পয়সা না দিয়ে চলে যায়। চালানবাবুর বঞ্চনার কথা মানিক লিখেছেন-

'কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশ মাছ গোনা হইবামাত্র তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটি মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরিয়া ফেলিতেছে।'[১]

এই উপন্যাসে বর্ণিত জেলেজীবনের স্বাদ উপলব্ধ হয় ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায় আর দেশী মদে। ঈশ্বর ভদ্র পল্লীতে থাকলেও এখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ঈশ্বরকে সহায় করেই মধ্যবিত্ত মুৎসুদ্ধিশ্রেণির প্রতিভূ চালানবাবু কেদারনাথ বিনা দ্বিধায় ও বিনা পয়সায় দরিদ্র জেলের শ্রমে ধরা ইলিশে ভাগ বসায়। কিন্তু এই মধ্যবিত্তেরই বিচারে দরিদ্র জেলে সিধুর বিনে পয়সায় খাসির মাথা বাগানোর ঘটনা চৌর্যবৃত্তির সামিল। খাসির মাথার 'ব্যানুন'-এর কিছু অংশ কুবেরকে দেবে সিধুর এই প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয় কুবের। কুবের সিধুকে তেল, মশলা আর চাল দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোপী বাটি নিয়ে খাসির মাথার ব্যঞ্জন আনতে গেলে সিধু জানায় যে বিড়াল সব খেয়ে গিয়েছে। এই অন্তঃবঞ্চনার চিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

ধনঞ্জয়ের হাতে এই বঞ্চনার ব্যাপারটি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ধনঞ্জয় নিজে একজন কৈবর্ত। কুবের-গণেশ-ধনঞ্জয় এই তিনজনে একই নৌকায় মাছ ধরে পদ্মার বুকে। কিন্তু নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয়, তাই-

'প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা ও জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলো সঞ্চয় করে।'[২]

অর্থনৈতিকভাবেও ধনঞ্জয় কুবের ও গণেশকে বঞ্চিত করে। পদ্মায় ধৃত চারশ মাছকে আড়াইশ বলে চালিয়ে দেয় ধনঞ্জয়। বঞ্চিত হয় কুবের-গণেশ। বঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অবজ্ঞাও জোটে কুবেরের কপালে-

"ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, 'চাইরশ' না হাজার। দুইশ' সাতপঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশ'র দাম দিছে।"[৩]

ধনঞ্জয় কর্তৃক কুবেরের বঞ্চিত হওয়ার আরো ঘটনার উল্লেখ রয়েছে এই উপন্যাসে। মাছমারা শেষ করে কাতর শরীরে ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামিয়ে টিনের কৌটো হতে কড়া দা-কাটা তামাক বের করে পুরনো কল্কেতে কুবের তামাক সাজতে গেলে তার প্রথম টান দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেয় ধনঞ্জয়। তামাক সাজা শেষ হলে ধনঞ্জয় আগে তামাক ধরাতে চায়। সামান্য পানীয় তামাকও প্রথমে পান করার অধিকার ও সুযোগ কুবেরের নেই। ধনঞ্জয়রা তাদের অধিকার সুকৌশলে অথবা জোর করে প্রতিষ্ঠা করে কুবেরদের অর্থে ও খাদ্যে।

উচ্চবর্গীয় ও নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব আবহমানকালের; এ দ্বন্দ্ব সামাজিক, এ দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসের মালোদের ব্যক্তি জীবন ও সমাজজীবন। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মালোদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেনি, বাজার অর্থনীতির টানাপোড়েনেও তাদের বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে তিতাসকে ঘিরেই মালোদের অর্থনৈতিক সংঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছে। গৌতম ভদ্র বলেছেন-

'তিতাস শুধু নদী নয় বরং একটা আলাদা অর্থনৈতিক জগৎ। এই জগতে মালোরা একটা গোষ্ঠীবদ্ধ পক্ষ- সেটা উপন্যাসের প্রথমেই বলা হয়। এবং মূল অর্থনৈতিক শক্তিকে কেন্দ্র করে মালোদের ব্যক্তি ও সমাজজীবন কি করে আবর্তিত হয়- তাও পর্বে পর্বে বিবৃত হয়েছে।'[৪]

মাছধরার মতো আদিম উপজীবিকার ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য সমাজের সংঘাত প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। বাইরের এই শক্তিসমূহ মালোদের অস্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে কব্জা অথবা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। উপন্যাসের প্রথম থেকেই মালোদের অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন লেখক। এসেছে বিজয়নদীর পাড়ের মালোদের সঙ্গে তিতাস পাড়ের মালোদের অর্থনৈতিক তুলনা। গোকর্ণঘাটের মালোদের অবস্থা সচ্ছল। কারণ, এখানকার তিতাসে অনেক জল, অফুরান মাছ। তবু এখানে গগন মালোর মতো দরিদ্ররা আছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের-গণেশের জাল-নৌকা ছিল না। ফলে ধনঞ্জয়ের মতো

শোষকের জাল-নৌকা নিয়ে তাদেরকে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। এরা প্রতারিত হয়েছে, দারিদ্রের পীড়ন পেয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে গগন-সুবলের কোনোকালেই নিজস্ব নৌকা-জাল ছিল না। ফলে দারিদ্রের কামড় তাদেরকেও সহ্য করতে হয়েছে। বোধাই-কালোবরণদের সঙ্গে সুবল-গগন-তিলক-গৌরাঙ্গদের শ্রেণিপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজ বিকাশের ধারায় কৈবর্তরা একটা বিশেষস্তরে স্থিত, কিন্তু সেখানেও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের চিত্র স্পষ্ট। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ধ্বংস হওয়ার পেছনে বিরুদ্ধ অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করে এবং মালোসমাজেই তার উদ্ভব হয়।

মাটির মালিক জমিদারদের শোষণপ্রক্রিয়ার চিত্র আছে এই উপন্যাসে। জমিদারের অত্যাচার কী করে প্রতিরোধ করা যায়- তাই নিয়ে সলা-পরামর্শ করবার জন্য মালোরা জমায়েত হয়েছে। ঘরের মালিক বাসিন্দা, কিন্তু জমির মালিক জমিদার। জমিদার রাজকীয় ঐশ্বর্যে দিন কাটায়, খাজনা আদায়ের জন্য তহশিলদার রাখে। সে আদায়পত্র করে, খাজনা দিতে অপারগ প্রজাদের উচ্ছেদ করে। সেই জায়গায় আরেক প্রজা এসে বাস করে।

> 'তিতাসের মালিক জেলেরা। কাগজপত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা।... বছরে একবার করিয়া মাছের বদলে মাথট তুলিয়া রাজ-সরকারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেই চলিবে।'[৫]

কিন্তু গত তিন বছরের 'মাথট' জেলেরা যথাযথভাবে রাজ-সরকারে পৌঁছায়নি। ফলে তিনি রাজদূত মারফত জেলেদেরকে উচ্ছেদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। জমিদার আনন্দবাবু মালোদের সহায়তায় বাজার বসিয়েছিলেন। বাজারে তাদের কোনো খাজনা দিতে হত না। কিন্তু আনন্দবাবুর মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকারীরা জেলেদের কাছ থেকে মাশুল আদায়ের উদ্যোগ নিয়েছে-

> 'আনন্দবাজারের মাছ বিক্রেতাদের কাছে এখন জমিদারের লোকে মাশুল চাহিতে শুরু করিয়াছে। মাছের ভার পিছু দুই আনা করিয়া মাশুল না দিলে বলিয়া দিয়াছে মালোদিগকে বাজারে বসিতে দিবে না।'[৬]

বাজারের বর্তমান মালিকরা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তারাও দরিদ্র মালোদেরকে প্রতিশ্রুতি ভেঙে শোষণ করতে দ্বিধা করছে না। মাছের বেপারীরাও জেলেদের ঠকায়-

‘মাছ বেপারীরাও এই রকম। জাল্লার সাথে মুলামুলি কইরা দর দেয় টেকার জায়গায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।’[৭]

শোষকের আরেক উদাহরণ কালোবরণ। মূলত, তারই প্ররোচনায় সুবলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সুবল কালোবরণের নৌকায় অংশীদার হতে চেয়েছিল, কিন্তু শ্রেণিচেতনায় উজ্জীবিত কালোবরণ তাতে রাজি হয়নি। কালোবরণের বড় নৌকায় করে সুবল জিয়লের ক্ষেপ দিতে গেল। মেঘনানদীতে নৌকাটি ঝড়ে আক্রান্ত হল। তীরবেগে নৌকাটি কূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা থেকে নৌকাটিকে বাঁচাল বেতনভোগী সুবল। মনিবের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করে এবং বেতনধারী লোক হিসেবে মনিবের প্রতি প্রবল বাধ্যবাধকতাবোধ থেকে সুবল এর ফলাফল চিন্তা না করে মালিকের আদেশমতো তীরে নামল। নৌকার বেগ কমাবার জন্য সুবল মাঝখানটায় কাঁধ লাগাতে গেল কিন্তু নৌকার বেগ তীব্র ছিল বলে সুবল নৌকার তলায় চাপা পড়ল এবং মারা গেল। ধনবানরা দরিদ্র জেলেদের শোষণ করে এবং সেই শোষণের প্রক্রিয়া মর্মান্তিক মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। কালোবরণের মায়ের সুতার ব্যবসাসূত্রেও মহাজনী শোষণের ইঙ্গিত আছে। অভাবগ্রস্ত অনন্তর মা একদিন সুবলের বউকে জানাল যে কালোবরণের মা তাকে সুতা দেবে। সুবলের বউ গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেছে-

‘এই ত জগৎ বেড় ফেলিয়াছে। এদিকে রাঘব-বোয়াল আছে মনের আনন্দে।’[৮]

এখানে জগৎবেড় জাল কিংবা রাঘব বোয়ালের উপমায় শোষণের সুস্পষ্ট আভাস লক্ষ করা যায়।

তিতাসের জলের দখলিস্বত্ব ছিল মালোদের। চর জাগার ফলে তিতাস হয়েছে শীর্ণকায়া, তার বিপুল জলরাশি শুকিয়েছে। জলসংশ্লিষ্ট মালোদের জীবন ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের পর্যায় থেকে মানবেতর স্তরে নেমে আসে। তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে যায়। লোন কোম্পানির বাবুরা বন্দুকধারী পেয়াদার সাহায্যে মালোদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে যায়। তারা ঋণদান কোম্পানির কাছ থেকে হুজুগে পড়ে যে ঋণ নিয়েছিল, তা শোধ করতে পারে না। চক্রবৃদ্ধিহারে সে ঋণের পরিমাণ এখন পাহাড় সমান। এই কোম্পানির প্রতিনিধি বিধুভূষণ পাল মালোদের ধ্বংসকামী পালদের প্ররোচনায় রুদ্রমূর্তি ধারণ করল।

এ খানে বিধুভূষণ একক ব্যক্তি নয়, সমবায় সমিতির প্রতিনিধি। যে সমিতি প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণে নিয়োজিত ছিল, সে সমিতিই আজ চক্রান্তকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

তিতাসের বুকে চর জাগার ফলে তার দখল নিয়ে বিরোধ ঘটেছে ভূমিলগ্ন কৃষকের সঙ্গে রামপ্রসাদ মালোদের। ভূমিহীন কৃষক ও মালোরা দখল পায় না, চরের মালিক হয় পেশীতন্ত্রের লালনকারী শোষক মহজনরা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এখানে অসহায় ব্রাত্য শ্রেণির শ্রমজাত মুনাফা লুণ্ঠনকারী শোষকদের রুগ্ন-স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। সমাজ পাল্টায়, ব্যবস্থাও পাল্টায়, কিন্তু শোষণের চাবুক চলতে থাকে। সময়ের পরিবর্তনে শুধু শোষকের কৌশলটি বদলে যায়।

আগে থেকেই রানি রাসমণির সৌজন্যে গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য জেলেদের জলকর দিতে হয় না। জলকর দিতে না হলেও সরকারকে আয়কর দিতে হয়। গঙ্গা ও সমুদ্রে প্রবেশের পথে সরকার গেট দিয়ে রেখেছে। আসল গেট হল কেষ্টপুরের খাল-গেট, একে চেন-গেটও বলে। কারণ, লোহার শেকল দিয়ে সমস্ত জলযাত্রীদের রাস্তা বন্ধ রাখা হয়। জেলেদের অসহায়তা ও সরকার কর্তৃক জেলেদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতার বিবরণ লেখক এভাবে দিয়েছেন-

> ‘কেষ্টপুরের খাল-গেট হল কুতঘাট। এখানে কুত হবে, অর্থাৎ নৌকার মাপ হবে। কত বড় নৌকা, কত গহীন তার খোল, কত মাল্লা তার দাঁড়ে, বৈঠার হালে। সেই মাপে যা সরকারের মর্জিতে সাব্যস্ত হবে, তত পয়সা দিয়ে কাটতে হবে টিকিট। জলে জমিনে ফারাক নেই, খোদার ওপরে যারা খোদাগিরি করে, তারা জলের পথও আটকায়।’[৯]

‘গঙ্গা’ (১৯৫৭) উপন্যাসে জেলেদের ওপর সুদখোর মহজনের হিংস্রতা সরকারের অর্থনীতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। মহাজন পাল মশাইয়ের কাছে তাদের জিয়নকাঠি-মরণকাঠি জমা আছে। তার কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে ধলতিতা গাঁয়ের মালোরা মাছধরার সরঞ্জাম ও খাদ্যাদি কিনে গঙ্গায় যায়। কিন্তু গঙ্গায় ধরা মাছের টাকায় মহাজনের সুদাসল শোধ করতে পারে না তারা। বছরে দুশো টাকা জমা দিলেও বাকি থাকে প্রায় দেড়্গুণ। সুদ মুকুবের আবেদন নাকচ করে দেয় মহাজন। ফলে তার কাছে জেলেদের নৌকা-জাল বাঁধা পড়ে।

একখানি ত্রিশ-হাত বাছাড়ি নৌকার দামই কম করে সাতশো টাকা, বাঁধাছাঁদি জালটির দাম দেড়শ-দুশো টাকা। তিনশ টাকার ঋণের জন্য প্রায় হাজার টাকার নৌকা-জাল রেখে দেয় মহাজন। মহাজনের কাছে আসলের চেয়ে সুদের মায়া বেশি, আর সুদ হল দেনাদারের যম। সুদের টাকা সময়মতো শোধ করতে না পারার দায়ে পাঁচুদের বাছাড়ি নৌকাটি প্রতিবছর মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে। নৌকা ছাড়িয়ে আনার সময় শোষক মহাজন পাঁচুকে মনে করিয়ে দেয়-

> "তোমাদের খাজনা-ট্যাকসো লাগে না গঙ্গায়, রাণী রাসমণির জলে মাছ ধর। এবার পাঁজিতেও লিখেছেন, 'মৎস্য দশ।' এবারে ও কথা বললে হবে না।"[১০]

'মৎস্য দশ' মানে এবারে গঙ্গায় প্রচুর মাছ ধরা পড়বে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মা-গঙ্গা উদার হন না, দারিদ্র জেলেদের পিছু ছাড়ে না। পাল মশাইরা শুধু নদীর মাছে ভাগ বসায় না, সুদিনে বাওড়ে-বিলে ধরা মাছেরও ভাগ আদায় করে নেয়।

মহাজনরা নিজ ঘরে বসেই শুধু সুদের টাকা আদায় করে না, মরসুমে এরা নৌকা নিয়ে গঙ্গায় মাছধরার জায়গায় পৌঁছায়। পাল মশাই নৌকায় নৌকায় ঘুরে আদায়পত্র করতে থাকে। মাছ পড়লে নিজেই ফড়ে পাইকারদের ডেকে দরদস্তুর করে। মাছ বিক্রি করে যে টাকা পায় তা নিজের পকেটে রাখে। তার থেকে হিসেব রাখে কত টাকা শোধ যাচ্ছে। মহাজন এসে গঞ্জের চালায় ওঠে, ভালোমন্দ খায়। বাজারে মেয়েমানুষ সহজলভ্য। এই সময় মহাজনের বড় একলা একলা লাগে, শরীর মোচড় দেয়। বাজারে মেয়ের প্রতি টান বাড়ে। এসব খরচ মেটে মালোদের সুদের টাকায়। হোটেলে খাওয়া, মেয়েমানুষদের কাছে যাওয়ার টাকা মহাজন কখনো নিজের পকেট থেকে দেয় না। হিসেবের ওপরে ফাউয়ের টাকায় মহাজন ফুর্তিফার্তি করে।

এক একজন জেলে এক একজন মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়। পাঁচু নিয়েছে পাল মশাইয়ের কাছ থেকে, তেমনি কেদমে পাঁচু নিয়েছে ব্রজেন ঠাকুরের কাছ থেকে। উচ্চবর্ণের লোক বলে ব্রজেন ঠাকুর জেলেদের তুই তোকারি করে। দশ-বিশ গণ্ডা জেলে নিয়ে তার সুদের কারবার। সে পাল মশাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর, অকথ্যভাষী। কেদমে পাঁচুর মাছ দেয়ার কথা ব্রজেন ঠাকুরকে। কিন্তু, খিদের যন্ত্রণায় কাতর হবে বলে নগদ টাকার লোভে কেদমে পাঁচু আতরবালার কাছে ধৃতমাছ বেচে দিয়েছে। একথা শুনে ঠাকুর ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে-

'প্রাণ জল করে দিলে। এই শ্রাবণ মাস, ভালো চালান নেই, নদীতে আকাল, শালা আমাকে তিনটে মনিষ্যির পেট দেখাচ্ছে।'[১১]

প্রত্যেক বছর জেলেরা আশা করে-এবার গঙ্গায় ভাল মাছ পড়বে, তাদের দুর্দিনের অবসান হবে। কিন্তু মা-গঙ্গা যথারীতি নিস্ফলা থাকে। জেলেরা যথারীতি হাত পাতে মহাজনের কাছে। চক্রাকারে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। সুযোগসন্ধানী সুদখোর মহাজনরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদেরকে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়। ধীরে ধীরে মহাজনের ঘরে চলে যায় নৌকা-জাল-থালা-ঘটি-বাটি এমন কি শেষ সম্বল বাস্তুভিটেটিও। এরপর মহাজনের লোলুপতা থেকে মালোদের রেহাই নেই। শেষ পর্যন্ত তারা হাত বাড়ায় জেলেনারীর দিকে। জলে মাছ নেই, ঘরে মেয়েমানুষ তো আছে। জেলেবউয়ের একান্ত সান্নিধ্য চায় মহাজনরা। মহাজন ব্রজেন ঠাকুর রসিক মালোর বউকে নিজের কাছে রাখে। কারণ রসিক মালো ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারেনি।

জালকাটার প্রসঙ্গ 'গঙ্গা'র পাতায় যথাযথভাবে স্থান পেয়েছে। কেদমে পাঁচুর জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিমের বারোদাঁড়ির মহাজনী নৌকা। সাহসী বিলাসের প্রচণ্ড প্রতিবাদের ফলে নৌকাটি ৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। অনেকদিন আগে মুর্শিদাবাদগামী মালভর্তি এক মহাজনী নৌকার জাল-ছেঁড়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছিল বিলাসের বাবা নিবারণ। তবে, সেই প্রতিবাদের ভঙ্গি ছিল অন্যরকম। জাল ছেঁড়ার পর ভাটার কারণে ওই মহাজনী নৌকাটি বেশিদূর যেতে পারেনি, কাছেই নোঙর করেছিল। নিবারণ একা চুপিসারে গিয়ে সেই নৌকার তলার কাঠ খসিয়ে দিয়ে নৌকাটি ডুবিয়ে দিয়েছিল।

'অবগাহন' (১৯৬২) উপন্যাসে জেলেদের অর্থনৈতিক অবস্থা, তার গতি-প্রকৃতি, তাদের সুখ-দুঃখের উৎসমূল ঘনশ্যামের ভাল করে জানা ছিল। মৎস্যাদিই যে জলদাসদের জীবনশস্য, সেটা লেখক অতি উত্তমরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঔপন্যাসিক বুঝেছিলেন- মাছই জেলেদের হাসি-আনন্দের প্রধান উৎস। তাই তিনি লেখেন-

'ভাল মাছ উঠলে হাসি মুখ। মাছ ভালো না উঠলে ভারী চিন্তা হয় নদীপাড়ের জেলেদের।'[১২]

চরসুলতানপুরের জেলেসমাজ অন্যদশটা জেলেসমাজের মতো নীরক্ত। গতানুগতিক জীবনপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলছিল ওরা। মৃতপ্রায় এই সমাজটি হঠাৎ করেই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠল। অর্ধভুক, অনাহারক্লিষ্ট সর্বহারা এই মানুষগুলো রীতিমতো দ্রোহী হয়ে উঠল। আর সেই ঘটনাটি হল- পরেশ দাস, 'জাউল্যা' পরেশ দাসের খুন হওয়া-

> 'খবরটা শুনলো সবাই। গ্রামকে গ্রাম ছড়াতে লাগলো খবরটা। চর সুলতানপুরের জাউল্যার ব্যাটা পরেইশ্যারে কাইল রাত্রি থিকা খুঁইজ্যা পাওয়া যাইতাসিলো না। আইজ দুপুরে অর লাশ নাহি ভাইস্যা উঠসে গেরামের বাঁশবাগানের কাছে গাঙের মইধ্যে।... আমাগো পরেইশ্যারে ক্যারা যেন খুন করসে। মাথাডারে দুই ফাঁক কইরা ফ্যালাইসে। পরেশ ওদের বড় আপনজন। এই খবরে ওরা থমকে গেলো।'[১৩]

আড়তের মহাজনরা জেলেদের কাছ থেকে বারোশো গ্রামের মাছ এক কেজি হিসেবে নিতো, আর চালানি মাছ ওজনে কম দিতো। ফলে জেলেদের লাভের ঘর থাকত শূন্য। জেলেদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত, দারিদ্রে জর্জরিত ছন্নছাড়া জীবন থেকে মুক্তি দিতে চাইতো বলে পরেশ এসব ঠকবাজির বিরূদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। শোষকদের হাতের মুঠী আলগা হয়ে যাচ্ছিল বলে পরেশকে তারা ফাঁদে আটকে দিল। জেলেসমাজের স্বাধিকারবোধে জেগে ওঠার স্পৃহাকে কীভাবে স্তব্ধ করে দেয়া যায়, তারও কাহিনি শুনিয়েছেন ঘনশ্যাম 'অবগাহন' উপ ন্যাসে। কিন্তু এই উপন্যাসে শুধু স্তব্ধ করে দেয়ার গল্প নয়, আত্মসম্মানে উজ্জীবিত হবার বৃত্তান্তও। জেলেদেরকে এই উজ্জীবনী মন্ত্র শুনিয়েছে গোপাল রাজবংশী ও তার অনুরাগী পরেশ দাস। জেলেসমাজে নারীও মৎস্যবিপণনে অংশগ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সংকটে নারীরা সক্ষম পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই উপন্যাসে দেখা যায়, পারিবারিক বিপর্যয়ের দিনে মালতীও ক্রীত-মাছ হাটে বিক্রি করতে বসেছে। বাজারে মালতীর বসা, মাছ বিক্রির ভঙ্গি ইত্যাদি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে মালোজীবনের একটি বাস্তব পরিবেশকে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

ডোমের পোলা রাজা তার চেলাদের নিয়ে মাছবাজার থেকে শেতলাপুজো, কালীপুজো, বড়ঠাকুরের পুজোর দোহাই দিয়ে চাঁদা তোলে। চাঁদা দিতে সম্মত না হলে চাঁদাবাজরা মালতীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করে। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিলে হাত ভেঙে ফেলবে এই ঘোষণাই করে নীরব, নীরক্ত মালোসমাজ। মালো নারীর অপমানে জ্বলে ওঠা মালোদের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

'ঠিকঠাক সময়ে পলতেতে আগুন পড়লেই সেটা যে জ্বলে উঠবে! মালতী আজ সেই আগুনের কাজ করলো। বাঞ্ছারামের মতো নির্বিরোধী মানুষও অন্যায়কে গুঁড়িয়ে দিলো। মানিক ঝাঁপ দিলো ছুরির মুখে। আর এতদিনকার ভীতু মানুষগুলো প্রবল সাহসী হয়ে উঠলো।'[১৪]

'মৎস্যগন্ধা' (১৯৮৭) উপন্যাসে জেলেরা সুদখোর মহাজনদের কাছে জম্বুদ্বীপ যাওয়ার পাঁচ মাস আগে চড়া সুদে বাড়িতে বসে টাকা নেয়। মহাজনেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওদের হাতে যেচে টাকা গছিয়ে দিয়ে আসে। ওরা সেই সব টাকায় নামখানার হাট থেকে ওদের জম্বুদ্বীপ যাত্রার রসদপত্র কিনে নেয়। তাদের গ্রামে ফেরার সময় হলে মহাজনরা নেকড়ের মত ওৎ পেতে থাকে পথের মুখে। গ্রামে গিয়ে আদায় করার মত ধৈর্যটুকুও মহাজনদের থাকে না। অথচ টাকা দেবার সময় ওরা অনেক ভালোমানুষ। টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাজনদের হিসেবের ভুল ধরা পড়ে। দরিদ্র জেলেরা মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রেহাই পায় না কিন্তু তার প্রতিবাদ করার মত সাহসটুকুও ওদের মধ্যে নেই। ওদের ভয় হয় আগামী বছর ঐ সব মহাজনদের কাছ থেকে ঋণের টাকা আর যদি না পাওয়া যায়। এই ভয়ই শেষপর্যন্ত ওদের দারুণভাবে পেয়ে বসে। নিষ্ঠুর মহাজনেরা ওদের কান্নায় কান দেয় না। কোন সময়ে বেতনভোগী লোকদ্বারা, আবার কোন সময়ে নিজেরাই ওদের বোঁচকা বুঁচকি ট্যাঁক এমনকী মেয়েদের তলপেটের মধ্যে পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে লুকান তহবিলের সন্ধান করে। কোনরকম মিথ্যে বলে বা মহাজনকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তার উপায় নেই। মহাজনেরা শুধু যে আড়তদারদের খাতা থেকে হিসেব তুলে নেয় তা নয়, অনেক সময় ঐ সব বড় বড় আড়তদাররাও মহাজনদের হাত করে গরিব জেলেদের টাকা দেয়। সুতরাং আড়তদার আর সুদখোর মহাজনের সম্পর্কটা মাসতুতো ভাইয়ের মত। শুধু পাকা নয় গরিব জেলেরা। তাদের হাত পেতে নেওয়া টাকার পরিমাপটা তাই অনেক সময়ে এক কুড়ির পরিবর্তে দুকুড়ি দিতে হয়। অবহেলায় ওরা নিষ্পেষিত। শোষণে ওরা নির্যাতীত।

'শাইলক মহাজন দশ পাল্লা মাছের বদলে বিশ পাল্লা দাবি করে। তাও আবার চতুর মহাজনেরা পাল্লা ধরে মাছ মাপবার সময় কাঁটা পাল্লার কারসাজি তো আছেই, তার ওপর গোনার সময়েও দারুণ জোচ্চরী। ঊনিশের কোঠায় পৌঁছে চতুর মহাজন নয়ের সংখ্যায় ফিরে আসে। আবার গোনা শুরু হয় দশ এগারো বারো...।'[১৫]

বকখালির ঘাটে জেলেদের নৌকো ভেড়ানো মানেই মহাজনদের পাকা খাতায় আর এক বার করে পাকা টিপ দেওয়া। গত বছরের বকেয়া টাকা তার সুদ আর এবছরের নতুন টাকা একত্র করে তার লম্বা ঋণটা আরও লম্বা করে কায়েমি করে বসানো। রাধার বাবার মহাজন কাকদ্বীপের কয়ালবাবুরা। বকখালির ঘাটে বাবুদের গদিতে প্রিয়বরকে একবার জমিদারের পুণ্যাহের মত ওদের সিঁদুর মাখানো পাকা খাতার চৌকাঠে কপাল ঠেকিয়ে যেতে হবে।

'ইলিশজোড়' (১৯৯৭) উপন্যাসটিতে শুকমারী মৎস্য সমবায় সমিতির সেক্রেটারী মহাদেব আর প্রেসিডেন্ট আদিনাথ। এই দুই জনের হাতে পড়ে সমবায় সমিতির প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা। সাধারণ মেম্বাররা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। অন্যান্য এলাকার সমবায় সমিতি সরকারের দেয়া মাছ ধরার ট্রলারের সদ্ব্যবহার করে সরকারের পাওনা টাকা নিয়মিত শোধ করে এবং পরিশেষে ট্রলারগুলো সমিতির নিজস্ব হয়ে যায় সেখানে এই সমিতি নানা অজুহাতে বছরের পর বছর সরকারী টাকা কেবল বাকি রেখেই চলেছে। সমবায় সমিতির সরকারি ট্রলারের মাছ ধরার ব্যবসায় যখন এই হাল, তখন আদিনাথ ও মহাদেবের নিজস্ব ট্রলারগুলো ব্যবসা করে রমরমিয়ে। সমিতির মেম্বাররা তো বটেই, গ্রামের সাধারণ মানুষও এসব জানে। কিন্তু এ নিয়ে মুখ খোলার সাহস নেই কারুর। গ্রামের পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি, সরকারী মহল সবই যখন এই আদিনাথ ও মহাদেবের মত লোকের হাতে তখন তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে নিজের বিপদ ডেকে আনতে কেউই রাজি নয়।

'রুদিজলার মানুষ' (১৯৯৭) প্রবন্ধ গ্রন্থে জেলেদের দুরাবস্থা ও মহাজনী শোষণের কথা জানা যায়। রুদ্রসাগরে জেলেরা মনের আনন্দে মাছ ধরে কিন্তু মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম, জাল নৌকা ইত্যাদি তৈরি করার পয়সা তাদের হাতে নেই। সেই পয়সা আসত মহাজনদের কাছ থেকে। মহাজনরা দাদন দিত নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে। একজন জেলে সারাদিন রাত খেটে যে মাছ ধরবে সে মাছ যে মহাজনের নিকট থেকে দাদন এনেছে তার কাছে ছাড়া অন্য কারোর নিকট বিক্রি করতে পারবে না। মহাজন মাছের যে মূল্য স্থির করে দেবে সে মূল্যই তাকে মেনে নিতে হবে। সারাবছর কষ্ট করে মাছ ধরে বিক্রি করে যে পয়সা পাওয়া যায় তাতে সংসার চলে না, মহাজনের টাকা শোধ হবে কি করে। মহাজনের টাকা শোধ না হলে মহাজন জেলেদের জমি বন্ধক দেওয়ার কথা বলে। মাছ এবং শ্রমে যেমন দাদনী প্রথা ছিল তেমনি নগদ টাকার উপরও দাদনী প্রথা ছিল। যদি কোন বছর ফসল মার খায় বা ছেলের বিয়ে দেবে বা মেয়ের বিয়ে দেবার সময়ে তার নগদ টাকার প্রয়োজন। তখন তাঁরা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় আর সেই ধার ধান দিয়ে টাকায় সুদ দিতে হবে।

পৌষ, মাঘ মাসে একশত টাকা ধার নিলে বৈশাখ মাসে তাকে নগদ একশত টাকা এবং চার মণ ধান সুদ দিতে হবে। আবার ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে একশত টাকা ধার নিলে তাকে বৈশাখ মাসে নগদ একশত টাকা এবং দুই মণ ধান সুদ দিতে হবে। প্রতি বছরের সুদ তাকে প্রতি বছর পরিশোধ করতেই হবে।

উপন্যাসগুলোতে মালোদের প্রধান বৃত্তি মাছধরা। বৃত্তিবদলের কথা আছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) তে মৎস্যশিকারের মরসুম শেষ হয়ে গেলে কুবের, গণেশ, বঙ্কু প্রভৃতিরা মাঝিগিরি করে জীবন-নির্বাহ করে। হোসেনের নৌকায় চাকরি নিয়ে তারা চাঁদপুর-ময়নাদ্বীপ যাতায়াত করে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও তদ্রূপ। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বনমালী মাছধরার বৃত্তি ত্যাগ করে কুমিল্লা থেকে মাছের পোনা এনে হাটে-পল্লিতে বিক্রি করে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় মালোদের দুর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন জীবনের ছবি। রুগ্ন, ক্লান্ত, অবসন্ন জীবনকে তারা কোনরকমে টেনে চলেছে। তাদের কাছে এখন 'অন্নচিন্তা চমৎকারা।' তাদের সকল স্বপ্ন ফুরিয়েছে, এক নিবিড় বিষণ্নতা সমগ্র জেলেপাড়াটিকে গ্রাস করেছে। মালোদের পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে তারা ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ে। জয়চন্দ্রের বউ প্রথমে ভিক্ষা শুরু করলে পরে প্রায় সবাই তাকে অনুসরণ করে।

উপন্যাসগুলোতে জেলেদের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। যথা: জাল-নৌকার মালিক জেলে, অন্যের নৌকায় অংশীদার হিসেবে মাছধরা জেলে, পুকুর-জলাশয়ের লিজ-নেওয়া কৈবর্ত, মালোশ্রমিক, অন্যজন থেকে ক্রীত মাছ বাজারে বিক্রি করা জেলে ও চাষাবাদকে উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করা জেলে।

'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) তে ধনঞ্জয়ের নিজস্ব নৌকা-জাল আছে আর তার নৌকায় অংশীদারের ভিত্তিতে কুবের-গণেশ মাছ ধরে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬)- এ সুবলের বাপের কোনোকালে নৌকা-জাল ছিল না, অন্যের নৌকায় মাছ ধরে সারাজীবন কেটে গেছে তার। সুবলের বাবা গগণ মালো যখন মারা যায় সুবলকে নাও-জাল গড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। তাই মাথা তোলা হয়েই সুবল কিশোরের নৌকাতে গিয়ে তার সঙ্গেই জাল বাইতে লাগল। কিশোরের বাপ নৌকা-জালের মালিক। আর নাও-জাল নেই তিলকের। সেও অন্যের নৌকায় অংশীদার হয়ে মাছ ধরতে যাওয়া মালো। নয়ানপুরের বোধাই মালো বড় বড় দিঘি ইজারা নিয়ে মাছের চাষ করে এবং মালোশ্রমিক দিয়ে সেখান থেকে মাছ ধরে চালান দেয়। 'অবগাহন' উপন্যাসে মালতী দাস অন্যের কাছ থেকে মাছ কিনে স্টেশনবাজারে বিক্রি করে।

প্রত্যেক মালোর অন্তরগত নিবিড় বাসনা একখণ্ড চাষযোগ্য ভূমির মালিক হওয়া। অর্থাৎ চাষাবাদকে উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে জীবন-নির্বাহের পথটিকে সুগম করা প্রত্যেক মালোর তীব্র অভীপ্সা। অদ্বৈতের উপন্যাসে এই ধরনের কৈবর্তের সন্ধান পাওয়া যায়, যে একাধারে হালিক ও জালিক কৈবর্ত। 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬)-এ শুকদেবপুরের জেলেদের জালের সরঞ্জামের পাশে হালের সরঞ্জাম আছে। কখনও যদি মৎস্য-দুর্ভিক্ষ হয়, তবে এই জমি তাদের বেঁচে থাকার খাদ্য জোগাবে। 'গঙ্গা' (১৯৫৭) উপন্যাসে নিবারণের ভাই পাঁচু স্বপ্ন দেখে এবার মা-গঙ্গার দয়ায় অধিক মাছ ধরা পড়লে এক টুকরো ধানি জমি কিনবে। 'অবগাহন' (১৯৬২) উপন্যাসে মাছ ধরার পাশাপাশি চাষের পরিচয় পাওয়া যায়। নদীর চর অঞ্চলে অফুরন্ত রবিশস্য ফলে। মূলো, পালং, উচ্ছে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, করলা, কড়াইশুটি, ছোলা, মটর, কলাইয়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত বোঝাই হয়ে আছে। 'গহিন গাঙ' (১৯৮০) এর ললিতের হাতে যখন দুটো পয়সা আসে, অন্যান্য মালোর মতো তা তাড়িতে উড়িয়ে না দিয়ে সে একখণ্ড জমি কিনেছে। জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে উপজীবিকার প্রতি জেলেদের এই তীব্র আকর্ষণের কারণ হল প্রকৃতিনির্ভর অনিশ্চিত জীবনে নিশ্চয়তার একটু আশ্বাস। 'মুক্তামাছ' (১৯৯৫) উপন্যাসে সুবল একই সঙ্গে মাঝি ও জেলে। সে বড় নৌকার মাঝি হতে চেয়েছিল, বাবা হারাধন মাঝির মতো। সে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সে হয়ে গেছে জেলে, মাছমারী, অপয়া, দাদনভোক্তা। 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪) উপন্যাসে গোকুল বাবার নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার পর মিলের কাজে অংশগ্রহণ করে। 'জাল থেকে জালে' (২০১৫) উপন্যাসে আফজল আড়তদার ও পরে সুতোর ব্যবসা ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ধনু জেলের ছেলে হলেও সে বিলে সেঁতিজাল বসায়, বিলের তলায় জমি অধিগ্রহণ করে ধানের চারা লাগায়। জেলের ছেলেদের সেঁতিজালে বিলে মাছ ধরার কাজে লাগায়।

'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ও 'গঙ্গা' (১৯৫৭) উপন্যাসে দুটো মালোসমাজ সম্পূর্ণত অশিক্ষা-পীড়িত। 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), 'গহিন গাঙ' (১৯৮০) ও 'অবগাহন' (১৯৬২)-এ দু একজন শিক্ষিত মালোর সন্ধান মেলে। অদ্বৈতের উপন্যাসে মৌসমে মালোদের হাতে দুটো পয়সা এলে তার সবটুকু মহাজনের দেনা শোধে চলে যায়। এমনি যাদের জীবনযাত্রার হাল, তাদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শেখানোর স্বপ্ন দেখা বিলাসিতার নামান্তর। দারিদ্রের চাপে পড়ে মালোরা শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে থাকলেও শিক্ষা-বিস্তারের একটা অভিঘাত মৃদু হলেও মালোসমাজকে আন্দোলিত করেছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) এর পৃষ্ঠায় তার সংবাদ জানা যায়। ভৈরব বন্দরের মালোরা নাগরিক জীবনের ভাবসত্যগুলো কিছু কিছু জানে-

‘এ গাঁয়ের মালোরা গরীব নয়। বড় নদীতে মাছ ধরে। রেলবাবুদের পাশে থাকে। গাড়িতে করিয়া মাছ চালান দেয়।’[১৬]

তাদের সমাজে শিক্ষার স্পন্দন দেখা যাচ্ছে। বাবুসমাজের সঙ্গে তাদের দূরত্ব কমে আসছে, তারা জামা-জুতো পরে বাবুদের বাসায় গিয়ে বেড়ায়। বাবুরা মালোপাড়ায় তামাক টানে আর পোলাপানকে স্কুলে দিয়ে শিক্ষিত হওয়ার কথা বলে। কিন্তু তিলকের অভিজ্ঞতা বড়ই মর্মান্তিক।

শিক্ষিত মানুষের প্রতি প্রান্তজন তিলকের মনোভাবের সঙ্গে গোকর্ণঘাটের সাধারণ চাষি কাদিরের মনোভাবের মিল আছে। তার মতানুযায়ী চাষাদের শিক্ষিত হবার প্রয়োজন নেই। মূর্খ থাকাই ভাল। স্কুলে পাঠালে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। কাদিরের বিশ্বাস স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করলে মানুষ মিছা কথা শেখে, জাল-জুয়াচুরি শেখে, পরকে ঠকাতে শেখে। বলাবাহুল্য, এখানে তিলক ও কাদিরের শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব অপেক্ষা উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা ঝরে পড়ছে।

নিজেরা শিক্ষিত না হলেও সার্বিকভাবে শিক্ষার প্রতি এক নিবিড় আগ্রহ গড়ে উঠেছিল মালোদের। বিশেষত শুকদেবপুরের মানুষরা কিশোরকে তার গ্রামের শিক্ষার কথা বলেছে, সেখানে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত লোকেরা বসবাস করে। কিশোর অবশ্য খুব উৎসাহ দেখায়নি। কারণ, সে স্কুলপালানো ছেলে। সুবল ও কিশোরের বাবারা বড়ই আশা নিয়ে তাদের পাঠশালায় পাঠিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা পাঠশালা পরিত্যাগ করে।

শিক্ষার প্রতি মালোদের বিরূপ মনোভাবের চিত্র থাকলেও অনুরাগের চিত্রও এই উপন্যাসে আছে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (২০০২) উপন্যাসের এতিম বালক অনন্ত। সে কালো অক্ষরের মধ্যে এক নতুন জগতের সন্ধান পায়-

‘গোঁসাই বাবাজী যেদিন তাকে প্রথম ‘কালা আখর’ শিখাইল, সেদিন তার আনন্দ উপচাইয়া উঠিল। একটি নূতন জগৎ তাকে দ্বার খুলিয়া ডাকিয়া নিয়া গেল।’[১৭]

মালোসমাজ যেন অনন্তর হাত ধরে আলোর জগতে প্রবেশ করল। এ সমাজে বিদ্যার কোন আলো নেই, তাদের জ্ঞানের জগতে বড়ই অন্ধকার। মালোগোষ্ঠীর মধ্যে কোন বিদ্বান

লোক নেই। তাই চিঠি লেখা, তমসুকের খত লেখবার জন্য, মাছের ব্যবসার হিসাব লেখানোর জন্য গোপালনগরের হরিদাস সার পাও ধরাধরি করে, ভাল ভাল মাছ খাওয়ায়। এই বেদনা থেকে মুক্তির জন্যই মালোপুত্র অনন্তকে বিদ্বান হতে হবে। গোঁসাই বাবাজীর উৎসাহে অনন্তকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেয়া হল। পাঠশালার পথে এক নাপিতানীর পরামর্শ অনন্তর ভেতরের বিদ্যানুরাগকে আরও উস্কে দিল-

> ‘তোকে আমি ভাল পরামর্শ দিই। তুই চলিয়া যা। এখানে তোকে দ্বিতীয় শ্রেণী পড়াইয়া জেলে-নৌকায় তুলিবে। অধিক পড়া তোর হইবে না। কিন্তু তোকে আরো শিখিতে হইবে, বিদ্বান্ হইতে হইবে। বামুন কায়েতের ছেলের মতো এলে-বিয়ে পাশ করিতে হইবে।’[১৮]

শেষ পর্যন্ত অনন্ত ওই গ্রাম ত্যাগ করে, কলেজে অধ্যয়ন করে। পারস্পরিক সন্দেহ, দলাদলি ও ব্যক্তিগত রেষারেষির সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে অনন্ত বেরিয়ে আসে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে- প্রান্তিক শ্রেণির যে অংশ শিক্ষার আলো পায়, তাদের বিরাট অংশ শহরে বাস করে, উচ্চমধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও সোপান বেয়ে ওপরে ওঠার চিন্তায় বিভোর থাকে। উচ্চমধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও সোপান বেয়ে ওপরে ওঠার চিন্তায় বিভোর থাকে। উচ্চবর্ণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়। কখনও কখনও তারা বিবেকের তাড়নায় নীরন্ধ্র অন্ধকারে পড়ে-থাকা আপন সম্প্রদায়ের দুর্ভাগা মানুষগুলোর জন্য কিছু কৃপা-কর্তব্য করে। উল্লেখনীয় যে, তারা এই কর্তব্য সম্পাদন করে চিরকাল যাদের হাতে নির্যাতিত, শোষিত ও অপমানিত হয়ে আসছে- সেইসব বাবুদের সহযোগী প্রক্রিয়ায়। ‘অবগাহন’ (১৯৬২) উপন্যাসে কমার্স নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে পরেশ কালনা কলেজে ভর্তি হয়েছিল। মাসখানেক ক্লাসও করেছিল। কিন্তু ইনফর্মার হিসেবে ধরা পড়ায় তার আর কলেজে পড়া হয়নি। কলেজে না গেলেও পরেশ ওর বিদ্যা বুদ্ধি যুক্তি আর বিবেক দিয়ে নদীপাড়ের জেলেদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আড়তের মহাজনরা জেলেদের থেকে প্রতি কেজিতে দুশো গ্রাম মাছ বেশি নিয়ে নিত। আবার ট্রাকে আসা চালানি মাছ ওজনে কম দিত। জেলেরা লাভ আর দেখত না। এইসব ঠকবাজি সব পরেশ ধরিয়ে দিয়েছিল। পরেশ নদীপাড়ের সব জেলেদের কাছে কবে যে পরেশদাদা হয়ে উঠেছিল, তা সে নিজেই জানে না। ‘অবগাহন’ (১৯৬২) ও ‘গহিন গাঙ’ (১৯৮০) এর পরেশ ও গোপাল নিজেরা শিক্ষিত হয়ে শিক্ষাপ্রসূত অধিকার চেতনা জেলেসমাজে ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। স্বাধিকারবোধে উজ্জীবিত হবার কারণে পরেশের জীবন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সন্তোষ করের ‘মুক্তামাছ’ (১৯৯৫) উপন্যাসে জেলেসমাজে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও প্রকার মাথা ঘামানো বেড়াখানার জেলেপাড়ার রীতি বিরুদ্ধ। জেলেপাড়ায় পাঠশালা নেই। হাতেখড়ি অনুষ্ঠান এখানে কারোর হয়নি কোনও কালে। হারাধন তার ছেলে সুবলকে প্রথমে বোটের মাঝি করতে চাইলেও পরে ভাবে তার ছেলে কোনও বোটের মাঝি-মাল্লা হবে না। তাই পড়াশুনো শেখানোর জন্য সুবলকে তার মামার বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে অমূল্য পণ্ডিতের কাছে সে পড়াশোনা করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সুবল গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামের লোকেরা বলল জেলের ছেলের বেশি পড়াশুনো করে লাভ নেই-

> ‘হারান ঠিক করচে। বেশি লেখাপড়ি শিখি কি হবে? জাল টানতে অমুয়া ধরবে তখুন। পুঁথি পড়তে পারচে, এই ঢের। যতেষ্ট।’[১৯]

হরিশংকর জলদাসের ‘জলপুত্র’ (২০০৮) উপন্যাসে জেলেদের শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরী আর চন্দ্রমণির ছেলে গঙ্গাপদ স্কুলে যায়। দুই মাইল পথ ঠেঙিয়ে খালের পাড় ধরে সে কাটগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। পড়তে যায় মা ভুবনেশ্বরীর প্রবল উদ্যোগে। ভুবনেশ্বরী তার ছেলেকে শিক্ষিত করতে চায়। সে চায় না তার ছেলে তার স্বামী চন্দ্রমণির মতো গঙ্গাপদও মা-গঙ্গার ভোগে যাক। তাই সে স্থির করে-গঙ্গাপদ পড়বে, সমুদ্রে মাছ মারতে যাবে না কখনো। ভুবনেশ্বরী কিছুতেই তাকে সমুদ্রে যেতে দেবে না। অষ্টম শ্রেণি পাশ করে নবম শ্রেণিতে উঠলে গঙ্গার আর পড়াশোনায় মন থাকে না। মায়ের কষ্ট তাকে অবসন্ন করে। দাদু মারা যাবার পর পড়ালেখা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে ও যুক্তি আরও প্রবল হয়। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সে টাউঙ্গাজাল বায়। মাছ বিক্রির কাজে মাকে সাহায্য করে। গঙ্গা কাঁধে করে মাছ বহন করে। নানা পাড়ার গলিতে ঘুরতে ঘুরতে ডাক দেয়,

> ‘মাছ লইবা না মাছ? ভালা লাইট্যামাছ, চিক্কা ইচা। ই-লি-শ মাছ।’[২০]

হরিশংকর জলদাসের লেখা ‘দহনকাল’ (২০০৯) উপন্যাসে জেলে রাধানাথ তার ছেলে হরিদাসকে আদ্যাবসারের স্কুলে ভর্তি করায় পড়াশোনা শেখানোর জন্য। বাবা রাধানাথ জলদাস শিক্ষকের হাতে তার ছেলেকে তুলে দেয়। স্কুলের শিক্ষক আদ্যাবসার বলেন-

'আমাদের গ্রামটিতো একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে। তোমরা দু'তিনজন লেখাপড়া করে এ গাঁয়ে একটু হলেও পিদিম জ্বালাবে। নারীদের শিক্ষা আগে প্রয়োজন। গাঁয়ের লোকেরা সেটা বুঝতে চায় না। মেয়েদের পড়াতে চায় না।'[২১]

হরিদাসের বাবা রাধানাথের লেখাপড়ার পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। লেখাপড়ার প্রচলন জেলেপাড়ার ধারে কাছে নেই। এই পাড়া থেকে কেউ স্কুলেও যায় না। এ পাড়ার একজন লোক পড়াশোনা জানেন, তার নাম যতীন্দ্রমোহন জলদাস। রাধানাথ এই যতীন্দ্রমোহন জলদাসের কাছে পড়াশোনা করেন। অ-আ, শতকিয়া, ABCD ইত্যাদি অধ্যয়ন চলতে লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় চেরাগের আলোতে শিক্ষকের দেয়া পড়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে লাগল রাধানাথ। এইভাবে বছরখানেক চলার পর তার মা চন্দ্রকলা অসুস্থ হবার পর রাধানাথ হঠাৎ করে যেভাবে একদিন পড়াশোনা শুরু করেছিল, তেমনিভাবে হঠাৎ করেই একদিন পড়া থামিয়ে দিল। হরিদাস এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে বাবার শরীরের অবস্থা দেখে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে চায়। সে নদীতে জাল বাইতে চায়।

প্রশান্ত মৃধার 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪) উপন্যাসে বাঁশরি চায় তার নিজের ছেলে গদাই যেন পাঠশালায় যায়। গ্রামে ফ্রি-প্রাইমারি স্কুলে এলাকার হিন্দু-মুসলমান গেরস্তবাড়ির ছেলেমেয়েরা যায় কিন্তু মালো বা নিকারির ছেলেমেয়েরা প্রায় কেউই স্কুলে যায় না। গণেশের ছেলে গোকুল জেলেদের ঘরে জন্মালেও জেলেদের মতো মাথা নিয়ে জন্মায়নি। জেলেদের তুলনায় সে অনেক বুদ্ধিমান। বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও জেলের ঘরে জন্মানোর জন্য পড়াশোনা আর করে উঠতে পারেনি। মাছ ধরেই তাকে জীবন কাটাতে হবে। স্কুলে পড়াশোনার আগ্রহ থাকলেও সৎমার জন্য তা সম্ভব হয়নি। গোকুল বইখাতা নিয়ে যদি স্কুলে যেতে চায় তাহলে বাড়ি যেয়ে আর ভাত পাবে না, চুলা থেকে ছাই উঠিয়ে ভাতের বদলে ছাই খেতে বলবে। গোকুলকে স্কুলে পড়তে দিতে না চাইলেও বাঁশরি তার নিজের ছেলে গণেশকে স্কুলে দিতে চায়। কিন্তু গদাই এর গায়ে গতরেই যত জোর, কিন্তু মাথায় কিছু নেই।

নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের 'জাল থেকে জালে' (২০১৪) উপন্যাসে শরীফ মাস্টার নজর আলীর ছেলে আফজলকে স্কুলে দেওয়ার কথা বললে নজর আলী জানায়-

> 'জাউল্যার বেটা লেখাপড়া শিখে কী করবে? জালের রশি ধরা শিখতে পারলে জীবন বাঁচাতে পারবে।'[২২]

নজর আলী বিলে মাছ ধরতে চলে গেলে আফজল নিজেই শরীফ মাস্টারের স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আফজল জেলের ছেলে হলেও সে অল্প সময়ের মধ্যে নামতা শিখে ফেলে এবং শরীফ মাস্টারের কথামতো পরবর্তীতে আফজল মাছের বড় কারবারি হয়ে উঠেছিল। স্কুলে পড়াশোনা সে বেশিদিন চালাতে পারেনি কারণ জেলের ছেলে হওয়ায় তাকে অপমানিত হতে হয়। এরপর পড়াশোনা ছেড়ে সে হাটে মাছ বিক্রির কাজ শুরু করে।

মালোদের জীবন দলিত-মথিত করবার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বর্ণহিন্দুরা। শুধু মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) কিছুটা ব্যাতিক্রম। মেজকর্তা এখানে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জেলেদের শিক্ষিত করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে উচ্চবর্ণের সমাজ সম্পর্কে মালোদের তিক্ত অভিজ্ঞতা। ব্রাত্য হিসেবে তারা সর্বদা উচ্চবর্ণের হিন্দু দ্বারা ঘৃণিত, অপমানিত ও অত্যাচারিত হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণেরও হয়তো সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। অদ্বৈত অতিবাস্তবতার সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতাকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এ উপস্থাপন করেছেন। ভারতের বাড়িতে দশজনের সভা বসেছে, আলোচ্য বিষয়- মালোসমাজের নানা সমস্যা ও তার প্রতিকারের দিকনির্দেশনা। বয়োবৃদ্ধ মালোদের সমাজ-অভিজ্ঞতা প্রচুর। সে অভিজ্ঞতার সবগুলো মনোরম নয়, তাদের অভিজ্ঞতায় আছে- মালোদের প্রতি উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের অতিচালাকি ও সুতীব্র ঘৃণার বৃত্তান্ত। হিন্দু-মালোর সমাজ-সম্পর্কের চালচিত্র এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে-

> 'তারা (কায়েতরা) মালোদের ঘরে নেয় না, মালোরা কোনো জিনিস ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে। পূজা-পার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসতে হয়। সে পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মতো ধুতি-চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁওয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।'[২৩]

শিক্ষিত উচ্চবর্ণেও হিন্দুরা চিরকাল এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অবহেলা করে এসেছে। তারা নিজেদের প্রয়োজনে এই জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাদের প্রতি পোষণ

করেছে তীব্র ঘৃণা। এই ঘৃণার প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে তামসীর বাপের উদ্দেশে বলা দয়ালচাঁদের সংলাপে-

> ‘বাজারের কায়েতরা তোমার বাড়ি আসিয়া নাকি তবলা বাজায় আর মেয়েদের দিকে নজর দেয়। ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসন দাও, এ তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙ্গা তক্তা।তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কল্‌কেখানা।’’[২৪]

এ শুধু তামসীর বাবার প্রতি দয়ালচাঁদের বাস্তব সতর্কবার্তা নয়, দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করে মালোসমাজের এই উপলব্ধি এক অন্ধকার ইতিহাসের উন্মোচক।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৩৬) এ বর্ণবাদী হিন্দুদের ছুঁৎমার্গীয় মানসিকতা শুধু মালোদের ক্ষেত্রে ফুটে ওঠেনি, মুসলমানের ক্ষেত্রে এই বর্ণবৈষম্যের চিত্র আরও প্রকটভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বনমালী মালোরা কাদিরের আলুবোঝাই ডুবন্ত নৌকাটি প্রাণান্তকর চেষ্টায় ভাসিয়ে রাখে এবং বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কাদিরও উদারতায় কম যায় না। বিরামপুরের এই কাদিরের সামনে কেউ হোঁচট খেলে তাকে হাত ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার দাড়ির নিচের প্রশস্ত বুকটায় এক উদার হৃদয় স্পন্দিত হয়। এরকম উদার কাদিরও শুধুমাত্র মুসলমান বলে বামুন-কায়েতের বাড়িতে সম্মান পায় না। কাদিরের ছেলে ছাদির বহুবার বাপের সঙ্গে বামুন-কায়েতের বাড়িতে দুধ বেচতে গেছে। সেইসব দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছবি আজও কাদিরের চোখে ভেসে ওঠে-

> ‘‘তারা (বামুন-কায়েতরা) তার বাপকে আদর করিয়া ডাকিয়া বসায়। নিজেরা চেয়ারে বসিয়া ছেলেপুলের হাতে একখানা ধূলিধূসর তক্তা আনাইয়া মুখে মিষ্টি ঢালিয়া দিয়া বলে, ‘বও বও, কাদির বও। তামুক খাও।’ তাদের নিজেদের হাতে তেলকুচ্‌কুচে মসৃণ হুঁকা। কাদিরের জন্য বাহির করিয়া দেয় মাচার তলায় হেলান দিয়া রাখা সরু খামচাখানেক আকারের থেলো।’’[২৫]

'গহিন গাঙ' (১৯৮০) উপন্যাসে মহাজন ও মানবেতর প্রাণী দ্বারা মালোজীবন বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়। সন্ধ্যে বা দুপুরে বেতনা নদীর জল ঠেলে নৌকা এগিয়ে আসে, সেই নৌকায় থাকে অপমৃত্যুর সংবাদ। মালোপাড়ার ঘাটে হাহাকার ধ্বনি শোনা যায়, বাবলার গুড়ি স্বামীহারা জেলেনি বা পুত্রহারা জননীর কপাল ঠোকার রক্তে রঞ্জিত হয়। পথচলতি মানুষ থমকে সে কাহিনি শোনে এবং গাঁয়ে-গঞ্জে সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে এই সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। পরদিন থেকে জেলেপাড়া আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, শুধু হৃদয়-বিদারক হাহাকার ওঠে সংশ্লিষ্ট-পরিবারে। খটিদারদের ঋণের জাল থেকে জেলেরা বেরিয়ে আসতে পারে না কখনো। ঋণ নেওয়ার সময় শর্ত থাকে- নদীতে বিনজালে ধরা মাছ, জঙ্গলের খাড়িতে পাটাজালে ধরা মাছ-সবই ঋণদাতা খটিদারের কাছেই বিক্রি করতে হবে। মান্ধাতার আমলের দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে মেপে যা-ইচ্ছে দাম দেবে জেলেদেরকে। দাম ও ওজনের ব্যাপারে মালোদের কোনো আপত্তি চলবে না। এ ব্যাপারে তাদের মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। মহাজন-খটিদার মালোদের ভাগ্য যেভাবে নির্ধারণ করে, তাকেই নিয়তি-নির্ধারিত রীতির মতো দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে বাধ্য মালোরা। মালোদের বাধ্য বাধকতাকে আরো প্রকট করে তোলার জন্য শেষ লঞ্চ ক্যানিং চলে গেছে- এই অজুহাতে খটিদাররা মালোদের কাছ থেকে মাঝেমধ্যে স্বনির্ধারিত দামেও মাছ কেনা বন্ধ করে দেয়। ফলে তাদের রক্তজল করা ধৃত মাছ বাসি হয়ে ফুলতে থাকে, পচতে থাকে। ক্রয়ক্ষমতা নেই বলে জলের দরেও অন্য কেউ এই মাছ কেনে না। তাই খটিদারের কাছে জেলেরা আপাদমস্তক অসহায়। এদের সামনে মাথা তুলবার সাহস কোন মালোর নেই। খটিদার, ঘাটবাবু, লঞ্চের সারেং–এরা এককাট্টা হয়ে জোঁকের মতো মালোদের শোষণ করে। আবদুলের মনোজগতও অন্ধকারময়। মালোদের কীভাবে ঠকাবে, কীভাবে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবে- এই ভাবনায় সে মগ্ন। কথা সে কম বলে, কিন্তু যখন বলে তখন গালিগালাজের আধিক্য থাকে। কারণ, ওটাই ব্যবহার করে সে মালোদেরকে দুর্বল করে। মালোরা ধৃত মাছ দেরিতে খটিতে পৌঁছালে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়, তর্জনি দুলিয়ে বলে-

> 'গচ্ছাটা আমার বাপ দেবে? দানোরাও ও-মাছ ছোঁবে না রাতে ! ...ফের সেই কালকের লঞ্চ!'[২৬]

খটিদারদের চক্রান্তে মালো-সহায়ক কো-অপারেটিভ সংস্থাটি খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি। সেসময় ললিতদের মতো কতিপয় মালো আবদুলের কাছে আত্মসমর্পণ করার

কারণেই কো-অপারেটিভের সকল সৎ-উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আবদুল কূটকৌশল প্রয়োগ করে বহু জেলেকে কো-অপারেটিভ থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে।

মালোপাড়ার 'নতুন যোবক' বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে। আবদুলের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় সে এবং শেষপর্যন্ত আর্তস্বরে উচ্চারণ করে- 'জঙ্গলে যাবো।' অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভেঙে সে আবার বিভীষিকাময় অরণ্যঘেরা খাড়িতে আবদুলের দাদন গ্রহণকারী হিসেবে মাছ ধরতে যাবে। সে নিরুপায়। গৌরীপদ দত্ত লিখেছেন-

> "'গহিন গাঙে' ইঙ্গিত দেওয়া আছে, মালোপাড়ার মানুষদের বহমান অবিচারের বিরুদ্ধে নিরুদ্ধ ক্ষোভের। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্যে সংগঠিত হবার অসফল চেষ্টার। দূর থেকে আসা আদর্শবাদী যুবকদের আত্মত্যাগ এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতায় দোদুল্যমান দরিদ্রবাদী ডাক্তারের অসহায় অপেক্ষা। একই সঙ্গে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে খটিদার, যা অন্যত্র জোতদারদের সমার্থক, কুসীদজীবী মহাজন এবং আইনরক্ষক বা ভক্ষক ও. সি. মেজবাবু ইত্যাদির ভূমিকা। স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে ক্ষতস্থানে প্রলেপ প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধর্মের সংগঠক প্রবক্তাদের স্বরূপ। যাঁরা অবিচারসৃষ্ট আপৎকালে পীড়িত মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়েন। অত্যাচারীরা তাদের প্রয়াস প্রতাপের সঙ্গেই পালন করে।"[২৭]

'দহনকাল' (২০০৯) উপন্যাসে শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র ধরা পড়ে। ইচাখালের জেলেদের সঙ্গে কাঠালপাড়ার হালিক কৈবর্তদের তর্ক বিতর্ক দেখা যায়। চানমিয়ার হাটের পাশ দিয়ে কর্ণফুলী নদী বয়ে গেছে। নদীর যে-পাড়ে ইচাখালি গ্রাম, ঠিক তার উল্টো পাড়ে কাঁঠালিয়া। এই কাঁঠালিয়া গাঁয়ে নদীর কোল ঘেঁষে একটি জেলেপাড়া আছে। এর নাম কৈবর্তপাড়া। পাড়াটি ইচাখালির জেলেপাড়ার মতো জরাজীর্ণ নয়। কৈবর্তপাড়ার পরিবারগুলো সচ্ছল, শিক্ষিত। মাছ ধরা তাদের পেশা হলেও প্রধানতম পেশা নয়। এদের আছে জমিজিরাত। এরা হালিক কৈবর্ত। হালিকরা জালিকদের ছোটজাত ভাবে। বলে,

> 'হিতারা তো ছোড জাত, মাউছ্যা। মাছ মারণ ছাড়া গতি নাই। আঁরার জবিন আছে। আঁরা শিক্ষিত, চাউরি গরি। আঁরা হিতারাত্তোনও বড়। আঁরা উচ্চ বংশর কৈত্তর।'[২৮]

কালিধরে শিবশরণের নৌকা ডোবার কারণ হিসেবে সবাই মনে করে ছোটমেয়ে সবিতাকে বিয়ে দিয়েছেন কাউলির ভুবন বহদ্দারের মেজছেলে কৃপালের সঙ্গে। কৃপালরা জলদাস, জালিক কৈবর্ত। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ দুচারজনের কথায়-

> 'ফুঁইলাম যারে মাইয়া বিয়া দিতা লাইগ্য, হিতারা বলে মাউছ্যা। আঁরা তো কইত্তর। কইত্তরর মাইয়া মাউছ্যারে বিয়া দওন ঠিক অর না?'[২৯]

'পদ্মানদীর মাঝি' র অন্তর্গত স্রোতে রাজনীতির মিশেল আছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'গঙ্গা' একেবারেই রাজনীতি-বিবর্জিত উপন্যাস। কিন্তু, 'গহিন গাঙ' ও 'অবগাহন'-এর মালোজীবন রাজনৈতিক-দর্শনের পটভূমিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে মালোদের আত্মবোধ, অধিকার-চৈতন্য সবই রাজনীতিপ্রসূত। উল্লিখিত দুটো উপন্যাসে জেলেরা রাজনীতি-প্রণোদিত হবার ফলে স্পষ্টবাক, ঋজু ও প্রতিবাদী। কুবের-অনন্ত নির্জীব-নিরীহ হলেও বিলাস অনেক বেশি সাহসী, জীবনের ঝুঁকি নেবার স্পর্ধা রাখে সে। জেলেদের ওপর অন্যায় সংঘটিত হলে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এটা তার একক প্রচেষ্টা। গোটা জেলেসমাজকে সে সক্রিয় করতে পারেনি। যেমন পারেনি শ্রীপদ। খটিদার আবদুল ও থানার বাবুদের ফাঁসকলে আটকে তার প্রতিবাদ-স্পৃহা আপাতত স্তিমিত হয়ে গেছে। বিলাসের মাধ্যমে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে সূচনা হয়েছিল, পরেশে এসে তা পূর্ণতা পেয়ে যায়। নিজের জীবন দিয়ে পরেশ চরসুলতানপুরের মালোসমাজকে স্বাধিকারবোধে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

জেলেদের দারিদ্র-লাঞ্ছিত জরাজীর্ণ জীবনের ছবি সবকটি উপন্যাসে প্রায় সমান গুরুত্বে অঙ্কিত হয়েছে। মানিক, সমরেশ ও সাধনের উপন্যাসে দারিদ্র জেলেসমাজে পুরোদমে রাজত্ব করেছে; ঘনশ্যামের 'অবগাহন' উপন্যাসে দারিদ্র প্রকট আকারে চিত্রিত হয়নি। দারিদ্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদীর রুদ্ররোষ, মনুষ্যসৃষ্ট শোষণ ও শাসনযন্ত্রের শিকার হয়ে জেলেরা বাস্তুভিটে ছেড়ে দেশান্তরিত হয়েছে বারবার। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'গহিন গাঙ' ও 'অবগাহন'-এ জেলেদের স্বভূমিচ্যুতির কথা আছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' তে কুবের, আমিনুদ্দি, এনায়েত, বঙ্কুরা হোসেন মিয়ার কৌশলের জালে জড়িয়ে ময়নাদ্বীপে যেতে বাধ্য হয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রকট প্রতিকূলতায় গোকর্ণঘাটের মালোদের সাংস্কৃতিক জগৎ ধসে পড়ার সময়ে তিতাসের বুকে জেগে ওঠে চর। খাদ্যাভাবে গোষ্ঠীগত ঐক্যবদ্ধ চেতনার অভাবের কারণে জেলেরা দেশান্তরি হয়। বেতনা নদীতে মাছ ফুরিয়ে এলে জেলেরা

স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হবে- ললিতের ভাবনার মধ্য দিয়ে এরকম একটা ইঙ্গিত লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় ‘গহিন গাঙ’-এ দিয়েছেন। আর রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক রুদ্ররোষে পড়ে পূর্ববঙ্গের বাপ-ঠাকুরদার জন্মস্থান ছেড়ে এসেছে ভৈরব মালো। আবার, ভাগীরথীর ভাঙনের মুখে পড়ে পাড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে মানিক-মালতী দাসরা।

মালোরা সহজাতভাবে বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী। এরপরেও নানা লোকজ সংস্কার ও লোকবিশ্বাস মালো সমাজে মান্যতা পেয়েছে। এই বিশ্বাস ও সংস্কারের পথ ধরে তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে নানা অলৌকিক গল্পগাথা। এইসব গল্পগাথা নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন পীর, বনবিবি বা দক্ষিণা রায়, মা-গঙ্গা প্রভৃতিকে ঘিরে। জেলেদের জীবিকা নদীকেন্দ্রিক বলে নদী ও নদীর জল মাছমারাদের কাছে অতি পবিত্র। কোথাও যাত্রার আগে জেলেরা তাই নৌকার গলুইয়ে নদীর জল ঢালে, এই সময় উলুধ্বনি দেয় জেলেনিরা। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি মালোদের সংস্কার ও লৌকিক আচারের আধার। মালোদের লোকধর্মের কথা ‘গঙ্গা’ ও ‘গহিন গাঙ’- এ অল্প-বেশি স্থান পেয়েছে। ‘অবগাহন’-এ মালোসমাজের এই দিকটি অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে মিথের ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। মিথ-পুরাণের ঘটনা সন্নিবেশের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা মালোজীবনের বিকাশ-বিস্তারকে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। মাঘমণ্ডলের মতো বিভিন্ন ব্রতকথা, পুজোপার্বণ, যাত্রা, নানারকম খেলা-উৎসব, পুঁথিপাঠ, দোলযাত্রা, নৌকাবাইচ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মালোদের যে সাংস্কৃতিক জীবন-তা নদীকেন্দ্রিক এই সকল উপন্যাসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন লেখকরা।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও নদীর বুকে উভয়ের ধর্ম এক, আর তা হল মানবতারধর্ম । ‘পদ্মানদীর মাঝি’র হোসেন-কুবেরের মধ্যে, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর বাহারুল্লা-রামপ্রসাদ, বনমালী-কাদিরের মধ্যে এই মানবধর্মের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আবর্তসংকুল নদীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আত্মরক্ষা ও বাঁচার তাগিদে মৎস্যশিকারীদের মন থেকে ধর্ম, গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা মুছে যায়। নদীর বুকে নৌকার ছইয়ের নিচে হিন্দু-মুসলমান একই শয্যায় পাশাপাশি ঘুমায়। একই খাবার একসঙ্গে খায়। একই বিছানায় শুয়ে তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে। এভাবে জাতধর্মের বেড়া ভেঙে এক হার্দিক সম্পর্ক তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে গোষ্ঠীবদ্ধ মালোসমাজ মূলত মাতব্বর-শাসিত। এই সমাজে মোড়ল বা মাতব্বর বা সাঁইদারের কথাই শেষ কথা। এরা সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তারা সমাজের আনন্দে যেমন অংশ নেয়, তেমনি দুঃখেও নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে না, বরং জড়িয়ে নেয়। নানারকম অনুশাসনের মাধ্যমে তারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’- এর রামপ্রসাদ মাতব্বর, ‘গঙ্গা’র নিবারণ সাঁইদার, ‘গহিন গাঙ’-এর দয়াল সাঁইদার ও ‘অবগাহন’- এ একটু পরিশীলিতরূপে গোপাল রাজবংশী ও পরেশ মালো সমাজকে দিগ্‌নির্দেশনা দিয়েছে।

জোয়ার ভাটার ওপর ভিত্তি করে জলদাসদের মৎস্যশিকার চলে। তাই নববিবাহিত জেলে-তরুণকে কখনও রাতে কখনও দিনে মাছ ধরতে চলে যেতে হয় অনিশ্চিত, জীবননাশী সমুদ্রে। কিন্তু মন পড়ে থাকে ঘরে, বালিকাবধূকে ঘিরে তরুণের মন ঘুরতে থাকে। মালো-দাম্পত্যজীবনে কোনও ভালোবাসাবাসি নেই। আছে প্রয়োজনের তাগিদ, ক্ষুধার খেলা, দেহের লীলা। বউয়ের গর্ভে সন্তান আসতে থাকে একের পর এক। কোনও থামাথামি নেই, কোনও পরিবার-পরিকল্পনা নেই। নিত্যদিনের অভাবের ঘূর্ণিতে খাবি খায় জেলেদম্পতি। মালোজীবনে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, অপমান-যন্ত্রণা অফুরান। জীবনের এই সকল বিপর্যয়কে উভয়ে সমানভাবে মোকাবিলা করে। পুরুষরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যায়, নারীরা ঘরে বসে রাত জেগে পুরুষের মঙ্গল কামনায় এবং অধিক মাছের আশায় মা-গঙ্গা ও মাছের দেবতা খোকাঠাকুরের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানায়। জেলেরা মাছ ধরে, জেলেনিরা নিজেদের শারীরিক শক্তিকে নিঃশেষ করে সংসার গোছায়। পারিবারিক দুঃসহ দারিদ্রে, রূঢ়-বিপর্যয়ে জেলেনারীরা পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তখন জেলেপুরুষের ধৃতমাছ বাজারে-পল্লিতে বিক্রি করে তারা। যেমন ‘অবগাহন’-এর মালতী দাস। একমাত্র আয়-সক্ষম দাদা পরেশ খুন হলে সত্তর বছরের বৃদ্ধ বাবা ভৈরবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাছ বিক্রির বৃত্তিকে সে গ্রহণ করে। ‘গঙ্গা’র ফড়েনি দামিনী ও তার নাতনি হিমিকে মৎস্য কেনাবেচায় নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়।

মালোদের জীবন কর্মমুখর। কায়িক শ্রম তাদের জীবনধারণের প্রধান মূলধন। এই শ্রমসাধ্য জীবনে সঙ্গীত এক বিপুল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। শ্রমে-বিশ্রামে, মিলনে-বিরহে, সুখে-দুঃখে তারা গানকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরে। সংশ্লিষ্ট ঔপন্যাসিকবৃন্দ এই ব্যাপারটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই, প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে ভাটিয়ালি, মুরশিদি, বিচ্ছেদ, বাউল, কীর্তন, সারি-জারি ইত্যাদি গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ‘পদ্মানদীর

মাঝি'র হোসেন মিয়ার গানটি-তো বিখ্যাত হয়ে আছে। অদ্বৈতের উপন্যাসটি এইসব গানের ভাণ্ডার। 'গঙ্গা'য় বিলাসের মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক নদীনির্ভর মালোজীবনের ব্যথাচিত্র গানের রূপকে ব্যক্ত করেছেন। গীতিকবিতার আকারে 'অবগাহন'-এও গানের সন্ধান মেলে।

ভাষা নদীভিত্তিক উপন্যাসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা-বৈচিত্র্য ও কুশলতা অনন্য। মানিকের ভাষাগুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমরেশ মজুমদার লিখেছেন-

> "পদ্মানদীর মাঝি' তে বর্ণনার বাস্তবতা চরমোৎকর্ষে এসে পৌঁছেছে। এ সত্য চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য, অ-সংস্কৃত মানুষের হাসি-ক্রন্দনও এর বাইরে নয়। সে কারণে স্পষ্ট উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে লোকের বাস্তবতাবোধ সহজ ও অন্তরঙ্গ হয়ে, অতি তুচ্ছ আপাত তাচ্ছিল্য বস্তুগুলোও এমনভাবে বর্ণনায় এনেছেন মানিক, যা বাস্তবতার বৃত্তটিকে ভরে তুলেছে, এ গুণ এককথায় তুলনারহিত।'[৩০]

সাধারণত লেখকরা উপন্যাসে সাধু বা চলিত রীতিকে কাহিনি বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন। বর্ণনার ক্ষেত্রে মানিকের ভাষায় দেখা যায় এক নিরাবেগ নিরাসক্তি। এখানে তাঁর ভাষা স্পষ্ট, সৌষ্ঠবময় ও ভারবাহী; বক্তব্য প্রকাশে তাঁর ভাষা একান্তভাবে সক্ষম। যেমন- মালার জন্মবৃত্তান্ত ও তার মেয়েবেলার কথা লেখক অত্যন্ত সংক্ষেপে অথচ বলিষ্ঠ শব্দাবলীর আশ্রয়ে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন-

> 'কেতুপুরের দশ মাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের এমনই এক ভাঙা কুটিরে তার (মালার) মায়ের এক বামুন ঠাকুরের নামে কানাকানি-করা পাপের প্রমাণস্বরূপ এই ভাঙা পা-টি লইয়া সে জন্মিয়াছিল, বড়ো হইয়াছিল বাড়ির মধ্যে লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। বাড়ির অদূরে রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের কাছে কদমগাছটি পর্যন্ত ছিল তাহার কষ্টকর গতিবিধির সীমা। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ওই কদম গাছটির তলে খেলা করিত, আর করিত মারামারি।'[৩১]

কথ্য বা লেখ্য যে ভাষাই হোক না কেন তা মানুষের অন্তরের মানচিত্রকে শ্রোতা বা পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তোলে। মানিক এই উপন্যাসের অন্ত্যজ চরিত্রগুলোর মুখে আঞ্চলিক

উপভাষা বসিয়েছেন। এই উপন্যাসের সংলাপের মধ্যে বিশেষ বিশেষ টানটুকুর ইঙ্গিত পর্যন্ত দিতে সক্ষম হয়েছেন মানিক। নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাসে জেলেমাঝিদের ভাষায় অনেকসময় কোনও শব্দ থাকে না, শুধু অনুভূত হয় এক তরঙ্গিত সুরধ্বনি। তা বাচিত নয় বলে সাধারণের কাছে বোধগম্যও নয়। নদীর আবর্তসংকুল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করতে হয় বলে তাদের ভাষায় একটা তীব্র জোরালো ভাব লক্ষ করা যায়। হোসেন মিয়া, আমিনুদ্দি, রসুল, জহর, এনায়েত প্রভৃতি মুসলিম চরিত্রগুলো কাহিনিটির পরিপূরক চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। এদের সংলাপে কিছু আরবি-ফার্সি শব্দ লক্ষ করা যায়। এই ভাষাকেই 'Second Language' হিসেবে এই উপন্যাসে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুবের বা নকুলের সঙ্গে হোসেন মিয়ার ভাষার পার্থক্য রয়েছে। আমিনুদ্দি বা হোসেন বা এনায়েতের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় ঘরানার সঙ্গে ধর্মীয় শব্দের সংযোজন হয়েছে। এরপরও উভয় সম্প্রদায়ের ভাষায় একটা মরমী সুর আছে, যা উভয়কে একই সূত্রে সংগ্রথিত করেছে এই উপন্যাসে।

বাংলা ভাষার একটি উপকথা হল বঙ্গালী। 'পূর্বদেশী বঙ্গালী'-ই 'পদ্মানদীর মাঝি' তে উপভাষারূপে গৃহীত হয়েছে। ময়নাদ্বীপের নিজস্ব কোনও অঞ্চল ভাষা ছিল না। উপভাষা প্রসঙ্গে ভাষার গঠনতত্ত্বের মতোই ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, অন্বয়তত্ত্ব আসা স্বাভাবিক। কুবেরের মেয়ে গোপী বাবাকে বলে:

'বাই উ, ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইছে বাবা।'[৩২]

'ভাই' অল্পপ্রাণ হয়ে কণ্ঠনালীয় স্পর্শযুক্ত তৃতীয় বর্ণে পরিণত- এটা বোঝা গেলেও নাখান শব্দটি রংপুর জেলায় ব্যবহৃত। গোপীর ভাষায় তা অনায়াসে ঐ স্থানলাভ করেছে। এটি সম্ভবত ভাষার সরলতার উদাহরণ।

উপভাষা 'পদ্মানদীর মাঝি'র কৈবর্তদের জীবনবৃত্তকে কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃতি দিয়েছে। কুবেরের ভাষা থেকে হোসেন মিয়ার ভাষা এ উপন্যাসের ভাষার ভৌগোলিক সীমানায় বৈচিত্র্য এনেছে।

অদ্বৈত মালোসন্তান ছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসটিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপভাষা সবচাইতে উজ্জ্বলতা পেয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাধু ও চলিতের এক মিশ্ররীতিতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি লিখেছেন। তৎসম, তদ্ভব ও আঞ্চলিক শব্দের সমন্বয়ে অদ্বৈত উপন্যাসটি

লেখেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' অঞ্চলভিত্তিক উপন্যাস এবং এই উপন্যাসে কেন্দ্রীভূত সম্প্রদায়টি মাছধরা পেশার সঙ্গে যুক্ত। তাই এই উপন্যাসে এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা জাতিনির্ভর পেশাগত শব্দ। অনেক আঞ্চলিক শব্দ আছে এই উপন্যাসে, যার দ্বারা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের জীবনভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ- 'ডহর', 'মাথট', 'গরদিস', 'সাইৎ', 'উচ্চারণ', 'আরব্ব', 'ঠিসারা', 'কুয়ারা', 'বুলানি', 'গেরাপী' ইত্যাদি। তদ্ভব বিশেষত আঞ্চলিক শব্দের মাধ্যমে কৈবর্তজীবন এই উপন্যাসে নিবিড়ভাবে স্পষ্টতা লাভ করেছে। মালোরা অশিক্ষিত বলে তাদের ভাষায় পরিশীলন নেই, উচ্চারণে ভব্যতা নেই। ভদ্রসমাজে যা অনুচ্চার্য, এ সমাজে তা জীবনের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। ঝগড়ায় বা ভালবাসায় তাই অতিসহজেই তাড়া 'শকুন্যা বুড়া', 'উকুইন্যা বুড়া', 'শালা', 'পোড়ামুখি', 'বেইমান কাউয়া', 'বান্দিনীর ঘরের চান্দিনী' ইত্যাদি গালি উচ্চারণ করে। আর এই শব্দাবলীর মধ্য দিয়ে মালোজীবনের অন্তর্চিত্র আমাদের কাছে আর গোপন থাকে না।

নদীভিত্তিক অন্যান্য প্রধান বাংলা উপন্যাসগুলোর মতো 'গহিন গাঙ' ও আঞ্চলিক উপন্যাস। মালোদের জীবন ও জীবনাচরণকে স্পষ্ট করে তুলতে ভাষা এই উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসে দুধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। চলিতরীতিতে তিনি কাহিনি বর্ণনা করেছেন, আর মালোদের মুখে ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক ভাষা। সাধনের চলিতরীতির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এ রীতি সংক্ষিপ্ত, ইঙ্গিতধর্মী ও প্রতীকায়িত। আর নিম্নবর্গীয়দের মুখে তিনি যে উপভাষা ও উচ্চারণ রীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন, তা সব চরিত্রের বেলায় সমানভাবে প্রয়োগ করেননি। সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন-

> 'সুন্দরবন অঞ্চলের মালোরা ঠিক কোন উপভাষায়, কোন উচ্চারণের টানে কথা বলে তা ঠিক মতন বোঝা যায় না এই উপন্যাসে। কোনো কোনো চরিত্রের মুখে এক ধরনের আঞ্চলিক উচ্চারণ দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক। বইলে, দেখবা, খেইয়ো, লৈকোয়, রেইখো ইত্যাদি শব্দের যে আঞ্চলিকতার ধরনটি তুলে ধরতে চেয়েছেন সাধন চট্টোপাধ্যায় তার সবটাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ও সুন্দরবনের ভাষা কিনা তা নিয়ে কিছু সংশয় থাকতে পারে।'[৩৩]

'গহিন গাঙে' নিম্নবর্গীয়দের মুখে ব্যবহৃত উপভাষার মধ্য দিয়ে তাদের প্রাত্যহিক জীবন অনেকাংশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উদাহরণ-

'গিয়ে দেখবা নাতির মুখ –'
পান-বাতাসা খেইয়ো, গুণীন।'[৩৪]

জেলেসমাজে শিক্ষার আলো পড়েনি। যে-বিদ্যা মানুষকে পরিশীলিত করে, তা থেকে ওরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বঞ্চিত। ফলে, তাদের কথাবার্তায় পরিশীলনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা তাদের প্রণয়-হিংসা, ভালবাসা-ক্রোধকে গালিগালাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে। এই উপন্যাসের কুশীলবরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় সর্বদা ভদ্রজনোচিত শব্দ প্রয়োগ করেনি। তাদের ব্যবহৃত শব্দ অনেক সময় শ্লীলতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। কিন্তু, এই শব্দসমূহ মালোজনজীবনের অন্তর্চিত্রকে আমাদের সামনে খুলেমেলে ধরেছে। সংলাপে 'গু-খেকোর ব্যাটা', 'সুমুন্দির পুত', 'লাটের বেটা', 'পোঁদের লোম', 'শুয়োরের বাচ্চা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের ফলে 'গহিন গাঙে'র জেলেজীবনচিত্র অন্যমাত্রা পেয়ে গেছে। 'গহিন গাঙ'- এর আঞ্চলিক ভাষা নিখুঁত হয়নি। 'অবগাহন'এও ঘনশ্যাম চৌধুরী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, তবে তা কলকাতা ঘেঁষা, কৃত্রিমতা-জড়িত।

জেলেরা বর্ণগতভাবে ব্রাত্য, অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা, রাজনৈতিকভাবে অনুল্লেখ্য এবং সাহিত্যাঙ্গনেও আজ তারা অবহেলিত। জেলেরা সাধারণত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কুরুরাজ শান্তনু মৎস্যগন্ধা ওরফে সত্যবতীকে পাওয়ার জন্যে মহাভারতীয় যুগে একবার দাশরাজা অর্থাৎ জেলেরাজার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কথায় বলে- মানুষ দেখে শেখে, কিন্তু এই কথাটি শিক্ষার বেলায় জেলেদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দু-মুসলিম সমাজের সন্তানরা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, শিক্ষার স্পর্শে এই দুই সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে জেলেসমাজ নির্বিকার। শিক্ষায় আলো আছে, অর্থনৈতিক দুর্বিষহতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষাগ্রহণ- এই ব্যাপারটি জেলেরা দেখে শিখতে নারাজ। তাদের বিশ্বাস-শিক্ষা নিকট-আত্মীয়কে দূরে সরিয়ে দেয়, আপনকে পর করে ছাড়ে।

তাদের এই বিশ্বাস একেবারে অমূলক নয়। আজকালকার জেলেসমাজে যে দু'একজন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদের অধিকাংশই মা-বাবা-ভাই-বোনদের ত্যাগ করে শহরবাসী হচ্ছে। স্ব-সম্প্রদায়ের অল্পশিক্ষিত মেয়েকে এরা বিয়ে করতে নারাজ। এরা বিয়ে করছে বর্ণহিন্দুসমাজের কোনো উচ্চশিক্ষিত কন্যাকে। বিয়ের আগেই এই শিক্ষিত জেলেরা তাদের সম্প্রদায়গত পদবি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। গ্রহণ করছে চৌধুরী, সেন, রায়, দত্ত নিদেনপক্ষে

দাশ পদবি। বংশপরম্পরাগত পদবিতে তাদের যত অস্বস্তি। তারা মনে করে বর্ণচোরার সকল স্বস্তি লুকিয়ে আছে সেন, দত্ত, রায়, দাশ প্রভৃতি পদবিতে। অন্যসমাজে বিয়ে করার কারণে বর পাচ্ছে না শ্বশুরবাড়িতে যথাযথ মর্যাদা, আবার কনের কাছে সেই মাটিবর্তী শ্বশুর-শাশুড়িরা পাচ্ছে না আন্তরিকতা। তাদের অবহেলার কারণে আঁশটে মা-বাবার মনে প্রচণ্ড এক ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে। তারা ভাবছে - নিজ সন্তানকে পড়ালেখা করানোর কারণে আজ সে তাদের কাছে অন্যগ্রহের মানুষ হয়ে গেছে। অশিক্ষিত পুত্র কখনো মা-বাবাকে ত্যাগ করত না, তাদের ভুলত না। প্রধানত এই কারণে জেলেরা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে খুব বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে না আজও।

বাল্যবিবাহ প্রথা জেলেসম্প্রদায়ে এখনও দোর্দণ্ডপ্রতাপে বর্তমান। বারো থেকে পনেরো বছর বয়সের জেলে-বালিকাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সমাজের গ্রামীণ কন্যারা খুব বেশি পড়াশোনা করতে পারে না, সেটা অভিভাবকের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে যেমন, তেমনি নারীশিক্ষার প্রতি মালো মা-বাবার অনীহার জন্য। যে ক'জন জেলের ছেলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, তারা বিয়ে করছে বর্ণহিন্দু পরিবারে। ফলে শিক্ষিত জেলেকন্যারা থেকে যাচ্ছে অবিবাহিত। উদ্বিগ্ন মা-বাবারা এই শিক্ষিত কন্যাকে অশিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ততা থেকে মুক্তি চাচ্ছে।

জেলেরা প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। সমুদ্রনির্ভর জেলে এবং নদীনির্ভর জেলে। জেলেরা আহরণজীবী। নদী বা সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাই বহু প্রাচীনকাল থেকে নদী বা সমুদ্রপাড়ে জেলেরা তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলেছে। 'বিহিন্দিজাল', 'টংজাল', 'হুরিজাল', 'টাউঙ্গাজাল' ঠেলে। এই জালসমূহ দিয়ে মাছ ধরে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। ধৃত মাছ থেকে প্রাপ্ত টাকায় তাদের সংসার চলে না। নানারকম দাদনদার ও সুদের কারবারীর ফাঁদে তারা আটকে যায়।

বর্ষাকাল জেলেদের কাছে ফসলি ঋতু। বর্ষাকালে তাদের টংজালে ইলিশ ধরা পড়ে। এই সময়ে জেলেদের জীবন থেকে কিছু সময়ের জন্যে অভাব দূর হয়। আজকাল দাদনদার ফড়িয়াদের কূটচালে তারা নিঃস্ব হতে চলেছে। অন্ধকার এবং অভাব এই দুটোর সঙ্গে জেলেদের জীবনযাপন। নুন আনতে পান্তা ফুরানো জীবন তাদের। সন্তানাধিক্য এবং আয়ের স্বল্পতার কারণে অভাব তাদের পিছু ছাড়ে না। তাই মাছমারার মরসুমে, মুষ্টিমেয় দুচারজন জেলে ছাড়া প্রায় সবাই ঋণ করে, দাদন নিয়ে মাছ মারার উপকরণ কেনে।

সমুদ্রপাড়ের জেলেদের দাদন গ্রহণ প্রক্রিয়া বদলে গেছে। প্রাক্-আষাঢ় মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিকে দাদনদাররা জেলেদের টাকা দেয়। জেলেরা সমুদ্র থেকে ইলিশমাছ মেরে কূলে উপস্থিত হলেই মাছগুলোর দখল নিয়ে নেয় দাদনকারীরা। তারাই দাম নির্ধারণ করে এবং তারাই মাছগুলো কিনে নেয়। যত টাকার মাছ হয়, তার থেকে প্রতি হাজারে ২০০ টাকা কেটে রাখে। কেটে রেখে বাকি টাকা তৎক্ষণাৎ দেয় না তারা। বলে, মরসুমের শেষে বুঝিয়ে দেবে সকল টাকা। জেলেরা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব জানে না, ক্যালকুলেটর মেশিনের কারসাজি বোঝে না। ফলে মরসুমের শেষে তাদের ভাগ্য কীভাবে নির্ধারিত হয় সহজেই অনুমেয়।

আজকালকার দাদনদাররা জেলেদেরকে পথে বসাবার জন্যে, তাদেরকে একেবারে নির্জীব করে ফেলবার জন্যে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মৎস্যজীবী ভাড়া করে আনে। এদের মধ্যে মুসলিম মৎস্যজীবী ভাড়া করে আনছে। মাছমারার সকল উপকরণ কিনে মাছধরার কাজে তাদেরকে নিয়োজিত করছে।

উপকূলবর্তী জেলেরা একটা নির্ধারিত স্থানে জাল বসায়। এটাকে তারা ‘পাতা’ বলে। পুরুষানুক্রমে কে কোথায় জাল পাতবে সেটা নির্ধারিত আছে। একটি পাতা থেকে আরেকটি পাতা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে, থাকতে হয়। পাতাগুলো কাছাকাছি হলে জালে মাছ ঢোকে না। ভাড়া করা মৎস্যজীবীরা দাদনদারদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পাতার নিয়ম লঙ্ঘন করে জোর খাটিয়ে জেলেদের পাতার সামনেই জাল বসায়। ফলে জোয়ারের সময় ভাড়াটিয়া মৎস্যজীবীদের জালেই মাছ পড়ে। জেলেদের জাল-থাকে মৎস্যশূন্য। দাদন-গ্রহীতা জেলেদের কমবেশি রেহাই দিলেও যে জেলে দাদন নেয় না, দাদনকারীরা তাদেরকে কোনোক্রমেই স্বস্তিতে জাল বসাতে দেয় না।

ধৃত মৎস্য বিপণনের ক্ষেত্রেও তারা নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। দাদনদার ছাড়া অন্যান্য ক্রেতা মাছ কিনতে চাইলে নানাভাবে তাদের ভয়ভীতি দেখায়। এমনকি মাছ কিনে গন্তব্যে যাওয়ার পথে তাদের কাছ থেকে ক্রীত মাছ কেড়ে নেয়। এ ছাড়া যানবাহনের অভাবে এবং লোকবলের স্বল্পতায় জেলেরা ধৃতমাছ আড়তে অথবা বাজারে পৌঁছাতে পারে না। মাছ বরফজাত করে রাখার সময়, কৌশল ও বরফ জেলেরা পায় না। অধিকাংশ সময় মাছধরার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে স্বল্পদামে মাছ বিক্রি করে দিতে তারা বাধ্য হয়।

জেলেরা আজ একেবারেই নিঃস্ব হতে বসেছে। সমুদ্র আজ তাদের নেই। জাল পাতার স্থানসমূহ ছিনতাই হয়ে গেছে। মাছ মারার উপকরণ কেনার পয়সা আজ তাদের হাতে নেই। ধৃতমাছ বাজারে-হাটে বিক্রি করার যে স্থানটি তাদের জন্যে নির্ধারিত ছিল তা-ও আজ জবরদখল হয়ে গেছে। বংশপরম্পরাগত পেশা থেকে তারা আজ বিচ্যুত হয়ে গেছে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী অধিকাংশ জেলে আজ দাদনদারদের নৌকায় মজুর হিসেবে কাজ করছে। কেউ বা রিকশা চালাচ্ছে। জেলেনারীরা গোপনে-প্রকাশ্যে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করছে। এরকম অর্থনৈতিক অবস্থায় জীবন টিকিয়ে রাখা মুশকিল, পড়া-লেখা তো দূর-অস্ত। দুর্মর এই অর্থনৈতিক চাপকে অগ্রাহ্য করে যে দু একটি পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা শুরু হয়, তা কালক্রমে বেশি দূর এগোতে পারে না। মূলত, অর্থনৈতিক চাপে কুঁকড়ে গিয়ে পড়ালেখার চর্চা মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে জেলেজীবন আর শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে না। অন্ধকার আরও জমাট বাঁধে এই সমাজের আনাচে-কানাচে, সমাজমানুষের অন্তরে-চিন্তায়।

নদী-তীরবর্তী জেলেদের অবস্থা আরও করুণ। একসময় নদীসমূহ ছিল নানা মৎস্যে পরিপূর্ণ। সেই জলশস্যে জেলেদের জীবন ভরে উঠতো। ধৃতমাছের টাকায় তারা জীবন চালাতো, সন্তানদের বিয়ে দিতো, ঘরবাড়ি বাঁধতো, জাল-নৌকা এবং অন্যান্য উপকরণ কিনতো, পালা-পার্বণে খরচ করতো, কিন্তু আজ তারা সেই সুখ ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নদী আজ মৎস্যশূন্য। কলকারখানার নানা বর্জ্য পদার্থের প্রকোপে পড়ে আজ নদীতে মাছ নেই। মৎস্যশিকারীর সংখ্যাধিক্যের কারণে নদীর মাছ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই আজ জেলেরা কুঁচোমাছ সংগ্রহ করার জন্যে 'ছুরিজাল', 'টাউঙ্গাজাল' কাঁধে নিয়ে খানাখন্দ চষে বেড়াচ্ছে। বর্তমানের বাজার মূল্যে মাছ বেচার টাকা এত অল্প যা দিয়ে অভাবী সংসারে সন্তানের আবদার, স্ত্রীর নতুন শাড়ি পরার আকাঙ্ক্ষা, ভালোমন্দ খাবার বাসনা কোন কিছুরই মূল্য নেই। এরকম অবস্থায় বিদ্যাচর্চা কোনোক্রমেই গুরুত্ব পায় না এই সমাজে। রাতে ওরা উদ্বিগ্ন থাকে সকালের অন্ন জোগাড়ের চিন্তায়। আর দিনে ব্যস্ত থাকে রাতের খাবারের সংস্থানে।

জেলেরা আজ সমষ্টিগতভাবে শোষিত, মাছধরার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা। মাছধরার ক্ষেত্রগুলো আজ বেহাত হয়ে গেছে। শিক্ষিত নয় বলে অন্য পেশা অর্থাৎ চাকরি-বাকরিও তারা গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে তারা আজ নিশ্চিহ্ন হবার পথে।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে সাহিত্যে উপস্থাপিত মালোদের সমাজজীবন এবং মালোদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি কেমন সেই সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি।

তথ্যসূত্র

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : *পদ্মানদীর মাঝি,* কলকাতা ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ. ১১

২। তদেব : পৃ. ৭

৩। তদেব : পৃ. ১২

৪। ভদ্র, গৌতম : *"তিতাস একটি নদীর নাম: মালোর চোখে/ তিতাস একটি নদীর নাম: মধ্যবিত্তের চোখে",* 'চতুর্থ দুনিয়া', ডিসেম্বর ১৯৯৪ পৃ. ৫১

৫। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জুন ২০১৩, পৃ. ৮৯-৯০

৬। তদেব : পৃ. ৯১

৭। তদেব : পৃ. ১৪০

৮। তদেব : পৃ. ৮৪

৯। বসু, সমরেশ : *গঙ্গা,* কলকাতা-৯, মৌসুমী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মে-১৯৭৪, পৃ. ২

১০। তদেব : পৃ. ৫০

১১। তদেব : পৃ. ১২৭

১২। চৌধুরী, ঘনশ্যাম : *অবগাহন,* কলকাতা-১২, বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ. ৪১

১৩। তদেব : পৃ. ৪৯

১৪। তদেব : পৃ. ১৪৪

১৫। রায়, বলরাম : *মৎস্যগন্ধা,* কলকাতা ৭৩, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, প্রথম প্রকাশ দোল পূর্ণিমা, ১৩৯৩, পৃ. ৬৭

১৬। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জুন ২০১৩, পৃ. ৩৭

১৭। তদেব : পৃ. ২২৬

১৮। তদেব : পৃ. ২২৮

১৯। কর, সন্তোষ : *মুক্তামাছ,* পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪০১, দিঘলপত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২১ এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১০০

২০। জলদাস, হরিশংকর : *জলপুত্র,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ৭৩

২১। জলদাস, হরিশংকর : *দহনকাল,* ঢাকা ১১০০, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৮

২২। জাহাঙ্গীর, নূরুদ্দিন : *জাল থেকে জালে,* ঢাকা-১১০০, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭, পৃ.১৮

২৩। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জুন ২০১৩, পৃ. ৯২

২৪। তদেব : পৃ. ৯২

২৫। তদেব : পৃ. ১৪০

২৬। চট্টোপাধ্যায়, সাধন : *উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড),* কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ১৮

২৭। দত্ত, গৌরীপদ : *গহিন গাঙ: পাঠ ও প্রতিক্রিয়া,* নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৬২

২৮। জলদাস, হরিশংকর : *দহনকাল,* ঢাকা ১১০০, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৫

২৯। তদেব : পৃ. ২৭

৩০। মজুমদার, সমরেশ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি,* কলকাতা-৯, রত্নাবলী, ১৯৯০ পৃ. ১৮১

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : *পদ্মানদীর মাঝি,* কলকাতা ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ. ৪২

৩২। তদেব : পৃ. ১৭

৩৩। চক্রবর্তী, সুমিতা : *শিল্পভাষার প্রবণতা : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা,* সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৪২-৪৩

৩৪। চট্টোপাধ্যায়, সাধন : *উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড),* কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২০

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ

সাহিত্যে প্রান্তবর্গীয়-জীবনের সন্ধান-আধুনিকতার এক বিশেষ লক্ষণ। বিশ শতকের গোড়া থেকেই দেশ ও দেশান্তরের সাহিত্যে প্রান্তবর্গীয়দের প্রতি মনযোগ সৃষ্টি হয়। সাহিত্যে বস্তুধর্মিতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গরূপে প্রান্তবর্গীয়তার প্রকাশ। গত শতাব্দীর জনবিস্ফোরণ, মহাযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মন্দা সাহিত্যকে বিশেষভাবে বস্তুধর্মী করে তোলে এবং রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তবর্গীয় জীবনানুসন্ধান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু সাহিত্যিককেই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই প্রান্তবর্গীয়দের অন্যতম উল্লেখ্য জনগোষ্ঠী হল মালো বা জেলে।

সাহিত্যে মালো জাতির কথা বললে প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তার 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো জাতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। নিজে ঐ মালোগোষ্ঠীর লোক ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল এই সহজানন্দময় জীবন যন্ত্রণার বিশ্বস্ত প্রতিচিত্র অংকন করা। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাড়াও আরো অনেক উপন্যাস, গল্প রয়েছে যেখানে মালো বা জেলেদের প্রসঙ্গ, জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের মতে মালোরা আগে মল্লযোদ্ধার কাজ করত। প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন সময়ে রচিত কাব্য কবিতায় আমরা বহু মানুষের কথা পাই যারা এই বঙ্গদেশবাসী এবং বঙ্গীয় মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে জীবনধারণ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য নানান কর্মে নিয়োজিত থেকেছেন। চর্যাপদ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনীগ্রন্থ নির্বাচন করা হবে। গ্রন্থগুলিকে পর্যালোচনা করা হবে। এই গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং বাংলা সাহিত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মালো জাতির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করা হবে। পাঁচটি উপ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। অধ্যায়ের শেষে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে।

ক) প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি

অনেক কাল আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালির খাদ্যবিষয়ক গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, বাঙালিরা চিরকাল মৎস্যভোজী। ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে বারিবহুল, নদনদী-খালবিলবহুল প্রশান্ত সভ্যতা প্রভাবিত এবং আদি

অস্ট্রেলীয় মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হবে, এটা কিছু আশ্চর্য নয়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের আহার্য তালিকার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বাংলাদেশ এই হিসাবে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত। এই তালিকায় ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। কিন্তু বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে যথেষ্ট অপ্রীতিকর ছিল।

প্রাকৃত বাঙালির খাদ্য প্রসঙ্গেও ড. নীহাররঞ্জন রায় আমাদের বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থ থেকে একটি চমৎকার খাদ্যতালিকার উল্লেখ করেছেন তিনি। সেখানে নালতা বা পাট শাকের সঙ্গে মোইলি মচ্ছা অর্থাৎ মৌরলা মাছের উল্লেখ মেলে। প্রাকৃতপৈঙ্গল এ প্রাপ্ত একটি শ্লোকের অর্থ করলে জানা যায় যে নারী কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা বা পাট শাক পরিবেশন করতে পারেন, তাঁর স্বামী যে যথার্থই পুণ্যবান সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। 'নৈষধকাব্য'-এ নলদময়ন্তীর বিবাহভোজে নানা রকমের মাছের ও মাংসের সুস্বাদু এবং সুগন্ধী পদের কথা জানা যায়।

বাঙালির মৎস্যপ্রীতির কথা প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদ 'মাছের নামে গাছও হাঁ করে' বহুল প্রচারিত। প্রথিতযশা লেখক শ্রীপান্থ লিখেছেন, বাঙালি যখন দুটি পদে খাওয়ার কথা বলে, তখন হয় বলে ডালভাত বা দুধভাত কিংবা মাছভাত। বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মাছের উল্লেখ মেলে প্রাচীন কবিদের রচনায়, লেখকের লেখনীতে।

মৎস্য নামটির সঙ্গে আদিনাথের শিষ্য মৎস্যেন্দ্রনাথের নামটি সম্পর্কযুক্ত। তাঁকে নাথধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। চন্দ্রদ্বীপ ছিল তাঁর নিবাসভূমি, বর্তমান নাম বাখরগঞ্জ। ভিন্ন মতে, নোয়াখালির সন্দীপই চন্দ্রদ্বীপ। মৎস্যেন্দ্রনাথ নাম হওয়ার এক মতে বলে, ঈড়া ও পিঙ্গলা (গঙ্গা আর যমুনা) নাড়িতে যে শ্বাস-প্রশ্বাস বয়ে চলে সেখানে প্রাণবায়ু সতত বিচরণশীল। সান্ধ্যভাষায় এই প্রাণবায়ুই মৎস্য। মৎস্যজয়ী অর্থেই মৎস্যেন্দ্রনাথ। যোগবলেই তা সম্ভব। মতান্তরে, সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করে মৎস্যরূপ মনকে দেহসমুদ্রে নিয়ন্ত্রণ করার সাধনাই মৎস্যসাধন। চর্যাপদে হঠযোগ মতাবলম্বী নাথপন্থের আভাস মেলে। এক নম্বর চর্যা লুইপাদের লেখা। গঙ্গাতীরের জেলেরা মাছের নাড়িভুঁড়িগুলি ফেলে দিত, তা খেয়েই তিনি বারোবছর যোগসাধনা করেন। তা খেতেন বলেই জেলেনিদের কাছে তিনি 'লুইপা' আখ্যা

পান। সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে লুই নামটি সম্ভবত রোহিত শব্দ হতে এসেছে। ধর্মমঙ্গলের লুইয়া, লুইধর, লুইচন্দ্র এবং পরবর্তীকালের রুইদাস এই নামের সঙ্গে অভিন্ন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের (খ্রিস্টীয় ১৪শ-১৫শ শতাব্দী) 'অযোধ্যাকাণ্ডে' দেখা যায় ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিতে আসলে সঙ্গে করে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, ফলমূল যেমন নারকেল, কলা, পেয়ারা, আম ও ভালো মাছ রুই, চিতল ইত্যাদি মাথায় এবং কাঁধে বহন করে সকলে নিয়ে আসে।

মালোদের দেহের আকৃতি, শারীরিক গঠন দেখে অনেকে বলেন মালোরা মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাদের মল্লযোদ্ধা বা মল্লবীর বলা হত। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড এবং লঙ্কাকাণ্ডে মল্লযোদ্ধার সংবাদ পাওয়া যায়। রাজায় রাজায় মল্লযুদ্ধ তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বালি এবং সুগ্রীব এই দুই মল্লযোদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়-

'কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর ।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর ।।'[১]

মল্লযুদ্ধে বালি এক চাপড়ে সুগ্রীবকে কাতর করেন-

'সুগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর।।'[২]

একই সঙ্গে-

'বালি বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব শোণিত উঠে মুখে।।'[৩]

সুগ্রীবকে অচেতন দেখে শ্রীরাম ধনুকে ঐষিক বাণ জুড়ে আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করেন। দশদিক আলোকিত করে সেই বাণ ছুটে যায় এবং বজ্রাঘাত সম বাণ বালির বুকে ফুটে।

'বুক ধরি বালিরাজা করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার ।।'[৪]

এইভাবে রামচন্দ্রের হাতে বালি নিহত হয়।

লঙ্কাকাণ্ডে কুম্ভবীরের সঙ্গে বানররাজ সুগ্রীবের মল্লযুদ্ধের সংবাদ আছে। কুম্ভবীর রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের পুত্র। এই কুম্ভের বাণে দেবলোক দানবলোক কম্পমান। রাবণ কুম্ভকে রণক্ষেত্রে পাঠান রাম, লক্ষণ এবং বানর সৈন্যকে নিধন করার জন্য। কুম্ভবীর রণক্ষেত্রে এসে হাজার হাজার বাণ নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং বাণ নিক্ষেপ করে অঙ্গদকে আহত করেন।

‘অঙ্গদের পর্ব্বত বাণেতে ফেলে কেটে।
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে।।’[৫]

এই ঘটনায় রামচন্দ্র খুবই চিন্তিত হন এবং চিন্তাভাবনা করে ঋষভ, কুমুদ আর সুষেণ সেনাপতি এই তিন বীরকে পাঠান কুম্ভবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু তাঁরাও কুম্ভের কাছে পরাজিত হলে বানররাজ সুগ্রীব কুম্ভের সঙ্গে লড়তে যান। কুম্ভ সুগ্রীবকে আছাড় মারেন। কিছুক্ষণ অচেতন হয়ে থাকার পর চেতনা ফিরে পেয়ে সুগ্রীব পুনরায় কুম্ভের সঙ্গে লড়তে গেলে কুম্ভ সুগ্রীবকে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব দেন।

‘কুম্ভ বীর বলে, ধনু দূরে পরিহরি।
রিক্ত হস্তে এস না দুজনে যুদ্ধ করি।।’[৬]

দুজনের মধ্যে ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সুগ্রীব কুম্ভবীরকে ধরে আছাড় মারেন। কুম্ভের মাথার খুলি ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। সুগ্রীব মল্লযুদ্ধে জয়ী হন।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এর পাতায় পাতায় রয়েছে মাছের কথা। বিজয়গুপ্ত বরিশালের লোক অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন। পূর্ববঙ্গে নদী, নালা, খাল, বিলের অন্ত নেই। অন্ত নেই নানা স্বাদের নানা প্রজাতির মাছের। বিজয়গুপ্তের বর্ণনা থেকে কিছু অংশ তুলে দিলেই ওপার বাংলার মাছ ও মাছের রন্ধনকলার বৈচিত্র্যের পরিচয় মিলবে। বিজয়গুপ্ত লিখেছেন-

'রান্ধি নিরামিষ ব্যঞ্জন হইল হরষিত।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে হৈয়া সচকিত।।
মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ।।
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ ।।
ভিতরে মরিচ গুড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।
তৈল পাক করি রান্ধে চিংড়ির মাথা।।
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল চৈ।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎস্যের খৈ।।'[৭]

'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে চাঁদসদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন অংশে কৈবর্ত অর্থাৎ জেলে কৈবর্তের প্রসঙ্গ আছে। চাঁদসদাগর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য করে দেশে ফেরার পথে সমুদ্রে শঙ্খ অর্থাৎ সঙ্কর মাছের সন্ধান পান। কৈবর্ত ডিঙা নিয়ে যত সাধু এই পথে আসে যায় তারা এখানে থেকে মনসার পুজো করে এবং সে সদাগরকে চোদ্দডিঙা ভরা ধন দিয়ে ধূপ দীপ দিয়ে মনসার পুজো করতে বলে। কৈবর্ত ঘরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে চাঁদ অনুচরদের নির্দেশ দেন কৈবর্তকে বন্দি করে নৌকায় তুলতে।

'গুটিকত কিল দাও পথের উদ্দেশ।
তবেত কহিবে বেটা সকল বিশেষ।।
এতেক ধনা বেটা আরো আজ্ঞা পায়।
চুলে ধরি ধনা বেটা কৈবর্ত কিলায়।।'[৮]

অবশেষে সোমাই পণ্ডিতের অনুগ্রহে কৈবর্ত চাঁদের হাত থেকে ছাড়া পায়।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৫৪৪ খ্রি.) সবচেয়ে পুরনো না হলেও এটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ 'মঙ্গলকাব্য' বলা যেতে পারে। মুকুন্দরামের জন্ম হয়েছিল ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার দামুন্যা নামে এক গ্রামে। অনেকেই এই 'চণ্ডীমঙ্গল' কে সেই সময়ের বাঙালিদের খাওয়াদাওয়ার 'ভাঁড়ারঘর' বলে থাকেন। এই কাব্যে শুধু আমিষ নয় অসাধারণ সব নিরামিষ

পদও আছে। রকমারিত্ব ও রন্ধনকলার দিক থেকে কবি অভিনব এইসব পদ্গুলিকে অনায়াসে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মল্লযোদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। এরা ছিল অসাধারণ শক্তিশালী। চেহারা এবং ক্ষমতায় এদের সঙ্গে যমের দূতের মিল ছিল। তাই কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী এই মল্লবীরদের যমের দূতের দোসর বলেছেন। সাধারণত রাজপুত জাতিরা সর্বদাই মল্ল বিদ্যা শেখায় রত থাকত।

'দোসর যমের দূত,   বৈসে যত রাজপুত,
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।'[৯]

মল্ল-বিদ্যায় মগ্ন থাকলেও এই রাজপুতরা সময় পেলে কৃষ্ণ ভজনায় মগ্ন থাকত। ব্রাহ্মণদের এরা নানান ধন দান করতেন। এই মুষ্ঠিযোদ্ধাদের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৈষ্ণবরা যেমন আখড়ায় হরিনাম সংকীর্তন করত, ঠিক তেমনি মল্লযোদ্ধারা আখড়ায় মল্লযুদ্ধ করত।

'তুলিয়া আখড়া ঘরে,   মল্ল যুদ্ধ কেহ করে,
মালবিদ্যা গুলী চাপগারি ।
লইয়া ঢাল খাড়া,   কেহ কবে তোলাপাড়,
পশু বধে, কেহ বা শিকারী ।।'[১০]

বাঁ হাতে ঢাল ও ডান হাতে তরবারি ধরে এরা লম্ফ দিয়ে যুদ্ধ করত। শত্রুকে সামনে পেলে এরা প্রাণে মেরে ফেলত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মাছুয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। এরা জাল বুনত এবং সেই জাল দিয়ে মাছ ধরে তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত।

'মাছুয়া নিবসে পুরে,   জাল বুনে মৎস্য ধরে,
কোচগণ বসে লীলা রঙ্গে ।।'[১১]

মাছুয়ারা বাজারে মাছের পসার নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে বসলে ভাঁড়ু দত্ত মাছের পসরা থেকে বেছে ভালো মাছ তুলে নিত। মাছের দাম দিত না। পরিবর্তে মাছুয়াদের কটু ভাষায় গালি দিত।

কাশীদাসী মহাভারতে (১৬০৪ খ্রি.) শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যানে পোড়া মাছের কাহিনি পাওয়া যায়। একদা শ্রীবৎস রাজার ওপর ভার পড়ে লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে কে সেরা, সেই বিবাদ মীমাংসার। রাজা দুটি সিংহাসন বানালেন, একটি সোনার অপরটি রূপার। নির্দিষ্ট দিনে লক্ষ্মী এসে সোনার সিংহাসনে এবং শনি রূপার সিংহাসনে বসলেন। প্রমাণ হয়ে গেল লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠত্ব। সেই অপমানে শ্রীবৎসরাজার সর্বনাশ করতে শনি উঠে পড়ে লাগলেন। দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী চিন্তাকে নিয়ে রাজা শ্রীবৎস পথে বের হয়ে এক সময় বনমধ্যে মৎস্যঘাতী ধীবরদের দেখতে পান। তাদের কাছে ভোজন করার জন্য কিছু মৎস্য চান। জেলেরা জানায় যে তারা জালে কিছুই পায় নি। তাই তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। রাজা জেলেদের পুনরায় জাল ফেলার পরামর্শ দেন। রাজা শ্রীবৎস তাল বেতালের স্তুতি করেন। সকল জেলেরা জাল ফেলে প্রচুর মাছ পায়। অনেক মাছ পেয়ে জেলে কৈবর্তরা রাজা শ্রীবৎস ও তার পত্নীকে সাধক বলে মনে করেন এবং শলুক মৎস্য অর্থাৎ শোল মাছ দেন। রাজা শোলমাছ সাদরে গ্রহণ করে চিন্তাকে বললেন শোল মাছ পুড়িয়ে দিতে। মীনদগ্ধ করে চিন্তা সেটি জলে ধুতে গেলে শনির মায়ায় তা পালিয়ে গেল।

‘ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন
মৎস্য পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন।।
***
মীনদগ্ধ করি চিন্তা চিন্তিলেন মনে।
মৎস্যপোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে।।
***
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কাঁদিতে লাগিল।।’[১২]

প্রবাদ আছে মাছপোড়া খেলে শনির দোষ কেটে যায় (মীন পোড়া খেলে হয় শনি-প্রতিকার, কাশীদাসী মহাভারত)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মাছপোড়া লাগে, সপিণ্ডকরণ ব্যবস্থায় বলা আছে যে নিরামিষ অন্ন (প্রেতের জন্য দগ্ধ মীন) পৃথক পৃথক স্থানে রাখতে হয়। পোড়া মাছ শিবের ভোগে হাজরাতলায় লাগে, শিব হলেন হাজরাঠাকুর।

পুরাণ এবং মহাভারত মতে ‘মৎস্য’ একটি দেশ। মৎস্যদেশের একটি রাজ্য ‘বিরাট’। ভিন্ন মতে মৎস্যদেশই বিরাট দেশ, রাজা বিরাটরাজা। এই বিরাট হল বিরাটরাজের রাজধানী। আলোয়ারের পশ্চিমে কিংবা জয়পুর থেকে একচল্লিশ মাইল উত্তর দিকে অর্থাৎ দিল্লির একশো পাঁচ মাইল পশ্চিমে গেলেই বৈরাট বা বিরাট নামে বর্তমানে ছোটো একটি জনপদ। হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাই, মৎস্যদেশ খুবই বৃহৎ অর্থে অতিকায় ছিল। বারো বছর বনবাসে থেকে পাণ্ডবেরা এক বছর বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। তবে, মৎস্যদেশের সঠিক অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে।

কাশীদাসী মহাভারতে ‘শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ’ অংশে মহেশের আরাধনার জন্য বিরাট রাজা শঙ্কর যাত্রার আয়োজন করেন। নৃত্য গীত, শাস্ত্রের বিবাদ, হাতীর যুদ্ধের পাশাপাশি পর্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ আসেন এই যাত্রায়। মল্লদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বলবান সেই শক্তিশালী মল্লের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বিরাট রাজা ভীমকে আহ্বান করেন। ভীম সেই মল্লবীরকে দুই পায়ে ধরে অন্তরীক্ষে তুলে ঘুরিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত মল্ল প্রাণ ত্যাগ করল।

‘ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরি দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেন ঘুরাইয়া তায়।।
ক্ষুদ্র মীনে ধরে যেন গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুমারের চক্র।।
ঘুরাতে ঘুরাতে মল্ল ত্যজিল পরাণ।
ফেলাইয়া দিল ভূমে যেন লতাখান।।’[১৩]

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ‘শিবায়ন’ (১৭১১ খ্রি.) কাব্যে বাগ্‌দিনীকে শিবের অঙ্গুরী দান, শিবের সহিত বাগ্‌দিনীর বাক্‌বৈদগ্ধ্য এবং নারদ কর্তৃক গৌরীকে শঙ্খের নিমিত্ত মন্ত্রণাদান অংশে জেলের প্রসঙ্গ পাই। বাগ্‌দিনীরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। এই কাব্যে দেখি স্বয়ং মহামায়া (পার্বতী) শিবকে ছলনা করবার জন্য বাগ্‌দিনীর ছদ্মবেশে কৃষিক্ষেতে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং মায়াজাল বিস্তার করে ক্ষেতে মাছ ধরেছেন। কী কী মাছ তিনি ধরছেন তার বিবরণও কবি রামেশ্বর দিয়েছেন।

‘ধরেন পাবদা পুঁঠি পাঁগাস পাঠীন।
চিথল চিঙ্গুড়ি চেলা চাঁদাকুড়া মীন।।
ধান্যহুলি ধোপাঝি ধরিল ডানকনা।
মৌরলা খলিসা ভোল টেঙ্গরা নয়না।।
তেটেঙ্গরি ধরিল তেচখ্যা দিল ছেড়ে।
সোল সাল সিঙ্গাল মৃগাল মারে তেড়ে।।’[১৪]

ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’ (১৭১১) কাব্যে ‘ঢেকুর পালায়’ কেওট-এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই কেওট শব্দটি বীরভূমের মানুষদের কথ্য ভাষায় শোনা যায়। এরা মৎস্য ব্যবসায়ী (জেলে)। এরা পুকুরে এবং নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরত এবং তা বাজারে বিক্রি করত। ইছাই ঘোষ ঢেকুর গড় প্রতিষ্ঠা করলে কেওট/কৈবর্তরা এসে বসতি স্থাপন করে।

‘কেওট কৈবর্ত্ত, স্বর্ণকার ধূর্ত্ত
ছুতার বাইতি জালু ।।’[১৫]

এই কেওটরা জাতিতে ছিল কৈবর্ত। এদের জাতিগত বৃত্তি ছিল মাছ ধরা।

‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের ‘ফলা নির্ম্মাণ পালা’ অংশে মল্লবীরের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মল্লবীরেরা ছিল কুস্তি বিশারদ। তারা বলবান ছিল। মল্লবীরেরা যুদ্ধের পূর্বে আস্ফালন পূর্বক গর্জন বা সিংহনাদ করত। ফলা নির্মাণ পালায় দেখি মল্লবীর সারঙ্গধল চারজন অনুচর (এরাও মল্লবীর) কে সঙ্গে নিয়ে লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। লাউসেন যুদ্ধ করেন প্রবল বিক্রমে কিন্তু পাঁচজন এক পক্ষ হওয়াতে লাউসেন পরাজিত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হনুমানের বরে লাউসেন অজেয় হন।

মল্লযুদ্ধের পূর্বে মল্লযোদ্ধারা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসত। তারপর বাহুতে ধুলো মাটি মাখত। ফলা নির্মাণ পালায় দেখা যায় মল্লযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে লাউসেন মার মার রব তুলে মল্লবীর সারঙ্গধল ও তার চারজন অনুচরকে শায়েস্তা করার জন্য এগিয়ে আসে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে বাহুতে ধুলো মাটি লাগায়।

'আসি দেখে লাউসেন ভূমে হাঁটু পাড়ে ।
বীরমাটী মাখি ভুজে ভূতলে আছাড়ে ।।'[১৬]

অনেক সময় মল্লবীরেরা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে দুই বাহুতে মাটি লাগাত।

ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২ খ্রি.) কাব্যে সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ অংশে মল্লবীরদের প্রসঙ্গ আছে। এরা ছিল শক্তিশালী বাহুযোদ্ধা। মল্লযোদ্ধারা প্রতিপক্ষকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য ঘন ঘন মালসাট মারত। শক্তি প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে মাটিতে হাতের চাটি মারত। দূর হতে সেই শব্দ শুনে মানুষ ভয় পেত।

'মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটি ফাটে
দূরে হৈতে শুনিতে তরাস ।।'[১৭]

ভয়ংকর সেই শব্দ শুনে মনে হত মাটিতে বুঝি এবার ফাটল ধরল। যুদ্ধের সময় মল্লযোদ্ধাদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

খ) কথাসাহিত্যে মালো জাতি

বাংলা ভাষায় কথা-সাহিত্যের প্রচলন নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা। ইংরেজ আগমনের পরবর্তী কালে ইংরেজি সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে বাঙালির শিল্পবোধ আর কল্পনার যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটে, তারই খাত বেয়ে আধুনিক রুচি ও রীতি-সম্মত কথা-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। এই উপ অধ্যায়ে ১৯৩৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রচিত উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ও জীবনীগ্রন্থগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসের কাহিনির বৃত্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রান্তিক সমাজের সকল প্রকার বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে চেয়েছেন। জেলেদের দীনতা, দারিদ্র, পাশবিকতা, বিশ্বাস-চিন্তা, সরলতা, নীচতা- এককথায় সামগ্রিক জীবনাচরণ এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-

‘পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী- অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলোর ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ। এই ধীবরপল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই।... ইহার অধিবাসীদের ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রীতি-সমবেদনা, চক্রান্ত-দলাদলি সমস্তই বাহিরের মধ্যবর্তিতা ছাড়া নিজ-প্রকৃতি-নির্ধারিত, সংকীর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে।’[১৮]

কেতুপুর, চরডাঙা, ময়নাদ্বীপ- মুখ্যত এই তিনটি স্থানে কাহিনি পল্লবিত হয়েছে। আকাঙ্ক্ষায় যারা সামান্যের প্রত্যাশী, উচ্ছ্বাস ও আবেগে যারা তেমনভাবে অভিভূত হয় না, জীবনসংগ্রামের গ্লানিতে যাদের সমস্ত সময় কেটে যায়- তাদের জীবনকথাই এই উপন্যাসে বিবৃত।

উপন্যাসের গোড়ার দিকে জেলেপাড়ার অমার্জিত ক্লিন্ন পরিবেশ উন্মোচিত হয়েছে এইভাবে-

‘পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচেকানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।’[১৯]

জেলেদের আশা আকাঙ্ক্ষা সামান্য, অল্পেই তারা তুষ্ট, তবু সেটুকুই তাদের ভাগ্যে জোটে না। দুর্নীতি, দারিদ্র, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নিম্নমানের চালাকি, অবিশ্বাস আর

সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভয়, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহ্য করে চলা এই জেলেদের ওপর আছে অপেক্ষাকৃত সম্পদশালীদের বঞ্চনা, আর আছে পদ্মার উদাসীনতা, প্রকৃতির অমোঘ অভিসম্পাত। সারাবছর পদ্মা তার তীরবর্তী অঞ্চল ও অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে রাখতে পারে না। বিশেষ করে ইলিশের মরসুম ফুরিয়ে গেলে কোনোমতে জীবনধারণও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পদ্মার আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে জেলেপল্লীর জীবন-পদ্ধতিতে। পদ্মা ও পদ্মার খালগুলো অধিকাংশ জেলেদের উপজীবিকার ক্ষেত্র। কেউ মাছ ধরে, কেউ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেউ পদ্মার বুকে জাল ফেলে বেড়ায়, কেউ কুঁড়োজাল নিয়ে খালে দিন কাটায়। ঋতুচক্রের কোনো কোনো পর্যায়ে পদ্মাপাড়ের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)-তে আন্তঃশ্রেণি ও অন্তঃশ্রেণির সংঘাত স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় যে জাহাজঘাটায় কুবের ও কুবেরের মতো অন্য ধীবরদের প্রতি শেতলবাবু আর চালানবাবুদের মতো মুৎসুদ্দি ও পেতিবুর্জোয়া শ্রেণির বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কাহিনিতে আন্তঃশ্রেণি-সংঘাত বিশেষভাবে প্রকাশিত। কৈবর্তরা দীন দরিদ্র, শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের চির-অপরিচয়। পদ্মার দুর্বার জলপ্রবাহের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তারা বাঁচার স্বপ্ন দেখে। অসংখ্য নিদ্রাহীন রাত পদ্মার বুকে কাটিয়েও দারিদ্রের দুর্মর বলয় থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। এরকম অবস্থায় মধ্যসত্ত্বভোগীরা শোষণের হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসে। শেতলবাবু প্ররোচিত করে কুবেরের মতো সরল ধীবরকে আপন নৌকা থেকে মাছ চুরি করতে। কৈবর্তের কিন্তু এই ধৃত ইলিশের ওপর কোন অধিকার নেই। পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটিমাছ দিয়ে দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে তাদের দিন চলে কোনোরকমে।

অন্তরস্থিত রাগ-ক্ষোভ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো গালি। ভদ্রজনরা রাগ প্রকাশ করে শীলিত গালির মাধ্যমে। আর অশিক্ষিত জনরা তাদের মুখ দিয়ে গরল উগড়ে দেয় শ্রুতিকটু, অশ্রাব্য গালির মাধ্যমে। 'পদ্মানদীর মাঝি'র জেলেপল্লিতে দারিদ্রের দেবতার যেমন নিত্য আনাগোনা, তেমনি অশিক্ষার জমজমাট রাজত্বও সেখানে। এই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীও তাদের সন্দেহ-ক্ষোভ-বিরাগ-মানসিক যাতনা অশীলিত গালিগালাজের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এইসব গালিগালাজের মধ্য দিয়ে জেলেজীবনের মানসচিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' তেও কৈবর্তরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছে, যা ভদ্রসমাজে মান্যতা পাবে না। অনেকটা অশ্লীল হলেও অশিক্ষিত এই সমাজের মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই এগুলো

উচ্চারণ করে গেছে তাদের সংলাপে। তাদের রাগ, অনুরাগ, শ্লেষ এমন কি স্নেহ জানাতেও এই সকল অনুচ্চার্য অপাঙ্‌ক্তেয় শব্দ সংলাপে ব্যবহার করেছে। এরকম কিছু শব্দ হল- **খালাস হইছে, মুটাইছে দেখলাম, ধলাপোলা, হারামজাদী, হালা, জুয়াচোর, বজ্জাইত, পোলা বিয়ান, হারামজাদী, বদ্‌ ইত্যাদি।**

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) তে বর্ণনার ক্ষেত্রে মূলত সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে সর্বনামপদের ক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই চলিত রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে তার বর্ণনামূলক গদ্য গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়-

> 'এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে।'[২০]

সাধু ও চলিতের মিশ্রণ ঘটায় গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটেছে এই গদ্যে।

উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাদির ব্যবহারে নদী ও তার পারিপার্শ্ব নানাভাবে ছায়া ফেলে জেলে, মাঝিদের সংলাপে। 'পদ্মানদীর মাঝি'র অধিকাংশ চরিত্র যেহেতু নদীতীরস্থ কৈবর্ত, সেহেতু তাদের কথিত সংলাপে নদী ও তার অনুষঙ্গ এসেছে। দুরন্ত যৌবনা কপিলাকে দেখে কুবেরের মনে জেগেছে – বর্ষায় ভরা পদ্মার ছবি। কপিলার নির্মম দুর্বোধ্য আচরণ তার চোখে উপমিত হয়েছে পদ্মার রহস্যকুটিল আচরণের সঙ্গে।

মূলত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের প্রাপ্তি-যাতনা, সাদা-কালো সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সমাজ-কাঠামো, ভাষা-এককথায় সংগ্রামশীল জীবনবৃত্তান্ত নিখুঁত রেখায় অসাধারণ ভঙ্গিতে চিহ্নিত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুমিল্লা যখন ত্রিপুরা এস্টেটের অংশ। পরাধীন ভারতের অন্তর্গত স্বাধীন দেশীয় রাজার রাজ্য। উপজাতি সম্ভূত দেববর্মণ বা মাণিক্য বংশের রাজত্ব। ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণঘাট গ্রামের মল্লবর্মণ বা মালো পরিবারে অদ্বৈতর জন্ম। অজস্র সাহিত্যকর্ম ছড়িয়ে

আছে তাঁর স্বল্প জীবৎকালের পাতায়। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) উপন্যাসই তাঁকে বাংলা পাঠকদের কাছে সুপরিচিত করেছিল। উপন্যাসটি ছিল অসামান্য এক জীবন অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত চালচিত্র। তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত গোকর্ণঘাট গ্রামের মালো গোষ্ঠীর জীবনচর্যার এক জীবন্ত দলিল।

মল্লবর্মণ বা মালোরা আসলে ত্রিপুরার উপজাতি সম্ভূত গোষ্ঠী, ১৯৯১ সালের সেনসাসে তফসিলী তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এদের পেশা মাছ ধরা। এরা মাছ-জাল-জল আর নৌকা কেন্দ্রিক জীবনচর্যার ধারক ও বাহক। জল থেকে মাছ ধরে এরা মহাজন বা ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে, তাতেই জোটে পেটের অন্ন, পরনের কাপড়, মাথা গোঁজার ঠাঁই। জলই এদের জীবন, মাছই এদের অন্নদাতা।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিতাসের কাহিনি শোনাতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, তিতাস বিখ্যাত কোনো ইতিহাসের সাক্ষী নয়, ভূগোলের পাতায় তার নাম নেই- সে শুধু একটা নদী, একান্ত অখ্যাত-অকুলীন। তিতাস একটি সাধারণ নদী মাত্র। কোনো ইতিহাসের কেতাবে, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজে পাবে না। কেননা, তার বুকে যুযুধান দুই দলের বুকের শোণিত মিশিয়ে তাকে কলঙ্কিত করেনি। কিন্তু তাই বলে এই নদীর কোন ইতিহাস নেই এমনটা নয়। এই নদীর ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস তিতাস-তীরস্থ রক্তমাংসের মানুষের, সেই ইতিহাস মানবিকতার আর অমানুষিকতার। এই নদীকে কেন্দ্রে স্থাপন করে অদ্বৈত আসলে তিতাস-তীরবর্তী মালোদের অবজ্ঞাত, অপরিচিত, অবহেলিত জীবন-তাৎপর্যকেই তুলে ধরেছেন।

মূল কাহিনিবৃত্ত নির্মাণ শুরু করার আগে ঔপন্যাসিক মালোপাড়ার অবস্থান নির্দেশ করেছেন-

> ‘তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে-বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মট্‌কি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তক্‌লি- সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার। নদীটা যেখানে ধনুকের মত বাঁকিয়াছে, সেইখান হইতে গ্রামটার শুরু। মস্ত বড় গ্রামটা- তার দিনের কলরব রাতের নিশুতিতেও ঢাকা পড়ে না। দক্ষিণ পাড়াটাই গ্রামের মালোদের।’[২১]

তিতাসপাড়ের মাছশিকারী মালোদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শোষণ-বিড়ম্বনা, মিলন-বিরহ, দুঃখ-উল্লাস-দ্রোহ – এককথায় মালোসমাজের অতীত ও বর্তমান প্রাণস্পন্দনের হদিস মেলে 'তিতাস একটি নদীর নামে'। মালোজীবনের অতল থেকে লেখক যে অরূপ রতন তুলে এনেছেন, তা বহুমূল্যবান। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দৈবনির্ভরতা মালোদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। এই সমাজের সেবাবতী বিবাহিত নারীদের স্বামীরা জলের ফসল তুলতে গিয়ে প্রকৃতির দুর্বিপাকে পড়ে মরে গিয়েও মরে না, তারা শুধু নিখোঁজ হয়। আর অনাথা নারীর চারপাশে ছড়ানো থাকে ভ্রষ্টা হবার হাজারো প্রলোভন।

মালোরা সম্পূর্ণভাবে শোষিত এক সম্প্রদায়। দাদনদার, মহাজন ও আড়তদারদের শিকার এরা। মাছধরার মতো আদিম উপজীবিকার ওপর নির্ভরশীল মালোগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক শক্তির পাশাপাশি বাইরের সমাজের নানা অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গেও নিরন্তর লড়াই করতে হয়। মহাজন-আড়তদার থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতা পর্যন্ত সকলের সমবেত শোষণচক্রের বিরূদ্ধে লড়াই করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়।

মালোদের জলের উপরে জলটুঙ্গি বাঁধা জীবন, তাই তাদের জীবন সংশয়াতীতভাবে অনিশ্চিত। আর এই অনিশ্চয়তা স্বাচ্ছন্দ্যের- দুবেলা দুমুঠো অন্নের। একটা কদাকার, ভীষণ, জীবনধ্বংসকারী দারিদ্র মালোজীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকেছে। তাদের ছন্নছাড়া দারিদ্রদীর্ণ জীবনের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে গোটা উপন্যাস জুড়ে।

তিতাস ছাড়াও আর একটা নদীর প্রসঙ্গ আছে এই উপন্যাসে, সেটা বিজয় নদী। এ নদী তিতাসের মতো জলশস্যপূর্ণ নয়। এ নদী নিষ্করুণ, ফসলহীন। এর নাম বিজয় হলেও সে নিঃস্ব। তার তীরস্থ মালো-সন্তানদের সে পর্যাপ্ত মাছ দিতে পারে না। ফলে অনটন এই নদীপাড়ের মালোদের নিত্যসঙ্গী।

সব মালো মাছধরার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে না। বৃদ্ধরা, বিধবারা জালের সুতো কাটার মতো পরোক্ষ আয়ের সঙ্গে জড়িত। এই সুতা বিক্রিবাটার কমবেশির ওপর মালোদের স্বাছন্দ্য-দারিদ্র নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। গোকর্ণঘাটের মালোপাড়ায় আশ্রিত অনন্তের মায়ের দিন চলে সুতো কেটে, সুতো বিক্রি করে। বর্ষার সময় সুতো বিক্রি কমে গেলে অনন্তর মা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ল। তার সংসার অচল হয়ে পড়ল। পেটভরে খেতে না পেয়ে অনন্ত দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। এসময় অনন্তর মায়ের কুটিরটিরও জীর্ণ অবস্থা।

তিতাস নদী শুকিয়ে যাওয়ার পর মালোজীবন বিপন্ন, বিপর্যস্ত, দারিদ্রক্লিষ্ট। মালোদের অবস্থা জলছাড়া মাছের মতো হয়ে যায়। খেতে পায় না। তিতাসপাড়ের মালোদের জীবন হয়ে ওঠে শ্রীহীন, ছারখার। দুর্দশাগ্রস্ত মালোপাড়ার চিত্র অদ্বৈতের কলমে ফুটে উঠেছে-

> 'মালোদের পাড়াগুলো যখনই চোখে পড়িতেছে, তখনই বেদনায় বুক টনটন করিয়া উঠিতেছে। গাছগাছালি আছে, কিছুদিন আগে যেখানে যেখানে ঘর ছিল তার অনেকই এখন খালি ভিটা। ঘাটে আগে সারি সারি নৌকা ছিল, এখন আর নাই। মাঝে মাঝে দুই একটা কেবল বাঁধা রহিয়াছে। যেখানে তারা জাল শুখাইত, এখন সেখানে গরু চরিতেছে। ঘরগুলি কোথায় লুকাইয়াছে, ভিটাগুলি নগ্ন। তার উপরে বাঁশের খুঁটির গর্ত, ভাঙা উনানের গর্ত, শিলনোড়া রাখার সিঁড়ি, মাটির কলসী রাখার সিঁড়ি আধ-ভাঙ্গা পড়িয়া আছে উঠানে ঝরাপাতার রাশি, তুলসীমঞ্চ ভাঙ্গিয়া শত খান। প্রদীপ দেখাইবার কেউ নাই। মাঝে মাঝে দুই-একটি বাড়ি এখনো আছে। তারা বড়ঘর বেচিয়া ছোটঘর তুলিয়াছে।'[২২]

এ দীন অবস্থা শুধু গোকর্ণঘাটের মালোপাড়ার নয়; রাধানগর, কিষ্টনগর, মনতলা, গোসাঁইপুর-সবখানের একই অবস্থা। মালোদের বহির্বর্ণনা থেকে ভেতরের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় সেখানকার অবস্থা আরও ভয়াবহ, আরও মর্মান্তিক। তিতাস নদীর দুই তীর ঘেঁষে চর পড়েছে, একটিমাত্র জলের রেখা বহমান, তাতে নৌকা চলে না। মাছ ধরাতো দূরের কথা। পেটের দায়ে তবুও মালোরা মাছধরা ছাড়েনি। তবে মাছধরার স্থান বদলেছে। মালোদের সুঠাম শারীরিক কাঠামোতে অভাবের করালগ্রাসের স্পর্শ লেগেছে। মালোদের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ধ্বসে পড়েছে।

এই উপন্যাসে খরা-দারিদ্রে জর্জরিত মালোদের জীবনচিত্রই যে শুধু আছে- এমন নয়; দারিদ্র-ক্লান্ত, অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত মালোদের পাশাপাশি সচ্ছল সংগতি-সম্পন্ন মালোদের কথা উপস্থিত করেছেন ঔপন্যাসিক। বিজয় নদীর তীরলগ্ন অভাবী মালোদের জীবনচিত্রের পাশে নয়ানপুরের সচ্ছল বোধাই মালোর কথা লিখেছেন অদ্বৈত-

'নয়ানপুরের বোধাই মালো টাকায় সব মালোদের চেয়ে বড়। বাড়িতে চার পাঁচটা ঢেউটিনের ঘর। দুই ছেলে রোজগারী লোক।'[২৩]

শুকদেবপুরের মালোরা মাছধরা জীবিকার সঙ্গে চাষাবাদকে বেছে নিয়েছে উপজীবিকা হিসেবে। তাদের ঘরে তাই জালের সঙ্গে হাল আছে। জীবিকার সঙ্গে উপজীবিকার সহাবস্থানের ফলে শুকদেবপুরের মালোদের জীবনে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু গোকর্ণঘাটের মালোদের কারও ক্ষেত-খামার নেই; তাদের আছে মৎস্যপূর্ণ তিতাসনদী।

তিতাসে চর জাগার পর মালোরা তা দাবি করেছিল। এ চর তাদের। কারণ তিতাস তো তাদেরই ছিল। মাছ ধরা মালোদের প্রধান বৃত্তি হলেও চাষ তাদের অজানা নয়। শুকদেবপুরে কিশোর লক্ষ্য করেছিল এখানে মালোরা জাল ও হাল দুইই ব্যবহার করে। নদী শুকিয়ে গেলেও তারা শুকিয়ে মরবে না। গোকর্ণঘাটের মালোদের নেতা রামপ্রসাদ মনে করে চর হয়তো তিতাসের বিকল্প জীবিকার উৎস হতে পারে। কিন্তু চাষিরা লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রামপ্রসাদ ও কয়েকজন মালো চর দখল করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। এ প্রসঙ্গে কায়সার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে হালিক ও জালিক কৈবর্তরা, হেলে, চাষি ও জেলের বাংলার প্রাচীনতম জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই যুদ্ধ বিভাজন ও সংঘর্ষের প্রমাণ। যাইহোক, এই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে কোনোপক্ষই জয়ী হল না। শেষ পর্যন্ত চর দখল করল তারাই যাদের অনেক জমি আছে, আছে অর্থের জোর ও লাঠির জোর। বন্দে আলি আর করম আলির মত দরিদ্র কৃষক বা ক্ষেত মজুররা হল বঞ্চিত।

তিতাস তীরের মালোসমাজে কালোর মা, মঙ্গলার বউ, সুবলের মায়ের মতো অনেক চরিত্র আছে, কিন্তু বাসন্তীর মতো দ্বিতীয়টি নেই। এই চরিত্রটির প্রাণলক্ষণ নিহিত আছে অপরিচিতকে চেনার মধ্যে, বাস্তবকে স্বীকারের মধ্যে, প্রতিকূলতাকে জয়ের মধ্যে, ব্যক্তি ও সমাজ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে। বাসন্তীর ভেতরে একজন শাশ্বত বাঙালি নারীর উপস্থিতি আমাদেরকে সচেতন করে তোলে। নবাগত অনন্ত ও অনন্তর মাকে সে শুধু শুকনো ভালোবাসায় স্বীকৃতি জানায়নি। অসহনীয় দারিদ্র, সমাজের শাসন এবং শত বাধাকে অবহেলা করে তাদেরকে বুক দিয়ে রক্ষা করেছে। তার ভালোবাসা শুধু অনন্ত ও অনন্তর মায়ের জন্য নয়, অন্যদের মধ্যেও সে তার ভালোবাসাকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

মালোপাড়ায় যাত্রার অনুপ্রবেশের ফলে শুধু পুরুষরা বিগড়ে গেল না, নারীরাও বিলাসিতায় মগ্ন হল। মালোদের এইরূপ বিপন্ন অবস্থা শুধু পালদের কারসাজিতে সম্পন্ন হয়নি, বরং কিছু কিছু পর-ধন লোভে মত্ত মালোদের সহায়তায় সম্পূর্ণ হয়েছে। আর মালোজীবনের এই অসহনীয় অথচ বিশ্বস্ত চিত্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে এঁকেছেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ এক বিপুল ভালোবাসা দিয়ে মালো জনজীবনের সীমাহীন দুঃখ ও বুকভরা আর্তিকে সাজিয়েছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসকে যতই 'নদীর পাঁচালি' বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে লেখকের ঈর্ষণীয় নৈপুণ্যে এটি হয়ে উঠেছে- মালোজীবনের মহাকাব্য।

'গঙ্গা' (১৯৫৭) লেখার পশ্চাতে সমরেশ বসুর বাস্তবতাবোধের প্রেক্ষাপটটি এখানে আলোচনাযোগ্য। বারাকপুর মহকুমার শিল্পাঞ্চল, হাজিনগর-গৌরিপুর-নৈহাটি-কাঁকিনগর-জগদ্দল-গাড়ুলিয়া এবং এগুলোর সমান্তরালে পূর্বদিকের গ্রামসমূহ নিয়ে একটি বিশিষ্ট সামাজিক কাঠামো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চলটিতে শিল্পায়নের বিকাশ ঘটে। দেশীয় জমিদাররা গঙ্গাতীরের জেলে-মালোদের উৎখাত করে পুঁজিপতিদের হাতে জমি তুলে দেয়। গঙ্গার ধারে ধারে বড় বড় শিল্পকারখানা-সংলগ্ন হয়ে বিলিতি ঢঙে স্বাছন্দ্যময় কোয়ার্টার্স গড়ে ওঠে। ফলে অনিবার্যভাবে গ্রামীণ কাঠামো ভাঙতে থাকে। সৃষ্টি হয় মজুর-মিস্ত্রি শ্রেণির। সর্দাররা বিহার-উত্তর প্রদেশ থেকে দেহাতি মানুষ এনে কুলিলাইনে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এই সময়সীমার মধ্যে পূর্বপাকিস্তানত্যাগী উদ্বাস্তুরা এ অঞ্চলে ভিড় করে। কালক্রমে ঐ অঞ্চলে শিল্পনির্ভর এক জনবসতি তৈরি হয়ে যায়। এ অঞ্চলে সমরেশের বাসভূমি ছিল বলে তাঁর চোখের সামনেই সমাজের এ ভাঙা-গড়া চলে। এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলোতে। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলোর মধ্যে বিষয় ও ভাষাগুণে 'গঙ্গা' উজ্জ্বলতম। আতপুরে বসবাসকালে সমরেশের সঙ্গে গঙ্গার নিকটবর্তী মৎস্যজীবীদের পরিচয় ঘটে। এবং এই পরিচয়ের সূত্রেই তিনি তাঁর ভেতর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) লেখার তাগিদ অনুভব করেন। 'গঙ্গা' (১৯৫৭) উপন্যাসের ভূমিকায় সমরেশ বসু লেখেন যে, আতপুর ও হালিশহরের মৎস্যজীবীদের সহযোগিতা না পেলে এই উপন্যাস লেখা সম্ভব হতো না। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস ও হালিশহরের নিমাই অধিকারী, তার বড় ভাই ও পিতার কাছে ঋণস্বীকার

করেছেন। ‘গঙ্গা’ (১৯৫৭) লেখার আগে এঁদের সঙ্গে সমরেশ বসু অনেক দিন ও রাত গঙ্গাবক্ষে কাটিয়েছেন।

‘গঙ্গা’ (১৯৫৭) উপন্যাস নদী থেকে সমুদ্রে যাবার আখ্যান। পৃথিবীর আদিম এক শিকারী সমাজকে নিয়ে তিনি ‘গঙ্গা’ উপন্যাসটি লিখলেন। যাদের জীবনের সামান্য অংশ ডাঙায় কাটে, অধিকাংশ কাটে জলে, তাদের জীবন ও সমাজব্যবস্থাকে লেখক এই উপন্যাসে চিত্রিত করলেন। মালোদের বেঁচে থাকার অবলম্বন ও মরে যাওয়ার পটভূমি হিসেবে গঙ্গানদী এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। নদী ও নদীনির্ভর মানুষদের বিষয়ে প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেই সমরেশ বসু ‘গঙ্গা’ (১৯৫৭) লিখতে বসেছেন। শুভঙ্কর ঘোষ লিখেছেন-

> ‘সমরেশ বসু ‘গঙ্গা’য় মাছমারাদের বাঁচার লড়াই চিত্রিত করেছেন। তারও আগে, এ উপন্যাস লেখার আগে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মাছমারাদের সঙ্গে গঙ্গায় ঘুরে বেরিয়েছেন। এটি কেবল জীবনচিত্রণ নয়, জীবনবোধের কথাশিল্প।’[২৪]

গঙ্গায় থাকে জলের শস্য মাছ, মাছ জেলেদের জীবনের ফসলও। এই গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই মালোদের দিবারাত্রির বারোমাস্যা রচিত হয়েছে। নিয়তির মতো নিষ্ঠুর উদাসীন গঙ্গানদীর সঙ্গে তাদের পুরুষানুক্রমিক দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে নিবিড়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আনন্দ বাগচীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য-

> ‘খণ্ড দৃষ্টিতে যে জীবন মনে হয় শুধুই জলের পাঁচালী, লৌকিক মহাকাব্য চাপা পড়ে আছে তারই তলায়। সমরেশের চোখে সেটা এড়ায়নি। বহুবার ছুঁয়ে ছেনে দেখার মতই এই নদী আর তার নাব্যজীবন তাঁর জানা ছিল। এই মাছমারাদের হালেজালে হাত রেখে তিনি তাঁদের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করেছেন, যেন মুখোমুখি বসে একই বিড়ির আগুনে গল্প ধরিয়েছেন। এই অন্তরঙ্গতাই যুগিয়েছে ‘গঙ্গা’ উপন্যাসের উপকরণ, তার চাল-চরিত্র এবং চালচিত্র। গাবে মজানো জালের মতই গল্পের রসে আঁচিয়ে এর ক্যানভাসটা ছড়িয়ে পেতেছিলেন সমরেশ, জলস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছিল এর ভাটিয়ালী কাহিনী, বর্ণবহুল ঘটনায় ছলাৎ ছলাৎ দাঁড় টানার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল থেকে থেকে।’[২৫]

বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মাছমারা গঙ্গায় এসে ভিড় করেছে। কারণ, গঙ্গার সঙ্গেই তাদের টিকে-থাকার সম্পর্ক। মাছমারাদের ভাত-কাপড় বাঁধা আছে গঙ্গার কাছে। গঙ্গাও তার বুকে সবাইকে ঠাঁই দিয়েছে। মাছের মরসুমে ওপার অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তান থেকেও জেলেরা এসেছে। মালোদের অস্তিত্বের ব্যাপারটি নদীর কাছে সমর্পিত। গঙ্গাই তাদের জীবনের পরিপূরক। গঙ্গার মতো সরকার ও সুদখোর মহাজনের কাছেও মালোজীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

মালোদের জালে মাছ পড়লেও বিপদ, না পড়লেও দারিদ্রের কষাঘাত। মহাজন-আড়তদার থেকে শুরু করে ছোট পাইকার-ফড়েনিরাও 'গঙ্গা'য় জেলেদেরকে নানাভাবে প্রতারিত করেছে। দামিনী নিবারণের প্রতি কিংবা হিমি বিলাসের প্রতি যে দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়েছে, তাতে ফড়েনির স্বভাবজাত প্রকৃতি অপেক্ষা প্রেমের টানই বেশি কাজ করেছে।

শাঙনে টোটায় ছারখার হয়ে গেছে মালোজীবন। পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ের মালোপাড়ায় মরণ তার ভয়ানক সংহার মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অভাবের তাড়নায় বাপ-ছেলে মারামারি করছে। স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। এই সময় পশ্চিমপাড়ের জেলেরা বাঁধাছাঁদি জাল পেতেছে গঙ্গায়। বাঁধাছাঁদি জালের বিশাল বেড়-গঙ্গার এপাড় থেকে ওপাড় পর্যন্ত। ফলে অন্যান্য জেলেদের জালে মাছ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। পূর্বপাড়ের জেলেরা বিলাসের নেতৃত্বে এর প্রতিবাদ জানাল এবং এই প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত রক্তাক্ত মারামারিতে রূপান্তরিত হল।

জেলেরা সারাটা জীবন অন্নসংস্থানের পেছনে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে। পরিবার-পরিজনের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেবার জন্য এরা জীবনবাজি রেখে গঙ্গায় যায়, যায় শ্বাপদসংকুল বাদা অতিক্রম করে দুস্তর সমুদ্রে। সমুদ্রে অবস্থানকালে পরিবারবর্গ ঠিকমতো খেতে পেল কিনা- এ নিয়ে তারা দুশ্চিন্তা করে; আর নিজেদের অধিক খাওয়া নিয়ে হাহাকার করে। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলে কৈবর্তদের খাওয়ার পরিমাণও অধিক। দুজনে এক বেলায় পাঁচপো চাল অবলীলায় গলাধঃকরণ করে। মোটা চালের ভাত ও সাধারণ মানের মাছই তাদের প্রধান খাদ্য। খাদ্য তালিকায় যদি পিঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা বা গোল আলু যুক্ত হয়, তবে তাদের তৃপ্তির সীমা থাকে না।

নিবারণের বাবার গায়ের রং ছিল কালো। নিবারণের বাবার বাবারও চেহারা ছিল এমনি। আর নিবারণের চেহারার মধ্যে মালো জনগোষ্ঠীর আদিম শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট হয়ে আছে। সমরেশ বসু নিবারণের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে তার কালো

কুচকুচে রং, পেটানো শরীর। নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিমকাঠের কালো রং মাখা চকচকে মূর্তি মনে হয়। মনে হয় কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। ভেড়ার লোমের মতো কালো কোঁচকানো চুল। চুল দেখে মনে হয় যেন জাতসাপের ডিম ফোটা শালুই কিলবিল করছে মাথায়। হাসতে গেলে চোখ ঢেকে যায়। দেখে মনে হয় চোখ নেই, নাক নেই, খালি এক মুখ হাসি। ধলতিতার প্রাচীন ব্যক্তি রাম মালো। বাদার মালোদের প্রথম পুরুষের গায়ের রঙও ছিল কালো কুচকুচে। এই প্রথম পুরুষেরই গায়ের রং ধারণ করে আছে পরবর্তীকালের মালোরা। প্রথম পুরুষের দ্রোহী মনোভাব বর্তমান মালোদের রক্তেও বইছে।

জেলেদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বিচিত্র ধরনের। ভবিষ্য-জীবনের দুরবস্থা নিয়ে তারা চিন্তিত হয়, কিন্তু সেই দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য কোনোরূপ দূরদর্শিতামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। হাতে পয়সা এলে ফুর্তি করে তা উড়িয়ে দেয়, ঘরে চাল না থাকলে উপোস দেয়। তবে 'গঙ্গা'র সব জেলে এরকম নয়। কেউ কেউ নতুন জাল কেনে, কেউ মহাজনের কাছে বাঁধাপড়া জাল-নৌকা ছাড়িয়ে নেয়। যারা একাধারে হালিক ও জালিক কৈবর্ত, তারা ফড়ে-ব্যাপারীদের কাছ থেকে দাদন নেয় না। কখনো ঋণ করলে সারা বছরের ফসলে তা শোধ করে দেয়। যাদের জমি নেই তারা এক টুকরো জমির স্বপ্ন দেখে।

জলজীবী মানুষের জীবনে 'বাচখেলা' নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। নদীতে বাছাড়ি নৌকার প্রতিযোগিতাকে জেলেরা বলে বাচখেলা। এই খেলা নদীনির্ভরজীবনে একটি বিশিষ্ট আনন্দানুষ্ঠান। প্রতিবছর জেলেদের মধ্যে সাড়ম্বরে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। নানা গাঁয়ের কৈবর্তরা তাদের সেরা নৌকাটি নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। রূদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় টানটান হয়ে অসংখ্য মানুষ নদীর দুইপাড়ে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখা যায় যে অর্জুন মাঝিকে হারিয়ে নিবারণ ও পরে তার ছেলে বিলাস এই বাচখেলায় প্রথম হয়েছে। এই খেলার ফলাফল নিয়ে মালোদের মধ্যে হিংসা ও আক্রোশের সৃষ্টিও হয়। 'গঙ্গা'য় উপস্থাপিত জেলেদের জীবন দারিদ্রে ভরা। তাদের জীবনের সিংহভাগ জুড়ে আছে কষ্ট-লাঞ্ছনা, শোষণ-তিরস্কার। তবুও দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্রের ভেতরও মাঝেমধ্যে জেলেদের জীবনে উৎসবের ছোঁয়া লাগে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে জেলেদের নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

জেলেদের জীবিকা ও জীবনবিশ্বাসের মধ্যে বারে বারে মৃত্যুবোধ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথমদিকে পাঁচুর স্মৃতি-চিন্তার অনুষঙ্গে নিবারণ মালোর মৃত্যুরহস্য গোটা

পটভূমিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তারপর নদীদূষণের প্রতিকূলতায় পাঁচুর মৃত্যু, মাছধরার নিরন্তর সংগ্রামে ঠাণ্ডারামের মৃত্যু, আকালের দুর্দিনে হাবরে মাছ চুরি করতে গিয়ে অভয় মালোর মৃত্যু প্রভৃতি মৃত্যুঘটনা জেলেজীবনের চূড়ান্ত সংকটের দিকটাকেই উন্মোচিত করেছে। নদীতে-সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতিপদে মৃত্যুভয় আছে জেনেও কৈবর্তরা বৃত্তিবদল করেনি, নদীকে ত্যাগ করেনি। কারণ, মরণের ভয় মাছমারার নেই। মরণ ও মারণ, তার প্রত্যক্ষ জীবনের পথ। এই জীবনবোধের নিরিখে মালো জনজীবন স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত হয়ে 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৮০) ছোটমাপের একটি উপন্যাস। সুন্দরবন অঞ্চলের মালোদের জীবনকাহিনি এই উপন্যাসে সংহত ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এটি নিম্নবিত্ত প্রান্তিক সমাজের বাস্তব সংকটের ইতিকথা। মহাজনের কাছ থেকে দাদন-নেয়া গরিব মালোরা তাদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। ঋণ দেওয়ার অজুহাতে খটিদাররা তাদের ধৃত জলশস্য জলের দরে নিয়ে নেয়। খটিদারদের মোকামে মুদ্রার সুমধুর আওয়াজ ওঠে। জেলেদের ভাড়ার থাকে শূন্য। বাদা অঞ্চলে একটি সমবায় সংস্থা গড়ে তুলেছেন ডাক্তার ভূপতি বর্মণ। কিন্তু তাঁর বিরোধীশক্তি বড় প্রবল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ছত্রছায়ায় আবদুল, ঈশ্বর মণ্ডলের মতো দাদনকারীরা মালোদের রক্ত চুষে নেয়। তাদের নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে যাবার সামর্থ্য ও সাহস মালোদের নেই। কো-অপারেটিভ ও মহজনদের সংঘাতের মাঝখানে পড়ে জেলেরা দিশেহারা হয়। শেষপর্যন্ত ঋণদানকারী খটিদারদের পায়ের তলায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় তারা।

এই উপন্যাসের পটভূমিতে আছে নকশাল-আন্দোলন। নকশাল-আন্দোলনের ঢেউ মালোপাড়ার শ্রীপদর অন্তরে পরিবর্তনের স্পন্দন জাগাতে সক্ষম হলেও শেষপর্যন্ত শোষণকারীদেরই জয় দেখানো হয়েছে 'গহিন গাঙে' (১৯৮০)। তবে তাদের এ জয় সাময়িক। দীর্ঘস্থায়ী একটা যুদ্ধের ইঙ্গিত আছে এই উপন্যাসে। সে-যুদ্ধ শোষকের বিরূদ্ধে শোষিতের, বিত্তবানদের বিরূদ্ধে বিত্তহীনদের। মালো সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বঞ্চনার রূঢ় ইতিহাস নির্মাণ করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ক্ষীণকায় অথচ বাস্তবতালগ্ন 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে।

গাঙের বাতাসে নৌকা খবর নিয়ে ফিরছে এরকম নাটকীয় বাক্য দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। অল্পকিছুক্ষণ পরেই ভেড়ির ওপর কোলাহলের মধ্যে নৌকাটির বয়ে-আনা খবরটি

জানা গেল। খবরটি একটি অনভিপ্রেত মৃত্যুসংবাদ। সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে শ্রীপদর বাবা ললিতকে বাঘে খেয়েছে। লেখক উপন্যাসের শুরুতেই মালোজীবনের একটি রুক্ষ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। আর সে বাস্তবতা হল- জেলেদের জীবন অনিশ্চিত।

মালোজীবন নদীনির্ভর। নদী অরণ্যঘেরা। অরণ্য শ্বাপদসংকুল। বেতনানদী-তীরস্থ মালোদের অধিকাংশই এই অরণ্যঘেরা বাদা অঞ্চলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘ-কুমিরের শিকারে পরিণত হয়েছে। ফলে পাড়ার অধিকাংশ জেলেনি বিধবা। ললিতের স্ত্রী ননীবালার মতো ভাবিও দিন পনেরো আগে বিধবা হয়েছে। মালোপাড়ার বা বিধবাপল্লীর বিবরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> 'মালোপাড়ার অন্য নাম বিধবাপল্লী। মালোদের মধ্যে এমন কোনও পরিবার নেই, যাদের কোনও বউয়ের দেহে কালো পাড়ের থান ওঠেনি, শোকের শেল তোলেনি হাহাকার। এমন কোনও কুটির নেই যার বড়ো ছেলে অশৌচ পোশাকে খটিদার, মহজনদের পায়ের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টার বদলে দু-দশ টাকার সাহায্য পেয়ে সুদের গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েনি।'[২৬]

'গহিন গাঙে' (১৯৮০) মালোসমাজের প্রবল প্রতিপক্ষ প্রকৃতি নয়, মানুষ; সুদখোর দাদনকারী খটিদার মহাজন। এদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয় মালোদের সকলপ্রকার আশা-অভীপ্সা। এদের অঙ্গুলি সংকেতে মালোদের জীবনে ঝড় ওঠে, এদের ষড়যন্ত্রে নিরপরাধ মালো খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। মালোপাড়া থেকে গাঙপথে দশমিনিটের দূরত্বে খটি অর্থাৎ মাছের আড়ত গড়ে উঠেছে।

খটিদার মালোদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক। খটিদার তথা সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এরা নৌকা-জাল কেনে। গৃহীত টাকা বছর বছর সুদাসলে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। ফলে মালোরা এই ঋণের জাল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে না কখনো। আবদুল এই অঞ্চলের খটিদার, দাদনকারীও। সে ঈশ্বরের মতো ক্ষমতা রাখে, এখানকার মালোদের জীবনে নিয়তির ভূমিকা পালন করে সে। সুদখোর ঈশ্বর মণ্ডলরা আবদুলের সহযোগী। খটিদার আবদুল ছাড়া মাছ কেনার আর কেউ নেই এই অঞ্চলে। ফলে তার মর্জির ওপরই মালোদের ধৃত মাছগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মালোরা হাতে-পায়ে ধরে মাছগুলো কিনতে রাজি করায় আবদুলকে। এই বাদা অঞ্চলে মালোজীবন নিতান্ত অসহায় ও বিধ্বস্ত।

ভূপতি বর্মণ নামে একজন এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার মালোদের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাবার জন্য এই বাদা অঞ্চলে কো-অপারেটিভ গড়ে তুলেছেন। তিনি জাতে মালো। মালোদের কাছ থেকে সঠিক দামে ও সঠিক ওজনে মাছ কেনার জন্য তিনি কো-অপারেটিভ গঠন করেছেন। কিন্তু মালোরা এলাকার সবচেয়ে নিপীড়িত অথচ সবচেয়ে সুযোগসন্ধানী। কো-অপারেটিভের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধায় অনেকেই এসেছিল, লাভের পরিমাণ সমবন্টনে শেষে পিছপা হয়েছে।

মালোপাড়া এখন তার হাতের মুঠোয়। সে ইচ্ছে করলে এক চাপে সমস্ত মালোপাড়াকে গুড়িয়ে দিতে পারে। এরকম অবস্থায় শ্রীপদর উত্থানকে সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। শ্রীপদর আত্মবিশ্বাসী আচরণ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথাবার্তা আবদুলের মনে জ্বালা ধরায়। বাপ ললিতের মৃত্যুর পরে শ্রীপদ ঠিক করে খাড়িতে আর মাছ ধরতে যাবে না, বেতনায় ধৃত মাছ আবদুলের কাছে বিক্রি না করে কো-অপারেটিভে বিক্রি করবে। শ্রীপদর এই সিদ্ধান্ত আবদুলকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। এখানকার খটিদাররা ক্রোধে নির্মম ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আবদুল শ্রীপদকে শায়েস্তা করবার জন্য হিংস্র হয়ে ওঠে। সে বিদ্রোহী শ্রীপদর কো-অপারেটিভে প্রেরিত মাছ মধুর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। শ্রীপদর ভাই লগাইকে দিয়ে তাদের ফসলি জমি আত্মসাতের পাঁয়তারা করেছে। ক্যানিং-এর চাকরির টোপ দিয়ে লগাইকে দিয়ে শ্রীপদর বিরুদ্ধে থানায় পিতৃহত্যার ডায়েরি করিয়েছে। দাদনের দোহাই দিয়ে শ্রীপদর কাছ থেকে নৌকা-জাল কেড়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছে। পারিবারিক উৎসবের দিনে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি বাঁধিয়ে দিয়ে সমস্ত আনন্দকে মাটি করিয়েছে। এতে মালোপাড়ার ‘নতুন যোবক’ শ্রীপদ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে। আবদুলের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় সে এবং শেষপর্যন্ত আর্তস্বরে উচ্চারণ করে যে সে জঙ্গলে যাবে।

ডাক্তার ভূপতি বর্মণের প্রণোদনায় হোক বা আদর্শবাদী নকশালপন্থী যুবকদের সংস্পর্শে, শ্রীপদর মধ্যে একটা অধিকারবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার মনে প্রতিবাদ দানা বেঁধেছিল। আপাত অসহায়তার মধ্যে সে নিশ্চুপ থাকলেও উপন্যাসের শেষে বাদায় যাত্রাকালে ডাক্তারের উদ্দেশে প্রবলপ্রতাপী, ইঙ্গিতবাহী বাক্যটি উচ্চারণ করেছে যে সে এক মামলা মাথায় নিয়ে যাচ্ছে আর ফিরে এলে আবার অন্য মামলা।

একান্ত বাস্তববাদী বলে শ্রীপদ আবহমানকাল থেকে মালোসমাজে প্রচলিত লোকাচার বা ধর্মীয় সংস্কার পালনে অনিহা প্রকাশ করেছে। জঙ্গলে কোনো নিকট আত্মীয় বাঘের পেটে

গেলে তার কুশপুত্তলি পোড়াবার রীতি আছে মালোদের মধ্যে। শ্রীপদ প্রথমে কুশপুত্তলি পোড়াতে রাজি না হলেও শেষপর্যন্ত কুশপুত্তলি পোড়ায়। তবে তা তার বাবার নয়, নিজের; মৃত্যুর আগে নিজের কুশপুত্তলি পুড়িয়ে সে নবাগত সন্তানটিকে দেনার দায় থেকে মুক্তি দেয়।

মালোরা গরিবের মধ্যে আরো বেশি গরিব। এই দীনতার ছাপ শুধু আহার্যবস্তুতে নয়, পোশাকেও জীর্ণতার প্রকট উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অপঘাতে ললিতের মৃত্যুর পর মধু, হারান ও শ্রীপদ নৌকা নিয়ে বেতনা নদী বেয়ে বাড়ি ফিরছে। ছইয়ের ভেতরে পিতৃহারা অবসন্ন শ্রীপদ বসে আছে। মধু আর হারান দাঁড় টানছে। এই মধু-হারানের পরনে কাপড় নেই বললেই চলে। লেখক এই মালোদের পোশাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে তাদের পরনে ছেঁড়া নেকড়া, খালি গা।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মালোদের জালের সঙ্গে ঘর-গেরস্থি। জীবনের প্রথম থেকেই গভীর জলের তলদেশ থেকে শিকার তুলে এনে পরিবারের মুখে অন্ন যোগায় মালোরা। বেঁচে থাকার জন্য মৎস্যশিকারের কৌশলটা জন্ম থেকেই শিখতে হয় তাদের। জীবিকার সন্ধানে নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়ায় তারা। গাঙে মাছ ফুরিয়ে গেলে নতুন জায়গায় মালোরা তাদের আস্তানা গড়ে তোলে। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় বেতনা তীরস্থ মালোদের এই জীবনসংগ্রামের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন-

> 'এখানেও দিনে-দিনে মাছ যত অপ্রতুল হয়ে উঠছে, বাড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিন-জালে এই বেতনা হাঁসফাঁস করে। তখন আশঙ্কায় মালোরা ছুটে চলে গাঙ বেয়ে আরও দক্ষিণে, ওই মোহনার খাড়ি, জঙ্গলের দিকে। জীবনের মায়া-মমতা, মৃত্যুর আশঙ্কা করার সময় পায় না। চোখগুলো স্থির, নোনাজলের বুক বেয়ে শিকারির মতো নেমে যায় খাড়িতে, অরণ্যের কোলে।'[২৭]

এই অরণ্যের কোলে ও খাড়িতে বাঘ-কুমিরের আস্তানা। এদেরকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ মৃত্যুকে অবহেলা করে মালোরা বাদা অঞ্চলের খড়িতে মাছ ধরতে যায়। অধিকাংশ মালোদের অপমৃত্যু ঘটে এই হিংস্র প্রাণীর হাতে। স্বামীদের মাছ ধরতে পাঠিয়ে জেলেনারীরা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। কারণ, তারা জানে- তাদের স্বামী-পুত্রের জীবন একেবারেই অনিশ্চিত।

বউয়ের কোনোরূপ অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হলে মালোসমাজে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। কড়ির বন্ধ্যাত্বের দোহাই দিয়ে ননীবালা শ্রীপদকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করাতে মনস্থির করে। যদিও শেষপর্যন্ত শ্রীপদর দৃঢ়তার কাছে ননীবালার সংকল্প পরাজিত হয়। মালোদের বউ-শাশুড়ির সম্পর্কের চালচিত্র সাধন চট্টোপাধ্যায় 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এছাড়া মালোদের আধিদৈবিক শক্তিবিশ্বাস, নানা উৎসব অনুষ্ঠান, তাদের ধর্ম ইত্যাদি এই উপন্যাসে লেখক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

'গহিন গাঙ' (১৯৮০) উপন্যাসটির শেষে কোনো আশাবাদের ইঙ্গিত নেই। শ্রীপদর মধ্যে যে সংগ্রামী মানসিকতা ছিল তাকেই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন মাত্র। মূলত সাধন চট্টোপাধ্যায় মালো জনজীবনের স্বপ্ন ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে।

বলরাম রায়ের লেখা 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৮৭) উপন্যাসে জম্বুদ্বীপ হল শুঁটকী মাছের বিরাট ঘাঁটি। এই শুঁটকী মাছ শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের বাজার ছেয়ে আছে তা নয়, সারা বিশ্বের বাজারে এর চাহিদা ভীষণ এবং এ থেকে বেশ মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্য সরকারের হাতে এসে থাকে। একদিকে আছে জল পুলিশ অন্যদিকে আছে মহাজন। মহাজনেরা টাকা ছাড়াও নৌকা থেকে শুরু করে সমুদ্রে ফেলা জাল, অস্থায়ী ঘর বাঁধার জন্য বাঁশ, দড়ি এমন কি উদর পূরণের জন্য চাল, ডাল, লবণ, পানীয় জল পর্যন্ত দিয়ে থাকে। শুধুমাত্র মহাজনের সিঁদুর মাখানো মোটা খাতার পাতায় একটা করে বুড়ো আঙুলের ছাপ দেওয়ার অপেক্ষা। তাতেই গত বছরের বাকি বকেয়া সমেত নতুন বছরের নির্ভুল হিসাব একেবারে সুদসমেত কষলেই মহাজনেরা খুব খুশি। তারপর ঝোড়া ভর্তি করে মহজন আড়তদারদের ঘরে পাঠিয়ে দিলে জেলেদের ওজন পর্যন্ত করতে হয় না। ওজনের কারসাজিটা জেলেরা জানে না, বরং ভালো জানে মহাজনের বেতনভোগী কর্মচারীরা।

জম্বুদ্বীপের অর্ধেকটা আছে গভীর অরণ্যে ঢাকা। সেই অরণ্যে বন্য শূকর আর বিষধর কেউটের অবাধ রাজত্ব। বাকী অর্ধেকটা সাদা বালিতে ঢাকা। ঠিক মরুর মত। সেই মরুপ্রান্তরে হাজার হাজার জেলেদের অস্থায়ী বসবাস। পাঁচ-পাঁচটা মাস দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে রিক্ত টেঁকে একরকম উলঙ্গ হয়েই বাড়িতে ফিরে আসে। আর ফেরার পরের দিনই ধার করে সংসার সাজায়। সভ্য সমাজের মহাজনেরা এই নিম্নস্তরের কপর্দকশূন্য জেলে

সম্প্রদায়ের কতখানি স্বীকৃতি দেয় বা তাদের আদৌ সমাজসেবী বলে স্বীকার করে কিনা সেটাই এখন ভাবার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ' (১৯৯৫) উপন্যাসে মৎস্যজীবী এলাকার মৎস্যবন্দর শংকরপুরের লাগোয়া ক্ষীরপাল গ্রামে ঔপন্যাসিক সন্তোষ করের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাঁর গ্রাম থেকে তিন-চার মাইল পূর্বে জলাধার মোহনা। সেখানকার মৎস্যজীবীরা কীভাবে জীবনকে বাজি রেখে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। গতানুগতিক শিক্ষা থেকে দূরে থেকে সমুদ্রের ভাষায় শিক্ষিত হয়ে কীভাবে আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি নির্ণয় এবং কীভাবে মাছ ধরতে পারে। তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা, লৌকিক বিশ্বাস ও আঞ্চলিক ভাষার মোড়কে টানটান কাহিনি নিয়ে সন্তোষ করের উপন্যাস 'মুক্তামাছ'।

এই উপন্যাসে বেড়াখানা জেলেপাড়ার কথা বলা হয়েছে। সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে জেলেপাড়ার দিন-রাত্রি সম্পর্ক ততটা নেই যতটা রয়েছে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সঙ্গে। রাত দুপুরে জোয়ার এলে জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে বিছানা ছাড়ার তাগিদ শুরু হয়ে যায়। হাঁক- ডাক করে একঘর অন্যঘরকে জাগিয়ে তোলে। শক্তসমর্থ জেলেরা দল বেঁধে জাল দেয়, নৌকা বায়, মাছ ধরে। জোয়ারের প্রথম জলে ছোট-বড় ঢেউ এর মতো কূলে আছড়ে পড়ে মাছ। তখনি সময় বুঝে, জল চিনে জাল ফেলতে হবে। জোয়ারে যতই জল ফুলবে তেবাঁকি খালে ততই জল উপচাতে থাকবে। জেলেদের শিরায় শিরায় উৎসাহ ততই বাড়বে। জেলেদের চোখ স্বপ্ন, সফলতা, স্বচ্ছল ঘরকন্না, সুখময় ভবিষ্যতের আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরপর ভাটার সময় জেলেদের রক্ত নরম হয়ে যায়। দাঁড় শিথিল হয়ে যায়। সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে জেলেরা বাড়ি ফেরে। কেউ কেউ খেয়ে দেয়ে মাছ বিক্রি করতে বেরোবে। আবার কেউ কেউ আগে থেকে মাছ মাপিয়ে দিয়েছে ব্যাপারীকে। আবার পরবর্তী জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করে। এইভাবে জেলেদের দিনরাত্রি অতিবাহিত হয়।

জেলেদের বউ-ঝিদের কথা আলাদা। রাতের জোয়ার তাদের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে পুরুষ মনিসরা চলে গেলে রাতে তারা আবার ঘুমায়। বয়স্ক জেলেরা জাল বোনে। ছোটরা মাছ ধরতে যায় তেবাঁকি খালে। গরু চরাতে যাওয়ার সময় একটা ছানিজাল নিয়ে যায় হাতে করে। গরু চরানোর ফাঁকে ফাঁকে মাছ ধরে। মাছ ধরা শিখবে।

জেলেপাড়ায় সুবলের আহ্লাদি ঠাকুমার দৃষ্টি ছিল সাবেকি। তার মতে জেলের ছেলে জেলে হবে। বড় হয়ে জাল টানতে বা দাঁড় বাইতে যাবে। বৃষ্টিতে ভিজবে, রোদে পুড়বে, জল চিনবে, আকাশ চিনবে, জোয়ার ভাটার মর্ম বুঝবে। ছেলেবেলা থেকেই এই মহড়া দিয়ে রাখতে হবে। ঘরের বাইরে তাকে ঠেলে পাঠাতে হবে কারণ ঘরে থাকলে উপযুক্ত পুরুষ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না এবং বড় হলে অকর্মা হবে।

জেলেপাড়ার ছোট ছেলেরা সকাল থেকে ছড়িয়ে পড়ে তেবাঁকি খাল আড়িতে, বনের ঝোপ-জঙ্গলে। চড়ুই পাখির মতো সারাদিন চরে। জলে ডোবে, জলকাদা মাখে। সন্ধ্যেবেলা ঘর খুঁজে ঠিক ফিরে আসে। তারা কখনো হারিয়ে যায় না বা জলে ডুবে মরে যায় না।

'যে মরে সে জেলের বাচ্চা নয়। বামুন-কায়েতের বাচ্চা হিলে হিতে পারে।'[২৮]

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো প্রকার মাথা ঘামানো বেড়াখানার জেলেপাড়ার রীতি বিরূদ্ধ। জেলের লক্ষ্মী জালে। জেলের ছেলে বড় হয়ে জালে যাবে- এটাই এখানকার সকলের ছক-কাটা হিসেব। এর বাইরে কেউ কখনো ভাবতে পারে না। ভাবতে চায় না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর চিন্তা তো অনেক দূর।

জেলেপাড়ায় কোনো পাঠশালা নেই। হাতেখড়ি অনুষ্ঠান এখানে কারোর হয়নি কোনো কালে। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম জালে যাওয়ার দিনে মা মঙ্গলাকে ভালোরকম পুজো দেওয়ার প্রথা আছে। সেদিন ছেলেকে দু-এক ঘন্টা উপবাসী থেকে মা-মঙ্গলার সিঁদুর নিতে হয়। প্রসাদ পেতে হয়।

এভাবে আনুষ্ঠানিক জালে যাওয়ার আগে তার শিক্ষানবিসিটা অবশ্যই তে-বাঁকি খালের জল-কাদায় হয়। সেখানে সে জোয়ারভাটার তফাত বুঝতে শেখে। স্রোতের ধার, জলের রং, মাছের চরিত্র অনুযায়ী জাল দিতে শেখে কিছুটা এবং ঝড়, জল, রোদের ধকল সহ্য করতে শেখে। তুখোড় জেলে হতে এই শিক্ষাই যথেষ্ট।

সুবলের বাবা হারাধন মাঝি চেয়েছিল যে তার ছেলে বোটের মাঝিমাল্লা হবে না। সাধারণ জেলেদের মতন দাঁড়ই বাইবে এবং মাছ ধরবে। সেই সঙ্গে মাছের কারবার ফাঁদবে। পরাধীন চাকরি না করে স্বাধীন ব্যবসা করবে। 'বেড়াখানা' জেলেপাড়ায় আজন্ম নিরক্ষরতার

অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অন্তত বালক সুবল যদি তরুণী দলুইর মতো পুঁথি পড়তে পারতো। শেষ পর্যন্ত সুবল পাঁচ বছর পর বৈকুণ্ঠপুরের মামা বাড়ি থেকে বেড়াখানার জেলেপাড়া ফিরে এল। কেতুর বাবা ব্রজেন্দ্র বেরা সুবলকে দেখে বলেছিল যে জেলের ছেলে জাল বাইবে, পচা মাছ ঘাটবে। লেখাপড়া কেন করতে যাবে।

সুবল জেলে, সে মুক্তামাছের সন্ধানে যায়। জেলেদের মাঝিও হতে হয়। জানতে হয় সমুদ্রের খুঁটিনাটি বিষয়। সে এখন অভিজ্ঞ জেলে। তার এক হাতে দাঁড়, অন্য হাতে জাল। সীমাহীন জলতরঙ্গের অভিযাত্রী সে। জেলের সরস্বতী যে জলে, আর জালের মধ্যেই থাকে অর্থলক্ষ্মী। তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে, 'ফুলিবউ' যে তারই জাল আর জলের উপর নির্ভর করে আছে। কবে জল থেকে জাল নিয়ে জেলে, ঘরে ফিরে আসবে। আর সেই সঙ্গে মিশে আছে সুবল জেলের মুক্তামাছের স্বপ্ন-সন্ধান।

তেবাঁকি খালের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তেবাঁকি খাল বেড়াখানার জেলেদের নয়। বাইরের জেলেদেরও। কেবল শীতকালে তে-বাঁকি খালপাড়ে বসে মাছের আড়ত, খটি। বেড়াখানা বিল আড়ি অব্দি ছেয়ে যায় সারি সারি মনিহারি দোকান। মিষ্টি-তেলেভাজার দোকান। কাচের চুড়ি, সেন্ট-পাউডার, ঘুনসি-ফিতা সব কিছুই পাওয়া যায় কিনতে। দূর দূর গাঁ থেকে দলে দলে লোক আসে। পাটের কাঠি, খেজুর রস, গুড়, ডাব, কয়েত বেল কি পিঠা নিয়ে। রাত জোয়ারের মাছ নিয়ে জেলে নৌকাগুলো ভিড়ে যায় ভোর না হতেই। তখন চলে মাছের সওদা। পয়সার বদলে মাছ। পিঠের বদলে মাছ। ডাব কি তেঁতুলের বদলে মাছ। বিনিময় ও কেনাবেচা চলে সারাটা দিন। যারা দূর থেকে আসে তারা মাছ নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। কেবল জেলেরা, দেশ-বিদেশের ব্যাপারীরা থাকে। মনিহারি দোকানগুলোতে, খাবারের দোকানগুলোতে পয়সার খেলা চলে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করে ওঠে তেবাঁকি খালপাড়।

উপন্যাসে দেখা যায় যে সংস্কার ভীরু জেলেরা, সুবলের অনাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পায় না। এমনকি সুবলের দোস্ত নগেন মাঝিও নয়। সুবলকে সাত-কলমা পড়তে হল মঙ্গলা মায়ের সামনে। শুভ নৌকাযাত্রায় শরীর শুদ্ধ করে নৌকায় ওঠেনি সুবল জেলে। তাই সুবলের নৌকা কাত হয়ে জল ঢুকে গেল। লখা পালকে সমর্থন করে কেউ কেউ। মাছ না পাওয়া এবং শুভযাত্রা নষ্ট হওয়ার জন্য সুবলকে দোষ দেয়। সেই অপয়া সুবলই নীল সমুদ্রে প্রথম দেখেছিল ইলিশ মাছের ঝাঁক।

সমুদ্রের জেলেদের কাছে, মদনভঞ্জন পূর্ণিমার মহাকালদেবের পুজো গুরুত্বপূর্ণ। চৈত্র মাসের শেষ থেকে প্রথম বৈশাখের এই পূর্ণিমার তিন-দিন, তিন-রাত্রি জাল ছোঁবে না জেলেরা। মাছ ধরবে না। এমনকি মাছও খাবে না জেলে পরিবার। বিশেষ করে সামুদ্রিক সাবাড় জালের জেলেদের কাছে- মদনভঞ্জন পূর্ণিমায় মহাকালদেবের পুজোয় তাই আনন্দ আশা পূরণে পরিপূর্ণ। ভালোয় ভালোয় সমুদ্র থেকে ফিরে এসেছে জেলেরা। সারা মাছ-মরশুমের টাকা-পয়সার লেনদেনের হিসাব হয় এই মিলন পূর্ণিমায়। লখা পালের ভেটিতে জেলেপাড়ার সবাই টাকার ভাগ পেয়েছে। সুবল ছাড়া সবাই আজ যথেষ্ট টাকা পেয়েছে। জেলেপাড়ার সবার ঘরে আজ টাকার আনন্দে মশগুল। ভাত-ভিখিরি দরিদ্র জেলে পরিবারে এতটাকা সহ্য হয় না।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ তরুণী দলুইয়ের মতে দুমাস পরে জেলে ঘরের টাকা উধাও-

> ‘তখুন যেই নাইকে সেই নাই। হেঁ-হেঁ-শাস্ত্রে কইচে না, মীনের টাকা হীন।
> জালের টাকায় বড়লোক হিচে কে আবার? সহ্য হিলে হয়।’[২৯]

জালের টাকা জেলেরা জমাতে পারে না। সমুদ্রের সাবাড় জাল থেকে ফিরে দিগ্বিজয়ী জেলেরা ধরাকে সরা ভাবে। খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়, জেলেদের সাবাড় জালের ভাগের টাকা। তারপর জেলেদের আজন্ম লৌকিক শাস্ত্রের সেই অমোঘবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে যায়- ‘মীনের টাকা হীন’। তারপর হীনমান দরিদ্র ভাত ভিখিরিদের দল সেই অলৌকিক মুক্তামাছের স্বপ্ন দেখবে। যে মুক্তামাছ তাদের অভাব দূর করবে।

আলোচ্য উপন্যাসে জাল বিশেষত সরমা বুড়ির ধাই জাল এবং সুবল সারানি জাল ছেড়ে ‘সাবাড় জালের’ কথা বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে। ‘ধাই জাল’ শুধু সরমা বুড়ি ব্যবহার করেনি, ন্যাংড়া নৃপতি বউ রাধাও ‘ধাই জাল’ ব্যবহার করেছে। জেলেনিদের কাছে ‘ধাই জাল’ আর সামুদ্রিক জেলেদের কাছে ‘সাবাড় জাল’ গুরুত্বপূর্ণ।

‘সাবাড় জাল’ শুধুমাত্র সমুদ্রেই ব্যবহৃত হয়। সাবাড় জালে ভেটি সমুদ্রে নামাতে গেলে কমপক্ষে ৬ টা বড় নৌকা চাই। দরিদ্র জেলেপাড়ায় আছে মাত্র ২টি। তাই বাধ্য হয়ে শুট্‌কি মাছের ব্যবসায়ী লখা পালের সঙ্গে জেলেদের ভিড়তে হয়েছে। ৬০ জন জেলের ৬০ টি জাল একত্র করে ‘সাবাড় ভেটি’ করা হয়েছে। দুটো বড় নৌকায় শুধু ‘সাবাড় জাল’ আর অন্য

চারটি নৌকায় সুবলরা থাকবে। নৌকার উপরেই নাওয়া-খাওয়া, আরাম-বিরাম। অনেক সেধে, কেতু বউ-এর মাধ্যমে দরিদ্র সুবল একটা ভাগ পেয়েছে।

সাবাড় জাল অনেক বড়। ৮০ হাত খাড়াই জালের রশি ছেড়ে দেওয়া হয় সীমাহীন সমুদ্রে। শুরু হল- সমুদ্রে মাছমারি উৎসব।

> ‘সামনেই সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটছে। ভাতের হাঁড়ি যেমন ফোটে। বিঘা-তিনেক জায়গা জুড়ে লালচে হয়ে আছে জল। ঠাসাঠাসি মাছের লালচে শিরাগুলো পাশাপাশি জোড়া লেগে। দেখেই জেলেরা বুঝল। মাছ-ইলিশ মাছ-বড় মাছের চাঁই।’[৩০]

কয়েক হাজার মণ ইলিশ মাছ পাওয়ার পর নৌকায় জোড়া ‘নিশান’ উড়িয়ে দেয় জেলেরা। অন্য জেলেরা ছুটে আসে নিশান দেখে। মাছ মারার পর রফা হয় তাদের সঙ্গে। যারা নিশান দেখিয়েছে, তারা পায় ‘সিকি’ ভাগ। মাছ ধরার পর লঞ্চওয়ালাদের খুবই প্রয়োজন। সমুদ্রের বুকে মাছ মাপায় তারা। বরফ দিয়ে প্যাক করে ইলিশ মাছের ঝুড়ি। ঝুড়ির মাপে মাপ হয়। ঝুড়ি গুণতিতে টাকা। পাল্লা-বাটখারা এখানে অচল। সমুদ্রে সময় নেই। যত দ্রুত শহরে ফেরা যায়। এক একটা লঞ্চ আট-ন’শ মণ মাছ নেয়। ইলিশ বড় শৌখিন মাছ। জল থেকে তুললেই মরে যায়। মাঝ দরিয়ায় অনেক লঞ্চও নেই। নেই মাছের বাজার। তাই লঞ্চ ওয়ালাদের বাড়-বাড়ন্ত। তারপর লাখ টাকার লখা পালের মৎস্য-শোষণ। মাছ মহাজনের নির্মম শাসন ও শোষণে, দরিদ্র, ভাত-ভিখিরি জেলেরা শেষপর্যন্ত যৎসামান্য অর্থ পেলেও তা ধরে রাখতে পারে না।

যারা দিনের পর রাত জেগে, দূর দরিয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরে; তারা সেই শ্রমের অর্থ পায় না। মাঝখানে পাইকার, লঞ্চওয়ালা আর লখা পালের মতো মহজনদের পাল্লায় পড়ে, গরিব জেলে জীবনের আর্থিক স্বচ্ছন্দ আসে না। সমুদ্রনির্ভর জেলেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, আড়তদার এবং মহাজনদের মাধ্যমে। অগ্রিম দাদনের মধ্যে জেলে-জীবনে শ্রেণি শোষণ অব্যাহত থাকে। মাছের আড়তদারদের কাছে টাকা ধার নেওয়ার ফলে, জেলেদের শ্রমের জলশস্য বাঁধা দামে বিক্রি করতে হয়। দরিদ্র জেলেরা নৌকা এবং জাল দুই-ই আড়তদারদের কাছ থেকে নিয়ে, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। তার ফলে আড়তদারি শোষণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে লখা পালের মতো মহাজনি শাসন ও শোষণ।

লখাপুত্র আধুনিক চন্দন পালের ব্যাখ্যা নস্যাৎ করে, বিরুমঙ্গলরা, দরিদ্র, ভাত-ভিখিরি সুবলের মাছ ধরার ন্যায্য পাওনা টাকা দেয়নি। হক পাওনা টাকা না পেয়ে গরিব সুবল মাঝি আত্মহননের পথে এগিয়ে গেছে। জেলেদের গভীর আর্তনাদ শোনার কেউ নেই। মহাকালের মহারোষ উপেক্ষা করে, মোহনা ছাড়িয়ে, ভাত-ভিখিরি, হীনমান সুবল জেলে অন্য যাত্রার শুরু হয়েছে। এক হাতে দাঁড়, অন্য হাতে 'খেই জাল'।

নটরাজনের লেখা 'ইলিশ জোড়' (১৯৯৭) উপন্যাসের প্রথমেই দেখা যায় জেলেদের পাওনা নিয়ে ট্রলার মালিক আদিনাথ কৈবর্তর সঙ্গে জেলেদের বিবাদ চরমে ওঠে। একশ কুড়ি-পঁচিশটি পরিবার নিয়ে জেলেদের গ্রাম শুকমারী কলোনী। আদিনাথ কৈবর্ত একদিকে পঞ্চায়েত প্রধান তারপর আবার শুকমারী মৎস্য সমবায় সমিতির প্রেসিডেন্ট। এই বিবাদের সময় সেখানে এসে উপস্থিত হয় নেপাল কৈবর্ত। একদিকে তার ভাইপো আদিনাথ, অন্যদিকে ভাগ্নে বিজয়। নেপাল নিজে সংসার করেনি। কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে আদিনাথকে। নিজের জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে একজন দক্ষ জেলে করে তুলতে চেয়েছিল তাকে। কিন্তু সে পথে যায়নি আদিনাথ। কাকার প্রভাব ও নিজের বুদ্ধির সঙ্গে কৌশল মিশিয়ে আজ সে শুকমারী কলোনির একজন কেউকেটা। এদিকে মামার শিক্ষায় কিন্তু এইটুকু বয়সেই ইলিশ ধরায় একজন দক্ষ জেলে হয়ে উঠেছিল বিজয়। ভাগ্যের পরিহাসে আদিনাথ আজ আদিনাথ বাবু, আর বিজয় এর-ওর ট্রলারে মাছ ধরে বেড়ায়।

স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে মানুষ এপার বাংলায় এসে হাজির হয়। এই ঠাঁই খুঁজতেই এককালে এই অঞ্চলে এসে হাজির হয়েছিল পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ তথা বরিশাল জেলার চৌত্রিশ পয়ঁত্রিশ বছর বয়সের সুঠাম দেহের অধিকারী ওস্তাদ জেলে নেপাল কৈবর্ত। প্রধানত তারই প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে আজকের এই শুকমারী কলোনি। ওপার বাংলা ছেড়ে এপারে চলে আসার কোন পরিকল্পনাই ছিল না নেপালের। তারা গরিব জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ- তপশিলী শ্রেণিভুক্ত। স্বাধীনতার আগে পূর্ববঙ্গে জেলে বলতে এই তপশিলী শ্রেণির মানুষদেরই বোঝাতো। এই কাজে মুসলমানরা নগণ্য ছিল। নেপাল কৈবর্তর মতো কিছু জেলে পরিবার পূর্ববঙ্গে থেকে গেলেও অনেক জেলে পরিবারই সেদিন উদ্বাস্তু হয়ে এসে ভিড় করেছিল পশ্চিমবঙ্গে। সামাজিক নিয়মেই তাদের শূন্যস্থান পূরণ করেছিল মুসলমান জেলেরা এবং অচিরেই তারা হয়ে উঠলো তপশিলী শ্রেণির হিন্দু জেলেদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই শুরু হলো সংঘাত। মুসলমান জেলেরা মনে করতে শুরু করলো যে এই দেশটা যখন তাদের হয়ে গেল তখন এর প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার অধিকারও

একমাত্র তাদের। অন্যরা সেগুলো ভোগদখল করতে পারবে না। আবার তপশিলী হিন্দু জেলেরাও মনে করতে লাগলো যে তাদের বাপদাদা চৌদ্দপুরুষের অধিকার একমাত্র দেশভাগের কারণেই তারা কেন ছাড়বে।

দেশভাগ ও তার তিনবছর পর নোয়াখালির দাঙ্গা হলে অধিকাংশ জেলে পরিবার চলে গেলেও নেপালরা তখনো যায়নি। দেশে থাকতেই ওস্তাদ জেলে হিসেবে নাম করেছিল নেপাল। বিশেষ করে ইলিশ মাছ ধরায় তার পারদর্শিতা গোটা জেলে সমাজে হয়ে উঠেছিল আলোচনার বস্তু। সমুদ্র কিংবা সাগরের মোহনায় জায়গা দখল বা জাল ফেলা নিয়ে রেষারেষি না থাকলেও নদীর যে নির্দিষ্ট এলাকায় বেশি ইলিশ পাওয়া যায় সেখানে জাল ফেলা নিয়ে জেলেদের মধ্যে রেষারেষি দেখা যায়। এই রেষারেষি এড়াতেই জেলে মহলে অলিখিত নিয়ম, যে আগে আসবে সেই পাবে অগ্রাধিকার। ক্রমানুসারে উত্তরের দিকে অন্যেরা জাল ফেলবে। ইলিশ ধরার মরসুমে চাবলি, খয়রা ইত্যাদি বাচ্চা ইলিশ ধরা না পড়ে তাই আরেকটি অলিখিত নিয়ম, একটা নির্দিষ্ট মাপের চাইতে ছোট মাপের ফোঁকড়ওয়ালা জাল কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। এই বাচ্চারাই তো একটু বড় হয়ে চলে যাবে সমুদ্রে। আবার নির্দিষ্ট বয়সে এরাই একদিন নদীতে এসে হাজির হবে ডিম পাড়তে। তাই সেকালে নিয়ম ছিল আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজোর পর থেকে মাঘ মাসে সরস্বতী পুজো পর্যন্ত বাঙালি বিশেষ করে হিন্দুরা ইলিশ মাছ খাবে না। পূর্ববাংলা পূর্বপাকিস্থানে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জেলেদের তৈরি এইসব অলিখিত নিয়ম কানুন অগ্রাহ্য করার ঝোঁক বেড়ে উঠেছিল ঐ অঞ্চলের মুসলমান জেলেদের মধ্যে। আর এই বিষয় নিয়ে মুষ্টিমেয় হিন্দু জেলেদের সঙ্গে মুসলমান জেলেদের ঝগড়া বিবাদ মাঝে মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। নদীতে জাল পাতা নিয়ে নেপালের বড়ো ভাই ভূপাল ও তার লোকজনের সঙ্গে জেলেদের সংঘর্ষ হয়। ভূপালের মৃতদেহ দুদিন পরে ভেসে ওঠে তেঁতুলিয়ার জলে। এরপরেই নেপাল দেশছাড়া হয়। দক্ষিণেশ্বরে নারায়ণ সর্দার নামে এক মাঝবয়সি লোকের সঙ্গে নেপালের সাক্ষাৎ হয়। তারা কথা বলে জানতে পারেন যে তারা উভয়ই জেলে কৈবর্ত এবং উত্তর দিকের মালোপাড়াতেই তার বাড়ি।

নারায়ণ সর্দারের সঙ্গে আলাপের সূত্র কিন্তু ছিন্ন করেনি বুদ্ধিমান নেপাল। নিজের জল-জাল-ইলিশের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে তাকে স্থানীয় জেলেদের সাহায্য নিতে হবে তা সে বুঝতে পেরেছিল। নারায়ণ সর্দার তার চারখানা নৌকার মধ্যে একখানা নৌকা আর দামি জাল নেপাল কৈবর্তকে দেয় কারণ তারা তার স্বজাতি। তাছাড়া পূর্ববাংলার জেলেরা ইলিশ

ধরায় ওস্তাদ। তিনি তাদের নিয়মমতো মাছের ভাগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। গঙ্গার ইলিশের সঙ্গে এভাবেই নেপালদের প্রথম পরিচয় হয়। কিন্তু বাকি জেলেদের ঈর্ষার কারণে সেই পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে নেপালের মন চায় না। তাই পরিবার পরিজন নিয়ে শুকমারী অঞ্চলে জেলেদের সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েছিল নেপাল।

উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কিনু ও তার মা পার্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। মা-মেয়ের সংসার। বাড়িতে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই। জাল বোনাই মা-মেয়ের সংসারে একমাত্র রোজগারের উপায়। পয়সা আছে এমন জেলেরা বাজার থেকে কট্-জালের সুতো কিনে এনে দিয়ে যায় দুঃস্থ পরিবারের ঘরে ঘরে। বাড়ির মেয়েরা মজুরির বিনিময়ে জাল বুনে দেয়। কোন কোন জেলেরা আবার নিজেদের বাড়িতেই জাল বুনিয়ে নেয় দৈনিক মজুরিতে। জাল তৈরির দ্বিতীয় পর্বের কাজ করে পুরুষেরাই। এই পর্বে ছোট বড় বিভিন্ন ফাঁসের জাল জোড়া লাগিয়ে তৈরি হয় সমুদ্রে মাছ ধরার উপযোগী মহাজাল। জেলে পরিবারের স্ত্রী-পুরুষের এই কাজের ভাগাভাগির মাধ্যমেই সচল থাকে মৎস্য-কেন্দ্রিক অর্থনীতি।

জনমানবহীন বিশাল সমুদ্রে যখন জেলেরা মাছ ধরে তখন তাদের মেনে চলতে হয় কতগুলো অলিখিত নিয়ম। একজনের জালের কাছাকাছি আর একজন জাল ফেলে না। সমুদ্রের জলে যেখানে খুশি জাল ফেলা যেতে পারে কিন্তু এমন ভাবে জাল ফেলা যাবে না যাতে অন্যের মাছ ধরায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। থাই ট্রলার ভারতের জলসীমানায় ঢুকে পড়ে এবং মাছ, জাল লুঠ করে নিয়ে যায়। কালিন্দীও সেইরকমই থাই ট্রলারের কবলে পড়ে। থাই জেলেরা প্রায় সবাই যুবক। কালিন্দীর জেলেদের শরীরে পূর্ববঙ্গের মারকুটে জেলের রক্ত। মনের জোর থাকলেও ইদানীং দৈহিক শক্তির বড়ই অভাব। অচিরেই থাই জেলেদের কাছে তাদের হার মানতে হল। ওদের লুঠপাঠের ধরন বুঝিয়ে দিল যে ওরা জাত জেলে নয়।

কার্তিক মাস। সমুদ্র অনেক শান্ত। আর শান্ত বলেই হয়তো ইলিশের ঝাঁকের খোঁজ পাওয়া দায়। তাই ইলিশ ধরার ট্রলারও কম। শান্ত সমুদ্রের মোহনায় ইলিশ ধরে চলে ট্রলার কালিন্দী। বিজয়ের সুপরিচালনায় মোটামুটি ইলিশ পড়ছে জালে। সমুদ্রে ছটা দিন কাটানোর পর আরো দুটো দিন বাকি। নিয়তি মানুষকে যে কখন কোথায় টেনে নিয়ে যায় তা আগে থেকে অনুমান করা একান্তই দুঃসাধ্য। নইলে সমুদ্রের সঙ্গে ছোট বয়স থেকে যার ঘনিষ্ঠ পরিচয় তার এমন ভুল হবার কথা নয়। বিজয় ভুল করে বাংলাদেশের জলসীমানায় ঢুকে পড়ে। ফলে বিজয়সহ সমস্ত জেলে মাঝিদের বাংলাদেশের লঞ্চের অফিসার গ্রেপ্তার করে

এবং ট্রলারখানি বাজেয়াপ্ত করে। দীর্ঘদিন বিদেশের জেলে কাটিয়ে একসময় জেলে মাঝিরা শুকমারী কলোনিতে ফিরে এল। কালিন্দী ট্রলারের সুখানি হিসেবে বাংলাদেশের জলসীমানায় অনুপ্রবেশের দায়িত্ব তার। তাই তাকে আরো একবছর জেলে থাকতে হবে। ছয় মাস পরে বিজয় ফিরে আসে। এরপর বিজয় আর কিনু নিজেদের মধ্যে তিন বছরের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি, অভিমান মিটিয়ে একসাথে ট্রলার সাগরিকা নিয়ে সমুদ্রে নামে। সাগরিকা পরিচালিত হচ্ছে বিজয়ের নির্দেশে। এরপর তারা ঝড়ের কবলে পড়ে। সেই ঝড়ে কিনু সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির মধ্যে হারিয়ে যায়। আর তাকে বাঁচাতে গিয়ে ভয়ঙ্কর জলরাশির মধ্যে বিজয়ও ঝাঁপ দেয়। শুকমারী গাঁয়ে আর কোনদিন ফিরবে না বিজয় ও কিনু। লেখকের ভাষায়-

> ‘হয়তো ইলিশ হয়ে যাবে ওরা। রূপোর মত চক্‌চকে জোড়া ইলিশ। বুকের কাছে লাল আভা। ঐ সাগরের জলেই একদিন ওরা হয়তো ঘর বাঁধবে। অবশেষে নোনা জল ছেড়ে ওরা রওনা দেবে নদীর মিষ্টি জলে। হয়তো একদিন ধরাও পড়বে কোন জেলের জালে। সেদিন কিন্তু ওদের আর চিনতে পারবে না কেউ।’[৩১]

প্রশান্ত মৃধার ’জল ও জালের তরঙ্গ’ (২০১৪) উপন্যাসে এক মালো পরিবারের কথা উঠে এসেছে। গণেশ মালো বলেশ্বর নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। পরিবারে গোকুল, গৌরী ও গদাই, গঙ্গা চার ছেলেমেয়ে। গোকুল ও গৌরীর সৎমা বাঁশরি। বাঁশরি গৌরীকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে তাদের বাবা গণেশ গৌরীকে শ্রীময়ীর হাতে তুলে দেয়। শ্রীময়ী তার ভাসুরপোর বাড়িতে বাগেরহাটে কাজ করানোর জন্য নিয়ে যায়।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় গণেশ মাছ ধরতে গিয়ে বলেশ্বরের জলে পড়ে গিয়েছে। সেই খবর দেওয়ার জন্য গোকুল তার দিদি গৌরীর বাড়িতে যায়। ছোটোখাটো মানুষ গণেশ। একটু সিধে-সরলও। ঠিক সাত চড়ে রা না-কাড়ার মতো না-হলেও সে মানুষের পিছনে থাকা, একটু কম বোঝা, বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাঁচতে চায়।

গণেশের বাবা গৌরাঙ্গ মালো। গৌরাঙ্গ মালোর গলা ছিল চড়ানো। গালগল্প, চুটকি ভালো দিতে পারত। মানুষ গৌরাঙ্গ মালো সম্পর্কে বলত,

'জাইলগা মানুষ খালে বিলে জলে থাহে, সারাদিন কতা কওয়ার মানুষ পায় না, সেই জন্যে অত কতা কয়। অত কথা-কতা তো একছের কইতেই থাকত; কথার বিরাম নেই।'[৩২]

ধানের ক্ষেতে নতুন জল উঠলে গণেশের বাপ গৌরাঙ্গ সেই মাছের সঙ্গেও কথা বলত। যেন, মাছ তার অনেকদিনের পরিচিত। গৌরাঙ্গ জানত মাছ ঘুরে ফিরে তার কাছে আসবে। গৌরাঙ্গ মাছকে ডাকত। তাই গ্রামের মানুষ তার সম্পর্কে বলত যে গৌরাঙ্গের গার গন্ধে মাছ কাছে আসে। গৌরাঙ্গর ডাক শুনে মাছ আসে। সেই গৌরাঙ্গ নদীর জলে ডুবে মরলে গ্রামের লোক বলত মাছই গৌরাঙ্গকে ডেকে নিয়েছে। গণেশ তখন ভাবত যে তার বাবা মাছের রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে মালোদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে কোনো জলকুমারীর বিয়ে দেখতে গেছে একলা একলা। একদিন ওই বিয়ে খাওয়া পেটটায় হাত বুলাতে বুলাতে উঠে আসবে।

গৌরাঙ্গ অনেক ঋণ রেখে মারা যায়। সেজন্য গণেশ বাঁধাজাল বেচে দেয়। তবুও সব ধার দেনা শোধ হয় নি। অবিনাশ গণেশকে উত্তরদিকে যেতে বলল। উত্তর মানে কচুয়া ও বাগেরহাটের দিক। জল নোনা এবং বড় নদী না থাকার কারণে মাছ ধরে মালোরা সেরকম সুখ পায় না। গোপালপুরের যে জায়গায় মালোরা থাকে অবিনাশ সেখানে গণেশকে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে চায়। গনেশ অবিনাশের কথায় প্রথমে গোপালপুর ও তারপর খলিশাখালি আসে। এইসময়ে তার মার মৃত্যু হয়।

গণেশ মালোর বেটা। জল তার কাছে নতুন কিছু নয়। জীবনে এর আগে বহুবার জলে নেমেছে, সাঁতরেছে, গাঙের এক কুল দিয়ে অন্য কুলে গিয়েছে। কিন্তু বলেশ্বর শান্ত স্থির জলের নয়। যেমন ছোট নয় তেমনি জলের গভীরতাও কম নয়। জলে পড়ে গেলে মোমিন গণেশকে টেনে তোলে।

গৌরী জেলের মেয়ে। তার বাবা গাঙে মাছ ধরে। গাঙে মাছধরা মানুষদের মালো বলা হয়। মালোদের ডাঙার মানুষ ভালো চোখে দেখে না। কথায় কথায় বলে 'মালোর জাত', 'মালো ছেমড়ি', 'মালো ব্যাডা', 'মালো বিডি', 'জাইল্যার ছাওয়াল'। সেই রকমই এক মালোর মেয়ে সে। তাই শ্রীময়ী তার কাছে তার বাবা তাকে ভালোবাসে কিনা জানতে চাইলে সে

জানায় যে তার বাবা তাকে ভালোবাসে। নিজের বাবার বদনাম সে লোকের কাছে করতে চায় না। তার বাবা তাকে ভালোবাসলেও সৎমার জন্য কিছু করতে পারে না। সৎমা গৌরীকে খোঁটা দিয়ে বলত-

> 'জাইলগার মাইয়ার অত ঢঙ অত হাউস, অত বেড়ানি- এ সমস্ত কীসের? এতকিছু কীসের? জাইলগার মাইয়ার জীবনে অতকিছু আছে? এ জীবন সোরতের শ্যালার। শ্যালা মানে শ্যাওলা।'[৩৩]

গণেশের প্রথম বউ সন্ধ্যা মারা যাওয়ার পর গণেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। জেলে হয়ে জাল ফেলে কূলে বসে থাকে। কিন্তু বউ বেঁচে থাকতেও কোনওদিন সংসারে ঠিক খেয়াল ছিল না। অন্যান্য মালোরা উন্নতি করলে, ঘরদুয়ার তৈরি করলে, হাল চাষ করলেও কিন্তু গণেশের কোন উন্নতি হল না। পরে গণেশ তার জ্ঞাতি শ্যালিকাকে বিয়ে করে। লোকমুখে শুনে গৌরীর নিজের ঠাকুরদা সম্পর্কে ধারণা হয়েছিল তার ঠাকুরদা অনেক বড়ো জেলে ছিল। তাঁর ধারদেনা শোধ করতেই তার বাবার এই দুর্দশা।

উত্তরদিকে বলেশ্বরের জল কমে যাওয়ায় গণেশ দক্ষিণে বলেশ্বরের দিকে যেতে চায়। গণেশ জাল বায় টেংরাখালির নীচের বলেশ্বরে। সে চাইলেই যে তালেশ্বরের বড়ো খালে চলে যাবে কোনোভাবে সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা জায়গায় ভাগের ভাগ রয়েছে। সেখানে এক রাত্রি বা সন্ধ্যাও জাল বাওয়ার উপায় নেই। দক্ষিণে নদী বড়, মাছ বেশি, পাইকার বেশি এবং আড়ত বড়ো হওয়ায় দাম পাওয়া যায় ভালো। তাই গণেশ দক্ষিণে যেতে চায়।

মালোরা পড়াশোনার তেমন সুযোগ পায় না কারণ বেশিরভাগই ছোটোবেলা থেকে বাবার সঙ্গে নদীতে যায়। মাঠে জল উঠলে সকলেই মাছ মারতে যায়। যদি কারো বাবার আর্থিক সঙ্গতি থাকে তাহলে সেই সকল মালো আর নিকারি ঘরের ছেলেরা নিজের নৌকায় চেপে যায়। আর যদি সঙ্গতি না থাকে তাহলে কারো নৌকায় যায়। কেউ কেউ গোনের সময় দক্ষিণে যায়। গোপালপুর মালোপাড়ায় কোনও পাঠশালা নেই। কিন্তু গ্রামের পুব দিকে একটা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল আছে। হিন্দু মুসলমান গৃহস্থ বাড়ির ছেলেমেয়েরা যায়। মালো বা নিকারির ছেলেমেয়েরা কেউই যায় না। কিছুদিনের জন্য গেলেও তারপর বাদ দেয়।

ধানিজমিতে ঘের হওয়ার কারণে মানুষের হাতে কাঁচা টাকা আসে। জেলে অর্থাৎ মালো আর নিকারির দাম নেই। ঘের মানে হাটবাজার-ভর্তি সাদামাছ। সাদামাছের আমদানি মানে মিঠাজলের মাছের দাম বাড়ে না। মাছের দাম না বাড়লে জেলেদের জীবনেও কোনো উন্নতি হয় না। এরই মধ্যে গণেশ গোকুল আর গদাইকে নিজের মতো জেলে বানানোর স্বপ্ন দেখে। কোনও কোনও কাজ গোকুল তার বাবার থেকেও ভালো বোঝে। গণেশের বুদ্ধি অনেক সময় গোকুলের চেয়ে কম। কখন কাকে মাছ দিয়েছিল সেই মাছের টাকা চাওয়ার কথা অনেকসময় গণেশের মনে না থাকলেও বা সংকোচ হলেও গোকুলের সেই কথা মনে থাকে এবং সে তার বাবাকে মনে করিয়ে দেয়। মোজাম গোকুলের বুদ্ধির প্রশংসা করে তার বাবাকে বলে যে তার ছেলে জেলের মতো মাথা নিয়ে জন্মায় নি। ভদ্রলোকের মাথা নিয়ে জন্মেছে। জেলের ঘরে জন্মানোর জন্য ওই মাথাকে কোন কাজে লাগাতে পারল না। একথার কোন লাভ নেই।

> ‘জাইল্যার ঘরে জন্মাইচে, জাইল্যার ছাওয়াল–এয়ার ভদ্দরলোকের মতন মাতা হইলে কী আর না-হইলে কী? ধরা লাগবে ওই মাছ। মাছ ধইরাই জীবন পার করতে হবে।’[৩৪]

গোকুলের ইচ্ছা বলেশ্বরের নীচের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে যাওয়ার ইচ্ছে। নদী একপাশে পূর্বদিকে গিয়েছে আর অন্য পাশ নেমে গেছে খাড়া দক্ষিণে। সেইদিকে সমুদ্র। সেই সমুদ্রে যাওয়ার পথে দুইদিকে সুন্দরবন। সে শুনেছে ওই বনে বাঘ আছে। সেই দক্ষিণের বলেশ্বরে যাওয়ার ইচ্ছে গোকুলের। বড় হলে বড়ো জাল বাওয়ার যোগ্যতা হলে গোপালপুরের যে মালো আর নিকারিরা দক্ষিণে যায় তাদের সঙ্গে সেও যাবে দক্ষিণে।

তালেশ্বরের হাটে মাছ বেচার টাকা নিয়ে সৎমা বাঁশরি গোকুলকে সন্দেহ করলে গোকুল বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। পরে গোকুল বাবার সঙ্গে নৌকায় উঠলে মাছ বেচতে সম্মত হয়নি। মালোর ছেলে হয়ে তার আর জলে নামা হয়নি। জলে পড়ে গণেশের বাম হাত অকেজো হয়ে পড়ায় গোকুল এখানে মাস দুই খানেক জাল বেয়ে মোমিনের সঙ্গে দক্ষিণে যেতে চায়। অস্তিত্বের সংকট আর দিনবদলের কুটিল বাস্তবতায় বলেশ্বর নদের উত্তর ছেড়ে জল ও জালের তরঙ্গের বিস্তরণ ঘটে আরও দক্ষিণে- যেখানে ওত পেতে আছে স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্নের নোনা ঢেউ।

নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের 'জাল থেকে জালে' (২০১৫) উপন্যাসে কৃষ্ণপুরের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নতুন জীবন কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। কোন এক কালে কৃষ্ণপুরের নাম হয়েছিল মরাডাঙি। মরাডাঙিতে মৎস্যজীবীরাই প্রথম বসতি শুরু করেছিল। অতীতে চাষবাস করে যারা জীবন ধারণ করত তারাও মাছ ধরত, তবে বেচবার জন্য নয়, নিজেরা খাওয়ার জন্য ধরত। যারা মরাডাঙি নিয়ে কথা বলে তারা কেউ নিজেদের পূর্বপুরুষকে জোতদার, সম্ভব হলে তথাগত কোনো ব্যক্তির সাগরেদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কাল্পনিক গল্প তৈরি করতেও ছাড়ে না। মরাডাঙির মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কৃষিজীবীদের কোনও সম্পর্ক নেই।

মৎস্যজীবীরা পূর্বসূরিদের সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের সনাতন জীবন তারা ত্যাগ করতে পারেনি। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি। কারণ অন্য সমাজের মানুষ তাদের মেনে নিতে পারেনি। কর্মসূত্রেই মানুষ সমাজ গঠন করে ধর্মসূত্রে নয়। জাল আর জল যাদের উত্তরাধিকার সেই জালের রশিতে তাদের জীবন বাধা থাকে। বিলে জল থাকাকালীন তাদের সুখ বজায় ছিল। বিলের জল যখন শুকিয়ে যায় তখন জেলেদের জীবন শুকনো বিলের বুকের কাদাজলে আশ্রয় নেয়া মাছের মতো। তাদের পূর্বপুরুষগণ দেশান্তরী হলে ও ঝড়ের কবলে পড়লে ঘাসিপির তাদের রক্ষা করেছিলেন। এখন তো সাধুপুরুষের কাল নয়, নেতার কাল। কৃষ্ণপুরের মানুষ নদী আর খাল থেকে উচ্ছেদ হওয়ার মতো সঙ্কটে পড়লে তারা ভাবে যে তাদের ত্রাণকর্তা কে হবে সেই মুহূর্তে গঞ্জের বেপারি আফজল যে আসলে তাদের গাঁয়ের ছেলে সে তাদের ত্রাণকর্তা হয়ে উপস্থিত হয়।

আফজল জেলেদের মাছ নিয়ে গিয়ে ঘাটে বিক্রি করে যা পেত সেই দাম জেলেদের বুঝিয়ে দিত। আফজলকে বেচতে দেয়া মাছের দাম নিয়ে কারো মনে সন্দেহ জাগেনি এমন নয়। আফজল হাট থেকে ফিরে এসে কোনো কোনো দিন বলত যে হাটে ক্রেতা কম থাকার জন্য মাছের দাম ঠিকমতো পায়নি। এর ফলে তার ওপর জেলেদের সন্দেহ থাকত না। এরপর আফজল বিলদহ ঘাটে বাকিতে মাছ কিনে হাটে গিয়ে নগদে বিক্রি করতে শুরু করেছিল। মাছের তেলে মাছ ভাজার পর বাড়তি তেল যেমন বোতলে জমানো হয় তেমনি বাকিতে মাছ কেনাবেচা করে নগদ টাকাও জমাতে শুরু করেছিল। বিলদহ ঘাটে আফজলের মাছ কেনার খবরটা লোকমুখে আশেপাশের গ্রামেও অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

জেলেরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘাটে মাছ নিয়ে আসে। আফজল গদিতে বসে জেলেদের মাছ কিনে বরফবাক্সে রাখে। আর বেলা শেষে মাছ নৌকায় করে দূরের হাটে বেচতে নিয়ে যায়। যতই দিন যাচ্ছিল আফজলের মাছ কেনার পরিমাণ এতই বাড়ছিল যে সে সামলানোর জন্য ধনু নামে পাড়ার ছেলেকে দোকানে এনে মাছ ওজন করার কাজে লাগিয়ে দিল। মাছ বেশি কেনার ফলে উপজেলায় বিক্রি করা যায় না। এরপর আফজল বরফকল বসানোর কথা ভাবে। আফজল শহরে গিয়ে আড়তদারদের সঙ্গে রফাদফা করে আসে। শহরের আড়তে প্রতিদিন সে মাছ পাঠাবে তার বিনিময়ে আড়তদার বাজারদরে তার টাকা বুঝিয়ে দেবে। শহরে চলনবিলের মাছের কদর অনেক বেশি। কী ভাবে আরো বেশি মাছ শহরে পাঠানো যায় সেটা আফজলের ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মাছের চাহিদা আফজলের মিটবার নয়। আরো বেশি মাছ পাওয়ার জন্য আরো পথ খুঁজতে থাকে এবং ভেবে নতুন উপায়ও বের করে ফেলে।

জেলেরা অর্থকষ্টে পড়লে আফজলের কাছে আসে। বিলে জল কমে যাওয়ার পর মাছও কমে যাচ্ছে। কারেন্ট জাল থাকলে মাছ বেশি পাওয়া যায়। জেলেদের সবার কারেন্ট জাল কেনার ক্ষমতা নেই। জাল কিনতে জেলেরা আফজলের কাছে টাকা ধার চায় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে মাছ বেচে যা পাবে তা আফজলকেই দেবে। মৌসুমে মাছ বেচে জালের বাকি টাকা শোধ করে দেবে। মেয়ের বিয়ের টাকার জন্য তারা আফজলের কাছেই হাত পাতে। তার কাছে অনেকে ছোটোবেলায় তাকে কোলেপিঠে করে বড় করেছিল সেকথা বলে। তার বাবা মায়ের গল্প করে। আফজল তাদের টাকা না দিয়ে পারে না। সে তাদের টাকা দেয় আর তারা মাছ ধরে আড়তে দেয়। ধীরে ধীরে টাকা শোধ হয়। তাতে তারা খুশি এবং মাছ পেয়ে আফজল খুশি। না চাইলেও কাউকে নতুন জাল কেনার জন্য, নাও কেনার জন্য ধার দেয়।

আফজল ধনুকে ব্যবসায় ধরে রাখার জন্য তাকে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবসা করতে দেয়। টাকার দরকার হলে সে সবরকম সাহায্য করবে। আফজলের টাকায় নৌকা কেনার পর ধনু নৌকায় ঘুরে ঘুরে বিলের মাছ কিনে আনতে শুরু করলে আফজলের আড়তে বেশি মাছ আসতে শুরু করল। সে এখন প্রতিদিন আফজলের আড়তে মাছ দিয়ে নগদ টাকা গুনতে পেরে খুশি। আর আফজলও মাছ পেয়ে খুশি।

রুস্তম কাজীর মেয়ে রোকসানার সঙ্গে আফজলের বিয়ে হলে আফজল বুঝতে পারে যে রোকসানা উজান গাঁয়ের কৃষকদের মতো আর আফজল কৃষ্ণপুরের মৎস্যজীবীদের মতোই। অন্য গাঁয়ের লোকজন কৃষ্ণপুরে মেয়ে বিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা তারা কেউ এই গ্রামেই আসতে চায় না। তারা এই গ্রামের মানুষদের কৈবর্তদের বংশধর বলে গণ্য করে। আফজলের পূর্বপুরুষ এককালে কৈবর্ত ছিল। শরীফ মাস্টার একদিন বলেছিলেন ধর্ম বদল হলেও কর্মবদল না হলেও জাত বদল হয় না। কারণ ধর্ম দিয়ে নয় কোনো এক কালে কর্ম দিয়েই মানুষের জাত নির্ধারিত হয়েছিল। এ গ্রামের মানুষ কর্মবদল করতে পারে নি।

বিলদহ ঘাটে মাছের আড়তের দায়িত্ব ধনুর হাতে দিয়ে আফজল বেপারি উপজেলায় সুতোর ব্যবসা শুরু করল। জেলেরা আফজলের গদি থেকে সুতো কিনতে শুরু করল। এতদিন সুতো কিনতে জেলেদের পাবনা যেতে হত। কিন্তু এখন তারা সেই সুতো আফজলের ঘর থেকে কিনতে পারছে। দাম বেশি নিলেও বাকিতে সুতো কেনার সুবিধে দিচ্ছে। আফজল বেপারির সুতোয় বিলের বুকে নতুন নতুন জাল বাড়তে লাগল। মৎস্যজীবী ও কৃষিজিবী দের ভোটে আফজল গ্রামের নতুন চেয়ারম্যান হয়ে উঠল।

জৈষ্ঠ্যের শেষে আষাঢ়ের বর্ষণে খালবিল ভরে গেলে কৃষ্ণপুর গ্রামের জেলেরা নতুন করে জীবন ফিরে পেল। বিলের নতুন জলে আগেভাগেই জেলেরা জাল নিয়ে নামল। নতুন জলে পোনামাছ ধরে এবার তারা সুখ পেল। মাছ ধরতে তাদের আর কেউ বাধা দেবার নেই। আষাঢ় গিয়ে শ্রাবণ আসতে না আসতেই ধনুর বুদ্ধিতে আফজল বিলের দখল নেওয়ার জন্য বিলে কাটা দেওয়ার জন্য অনেক শক্ত বাঁশ পাঠিয়ে দিলেন। বৃষ্টির দিনগুলো পেরিয়ে যাবার আগেই কাটা দেয়ার কাজও তারা শেষ করল। মাছ না ধরে ঘরে বসে থাকলে জেলেদের সংসার আর চলছে না। বিলে তাদের দখল আছে, কাটার তলে মাছ আছে আর ঘরে জাল আছে তবু জেলেরা জাল নিয়ে বিলে নামতে পারছে না। কেউ কেউ লুকিয়ে কাটার ফাঁকে ফাঁকে জাল ফেলে মাছ ধরতে শুরু করল। চেয়ারম্যানের বারণ ও ধনুর ধমকে তারা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকলেও জল আরো কমতে থাকলে বিলের বুকে জেগে ওঠা কাটা যেন জেলেদের বুকে বেশি করে বিঁধতে লাগল। আফজলের সঙ্গে পরামর্শ করে ধনু আশ্বিনের শেষে মাছ ধরার দিন ধার্য করল। মাছ ধরার জন্য নির্ধারিত দিনে সকাল না হতেই বিলের কাটার কাছে নৌকায় করে জেলেরা জড়ো হল। নৌকায় বসে বসে তারা শরীরে সরষের তেল মেখে তৈরিও হলো। ছোটোখাটো জাল দিয়ে বড় বড় মাছ ধরা যাবে না। তাই ধনু

নতুন জাল আর বেশ কয়েকজন অচেনা লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। নতুন জালের কথা শুনে শুরুতে হতাশ হলেও শেষে বড় বড় মাছগুলোকে মোটা সুতোর পাতলা জাল দিয়ে সযত্নে তুলে আনতে দেখে কৃষ্ণপুরের জেলেদের চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল। মাছ দেখে গ্রামবাসীর চোখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল। তারা এতমাছ একসঙ্গে কোনো দিন দেখেনি। সব মাছ দামদর করে ঐসব লোকই কিনে নিয়ে গেল। দামও ভালো পাওয়া গেল। একদিন মাছ ধরে তারা কয়েক হাজার টাকা পাবে সেটা তারা জীবনেও চিন্তা করেনি। কৃষ্ণপুরের ঘরে ঘরে কদিন আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

মাছ ধরার উৎসবের আর আনন্দের আবহ থাকতে থাকতে একমাসের মধ্যেই আবার মাছ ধরার আয়োজন হল। কিন্তু এবারের মাছধরাটা আর উৎসবের মতো হতে পারল না। এবার ছোট মাছ ধরা হল। ভাগের টাকা কম হওয়ায় কৃষ্ণপুরের মৎস্যজীবীদের আনন্দের ভাগ প্রথমবারের তুলনায় বেশ ছোটো হয়ে গেল। চেয়ারম্যান তাদের স্বপ্ন দেখালেন যে জিয়ল মাছ তো রয়ে গেছে। কয়েকটা দিন পরেই সেই মাছ ধরা হবে। মাছ ধরতে চাইলে কাটা বাদ দিয়ে ধরতে বলেন। চেয়ারম্যানের কথা মেনে নিতে কৃষ্ণপুর-নূরপুরের মানুষ বাধ্য হলো। তারা অর্ধাহারে-অনাহারে কাটিয়ে কার্তিক-অগ্রহায়ণ পার করল। তারপর পৌষে এসে ডালি ডালি জিয়ল মাছ দেখে নতুন করে বেঁচে থাকার উত্তাপ সঞ্চয় করতে চাইল। এরপর বিল শুকোতে থাকলে মৎস্যজীবীদের জীবনও শুকোতে শুরু করল। শেওড়ার ডালপালার তলে জলজ লতাপাতার ফাঁকে স্বচ্ছ জলের আয়নায় দু একটি শোল বা অন্য কোন মাছের ছায়া দেখে সব প্রস্তুতি সেরে নিয়ে একদিন যার যা কিছু ছিল সেসব নিয়ে বহুবছরের ঐতিহ্য অনুযায়ী দলে দলে বিলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতদিন বিলের বুকে নামতে না পেরে জেলেরা যে কষ্ট পাচ্ছিল এই আয়োজনে তারা সে কষ্ট ভুলতে পারল। বিলে নেমে মাছ ধরার এই স্মৃতি তাদের বেশ কিছুদিন চাঙ্গা করে রাখল। তারপর দোন আর সেঁতি নিয়ে সেঁচে বিলের তলার চ্যাং-টাকি ধরার মধ্য দিয়ে বছরের মতো মাছ ধরার পাট শেষ করল।

এরপর ধনু আফজলকে দিয়ে ‘বিলের তলা খনন প্রকল্প’ দাখিল করেন। উপজেলা উন্নয়ন সভায় চেয়ারম্যানের বিল খনন প্রকল্প পাশ হয়ে গেল। বিলের বুকে ডোবা কাটার কাজ শুরু হল। বর্ষার শুরুতে বিলে নতুন জল এলে সেই নতুন জলে পোনামাছ সাঁতার কাটতে শুরু করলে মৎস্যজীবীরা বাধাই জাল জোগাড় করে বর্ষার শুরুতেই বিলে নেমে পড়ে। বাধাই জালে বিলের পোনা ধরে ফেললে মাছ বড় হওয়ার সুযোগ পাবে নয়া। এরপর

ধনুর পরামর্শে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় মৎস্যজীবীদের স্বার্থে পোনামাছ না ধরা এবং বিলের মাছ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আগের মতোই যথাসময়ে মাছ ধরার লোক আর জাল নিয়ে এসে মাছ ধরা হলো। বড় মাছ ধরা হয়ে গেলে ছোটমাছ ধরা হল। গতবছর ডোবা কাটার ফলে জমি জেগে উঠলে ধনু সেই জমি দখল করে সেখানে ধানের চারা রোপণ করে। বিলের জল কমে যাওয়ায় বিলের তলায় ডোবা কেটে ডালপালা দেয়ার ব্যবস্থা করার পর থেকে কৃষ্ণপুরের লোকজনের আর বিলে নামার কোন প্রয়োজন পড়ছে না। কিন্তু বিলে জল না থাকলেও নদী আর খালে তো জল আসবে। তাই কৃষ্ণপুরের যুবকরা আফশোস না করে ধনুর বাড়িতে জাল বোনে এবং নগদ টাকাও পায়। জেলেরা ঘরে বসে বর্ষাকাল কাটাল। বৃষ্টিও কমে গেল। তারপর ধনুর সোঁতি পাতা শুরু হয়ে গেল। লোকজন বাইরে এসে দেখতে লাগল আর প্রকাশ্যে বলতে লাগল,

‘এবার দেখ, জাউল্যার বেটাও সোঁতি বসাতে পারে!’[৩৫]

সোঁতি বসানোর ফলে জেলেরা ঠিকমতো মাছ পায় না। জাল পাতার পর্ব শেষ হলে মাছ ধরার পালা শুরু হয়। বয়স্ক জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে বুঝতে পারে যে ভাটার সময় মাছ আসলে উজান থেকেই আসে। উজানে জাল ফেলে দেখল তাদের ধারণাই সঠিক।তারা মাছ ধরতে গেলে ধনুর দলের ছেলেরা তাদের নদীতে জাল নামাতে মানা করে। যেসব যুবকরা ধনুর কর্মরত তারা এবং তাদের বাবা ছাড়া বাকি জেলেরা চেয়ারম্যানের কাছে গিয়ে নদী থেকে ধনুর জাল তোলার আর্জি জানায়। তারা যাতে নদীতে আবার জাল নিয়ে নামতে পারে তার ব্যবস্থা যেন চেয়ারম্যান করে দেন।

সোঁতি জালে প্রাণ দিতে হয়েছে এক নিরীহ নারীকে। তার স্বামী এবং শিশু সন্তানটি প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। সোঁতির জন্য লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। এর সঙ্গে প্রভাবশালীরাও জড়িত। মৎস্যজীবীরা সোঁতিজাল তোলার প্রতিবাদে উপজেলার মাঠে জাল পুড়িয়েছে। আফজল চেয়ারম্যান সোঁতিজাল তুলে নেওয়ার ব্যাপারে ইউএনওর সঙ্গে একমত পোষণ করলেন। চেয়ারম্যানের পক্ষে একা কিছু করা সম্ভব নয়। তাই তারা এমপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়। এমপি জাল তোলার ব্যাপারে অসম্মত হন। জেলা প্রশাসক ইউএনও কে ফোন করে জানান যে তাকে ওএসডি করা হয়েছে আর এসব বিষয় থেকে

দূরে থাকার কথা বলেন। রাজনৈতিক প্রভাশালী ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ জেলেদের দাবি পূরণ হয় না। কিন্তু ইউএনও সাহেব আলী ইতিহাসে বিশ্বাস করেন। ইতিহাস বলে,

> ‘মানুষের সামনে পাতা জাল, অন্য কেউ নয়, একসময় তারা নিজেরাই ছিঁড়ে ফেলে।’[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘মেঘ ও রৌদ্র’ (১৩০১) গল্পে মালো বা জেলেদের দূর্দশার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের চারিদিকে বর্ষাকালে ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। বঙ্গভূমি সরস শ্যামল হয়ে ওঠে। তার শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশ দিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম হয়ে ওঠে। জেলেরা দুই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বেঁধে প্রকাণ্ড জাল পেতেছে। শুধুমাত্র একপাশ দিয়ে যাতে নৌকা চলাচল করতে পারে সেজন্য কিছুটা জায়গা রয়েছে। বহুকাল থেকে জেলেরা খাজনার বিনিময়ে এই কাজ করে থাকে। জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডন্ট বাহাদুরের বোট আসতে দেখে জেলেরা আগে থেকেই পার্শ্ববর্তী পথ নির্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করে। সাহেবের মাঝির ঘুরে যাওয়ার অভ্যেস নেই। সাহেবের মাঝি জালের ওপর দিয়েই বোট চালিয়ে দিল। জাল অবনত হয়ে বোটকে পথ ছেড়ে দিল কিন্তু বোটের হাল বেধে গেল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় হাল ছাড়িয়ে নেওয়া হল। এতে পুলিশ সাহেব অত্যন্ত রেগে গেলেন। তার রাগত মূর্তি দেখেই চারজন জেলে পালিয়ে গেল। সাহেবের নির্দেশে মাল্লারা সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। সাহেবের নির্দেশে কন্‌স্টেবল পলাতক চারটি জেলের সন্ধান না পেয়ে যে চারজনকে হাতের কাছে পেল তাদের ধরে আনলো। শশিভূষণ নদীপথে কলকাতা যাচ্ছিলেন। তিনি এই ঘটনা দেখে বললেন-

> ‘সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।’[৩৭]

সাহেবকে প্রহার করার কারণে শশিভূষণকে গ্রেপ্তার করা হলে জেলেরা মিথ্যে সাক্ষী দেয়। তারা বলে যে পুলিশ-সাহেব তাদের জাল কেটে দেন নি। বোটে ডেকে তাদের নাম ধাম লিখে নিচ্ছিলেন। এর ফলস্বরূপ শশিভূষণকে শাস্তি পেতে হয়।

'মিঠেজল : রুপোলী ইলিশ' (১৩৭১) গল্পের শুরুতে দেখা যায় যে বর্ষণমুখর গহিন রাতে ষাঁড়াষাঁড়ির বান-ডাকা ফেনা ওগরানো নদীতে ইলিশের জাল ফেলে উদ্দাম চিৎকারে গান জুড়েছে কলিমদ্দি মাঝি-

'আমি যদি পাখি হইতাম রে
তোরে লয়ে যাইতাম রে ভিনদেশে
হাড় কালো হইল আমার
তোরে ভালবেসে...'[৩৮]

জালের স্রোতে হাত দিয়ে পরখ করে কালিমদ্দি। আঠারোখানা নৌকা জাল পেতেছে গদাখালিতে। এছাড়াও রাইপুর, পুঁটেমাঝির ঘোলে আরো অনেক নৌকা নেমেছে। সাগর থেকে ইলিশের ঝাঁক নদীতে এসে হাজির। পাহাড়ের বরফগলা মিঠে লাল জল নেমেছে। জেলেদের ওপর মহাজনের অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যায় এই গল্পে। মহাজনের নৌকো, জাল-জালের এক বখরা, নৌকোর দেড় বখরা, মাঝির এক বখরা, দাঁড়ির এক বখরা। কুড়িটা মাছ পেলে সাড়ে চার বখরা হবে। মহাজনের একার আড়াই বখরা। আসলে পাঁচ বখরা করে সে তিন বখরা নিয়ে নেবে। তার মানে ১২ টা মাছ তার। কলিমদ্দিরা রায়পুরে মাছ ধরতে গেলে মহাজন তাদের কাছে মাছের ভাগ চায়। কলিমদ্দি মহাজনকে অপেক্ষা করতে বললে তিনটে ইলিশ মহাজন আঙুলে তুলে নিয়ে চলে গেল। অন্য নৌকোর আগের বখরাগুলো বেচে দিয়েছে। ওই তিনটে ঘরে খাবে।

'শামদ্দি জেলে এবং সমুদ্র' (১৩৭১) গল্পে শামদ্দি জেলের সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার কাহিনি পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। গল্পে দেখা যায় যে শামদ্দি জেলের সাতটা সেলে মাছ পড়েছে। দশ কেজি থেকে ষোল কেজি এক একটা মাছের ওজন। জালের দু বখরা, নৌকোর দু বখরা, মাঝির এক বখরা, দাঁড়ি চারজনের চার বখরা। তাহলে মোট ন-বখরা। পনেরো টাকা এগার পয়সা করে বখরা পিছু। সারাদিনের পরিশ্রমে তাদের মোটে পনেরো টাকা উপার্জন হয়। এইসব মাছ স্টীম লঞ্চে করে ফ্রেজারগঞ্জ, কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবাড়ে নিয়ে গিয়ে হিমঘরে রাখবে। এক টাকায় কেনা মাল ৩ টাকায় ছাড়বে। তাদের কাছ থেকে পাইকের দেশ-গাঁয়ের হাটে বরফ দিয়ে নিয়ে গিয়ে সাড়ে তিন টাকা চার টাকা কেজি বিক্রি করবে। শামদ্দি আক্ষেপ করে বলে-

'আমরা সাগর ছেঁচে মুক্তো কুড়োচ্ছি, বাইরের লোক মজা মারতেছে।'[৩৯]

একশোজন জেলে সাগরের সঙ্গে লড়াই করে মাছ ধরছে। তাদের গায়ে জামা নেই, কাপড় নেই, অন্ন নেই, হিমঘর নেই বলে তারা মাল রাখতে পারে না। মাইনেভুক্ত সরকারী লোক তুফান ভরা সাগরে, এই কাঠের 'নৌকো' নিয়ে লড়াই করে সারা দেশের মানুষের মুখে রোজকার মাছ ধরে এনে যোগান দিতে পারবে না। সাগরে মাছ আছে না নেই সেই রিপোর্ট তারা দিতে পারে। জেলেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম করে সমুদ্রে নেমে যায় নৌকো নিয়ে। ফেলে আসা পরিবার পরিজনের চিন্তাকে পেছনে ফেলে তারা সারারাত সাগরের জলে মাছ ধরে।

শওকত ওসমানের লেখা 'সৌদামিনী মালো' (২০০৯) গল্পে সৌদামিনী মালো নামে চার্চের সিস্টার মারা যাওয়ার পর চার্চ তার সম্পত্তি নীলাম করছে। সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধিবাসিনী। সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো পেশায় আরদালি ছিলেন। সৌদামিনীর বয়স চল্লিশ আর জগদীশের বয়স পঞ্চাশ হলেও তাদের কোন সন্তান ছিল না। ফলে তাদের বিপুল সম্পত্তি ভোগ করার কেউ ছিল না। জগদীশ মারা যাওয়ার পর তার জেঠতুতো দাদা মনোরঞ্জন মালো সেই সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করেন। সেইজন্য তিনি অনেক পাঁয়তারা কষেন। কিন্তু সৌদামিনীর তেজের কাছে হার মানতে বাধ্য হন। মনোরঞ্জনের চক্রান্তে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে সৌদামিনীর কুড়িয়ে পাওয়া পুত্র হরিদাস ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে এক শূদ্রাণী। সৌদামিনী গ্রাম্য সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জোর দিয়ে হলপ করে বলে হরিদাস শূদ্র। পরে সৌদামিনী জানায় যে হরিদাস শূদ্র নয় আবার ব্রাহ্মণও নয়। হরিদাস আসলে মুসলমান। এরপর হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলে সৌদামিনী খ্রিস্টান হয়ে যায়। তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখে দেয়। কিন্তু হরিদাসকে হারানোর যন্ত্রণায় সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতো হরিদাসকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

আল মাহমুদের 'কালোনৌকা' (১৯৯৭) গল্পে জেলেদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সূর্যাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলে নৌকাগুলো ফিরে আসে। ফৌজদারহাটের কাছেই জেলেপাড়া। এই আবাসস্থলের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীহীন কয়েকটা শীর্ণ চালাঘর। খুব নিচু করে তৈরি। দূর থেকে স্তব্ধ কালোরেখার মতো দেখা যায়। এই গল্পে জেলে রাসু জলদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। রাসু পঞ্চাশ বছরের সমুদ্রচারী জেলে। এই বয়সে গায়ে যতটা সামর্থ্য থাকে,

রাসু তার চেয়েও শক্তিশালী পুরুষ। তার পেশল হাত-পায়ে বার্ধক্য দূরে থাক, মধ্যবয়স্কেরও কোন চিহ্ন নেই। বিশাল পুরুষ। তার পাথরের মতো ছাতি। দাঁড়ের কাঠের মতো মোটা কবজির ওপর শিরা ফুলে আছে। লোকে বলে একটানা সাতদিন নাকি রাসু মাঝি দাঁড় বাইতে পারে, শুধু সময়মতো খেতে দিলেই হল। সন্দীপ থেকে রাসু সতী জলদাসীকে বিয়ে করে এনেছিল। জেলেদের মেয়েরা যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ হয়ে থাকে। তার মধ্যে সতী ছিল এক নামডাকঅলা জলদাস পরিবারের মেয়ে। সতীর মতো নারী-শরীর সচরাচর দেখা যায় না। সতীদের গ্রাম থেকেই কৃষ্ণ জলদাসের মেয়ে কালীকে দামোদরের বউ করে আনল রাসু। জাল নৌকার কাজ আর শুঁটকির চালানে কালী স্বামী-শ্বশুরকে সাহায্য করত।

পরিতোষ বিশ্বাসের 'গোত্রান্তর' (ভাসমান ২০০০) গল্পে জাতপাত সম্পর্কিত সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। দিব্যেন্দু নামে একটি যুবকের পরিচয় পাওয়া যায় যে ইউনিভার্সিটি তে পড়ে। ক্লাসের সকলে জানে সে হায়ার কাস্ট অর্থাৎ উচ্চ বর্ণ কিন্তু সে জেলে। নিজেকে শূদ্র বলে পরিচয় দিতে তার মাথা হেট হয়। সে জেলে একথা জানলে সবাই ওকে ছোট ভাববে, ঘেন্না করবে। যদিও মানুষ এখন অনেক সচেতন ও সংস্কারমুক্ত। তবুও তার কোথাও বাধে। দিব্যেন্দু নিজের পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করলেও তার সহপাঠী কাজল কিন্তু জানায় যে তার বাবা বৈদ্য আর মা মালো পরিবারের মেয়ে। সেই কারণেই এই সম্প্রদায়ের প্রতি তার টান বেশি। কাজল তার নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত না হলেও দিব্যেন্দু পারছে না। জাত পাত বলে কোন কুসংস্কার নেই তার মধ্যে। দিব্যেন্দু নিজের দেশের লোক মহাদেব দা কেও চিনতে অস্বীকার করে। শেষপর্যন্ত দিব্যেন্দুর আত্মদহন হয় এবং সে কাজলের কাছে স্বীকার করে যে সে সিডিউল কাষ্ট মালো।

পরিতোষ বিশ্বাসের 'প্রতিবাদ' (ভাসমান ২০০২) গল্পে এক মালো পরিবারের বিবরণ পাওয়া যায়। গগণ মালো মালোদের প্রধান। তাকে জিজ্ঞেস না করেই মণ্ডলরা মাছ ধরেছে। সেই নিয়ে মণ্ডলপাড়ার সঙ্গে তাদের বিবাদ হয়। এতদিন মালোরা প্রতিবাদ করতে পারে নি। গগণই সেই প্রতিবাদ করেছে। গগণের জন্যই তারা সঠিক বিচার পায়। মাছ মেরে খায় বলে যে তারা কারোর থেকে ছোট নয় সেকথা তারা মণ্ডলদের বুঝিয়ে দেয়।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' (২০০৩) গল্পে বকখালি থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে জম্বুদ্বীপের পরিচয় পাওয়া যায়। অঘ্রান থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মাছ ধরা আর মাছ শুকনো করার কারবার চলে। কয়েক বছর আগেও ঐ দ্বীপ নিঃসঙ্গ ছিল। পয়সার ধান্ধায়

ঘোরা এপারে চলে আসা নোয়াখালি আর চট্টগ্রাম জেলার লোকজনের নজরে পড়ে এই দ্বীপ। এরপর এখানে মাছের ব্যবসা শুরু হয়। ধীরে ধীরে মহাজন, দাদনদার, পাইকার, ফড়ে আসে। মাছের কারবার চলে। মাছধরার নৌকাগুলো দক্ষিণ সমুদ্রে যায়, মাছ ধরে। মাছ শুকোবার কারবারিরা দ্বীপের মধ্যে কিছুটা এলাকা বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে মাছ শুকোয়, ঝুপড়ি বেঁধে থাকে। একেই বলে খুঁটি। জম্বুদ্বীপের খুঁটিগুলো থেকে নামখানা বা কাকদ্বীপ হয়ে কলকাতা চলে যায় মাছ।

এছাড়া প্রফুল্ল রায়ের লেখা 'চোর' (১৪১৫) গল্পের চরিত্র খলিল মেঘনা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। সে পেশায় একজন জেলে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'বস্ত্রহরণ' (২০১২) গল্পে জেলেদের প্রসঙ্গ রয়েছে। গল্পে ভেরিতে বারো চোদ্দজন জেলে টানা জাল নিয়ে কায়দা কসরৎ করে দেড় দু কেজি ওজনের এক একটা ভেটকি ভাঙন তোলে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। জেলেরা কেউ জাল বোনে, কেউ ঝুড়ি বানায়। জেলেরা মাছ নিয়ে সারাদিন ঘাঁটাঘাঁটি করলেও শুদ্ধাচার নাকি সবার আগে প্রয়োজন। এসব ব্যাপারে জেলেদের মধ্যে সংস্কারবোধ টনটনে।

গ) কাব্যে মালো জাতি

কবিতা বিশ্বব্যাপী মানবিক অনুভূতির চিরস্থায়ী প্রকাশ। ভারতীয় আলংকারিকরা কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আনন্দবর্ধনের মতে 'বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্'। অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। কেউ কেউ মনে করেন অলংকৃত বাক্যই কাব্য কিংবা রীতিযুক্ত বাক্য কাব্য। শাস্ত্রবেত্তাদের মতানুসারে বলা যায়- শব্দ ও অর্থ, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার সাহসী-দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষ হল কবিতা।

অন্তরের গভীরতল থেকে তুলে আনা মণিরত্নকে শব্দের সাজ পরিয়ে দিয়ে কবিতা তৈরি হয়। তা অনুভববেদ্য জগতে আঘাত করে। কাব্যসত্য সম্পর্কে আমরা বলতে পারি কবিতা বস্তুসত্যকে ভাবসত্যে পরিণত করে। আর কাব্যসত্য আমাদের এক চৈতন্যময় অনুভূতির জগতে পৌঁছে দেয়। যে জগত অনির্বচনীয় জগত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছু লৌকিক ছড়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছড়াগুলির মধ্যে মাছও আছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে আমাদের ভাষা সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকতে পারে।

কিন্তু তাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেটি রবীন্দ্রনাথের নিকট অধিকতর আদরনীয়বোধ হয়েছিল। সহজ সরল ভাষায় না বলা অনেক কথার বাঙ্‌ময়তায় মূর্ত হয়ে আমাদের মনের দুয়ারে কত কথাই না বলে যায়। যেমন খোকা মাছ ধরতে গেলে তার গায়ে কাদা লাগবে কলুর বাড়ি গিয়ে তেল নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দাম দেবে তার দাদা।

একবার ঠাকুর পরিবারের সবাই শিলাইদহের বাড়িতে গেছেন। সেই সময় কবিপুত্রের গৃহশিক্ষক পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় জমিদার-কুঠিবাড়ির এক কর্মচারি যজ্ঞেশ্বরের হাতের রান্না খেয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় বসেই এ খবর জানতে পেরেছেন। কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল। রবীন্দ্রনাথ যজ্ঞেশ্বরকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, শিলাইদহে যাওয়ার পথে তিনি তার নিকট খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবেন। তার জন্য ভাতের সাথে কী কী রান্না করতে হবে তাও লিখে দিলেন। ডালবাটা ভাতে, আলুভাতে, শাকভাজা ও চুনোমাছের ফর্মাস। মাছ যে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল তাঁর লেখাতেই বোঝা যায়। বিশেষ করে মাছ নিয়ে ছড়াগুলি যে মাছের মতই প্রিয় হয়ে ওঠে সকলের কাছে। ‘খাপছাড়া’ (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থের ২ নং কবিতায় ভাজা ভেটকি, চিংড়ি, ইলিশ প্রভৃতি মাছের কথা পাওয়া যায়। ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের ‘ছেলেটা’ কবিতায় জলের ঝিলিমিলি দেখে তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে। মাছগুলো খেলা করে। ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় বলা হয়েছে যে ঝিলের জলে বাঁধ বেঁধে ডিঙ্গি নিয়ে জেলে মাছ ধরছে।

বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক সাতকড়ি দত্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি বাড়ানোর জন্য দুটি চরণ লিখতে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন যে মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে। এখন তারা সুখে জলক্রীড়া করে।

বাংলার ডাঙায় সোনার ফসল, জলে নানান রকম মাছ, প্রকৃতির আনন্দময় এমন রূপে ধন্য হয়েছিল বাংলা। ধন্য হয়েছে বাঙালি কবিরা। ‘ছড়ার ছবি’র (১৯৩৭) ‘বালক’ কবিতায় তপসে মাছ, ‘পদ্মা’ কবিতায় ইলিশ মাছ, ‘তুমি’ কবিতায় শুঁটকি মাছ, ‘আকাশ প্রদীপ’ কাব্যগ্রন্থের ‘সময় হারা’ কবিতায় কাৎলা মাছের কথা এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভোজনরসিক ছিলেন, যাঁরা তার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই জানতেন। একবার রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র সেনের রানাঘাটের সরকারি বাংলোয় এসেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেনের স্ত্রী রবীন্দ্রনাথকে ৫৩-রকম পদ রান্না করে সেবা করিয়েছিলেন। ৫৩-রকম পদে ঠিক কী কী ছিল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে এটুকু বললে মনে হয় বেশি বলা হবে না, বাঙালির কাছে মাছের স্বাদ ব্রহ্মস্বাদের সমান। 'ছড়া' (ভাদ্র ১৩৪৮) গ্রন্থের কবিতায় পাওয়া যায়-

'মাছ এল সব কাৎলাপাড়া
খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি
ডিগবাজি খায় কাৎলা,
চাঁদা মাছের সরু জঠর
রইল না আর পাৎলা।'[৪০]

এর সঙ্গে কাতলা মাছের ডিগবাজি খাওয়ার অনবদ্য এক ছবি যার শিল্পীও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছড়ার প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই মাছের কথা। চিতল প্রসঙ্গে কবি তার সরস স্বাদের কথা মাথায় রেখে বলেছেন- এ যে মিঠাই গজার ছোটভাই। জামাইষষ্ঠী পার্বণে অধ্যাপক জামাইকে শাশুড়ি ও শ্যালিকারা আদর করে মাছের মুড়ো দিচ্ছেন এবং তা মুখে দিয়েই জামাই কীভাবে তত্ত্বকথা বলতে শুরু করেছেন তার কৌতুক মেশানো ছবি কথা ও ছন্দ দিয়ে কবি এঁকেছেন। আর একটি ছড়া-

'খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।'[৪১]

কিংবা 'কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে-
মেছনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে'[৪২]

কবি সবার আগে বাঙালি, পরে ভারতীয় এবং সবশেষে বিশ্বের। তিনি বিশ্বকবি। পৃথিবীর আর কোনো কবি একটা জাতির সমস্ত অস্তিত্বকে অধিকার করে এভাবে বিরাজ করেনি। তাই তার রচনায় মাছের প্রসঙ্গ যে অনিবার্যভাবে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি মিশিয়ে যে সত্য চাক্ষুষ করেছেন তাই এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। এ যেন সুন্দরের সুনির্দিষ্ট এক উপলব্ধি। তার চরিত্রে যেমন কোথাও অসংযম দেখা যায় না, মাছ নিয়ে সে চিন্তার ক্ষেত্রেও সেই সংযম যেকোন অসতর্ক পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। এ থেকে তার মৎস্যপ্রীতি বোঝা যায়, বোঝা যায় তার বাঙালিয়ানা।

জসীম উদ্‌দীন এর 'রাখালী' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়' কবিতায় জেলে গাঙে মাছ ধরতে যায় পদ্মা নদীর উজান বাঁকে ছোট ডিঙি নৌকায় চেপে। পদ্মা নদীর স্রোত খুব ভারী। চাকুর মতো ধার, তার ওপর জেলের নৌকাকে পড়তে হয় উজান ভাঁটায়। জলের ওপর শ্যাওলা ভাসে, স্রোতের ফুলও ভাসে। তার ওপর জেলের তরীর পাল হাসে। তার সাথে জেলে ভাসায় ভাটির সুরে গান। জেলেনি বউ হয়ত সেই সুরে হয়তো জেলের সঙ্গেই ভেসে যান। জেলে গাঙে মাছ ধরতে গেলে জেলেনি বউ ঘরের ছায়ায় বসে জাল বোনে। সুতোর পর সুতো দিয়ে দীর্ঘ জাল বোনে। তার সঙ্গে মনেও নানা কথা ভাবতে থাকে। জেলে ঘরে নেই। ভোরে কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জেলেনি বউ ঘুম থেকে উঠে আপন মনে জাল বুনতেই থাকে।

পূর্ব কোণে মেঘ দেখা যায়। বান এল, ঢেউ ডাকল। জেলেনি বউ ঘর থেকে জল বের করছে। ঝড়ের তাণ্ডবে জেলের কুঁড়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। জেলে তার বৈঠাতে টান দিচ্ছে। কবি তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন-

'জেলে গেছে মাছ ধরিতে হায়,
পূব কোণেতে মেঘের গায়ে চক্কর দিয়ে যায়।
বাও ডাকিল, ঢেউঁ হাঁকিল তল তলা নাওখানি,
জেলেনী বউ ঘরের থেকে সেঁচছে তাহার পানি।
বৈষম শাপটজেলের কুঁড়ে ভাঙবে যে এই বেলা!
গাঙের থেকে দিচ্ছে জেলে বৈঠাতে তার পেলা।'[৪৩]

গাঙে জেলের নৌকা ভাসে। ঘরে জেলের প্রিয়া। জেলের মন সেখানেই পড়ে আছে। জেলে ভাবে ঘরের কথা, বউয়ের কথা। ঝড় ধীরে ধীরে থেমে যায়। জেলেরা গঙ্গা দেবীর পুজো দেয়। হাজরাতলা দুধে ভেসে যায়।

জেলে বাঁকে মাছ ধরে। জেলেনি বউয়ের মন ভালো নেই। সে কাউকে বলতে পারে না। জাল বুনতে ভুল হওয়াই, সুতো ছিড়ে যায়। জেলের বাঁকেই তার মন পড়ে থাকে। তার স্বামী অন্য দেশে থাকার বিরহে জলের ঘাটে কলসী করে জল ভরতে গিয়েও তার ইচ্ছে করে কলসীটিকে মাথার চুলে বেঁধে ভাসিয়ে দিতে।

জেলে বাঁকে মাছ ধরতে যায়। কূল হারা সেই গাঙে কত কার বংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। নদীর জলের গভীরতায় জালে তাল পাওয়ার ব্যথার থেকেও জেলের মনের ব্যথা আরো গভীর। নদী পেরোনোর পর ব্যথার নদী এতই উথল পাথল করছে যে পাড়ি জমছে না। মাটির মায়া যে ভাটিয়ালি সুরে কাটলো সেই ভাটিয়ালি সুরই তার মনকে গ্রামের দিকে আবার টেনে নিয়ে যায়।

জসীম উদ্‌দীন এর 'হাসু' (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়' কবিতায় দেখা যায় যে রাত দুপুরে মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ হয়। পৃথিবী জুড়ে বিদ্যুৎ চমকায় জোর দাপটে। বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম শব্দে। সেই বৃষ্টির শব্দে বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়। সে আর এক মুহূর্তের জন্য ঘরে থাকতে পারে না। বিলের জলে রূই, কাতলা মাছ ফাল দেয়, কই মাগুরের দল গাঁয়ের খাল ধরে সাঁতরে বেড়ায়। বছিরদ্দি একহাতে তীক্ষ্ণ টেটা নিয়ে আর এক হাতে মশাল জ্বেলে মাটির ওপর দিয়ে বীরের দাপটে ছোটে। তাল-তলাতে গলায় দড়ি দিয়ে তাঁতীর বধূ মরেছিল। সেই ভয়ে তার নাক, হৃদয় কাঁপে। শেওড়াবনের পেত্নীর নাচ, হাজরাতলার পিশাচের শিস, বিলের ধারে আগুন জ্বেলে ভূতের আনাগোনা কিছুতেই বছিরদ্দি ভয় পায় না। মশাল জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকার ঠেলে বছিরদ্দি একলা চলে জোর দাপটে চরণ দুখানি ফেলে। হাতে তার তীক্ষ্ণ টেটা, গায়ে মোষের মত জোর। চোখ দুটিতে উল্কা জ্বলে এবং তা দেখে যমদূতেরও ঘোর লাগে। রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ মারতে যায় সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে। কবি এই কবিতায় তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন-

'দূর হতে তার মশাল জ্বলে ধকো ধকো রাতের কালো ছায়।
বৃষ্টি-শিলা মাথায় পড়ে, তুফান চলে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মতো,
রয়ে রয়ে বিজলি জ্বলে ইন্দ্র ডাকে আঁধার করি ক্ষত;
শ্মশান-ঘাটায় পেত্নী নাচে, বটের শাখে পিশাচ দোলা খায়,
রাতদুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়।'[৪৪]

তাঁর 'মাটির কান্না' (১৯৫১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জলের কন্যা' কবিতায় পুরাতন জালে তালি দিতে দিতে জেলে বৌ জেলের গায় ঢলে পড়ে। জেলে বৌ এর মন মিহিসুরে গান গায় আর স্রোতের বাঁকে ধেয়ে যায়। কবিতার পঙ্‌ক্তি-

'পুরাতন জালে তালি দিতে দিতে ঢলিয়া জেলের গায়,
জেলে বো'র মন মিহিসুরি গানে উজানীর বাঁকে ধায়।'[৪৫]

সুশান্ত হালদার সম্পাদিত 'ভাসমান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৩ শ শতাব্দীর একটি আরবী কবিতার অনুবাদ করেছেন 'যোদ্ধার গান' (১৯৯৭) নাম দিয়ে। কবিতার পঙ্‌ক্তি-

'অজানা দেশেতে আমারে, জানার গৌরব দিয়াছেন,
মোর রাজত্ব-ছায়া দিয়ে তিনি ধরারে ঢাকিয়াছেন।
অজ্ঞাত ছিনু, অখ্যাত ছিনু, তাঁহারি মেহেরবাণী
দিকে দিকে মোরে বিজয় দিয়েছে আনি।'[৪৬]

'ভাসমান' পত্রিকায় অনাথ বন্ধু পাত্র অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মরণে কবিতা লিখেছেন-

'হারিয়ে তুমি যাওনি হে প্রিয়
স্মৃতি কভুও হবে না ম্লান
কেমনে ভুলিব তোমার কথা
কেমনে ভুলিব তোমার দান।
***
তোমার লেখনি দেখায়েছে পথ
নিলাম তোমার স্মরণে শপথ

শুকাতে দেব না "তিতাস" মোরা
নয়নের জলে আনিব বান।'[৪৭]

পরিতোষ বিশ্বাসের 'ঠিকানার খোঁজে' (১৪০৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ছোট বেলার তেরটি বছর' কবিতায় আমরা দেখি যে পরাণ নদীর কথা বলেছেন যার কাছে ছোট বেলার তেরটি বছর ফেলে এসেছেন। ছোটবেলার হাসিকান্না, ভালোলাগা ভালোবাসা, দস্যিপনার দুরন্ত দিনগুলো মিলেমিশে সুখস্মৃতি হয়ে একা থাকার সময় হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় একদল শাসন না মানা বেপরোয়া দস্যি ছেলের মাঝে। স্মৃতির আয়নায় তার স্পষ্ট জলছবি রয়েছে। ভোরে আযানের সুর শুনে গরু নিয়ে রাখালের সবুজ ধানের আল বেয়ে মাঠের পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। সারারাত্রির ক্লান্তি ঘুম চোখে সুশীল দিলীপ খোকনদের মাছভরতি জেলে ডিঙ্গি নিয়ে ঘাটে ফেরা প্রত্যাশার লক্ষ্য পূরণ দুচোখে তাদের এক চিলতে অনাবিল হাসি, সাদা সিধে সরল কলিম, সাধু, মাণিকের এক বুক ভালবাসা মাখা আদরের দুর্নিবার আকর্ষণে কবি যেন ফিরে আসেন সেই পরাণ নদীর তীরে যার কাছে তার ছোট বেলার তেরটি বছর ফেলে এসেছেন।

সন্তোষ হালদারের লেখা 'আমাদের জীবন' কবিতায় দেখা যায় যে তিনি গরীব মুটে মজুর, ছুতোর, তাঁতী, কামার, জেলেদের কথা বলেছেন ক্ষেত খামারে মাঠে ঘাটে তাদের জীবন কাটে। শীত বর্ষা রৌদ্র ঝড়ে তাদের বুকের মধ্যে রক্ত ঝরে। তাদের পান্তাভাতে নুন জোটে না। সারা জীবন তারা খেটে মরছে। সারা দিন এত খাটুনি শরীরে সহ্য হয় না। প্রতিদিন পেটে পিত্ত পড়ে। শিক্ষা, টাকা কিছুই নেই। শুধু খেটে খাওয়ার জন্যই যেন তাদের জন্ম হয়েছে। পেটের জ্বালায় মরতে হচ্ছে। ঘরের চালায় খড় নেই, জলে থই থই মেঝে। তবুও সংসারে সঙ সেজে থাকতে হয়। সংসারের ভাঙা বেড়ায় শুধু অভাব ঘুরে বেড়ায়। কষ্টে ভরা এই জীবনে দুঃখের শেষ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। পাঁচ দশক ধরে কবি মন্ত্রী-নেতার বাণী শুনেছেন তবুও গরীব গরীব রইলো, রইলো ডুবে অন্ধকারে। তাই তিনি জন্ম থেকে গরীব জীবনটিকে শুধু শাপ-শাপান্ত করেছেন।

পরিতোষ বিশ্বাসের 'ঠিকানার খোঁজে' (১৪০৯) কাব্যগ্রন্থের 'একটি নদীর সাথে দেখা' কবিতায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস অবলম্বনে কবি তিতাস নদী ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চরিত্রগুলিকে তুলে ধরেছেন। কবিতার পঙ্‌ক্তি-

'যেতে যেতে এক নদীর সাথে দেখা।
উচ্ছ্বল যৌবনা তন্বী মেয়ে তিতাস।
চলেছি তিতাসের তীর ধরে এগিয়ে-
যেতে যেতে দেখা-
কিশোর, সুবল কদম আলী আর বনমালীর সঙ্গে।
কিশোরের সেই ছেলে
হাটি হাটি পা, শৈশব পেরিয়ে-
কৈশোরের অনন্ত আজ সাবালক।
কোলকাতার রাজপথে অথবা ঢাকার গুলিস্থানে, দু'একবার
দেখেছি অনন্তকে-।
***
দীর্ঘ ষাট সত্তর বছর ব্যবধানেও ওরা যেন ঠিক তেমনিটিই
সাদা, মাঠা সরলতা মেখে আছে।
অনন্তর মা, সুবলার বৌ বাসন্তীর-
আপন করা ভালবাসা আদর-
অপত্য স্নেহের, এতটুকু ঘাটতি নেই।'[৪৮]

'ঠিকানার খোঁজে' (১৪০৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পরান নদী' কবিতায় কবি পরান নদী অর্থাৎ বাংলাদেশের কপোতাক্ষ নদীর কথা বলেছেন। রাড়ুলী, কাটিপাড়া, বাঁকা খেরশার গা ছুঁয়ে যায় কবির প্রাণের নদী কপোতাক্ষ। কপোতাক্ষের জলে জানু ডুবিয়ে, কখনো মাথা ছুঁয়ে নদীর সঙ্গে মিতালী হত। পরাণ নদী ছোট হলেও ছোট নয়। কবি তার কবিতায় পরান নদীর বর্ণণা দিয়েছেন এভাবে-

'কলকলিয়ে ছলছলিয়ে মন ভিজিয়ে
অতলতলের তল ছুঁয়ে যায়
তিরতির ঝিরঝির পরান নদী গো পরান নদী!
জগৎ ধরা বুকে আকাশখানি মুখে
ছোট্ট হলেও নয় সে ছোট, ভাবতে পার খড় কুটো
অইতো অই পরান নদী- আমাদের পরান নদী!
ঘর বাঁধে না ঘরের মতন

বাউল যেন ছন্নছাড়া,
বিশ্বভুবন আসন ছাওয়ায়
উদাসী সে পথিক পরান
আকাশ নদী পরান নদী
অই অইতো তিরতির পরান নদী কপোতাক্ষ!'[৪৯]

বিধান রায় 'অমাবস্যায় জ্যোৎস্নার আল্পনা' (২০০৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সনাতন মাঝি' কবিতায় বলেছেন যে চর হল নদীর কলঙ্ক। নদীর কলঙ্ক নিয়ে বার বার চর জেগে উঠলে মাঝিদের আয়ু কমে আসে। একদিন অগোচরে সনাতন মাঝি সেই সত্য উপলব্ধি করে নদীর পাড়ে অবলীলায় বেদনা জ্ঞাপন করে-

'প্রতিবেশী প্রদীপের আলোয় ঋণ বাড়ে তার
গৃহে।

জল ভাগাভাগি-কত আইন হল দেশে
সে কানুনের গুঁড়ো অদৃশ্যে ঘোরে।

মৎস্য বংশের পুনর্জন্মহীন শোকে
জেলে জীবনে শূন্য পরম্পরা-
দীর্ঘ বালুপথে শুয়ে আছে
মরা নদীর ছাপ...' [৫০]

দিলীপ দাস তার 'রক্তের ভেতর শুয়ে থাকা নদী' (২০১০) কবিতায় তার রক্তের ভেতর এক নদী দিনরাত খেলা করে জানিয়েছেন। কবির বর্ণনায়-

'জলের নিঝুম তলে শালুক ডগায়
গা মাজে মীন রূপসীরা।
শ্যাওলার আদর মেখে বৈচা-দারকিনা
নীরব নক্‌শা বুনে জলের চাদরে।
তারপর এ নদী স্থির-নীর নিজ অন্তরের শীতে।'[৫১]

ঝর্ণা বর্মণ তার ‘স্বপ্নের তিতাস’ নামক কবিতায় বলেছেন যে তিতাস জীবনের ছবি আঁকে। অকূল গাঙে যারা নৌকা ভাসায়, বাড়ি-ঘর প্রিয়জন ছেড়ে নতুন করে ঘর তৈরি করে জলের ভিতে, জীবনের অন্য নাম তৈরি করে। সেইসব খেটে খাওয়া মানুষেরা তিতাসের পাড়ে একে একে ভিড় করে। ঘাটে ঘাটে অকথিত জীবনের কত গাথা তৈরি হয়। সেই সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাও বলেছেন। তাঁর শরীরে রাজরোগ বাসা বাঁধা সত্ত্বেও এর ভয়ঙ্কর পরিণাম জেনেও অকুতোভয়ে দৃঢ়হাতে লিখে গেছেন নিপীড়িত মানুষের কথা। তিতাস শুকিয়ে গেলেও তিতাসের বুকভরা জল, তিতাসকে কেন্দ্র করে রঙীন মিষ্টি স্বপ্নেরা ঘুরে ঘুরে আসে, জলের মতো কলকলিয়ে কথা বলে। স্বপ্নেরা ঘুরে ফিরে আসে। জলের মতো কথা বলে।

লক্ষ্মণ কুমার হালদার ‘রাজমুকুট’ (২০১২) কবিতায় অদ্বৈত মল্লবর্মণকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন-

‘মল্লবীরের জয়গান গাহিয়াছ
তুমি আজ নাই।
তবু এত নাম তিতাস নদীর নামে
আমরা অমর।
তুমিও রেখেছ কৃতি কৃত্তিবাস সম
হে বন্ধু মহান;
তুমি যে অজেয় তাই তোমারে স্মরিয়া
ভরে ওঠে প্রাণ।’[৫২]

লিলি হালদার তার ‘গহীন জলে মৎস্যকন্যা’ (২০১২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলিতে মালো বা জেলেদের জীবিকা, জীবনযাত্রার ছবি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘চলেছি দূর সাগরে’ কবিতায় আমরা দেখি যে এক মালোর জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। সমুদ্রের ডাকে তার ঘরে থাকা সম্ভব নয়। তার হোগলার ঘরে টেমি জ্বলে। সে এতকাল টানাজাল টেনেছে। বউকে ঘরে রেখেই সে দূর সাগরে পাড়ি দেয়। রাতের জোয়ার যেন নিশির ডাক। রাতে বিছানা থেকেও না ঘুমিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। মাছের আনাগোনা দেখে মনে হচ্ছে যেন ঢেউ এর ওপর ভাত ফুটছে। মাছ ধরতে যাওয়ার আগে মালো তার বউকে বলে গেল সে ভাতের জোগাড় করতে যাচ্ছে। চাঁদের আলোর সঙ্গে মাছ ঝিকমিক করে। নদী এঁকেবেঁকে চলে মুগ্ধ ফণা বিস্তার করে। সে মাছ পাওয়ার আনন্দে বউকে বলে জলের আকাশে সাদা সাদা শস্যকণা হাসে।

‘স্বপ্ন’ কবিতায় দেখা যায় যে নদীর উজানে পুঁটি, খলসে প্রভৃতি মাছ ধীরে ধীরে চলে কারণ জল অত্যন্ত গভীর। রোদ বৃষ্টিতে রামধনু জলের আকাশে দেখা যায়। নদীর মাঝে অসংখ্য স্বপ্ন নিয়ে জেগে ওঠে মায়াবিনী চর। অসংখ্য মাছ সেই চরের বালির ওপর শুয়ে আছে। মাছ ধরার জন্য মালোরা ঘর ছেড়ে প্রবাসে গিয়েছে। তারা বাতাসে নিজেকে উজাড় করেছে মাছের গন্ধ গায়ে নিয়ে। স্বপ্ন যেমন অভিমানীর মতো সব ফেলে ছোটে। জগৎ যেমন মহাশূন্যে ছোটে তেমনি মালোরাও জলে ভেসে চলে। তারা একা একা জলে ভেসে চলে ও জলের শব্দে ডেকে মৎস্যকন্যার সন্ধান করে। মীন অর্থাৎ মাছের গন্ধ আজন্মকাল মালোদের গায়ে লেগে থাকে।

‘জীবন-কথা’ কবিতায় দেখা যায় যে মালোদের পেটে খিদে আছে, মনে খিদে আছে। বেড়জাল নিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছতে হয়েছে। সারারাত আকাশের সঙ্গে জেগে থাকতে হয়। সারাক্ষণ স্রোতের সাথে কথা বলতে হয়। তীব্রস্রোতে মন গতিহীন হয়ে পড়ে। ভোর হলে ঘরে ফিরে যাবে। বহু যুগ আগে কোন এক রাতে কালো শরীর নক্ষত্রের আলোয় ভেসেছিলো। তার আর ঘরে ফিরে যাওয়া হয় নি। জলের গভীরতায় তাকে হারিয়ে যেতে হয়েছে। তার দুহাতে বাঁধা ঘর-সংসার পড়ে আছে। জলে তারার মতো চাঁদ জেগে থাকে। সাগর অত্যন্ত গভীর। সেখানে জল আছে অগাধ।

‘প্রকৃতির খেলা’ কবিতায় মালোদের দুরাবস্থার কথা বলা হয়েছে। আড়াআড়ি নদী জুড়ে গালশা ডোবা। ইলিশ মাছ জালে পড়লে মালোদের ধার শোধ হবে সেই আশায় মালোরা মাছ ধরে। সাদা কাগজে টিপ সই দিয়ে মহাজনদের কাছে ধার করতে হয়। সেই ধারের পরিমাণ বাড়িয়ে তিনগুণ লেখা হয়। দিনের বেলা দিনযাপনের চিন্তা আর রাতে জলে ভাসার চিন্তা। নদী জুড়ে আড়াআড়িভাবে গালশাজাল পাতা। ইলিশের আশায় মালোদের বসে থাকতে হয়। সাধনা করতে হয়। জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ় এলে জলে রূপালি মাছ পাওয়া যায়। পাড়ে পাড়ে কাশফুলের সমারোহ দেখা যায়।

‘মেঘের আলোর উৎসব’ কবিতায় বর্ষাকালের আগমনে মালোপাড়ার বিবরণ দিয়েছেন কবি। শ্রাবণের মেঘ বৃষ্টির ধারা বয়ে নিয়ে আসে। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বৃষ্টি-ধোয়া জলে দগ্ধ শরীর ঘুমিয়ে পড়ে। মালোদের পাড়ায় তারাদের উৎসব শুরু হয়। বৃষ্টির ঝাপটায় মালোপাড়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন-

'বৃষ্টির ঝাপটায় নির্ঘুম চোখ
চকচক করে ওঠে জেলেনির মুখ
বিদ্যুৎ চমক লাগে জেলে-পাড়া জুড়ে
ঘন তমস-আলো জাগে ছোট কাঁচা ঘরে।'[৫৩]

নতুন জলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছের উৎসব শুরু হয়ে যায়। স্রোতের বিপরীত উৎসমুখে মালো পাড়াকে জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। নিদ্রাহীন মেঘের আলোয় পুড়ে তাদের জীবন কাটাতে হয়।

মালোরা বৈষ্ণব। তারা হরিনাম করে। লিলি হালদারের 'রাতের গান' কবিতায় মালোপাড়ায় হরিনামের কথা বলা হয়েছে। উঠতি মেয়েদের মন গাবের জলে যেন রঙিন হয়ে উঠেছে। মেয়েদের মন আষাঢ়ের নদীর মতো এলোমেলো ভাসে। মালোপাড়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন-

'দিন এখানে রাত
বয়সী পুরুষ চাটাই মাদুরে
গতরাতের নির্জন বেঁচে থাকা
ভাঙা রান্না ঘরে

অবসরে সুতো কাটা
আঁচলে তুলে আনা জল
তেল সিঁদুর... এলো খোঁপা
শালুক... শতদল।'[৫৪]

জ্যৈষ্ঠ মাসে খেপলাজালে মালোরা শিঙি মাগুর মাছ ধরে। জ্যৈষ্ঠ মাসে নদীর জল শুকিয়ে গেলে মালোদের দুরাবস্থার শেষ থাকে না। মহাজনদের দেনা শোধ করার চিন্তা তাদের গিলে খায়। 'অন্যদিনে' কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়-

'জলের নীচে নরম থাকো
জল শুকোলে কাঠ
আমার বাছা খাবে কি

কোথায় পাবো ভাত?

কিষাণ গায় নৈলা গান
নদী অজগর
নিশ্বাসে সে গিলে খায়
মালোপাড়ায় ঘর।'[৫৫]

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে নদীর মতো বিলও শুকিয়ে যায়। 'নদী শাড়ি ধার চায়' কবিতায় দেখা যায় যে টানাজাল নিয়ে বাড়ির জেলে বৌ-মেয়েরা গাঙে ভাসে। নদীর এক পাড়ে যদি হাঙর থাকে তো অন্যপাড়ে মহাজনের ভয়। উতলা বাতাসে যেমন শাড়ি এলোমেলো হয়ে যায় নদীও তেমনি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে শীর্ণ হয়ে যায়। বৌ মেয়েদের কাছে নদী যেন শাড়ি ধার চায়।

'অক্টোপাস' কবিতায় মালোদের দুরাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়-

'বিনজাল পাতা আছে নদী ও খালে
উজানে গেঁয়োজীবন ঠেলাজাল ঠেলে
সন্তানের অন্ন জোগায় রাতের কেরোসিন...
কবে যে মুক্তি পাবে...শোধ হবে ঋণ...'[৫৬]

মালোরা নৌকা ও বেড়াজাল ধার করে মাছ ধরার জন্য এমনকি নিজের জীবনও ধার রাখতে হয় মহাজনের কাছে। 'ধার' কবিতায় মালোদের সেই চিত্র ফুটে উঠেছে-

'অথচ আমার ধারে
জাল ছেড়ে প্রতিবার
তকলির সুতো জোটে না আর

হয় শোধ-নয় প্রতিশোধ
নৌকার পাটাতনে জ্বালানো আগুন
ধার বর্ষায় নেভে বারবার'[৫৭]

'পরান দাসের ভাটিয়ালি' কবিতায় পরান মাঝি ভেসে চলে ভাটার স্রোতে। তার গলায় শোনা যায় ভাটিয়ালি গান। কবির বর্ণনায়-

'নদীর ভাটিয়ালি ঢেউ-এ ঢেউ-এ
ধরা পড়ে সে সুর, জেলে পাড়ার
বৈঠা ও হালে-'[৫৮]

মালোরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে। তাদের পালিত উৎসবের মধ্যে পৌষপার্বণ অন্যতম। কৃষক তার ধান গোলায় তোলে, মালো পাড়া আনন্দে মেতে ওঠে। তাদের দরিদ্র ঘরে উৎসবের সমারোহ। 'পৌষপার্বণ' কবিতায় তার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। মালোরা গঙ্গাপূজাও করে থাকে। গঙ্গাপূজা কবিতায় কবি গঙ্গাপূজার বিবরণ দিয়েছেন। গঙ্গা পূজায় ধান দূর্বা লাগে। নতুন নৌকাকে জলে ভাসানোর আগে প্রসাদের কিছু নুন সাগরে দিয়ে আসতে হয়। বৃদ্ধারা ব্রতকথা বলে, বৌ-মেয়েরা উলু দেয়। সন্তানেরা নতুন পোশাক পড়ে। আকাশে যেমন পাখি ওড়ে তেমনি পালও উজানে ভেসে চলে। বাঁধের ওপর মালোদের কাঁচা ঘর। মালোরা পরিশুদ্ধ হয়ে নৌকা ভাসায় জলে। গলুইতে আবির দিতে হয়। সেই রাঙানো গলুই থেকে জল ছিটে আসে তরুণী বধূর ঘরে।

নদীর পাড়ে বা চরে মালোরা ঘর বাঁধে। সেই ঘর অস্থায়ী। নদীর জলে চর ডুবে গেলে সেই ঘর ভেঙে যায়। নতুন ঘরের স্বপ্ন বারবার পিছু ডাকে। 'ভাঙনেও ভাঙে না সব' কবিতায় আমরা এইরকমই ছবি দেখতে পাই। নদী চরের ঘর ভাঙলেও জীবন দাস নৌকায় নতুন রং লাগায়। ঘর ভাঙার দুঃখে বাতাসীর চোখে জল দেখা গেলেও সে উনুনে ভাত রান্না করে। ঘর ভাঙার দুঃখ থাকলেও সে সেই দুঃখ তারা সামলে ওঠে এবং আবার ঘর বানানোর স্বপ্ন দেখে। কবিতার পঙ্‌ক্তি-

'ভাঙনে ভাঙে না সব
নদীকে ভালোবেসে-নদীর পাড়ে অথবা চরে
ঘর বাঁধে যারা-
সে জীবন ভাটিয়ালি
সে জীবন সুজন বন্ধুর...'[৫৯]

ঘ) নাটকে মালো জাতি

সাহিত্যের স্বতন্ত্র একটি শিল্পরূপ হল নাটক। সাহিত্য জীবনের শিল্প। নাটকও জীবনকে নিয়ে রচিত- জীবনের দর্পণ। নাটকে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তার দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলে। নাটকের প্রাণ হল দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বহীন নাটক শিল্প হিসেবে দুর্বল, ব্যর্থ সৃষ্টি। জীবনকে প্রত্যক্ষত দেখতে, জানতে, বুঝতে নাটকের বিকল্প নেই। দেশ-কাল-সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত জীবন নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাটক মিশ্রকলা- একাধারে যেমন পাঠ্য আবার অভিনয়ও বটে। প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রী ভরত-এর মতে, নাটক হল সর্ব শাস্ত্র, শিল্প, কর্ম ও বিদ্যার সমন্বয়ে রচিত। নাটক জীবন নিয়ে রচিত। তাই সমাজের জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের শিল্পীত রূপ নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাট্যকার শব্দ ও অর্থের সাহচর্যে, তাঁর জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও অনুভব নাটকে রূপায়িত করে পাঠকের মনোরঞ্জন করেন। এই অন্বেষা থেকে নাট্যকার শব্দ ও অর্থের সাহায্যে কল্পনায় অনুভূত জীবন অভিজ্ঞতার একটি বাস্তবসম্মত রূপ প্রদান করেন নাটকে। যেখানে দর্শক-পাঠক দেখতে পান মানব প্রবৃত্তির নানা সংঘাত, প্রতিকূল প্রতিবেশ দৃশ্য অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা নিয়ত রহস্যময় একটি চলমান জীবন। এই জীবনকে তুলে ধরতে নাট্যকার তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেন। চরিত্রগুলি তাদের আঙ্গিক-বাচিকাদি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেন। নাটক তখন দেখা, শোনা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মধ্য দিয়ে শ্রাব্য, দৃশ্য ও কাব্য হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের গভীরতর রসচৈতন্যের সঙ্গে এভাবে যোগ সৃষ্টি হয় নাটকের। তাই নাটকের সমাদর যুগ থেকে যুগাতীত ব্যাপ্ত।

প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত জন্মসূত্রে পূর্ব বাংলার মানুষ ছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সারা জীবনই থিয়েটার, যাত্রা ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি মতাদর্শগতভাবে খুবই সমাজমনস্ক এবং বিপ্লবী মানুষ ছিলেন। শেকড়ের সংস্কৃতি, লোকায়ত চেতনার উপাদান তাঁর কাছে ছিল সচেতনভাবে প্রিয় এবং প্রয়োজনীয়।

বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল চরিত্র অদ্বৈত মল্লবর্মণ কে উৎপল দত্ত জানতেন। তার পাঠবিস্তার এবং স্বজনবৎসলতা উৎপল দত্তকে মুগ্ধ করেছিল। তিতাসে ব্যবহৃত কুমিল্লা-শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা অঞ্চলের এবং মালো সমাজের কৌম জীবনের বিভিন্ন যাপিত-কথন উৎপল দত্তকে প্রাণিত করেছিল।

খ্যাতকীর্তি নাট্যকার নাট্য পরিচালক উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে উৎপল দত্ত নাট্যরূপদানের কাজটি সমাপ্তি করেছিলেন। উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাট্যদল 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পর বিভিন্ন মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯৬৩ সালের ১০ই মার্চ থেকে টানা ৭ দিন নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

তখন দেশ বিভাগোত্তর পরিস্থিতি। বাংলার নানা স্থানে ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। তাদের একটি বড় অংশের স্মৃতি জেগে ওঠে এই নাটকের মারফৎ। উৎপল দত্ত মনে করেছিলেন তিতাসের হাওয়া বৈচিত্র্যের হাওয়া। অনেকেই মনে করেন, উৎপল দত্তের নাট্য প্রযোজনা ব্যতীত তিতাস হারিয়ে যেত। মহান সামাজিক মানব দলিল-'তিতাস একটি নদীর নাম'কে উৎপল দত্ত জনগণের কাছে অমর করে দিলেন। উৎপল দত্ত নাট্যরূপ দেওয়ার সময় মনে রেখেছিলেন, নদী বয়ে যায়- সভ্যতা গড়ে কখনো, ভাঙ্গে কখনো। তিতাসের বহমানতা ও অমরতাকে উৎপল দত্ত কল্লোলের মতো মঞ্চে এনেছিলেন। শিল্প মানেই লড়াই, এ চেতনা থেকে উৎপল দত্ত তিতাসকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। বামপন্থী নাট্যকার উৎপল দত্ত যে মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে তিতাসকে মঞ্চস্থ করেছিলেন সেই কারণেই এখনো 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

এক ভীষণ দায়বোধ থেকে উৎপল দত্ত একাজ করেছিলেন। পারিবারিক উত্তরাধিকারের ক্রোমোজোমের সুতোয় জড়িয়ে ছিল কুমিল্লা ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্য। আমরা জানি উৎপল দত্তের পারিবারিক আদিনিবাস ছিল কুমিল্লা জেলা। অবিভক্ত কুমিল্লা জেলা। শেকড়ের টানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দুর্মর সমাজবীক্ষা।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ নাট্যদল গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে, এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উৎপল দত্ত। ইংরেজি নাটক অভিনয় করতে করতে নাট্যগোষ্ঠীর এটা অনুভূত হয় যে জনপ্রিয় নাট্যদল হয়ে উঠতে গেলে সাধারণ মানুষের কথা এবং তাদের ভাষায় কথা বলাটা জরুরি এবং বাংলা নাটক তা করতে শুরু করে। বাংলা নাট্য জগতে লিটল থিয়েটার গ্রুপের ভূমিকাটি যে স্বতন্ত্র, তার উজ্জ্বল প্রমাণ এই নাটকটি। মঞ্চে যা আগে কোনোদিন দেখা যায়নি। ১৯৬৩ সালে তারই রূপ দিয়েছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে। মঞ্চের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে তিতাস নদী এবং তার পারে বসবাসকারী ধীবর গোষ্ঠীজীবনের রূপ তুলে বাংলা নাট্যমঞ্চে নব দিগন্ত বিস্তার করা হয়েছিল।

মঞ্চে নাটকের গল্পটি এরূপ ছিল- পূর্ব বাংলার কুমিল্লা জেলার তিতাস নদীর তীরের মালো সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, কলহ-প্রেম, কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস উপায়নের প্রয়াস রয়েছে দীর্ঘ উপন্যাসটিতে এবং মঞ্চস্থ হওয়া নাটকটিও এদের নদীতে মাছ ধরা, সুখ-দুঃখ, কুসংস্কারের উপরেই গড়ে ওঠে।

রামকেশব প্রতীক্ষায় আছে, তার ছেলে কিশোর বিদেশ থেকে ফিরে আসবে। বাসন্তীর চোখে জল, কারণ সে কিশোরকে ভালবাসত। গ্রাম থেকে চলে যাবার আগে কিশোর কেড়ে নিয়ে গেছে তার হৃদয়। কিন্তু শোনা গেল কিশোর নতুন গ্রামে গিয়ে বিয়ে করেছে এবং সঙ্গে বউ নিয়ে ফিরছে।

কিশোর ফিরলও বটে কিন্তু সুস্থ অবস্থায় নয়, একেবারে পাগল হয়ে। তার বন্ধু সুবল বলে- খুশি মনেই কিশোর বাড়ি ফিরছিল কিন্তু পথে নৌকো থেকে কিশোরের সুন্দরী বউকে ডাকাতে চুরি করে নিয়ে গেছে, সেই থেকেই কিশোর পাগল হয়েছে।

রামকেশববাবু ছেলেকে সুস্থ করার চেষ্টা করে। তার থালা, ঘটি, বাটি বাঁধা রেখে ওঝা ডাকে, চাল পোড়া, সরষে পোড়া, মারধর সবকিছুই চলে কিশোরের ওপর, কিন্তু কিশোর সুস্থ হয় না।

এমনি সময় সেই গাঁয়েতে আসে মুখঢাকা একটি মেয়ে একটি অনাথ শিশুর হাত ধরে, বলে স্বামীর নাম জানে না। মালোদের পঞ্চায়েতের অনুমতিতেই সে আশ্রয় পায় ওই রামকেশবের বাড়িতে। এদিকে মালোর মেয়ে অবহেলিত থাকতে পারে না তাই বাসন্তীর বিয়ে দিয়ে দেয় সুবলের সঙ্গে, কিন্তু বাসন্তীর মন পড়ে থাকে পাগল কিশোরের ওপর। সুবল তাকে ভালোবাসলেও মনের নাগাল পায় না। বাসন্তী সুবলকে জানিয়ে দেয় যে সে তাকে ভালোবাসে না। মালো কালোবরণ গ্রামের অবস্থাপন্ন লোক, মালোরা অনেকেই তার কাছে মাছ ধরার কাজ করে। ত্রিপুরার রাজার লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে লগ্নিপত্র সই করিয়ে নেয়। সুবল কিন্তু এই চালাকি ধরতে পেরে যায়। তার ফলস্বরূপ কালোবরণ মুখবন্ধ করার জন্য সুবলকে নদীর জলে ডুবিয়ে মারে।

এদিকে পাগল কিশোরের উপর অনন্তর মার অকারণ করুণা দেখে বাসন্তী ধরতে পেরে যায় সেই কিশোরের স্ত্রী। রামকেশব আর একটি অনাথ শিশুকে মানুষ করত নাম

রামপ্রসাদ, সে এক বিধবাকে ভালোবাসত, কিন্তু মালোদের আইনে এটা পাপ, কিন্তু রামপ্রসাদ তা মানতে পারেনি।

কিশোর ঝোঁকের বশে অনন্তর মার হাত ধরে। সতী নারীর অপমান হয়েছে বলে কালোবরণ গ্রামবাসীদের ক্ষেপিয়ে তোলে এবং কিশোরকে মারধর করে, মৃত্যুর আগে কিশোর তার বাবাকে বাবা বলে ডাকে ও চিনতে পারে তার স্ত্রীকে (অনন্তর মা)। মঞ্চস্থ নাটকে এখানেই যবনিকা পড়ে যায়।

অভিনয় শিল্পীরা একক এবং যৌথ কৃতিত্বে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। এই নাটকে দেখানো হয়েছে একটি সম্প্রদায়কে, বহুজনকে নিয়ে এই নাটক, একটি সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ সকলেই এতে উপস্থিত। মালো জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাদের নাচ-গান, সেই সঙ্গে তাদের বেশ-ভূষা, মালোদের ভাষা, আঞ্চলিক কথা বলার টান আশ্চর্যভাবে বাস্তবতার সাথে নাটকে দেখানো হয়েছিল।

সালটা ১৯৬৩, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়, এর আগে বাংলা নাট্যমঞ্চে গোরা, ঘরেবাইরে, গৃহদাহ উপন্যাসের নাট্যরূপদান করা হয়েছে। তবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের লিখিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ একটি কাব্যধর্মী উপন্যাস হওয়ায় এতে নাট্য উপাদান স্বল্প ও বিচ্ছিন্ন। তাই তার নাট্যরূপ দান করার ক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দেয়। কিন্তু এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দান যা ছিল অসম্ভব লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় উৎপল দত্তের পরিচালনায় তা সম্ভব হয়। নাট্যরূপায়ণের জন্য দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ বর্জন করে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, নতুন নতুন ঘটনার সংঘাতও আনতে হয়েছে, সংলাপও সংযোজন করতে হয়েছে। উপন্যাসের ভাষা এবং নাটকের ভাষা আলাদা, তাই পুরোপুরি উপন্যাসের মেজাজ বজায় রেখে মঞ্চে নাট্য উপস্থাপন করাটা অসম্ভব।

এই নাটকের মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর কেড়েছিল, সত্তরের দশকে বাংলা নাট্যমঞ্চে এক অভিনব কীর্তি করে দেখান উৎপল দত্ত। যা গতানুগতিক ধারা থেকে অভিনব ব্যতিক্রম ছিল, অভিনয়ের আসর ছিল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। প্রেক্ষাগৃহের মাঝের পথের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে অন্তত দু ফুট চওড়া বেদী মঞ্চের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নির্মিত করা হয়েছিল।সেই বেদীর প্রান্তের সিঁড়ি দিয়ে নাট্য অভিনেতাদের আনাগোনা, রামকেশবের বাড়ি,

ব্রত পালনের গান গেয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে কোথাও যেন দর্শক ও নটনটীদের ব্যবধান কমে গিয়েছিল, এমতাবস্থায় দর্শকবৃন্দ অনুভব করতে থাকে তারা যেন তিতাস নদীর পারেই বসে আছে এবং মালোদের জীবনটার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে থাকে। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে হলের দুধারে দর্শক আসনের মাঝে যে জায়গা থাকে সেখানে নদীর পারের রাস্তার মতো একটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। অভিনেতারা দর্শকদের সামনে দিয়ে এসে সেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বসে অভিনয় করছে, গান গাইছে ব্যাপারটি অভিনব। শিল্পী ও দর্শকে যেন কোন প্রভেদ নেই, সবই এক করে দিয়েছেন পরিচালক উৎপল দত্ত। এক কথায় উৎপল দত্ত শুধু উপন্যাসের নাট্যরূপ দেননি, উপন্যাসের মর্মবাণীকে অমরত্ব দান করে গেছেন। ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মঞ্চকে তৈরি করা হয়েছিল। উপন্যাসটির গ্রন্থনে ছিল দুর্বলতা। গল্পের মধ্যে ছিল অতি নাটকীয়তা। এত ছড়ানো-ছিটানো বিস্তৃত কাহিনি যে তারই প্রয়োজনে মঞ্চের পরিধিতে বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেইভাবেই মঞ্চ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অবশ্য উৎপল দত্ত নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি এই ভাবনার অনুপ্রেরণা হিসেবে মায়াকোভস্কির থিয়েটার মস্কোর কথা মাথায় রেখেছিলেন। মায়াকোভস্কির থিয়েটারের পরিচালক নিকোলাই অখলপখভ-এর কথা উৎপল দত্ত অনেক ক্ষেত্রেই স্মরণ করেছেন। তবে মায়াকোভস্কির থিয়েটারে ঠিক এই মঞ্চকে কখনো বাড়ানো হয়নি। তবে এরই অনুপ্রেরণা থেকে উৎপল দত্ত তাঁর নিজের মতো করে অন্যভাবে মঞ্চের পরিধির বিস্তৃতির ভাবনাটি মাথায় রেখেছিলেন 'তিতাস'-এর প্রযোজনার সময়।

নাটকে লোকসংগীতের ব্যবহার মালো জীবনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মালো সম্প্রদায়ের আনন্দ উৎসব, ব্রত পালনের গান নাটকে প্রাণ সঞ্চার করেছে। সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্মলেন্দু চৌধুরী জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছিলেন। আলোক সম্পাতে তাপস সেন অনবদ্য ছিলেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উৎপল দত্ত তিতাস নিয়ে যে নাটক লেখেন সেটি কুমিল্লার অভিনয় নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইউসুফের নির্দেশনায় ১৯৯৩-র জানুয়ারি ও নভেম্বরে বেশ কয়েকবার মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি ১৯৯৪-র ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে অভিনীত এবং ওই বছরেই জুনে একাডেমী কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক ১৪০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখী উৎসবেও ওই নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক এটি মঞ্চস্থ হয়েছে।

এ ছাড়া মনজরুল আলমের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাট্য সংস্থা কর্তৃক তিতাস একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়। ত্রিপুরার ননীগোপাল চক্রবর্তীও ২০০২ সালে তিতাস- এর নাট্যরূপ দেন। এছাড়াও তিতাস একটি নদীর নাম নিয়ে যাত্রাপালা রচনা করেন ও নির্দেশনা দেন শ্যামল ঘোষ।

নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও নাট্যাভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য তিতাসে কিশোরের বাবা রামকেশবের চরিত্রে অভিনয় করেন। তিতাস যখন নাট্যরূপ পেল ও মঞ্চস্থ করার জন্যে তৈরি, তখন বৃদ্ধ রামকেশবের অভিনয় কে করবে, দাঁড়ায় সমস্যা। উৎপল দত্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন কেবল বিজনদাই এই অভিনয় করতে পারেন। উৎপল দত্ত ও শোভা সেন উভয়েই এই প্রস্তাবটি নিয়ে গেলেন। প্রস্তাব না বলে বলা যায় দাবি। অনেক সাধাসাধির পর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। এতদিন ছিলেন পরিচালক, এবার হলেন অভিনেতা। বিজন ভট্টাচার্য মহাশয় উৎপল দত্তের উপাধি দিলেন কর্মবীর আলামোহন দাস। জেলেদের উচ্চারণ আর খাঁটি বিশুদ্ধ কলকাতার ভাষা- আসমান-জমিন ফারাক। জীবনযাপন পদ্ধতি ও বিশ্বাসে বিজন ভট্টাচার্যও তাই করেছেন। অদ্বৈত মূল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাঁর মালোজীবন ও পরিপার্শ্ব থেকে। আর বিজন ভট্টাচার্য ১৯৩০ সালে কলকাতায় আসার পূর্বে কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রাম এবং বসিরহাট ও সাতক্ষীরায়। সেখানে তিনি গ্রামবাংলার গানবাজনা, কথকতা, বাবাজীদের আখড়া, শোলার কারিগর, সাপুড়ে জীবন ইত্যাদি যেমন দেখেছেন তেমনি মালোপাড়ার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় যেমন দেখেছেন গ্রাম বাংলার দুই মাইল অন্তর ডায়ালেক্ট বদলে যায় তিতাসে অভিনয় করতে এসে কিংবা রামকেশবের চরিত্রায়ণ করতে গিয়ে তেমনি তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ লাভ করেছেন।

প্রথম থেকেই ‘তিতাস’ জনপ্রিয়। কিন্তু নানা বাঁধাও আসতে লাগল। প্রথম বিরোধ শুরু হল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের রঞ্জিত সিনহার সঙ্গে থিয়েটারের মধ্যিখানে যে ক্যাটওয়াক তৈরি হয়েছে তার অনুমতি তাঁরা দেবেন না। নোটিশ এলো। উৎপল দত্ত নাছোড়বান্দা।

সত্যজিৎ রায়কে নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানালেন। নাটক দেখে তিনি মুগ্ধ। রঞ্জিতকে ডেকে পাঠালেন। রঞ্জিত সিনহা এই নাটককে বেআইনি বলেছেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাকে জানিয়েছিলেন যে এই নাটককে যেমন করে হোক আইনি করা হোক এবং এই নাটক বন্ধ

করা যাবে না। পরে নাটকটি করার অনুমতি পাওয়া গেল। একশো রজনী নাটকটি হৈ-হৈ করে চলল।

অসামান্য নাট্যকার উৎপল দত্ত, বিপ্লবী উল্লাস দত্ত ও সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিনজনের জন্মস্থানই তিতাস নদীর এপার ওপার-তাই উৎপল দত্তই কেবল নতুন ভাবনায় তিতাস একটি নদীর নামের নাট্যরূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর উৎপল দত্ত কৃত নাট্য প্রযোজনাটি সম্পর্কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মূল্যায়ন পাওয়া গেছে। লেখাটির প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে যে কীভাবে নাগরিক মানসিকতা তার সমস্ত আন্তরিকতা সত্ত্বেও তৃণমূলের বার্তা গ্রহণ ও অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে মেলার দৃশ্যটি নাটক থেকে আলাদা করে ধরলে ভারতবর্ষের নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একক। এ দৃশ্য নিয়ে নাট্যোৎসাহীরা গর্ব করতে পারেন। কতো বড় শক্তিমান পরিচালক হলে যে এ ধরনের একটি দৃশ্য মঞ্চে উপস্থিত করা সম্ভব তা না দেখলে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এই দৃশ্যের সামগ্রিকতা ধ্রুপদী পর্যায়ের। পরিকল্পনা, কাহিনীর উচ্চগ্রাম এবং বিন্যাস নাটকের দৃশ্যে এমন জায়গায় গিয়ে উঠেছে যে তা চিন্তা করা যায় না। কিশোরের পাগলামির মুদ্রাগুলো অসংবদ্ধ অথচ আশ্চর্য ছন্দে অনুরণিত। দলের লোকের কিশোরকে খুঁজতে আসা, খুঁজে না পাওয়া এবং তারপরেই কিশোরের আবির্ভাব প্রত্যাশিত। কিন্তু পরিচালনার গুণে পরিচালকের দুর্মর প্রাণশক্তির পরিচয় বহন করেছেন। কিশোরের পিতৃসম্ভাষণের জন্যে রামকেশবের অস্থির মুহূর্তগুলো এবং তারপরের হতাশা দর্শককে সহজেই আন্দোলিত করে। এই ক্ষেত্রগুলোতে সময়ের পরিমাণ জ্ঞানের জন্যে প্রয়োগ প্রধান প্রশংসাযোগ্য।

'তিতাস' প্রযোজনা সম্পর্কে অজিতেশ লিখেছেন যে পিকচার ফ্রেম থেকে নাট্যশিল্পকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টা এবং চতুর্থ দেয়ালকে অস্বীকার করে মঞ্চকে দর্শকদের মধ্যে প্রসারিত করে তাদের অভিনীত নাটকের অংশীদার করে তোলার প্রচেষ্টা এদেশেও আগে হয়েছে কিন্তু তাতে মঞ্চস্থাপত্যের ভূমিকা ছিল না। কিন্তু এই সফলতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে শ্রীনির্মল গুহরায়ের প্রচেষ্টায় লিটল্ থিয়েটারের নাটকগুলোতে মঞ্চস্থাপত্যের শিল্পরীতির যে গণ্ডগোল অন্যান্য নাটকে ঘটে থাকে এ নাটকেও সেটি বর্তমান। মঞ্চস্থাপত্য কখনও suggestive, কখনও naturalistic, কখনও বা কিছুই না এবং কল্পনার বাধাস্বরূপ। প্রথমে

সিল্কের টুকরো দিয়ে তৈরি পর্দার ওপর নদী গাছ ও গ্রাম, তার একটু পরেই মিনার্ভার নিয়মিত লাল পর্দাটি উল্টে দেওয়া এবং তাতে নিচে অন্য কাপড় জুড়ে প্যাটার্ন তৈরি, সেটা উল্টোদিকে পরিদৃশ্যমান আর পিকচার ফ্রেমে তিতাস, আবার উল্টানো লাল পর্দা, আবার নায়কের বাড়ির naturalistic সেট, আবার নদীবক্ষে suggestion, কখনও গ্রাম্যমেলার naturalistic সেট আবার লাল পর্দা ইত্যাদি। শিল্পের দিক থেকে এগুলোর কোন যৌক্তিকতা নেই, একই নাটকে ব্যবহৃত সেটে শৈল্পিক চিন্তা ও মেজাজ এক নয়। বিভিন্ন সেটে অভিনয় ধারারও কোনও পরিবর্তন নেই। সুতরাং মঞ্চ স্থাপত্যের এই বৈষম্য অত্যন্ত স্পষ্ট। গ্রাম্যপথে কাঠের বাক্সগুলোর কাঠের টুকরোর ফাঁক এবং ছুতোর মিস্ত্রির র‍্যাঁদার কাজ প্রত্যক্ষ, ফলত সামগ্রিক নাট্যসৃষ্টির পক্ষে মঞ্চ স্থাপত্যের সামগ্রিকতা বারবার বাধা পেয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের ঝগড়া এবং মেঘনাবক্ষের পূর্বদৃশ্যে এবং মেলার পূর্বদৃশ্যে অভিনীত দৃশ্যগুলো লিটল থিয়েটারের আলোচ্য নাটকের অংশ বিশেষে মহলার মত লাগছিল। কিন্তু নায়কের বাড়ি, মেঘনা ও মেলার দৃশ্য আলাদা ধরলে মঞ্চ স্থাপত্যে অতুলনীয়। তাপস সেনের আলোর যোগ্যতা সত্ত্বেও গ্রাম্যপথের আলো সমতা রেখে বাড়ে কিংবা কমেনি। আবহ সৃজনে নির্মলেন্দু চৌধুরীর সংগীত ছিল খুবই conventional। সামগ্রিক প্রযোজনার নতুনত্বের সঙ্গে সেটি নতুন কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। সাধারণভাবে রূপসজ্জা পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হলেও কলকাতার সেলুনে ছাঁটা চুল দেখে গ্রামীণ লোক ধরে নেয়া ছিল মুস্কিল নাটকে সবাই ভাল করলেও, সুবল মারা যাবার পরের অংশটুকুতে শোভা সেনের অভিনয় মর্মস্পর্শী, কিন্তু উৎপল দত্তের অভিনয় কখনই শ্রীদত্তকে ছাপিয়ে কালোবরণ হতে পারেনি। সাধারণভাবে লিটল থিয়েটার সব নাটকেই চিৎকৃত অভিনয়ের পক্ষপাতী। এ নাটকেও সেটি উপস্থিত এবং সর্বক্ষেত্রে উপস্থিত তার বাহুল্যসমেতই। অভিনেতাদের ইংরেজি ঝোঁকে শব্দ বলার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। একে তো বিভিন্নজন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় কথা বলেছেন, তার উপর আবার পূর্ববঙ্গের ভাষায় ইংরেজি ঝোঁকে শব্দ বলার সব কথা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছায় না। নাটকে উৎপলবাবু এমন সব সংলাপ আমদানি করেন যা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রতাপ সি ঘোষের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে একটা তাৎক্ষণিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত ও অভিনীত হয় অ্যাজিটেশনাল প্লে। গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে তা বাংলায় পরিচিত হয়েছে ‘পোস্টার প্লে’ বলে। এই ধারার নাটক চরিত্রের দিক থেকে হয় আগ্রাসী প্রচারধর্মী। মানুষের মনের খন্ড খণ্ড ক্ষোভকে, ক্রোধকে সংঘবদ্ধ করে তাকে শোষকের প্রতি ঘৃণায় রূপান্তরিত করায় এক শক্তিশালী মাধ্যম। যার ফল উপলব্ধ হয় পরবর্তীতে। তার মধ্যে একটা মাধ্যম নির্বাচনকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের প্রাক্‌কালে পথঘাট, মাঠ-ময়দানে

ভোটের-ইস্যুতে প্রচারে আটকা পড়ে গেছে। কিন্তু অ্যাজিটেশনাল প্লে-র উদ্দেশ্য তো শুধুমাত্র ভোটে লড়া বা জেতা-হারা নয়। গত শতকের তিরিশের দশকে মার্কিন মুলুকে 'লিভিং নিউজ পেপার' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, 'জিংক স্ট্রাইক' নিয়ে, 'নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি স্ট্রাইক' নিয়ে এই ধারার নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছে। যার সাথে ভোটের জয়-পরাজয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ফলস্বরূপ বিশ্ব নাট্যসাহিত্য পেয়েছে ওডেটসের ওয়েটিং ফর লেফ্‌টি-র মতো কালজয়ী রচনা। চিনের বিপ্লবের সময়ে লাল ফৌজের সামনে বা সাধারণ গ্রামবাসীর সামনে ইয়েনানের কর্মসূচী বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে এই ধারার নাট্যাভিনয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বন্দীমুক্তি আন্দোলন, মহিলা শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, হিন্দমোটরের শ্রমিক আন্দোলন, গেস্ট কিন উইলিয়ামসের স্ট্রাইক, দুই বঙ্গের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন, বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণ, মরিচঝাঁপি-র মতো ঘটনা এই ধারার নাটকের উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এগুলোর কোনটাই কিন্তু নির্বাচনী নাটিকা হিসেবে লিখিত বা অভিনীত হয়নি।

এই বহুল বিস্তৃত পটভূমিকে স্বীকার করে ১৯৮৩ সালে উৎপল দত্ত রচনা করেছিলেন 'মালোপাড়ার মা' দলিল নাটক। নাট্যকাহিনি হিসেবে অবলম্বিত হয়েছিল 'সন্ত্রাস'। রতুয়া থানার মালোপাড়ায় সংগঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ। দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরেই এই বিভৎস নারকীয় হত্যাকাণ্ড স্বভাবতই উৎপল দত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সারা বিশ্বে কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত সরকারকে উৎখাত করার ধারাবাহিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সাথে এই সন্ত্রাস সৃষ্টির বহু মিল তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এ নাটক যেমন কোনও কাল্পনিক ঘটনা বা সংবাদপত্রের প্রতিবেদনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি তেমনি কোনও অনুবাদও নয়। উৎপল দত্ত নিজে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গ্রামে উপস্থিত হয়ে আক্রান্ত পরিবারগুলোর জীবিত সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন, সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিয়েছেন, এমনকী পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট ও আদালতে সাক্ষীদের প্রদত্ত বয়ান পর্যন্ত নাটক রচনার উপাদান হিসাবে সংগ্রহ করেছেন। এটা সম্পূর্ণত একটা পূর্ণাঙ্গ মৌলিক পথনাটক। তাই এ নাটকের নাট্যক্রিয়া ও সংঘাতের বাস্তবতা এত হৃদয়স্পর্শী, এত নিদারুণ।

সেবার জেলা পরিষদের নির্বাচনে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র এক আসনের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল কংগ্রেসকে। যারা চিরকাল মাটিতে নাক ঘষে কদমবুসি করেছে, তারা এখন পঞ্চায়েত চালাবে, জেলা পরিষদ চালাবে- এটা কংগ্রেসিরা মেনে নিতে পারছিল না।

আর এটাই বুর্জোয়া বাস্তবতা। বুর্জোয়ারা চাষিকে চাষি হিসাবেই দেখতে চায়, যোদ্ধা হিসাবে কখনই দেখতে চায় না। স্বভাবতই মালোপাড়ার চাষি আব্দুল বারির প্রথমবারের জন্য নির্বাচনে জয়ী হওয়াকে, বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের উত্থানকে, মেনে নিতে পারেনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তার দল। তাই সেই পুরনো কৌশল অবলম্বন। আইনসভায় আগুন দিয়ে জার্মানিতে হিটলার যেমন চেঁচিয়ে ছিলেন কমিউনিস্টরা পুড়িয়েছে বলে, হেমন্ত বসুকে কলকাতায় হত্যা করে যেমন রব তুলেছিল সি পি এম খুন করেছে বলে, তেমনি সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের লোককে খুন করে তার দায় কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে গ্রাম ঘিরে হত্যা। আজকের মতো সেদিনও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে গণরোষের কথা, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের কথা প্রচার করা হয়েছিল। যদিও ঘটনার সত্যতা কংগ্রেস দল বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউই অস্বীকার করেনি, মানে করতে পারেনি। মালদহ জেলা কংগ্রেসের পক্ষে মাসুদুর রহমান ও কমলকুমার ঘোষের স্বাক্ষরিত ছাপা প্রচারপত্র এক্সিবিট হিসাবে উৎপল দত্ত নাটকে হাজির করেছিলেন।

উৎপল দত্ত তাঁর গোটা নাট্যজীবনে দুনিয়াজোড়া ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপ আর তার বিরূদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদকে তার নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে আপামর বঙ্গবাসীর কাছে তাদের মতো করে এনে হাজির করেছেন, ফ্যাসিস্টদের চিনে নিতে সাহায্য করেছেন, তাদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন। 'মালোপাড়ার মা' তার সেই দায়বদ্ধতার ফসল। চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে উৎপল দত্ত বলছেন, যে নাটক এটাকে বলা যায় না। এটা একটা দলিল, ডায়েরি। ঘটনাটা এমনই প্রচণ্ড যে তা নিয়ে নাটক লেখা গেল না। কলমের কালি গেল শুকিয়ে, ক্রোধে-ঘৃণায় ধমনীর রক্ত দপ্ দপ্ করতে লাগল। কালির বদলে তপ্ত রক্ত দিয়ে লিখতে পারলে এটা নাটক হত।

'মালোপাড়ার মা' প্রযোজনা মালদহ তো বটেই, সারা বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার সুফল যে পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে পার্টি খুব একটা পেয়েছে এমন কথাও হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু অ্যাজিটেশনাল প্লে-র উদ্দেশ্য তো সেটা নয়। বরঞ্চ মার্কসবাদী নাট্যকারের হাতে সন্ত্রাসও যে নাট্যরচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে 'মালোপাড়ার মা' তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের লেখা 'রাজনৈতিক নাটক কি এবং কেন ও মালোপাড়ার মা' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে স্বৈরতন্ত্রের আসল স্বরূপ জনতাকে দেখানো নাট্যকারের কর্তব্য। সত্য

ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করলেই বিশ্বাসজনক হয়। বিদেশী নাটকের অনুবাদ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না, যেমন পারবে 'মালোপাড়ার মা'র মতন একটি তথ্যপূর্ণ নাটক। মালদার কেলেঙ্কারী সম্বন্ধে অনেকেই কাগজে পড়েছেন, শুনেছেন, একটি সকরুণ দুঃস্বপ্নের মতন মনে হয়েছে, তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে নি। মঞ্চে চোখের সামনে ঘটতে দেখলেই কী বীভৎস ভাবে ভারতবর্ষে আধা বুর্জোয়া শোষকরা শাসন করছে তা সকলে বুঝতে পারবে। 'মালোপাড়ার মা' র মতন নাটক শ্রেণি সংঘর্ষের হাতিয়ার। বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপরীত মতই প্রদান করে না, সর্বহারার বিপ্লবকে উদ্বুদ্ধ করে। মালোপাড়ার হত্যাকাণ্ডের তাৎপর্য অস্বীকার করলে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তে হবে। তাই রূপক ও ঐতিহাসিক শ্রেণি বিশ্লেষণও যেমন নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা উচিত সেইরকম সরাসরি রাজনীতিও প্রচার করা উচিত।

'মালোপাড়ার মা' শ্রী উৎপল দত্তের রাজনৈতিক নাট্য রচনায় নবতম সংযোজন। আগে দেখা গিয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক বা পালা রচনাই হোক, একাঙ্ক নাটকই হোক আর পথ নাটিকাই হোক সর্বত্রই তিনি রাজনৈতিক নাট্য রচনায় এক একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছেন, নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন। সর্বত্রই ঘটেছে তত্ত্ব আর তথ্যের সঙ্গে নাট্যের অসাধারণ সমন্বয়। তেমনি বর্তমান মালোপাড়ার মা রাজনৈতিক দলিল নাট্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাধারণ নির্বাচন, বা শ্রমিক ধর্মঘট, বা অপর কোনো সাময়িক প্রয়োজনে শ্রীদত্ত যে পথনাটকগুলি রচনা করেছেন সেগুলিতে দেখি তথ্য ও তত্ত্বের বিচিত্র সমারোহ। সেখানে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘটে মূলত দুই বিপরীত রাজনৈতিক চিন্তার সংঘর্ষে। চরিত্রগুলি প্রধানত সেই বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হয়। কিন্তু মালোপাড়ার মা নাটকে চরিত্রগুলি জীবন্ত বাস্তব মানুষ। তাদের কাজ ও কথা শুধু নাট্যক্রিয়া বা সংলাপ নয়, তা নির্দিষ্ট সময় ও কালের বাস্তব ঘটনার শৈল্পিক প্রতিবেদন। মালোপাড়ার মা যেহেতু কাল্পনিক নাটক নয়, যেহেতু শুধু সংবাদপত্রের খবরের ভিত্তিতে বা লোকমুখে শোনা কথার ভিত্তিতে রচিত নয়- সরেজমিনে তদন্ত করে, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তথ্য গ্রহণের ভিত্তিতে রচিত তাই এ নাটকের নাট্যক্রিয়া ও সংঘাতের বাস্তবতা এত মর্মস্পর্শী ও নিদারুণ।

মালোপাড়ার মা নাটকে বুদ্ধিবৃত্তি আর হৃদয়াবেগের প্রাবল্যের টানাপোড়েনে ঘটে অভূতপূর্ব নাট্য অভিজ্ঞতা। ঘটনা, চরিত্র চিত্রণে, ভাষা ও সংলাপ রচনা, তথ্য আর দলিলে নীরস গদ্য হয়ে উঠেছে যথার্থ নাটক, যথার্থ দৃশ্যকাব্য। হত্যাকাণ্ডে কাব্য খুঁজতে যাওয়া

পাগলামি। কিন্তু ঐ হত্যাকাণ্ডেই তো শেষ নয়, ওখানেই তো জীবন থেমে থাকবে না, ওখানেই সব কিছুর ইতি ঘটবে না, মনুষ্যত্ব তো ওখানেই মরে শেষ হয়ে যাবে না। রক্তমাংসের মানুষগুলো আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, কথায়, হাসিতে, গানে, স্নেহে, ভালোবাসায় মুখর হয়ে উঠবে, আবার কাজে নামবে, আবার জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চরিত্রগুলির ভাষা আর সংলাপ ও বাস্তবেরই মতো কখনো কোমল, কখনো প্রত্যয় কঠিন, কখনো বুদ্ধিতে ঝলমল, কখনো যুক্তিতে দুর্ভেদ্য, কখনো বিদ্রুপে শাণিত, কখনো গদ্যের দার্ঢ্য, কখনো কাব্যের ঝংকার। তাই শুধু রাজনৈতিক প্রচার নয়, শুধু তথ্য আর তত্ত্ব নয়, শুধুই ঘটনার আক্ষরিক রিপোর্ট নয়- সব কিছু নিয়ে মালোপাড়ার মা হয়ে উঠেছে নাটক, শিল্প। সর্বহারার জাগ্রত বিবেকের মতো নাট্যকার চরিত্রটি নাটকের শেষে শোষিত সর্বহারা শ্রেণির কাছে জানায় প্রতিশোধের আহ্বান। জাগ্রত করে শ্রেণিঘৃণা। ভেজা চোখ মুছে শোষিত নিপীড়িতের বেদনা আর ঘৃণা রূপান্তরিত হয়ে যেদিন ক্রোধের প্রকাশ ঘটবে সেদিন হবে শ্রেণি সংগ্রামে বিজয়ের সূচনা।

সন্তানহারা উন্মাদিনী মালোপাড়ার মায়ের সান্ত্বনাহীন আকুল ক্রন্দন শেষ হওয়ার নয়। অনেক পথপরিক্রমা বাকি। নাট্যকার নাটক শেষে আগামী কালের ঘোষণা করেন তা শুধু মালোপাড়ার মাকে সান্ত্বনা জানাতেই নয়, তা সমবেত শোষিত নিপীড়িত মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্যে এক দৃপ্ত ঘোষণা :

‘মা কথা কইল না শুধু কাঁদলো।
সে কি কান্না, না গান?
ভিটের পাশের বৃদ্ধ আমগাছটার পাতায় পাতায়
সে-গান ছড়িয়ে গেল,
ছড়িয়ে গেল প্রান্তরের শ্যামা ঘাসে-
সে গানে চোখের পাতা ভিজে গেল
মালোপাড়ার সব পুরুষের।
আর কাঁদে না মাগো,
পেশকারকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে কোল থেকে?
তোমার এত ছেলে মাগো, এত পেশকার,
রতুয়ার পাঁকভরা পথে যে মিছিল চলে,
ঐ যেঁ দূরে বারাসতের মাঠে,
কলকাতার ময়দানে আর দার্জিলিং চক বাজারে,

মাগো বেউরুটে, নিকারাগুয়ায়, এল সালভাদোরে,
কত লক্ষ তোমার ছেলে আগামীকালকে ছিনিয়ে আনতে
সাড়া দেয় মায়ের ডাকে।
মালোপাড়ার মায়ের গানের মতন কান্না
আজানের মতন ছেলেদের ডাক দিয়ে ফেরে।’[৬০]

এটাই তো ইতিহাস। অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের। শিল্পকর্মে ইতিহাসের সার্থক প্রকাশ হয় শিল্পরূপে। নাটকে ইতিহাসের প্রকাশ হয় নাটকীয় রূপে- দৃশ্যে আর কাব্যে। মালোপাড়া নাটকের শেষ সংলাপের বিশাল ব্যাপ্তি তাই গদ্যের সীমা ছাড়িয়ে কাব্যের অসীমে ছড়িয়ে যায় এবং চিরন্তনের বিরল স্তরে উন্নীত হয় মালোপাড়ার মা নাটক।

অমিত গুহ মালোপাড়ার মা নাট্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে নাটকটির উজ্জ্বলতম দিক হচ্ছে এটি একটি মৌলিক নাটক। ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করে আর যাই হোক না কেন বঙ্গ নাট্যশালাকে সমৃদ্ধ করা যায় না। চাই মৌলিকত্ব, চাই বিশ্বাস, চাই মেরুদণ্ডের ঋজুতা। এসব মিলেমিশে একাকার হলেই এমন একটি সার্থক নাটক লেখা যায় যার নাম- ‘মালো পাড়ার মা’।

ঙ) প্রবন্ধসাহিত্যে এবং জীবনীগ্রন্থে মালো জাতির প্রসঙ্গ

প্রবন্ধ এক বিশেষ ধরনের গদ্যরচনা যার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। যে কোন বিষয় নিয়েই প্রবন্ধ হতে পারে যদি সেই বিষয়টি লেখকের ভাবনা-অভিজ্ঞতা-মন-মননের প্রত্যয় দ্বারা যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং তার রসবোধে জারিত হয়। গুরুগম্ভীর কিংবা হালকা পরিহাসমণ্ডিত, গভীর ভাবোদ্দীপক কিংবা নিছক বস্তুগত কোনো বিষয়, কোনো সর্বজনীন প্রসঙ্গ বা সমস্যা কিংবা ব্যক্তিগত অভিনিবেশ, যে কোনো কিছুই প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরশপাথরের ছোঁয়ায়। জীবনী বলতে সাধারণভাবে আমরা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্তকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা ও তার চরিত্রের বিশ্লেষণ বুঝে থাকি। আত্মজীবনী বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও একটি বিশেষ স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

মেছুনিদের প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'লোক রহস্য'-র (১৮৭৪) 'BRANSONISM' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। ইলবার্ট বিল সমন্ধীয় বিবাদকালে লিখিত এই রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র রঙিনি জেলেনি ও বাগ্‌দির ছেলে ডিক্‌সন সাহেবের মাছ চুরির মামলার এক সরস বর্ণনা দিয়েছেন। রঙিনি জেলেনির ডালা থেকে শুঁটকি মাছ চুরি করার দায়ে কালা সাহেব ডিক্‌সনের শেষ পর্যন্ত সাতদিনের কয়েদ হয়ে যায়। জেলেনি খালে বিলে মাছ ধরে বেচত। সেই সঙ্গে শুঁটকি মাছও বেচত সে। মামলা চলাকালীন হাকিমের জেরার উত্তরে সে জানায় যে একদিন ডালা পেতে তাতে শুঁটকি মাছ সাজিয়ে সে বেচছিল। একজন খদ্দেরের সঙ্গে সে যখন কথা বলায় ব্যস্ত ছিল, তখন নাকি ওই সাহেব ডালা থেকে এক মুঠো শুঁটকি তুলে তার ছেঁড়া পকেটে পুরেছিল। এইসময় রসিক মেছুনি আসামিকে লক্ষ করে বিদ্রূপ করে বলে যে সাহেব শুঁটকি মাছে মরেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্ত' (১৮৮৫) রচনাতে মেছুনির খেংরা গুঁপো মিন্‌সে জাতীয় মধুর সব ডাকের উল্লেখ করেছেন। এখানে কমলাকান্ত বিশ্বসংসারকে একটি বৃহৎ বাজারের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তুলনা করেছেন পৃথিবীর সব রূপসিদের সঙ্গে মাছের। আফিমের মাত্রা চড়ে যেতে কমলাকান্ত দেখেন যে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনোপুঁটি, কই, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়ে ধড়ফড় করছে। মেছনীরা মাছ নেওয়ার জন্য ডাকতে থাকে। কমলাকান্তর দরে পোষাল না, তাই সে মেছোহাটা থেকে পালাল আর মেছনীরা গামছা কাঁধে তাকে গালি পাড়তে থাকে।

প্রকৃতি তার খেয়াল খুশিমত কখনো গড়ে তোলে মহাসাগর কখনো বা তৈরি করে বিশাল পাহাড়। ফুলে ফলে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য সাজিয়ে তোলে এই সুন্দর পৃথিবীকে। প্রকৃতির টানে মানুষ ছুটে বেড়ায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। মানুষ ভোগ করে প্রকৃতির সুরম্য ঐশ্বর্য্যকে। এইরকমই প্রকৃতির খেয়ালে সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরে তৈরি হয় বিশাল জলাশয়। তবে জলাশয়ে প্রচুর মাছ আর তীরে গন্ধবিহীন পলাশ গাছ। রাজস্থানে একটি বড় ঝিল আছে- তার নাম রুদ্রসাগর। ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজস্থানের ঝিলটির নামানুসারে নাম রাখেন রুদ্রসাগর। আসল নাম রুদির জলা।

সুকুমার বর্মনের 'রুদিজলার মানুষ' (১৯৯৭) প্রবন্ধটি থেকে জানা যায় যে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে পূর্ববাংলা থেকে জন্মগতভাবে ভাবে মৎস্যজীবী অংশের মানুষ কুমিল্লা,

নোয়াখালি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উদ্বাস্তু হয়ে দলে দলে ত্রিপুরায় আসেন এবং এই রুদ্রসাগরকেই বেছে নেয় তাদের জীবিকার আশ্রয়স্থল হিসাবে। গড়ে ওঠে রুদ্রসাগরের চার পাড়ের জেলে বসতি। এই জেলেদের মধ্যে ভাষাগত ভাবে পার্থক্য রয়েছে। ভাষাগতভাবে পার্থক্য থাকলেও ঝাল, কৈবর্ত বা নমঃশূদ্র সবার পেশাই হল মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা। চালচলনে, সামাজিক প্রথায় কোন পার্থক্য নেই। প্রায় একই রকম পেশাগত চালচলনে এক হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামি সেই আদিকাল থেকে এখনো বিদ্যমান। রুদ্রসাগরের চার পাড়ে ষোলটি গ্রাম- বটতলী, চন্দনমুড়া, কেচ্ছামুড়া, রাজেন্দ্রনগর, কেমতলী, লেটামুড় বৈদ্যেরমুড়া, করাতিয়ামুড়া, কাঁঠালিয়ামুড়া, বড়াকমুড়া, পোয়াংবাড়ী, রাঙ্গামুড়া, ভূঞার টিলা, মেলাঘর, দেবনগর, ঘ্রাণতলী। এই বসতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভূমিকা গ্রহণ করেন রেভেনিউ অফিসার দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাদের ঘর তৈরি করার জন্য দুই ভাড় ছন্, এক কান্দি বাঁশ এবং নগদ ৭৫০ টাকা দেন। জেলেরা বন জঙ্গল পরিষ্কার করে ঘরবাড়ি তৈরি করেন। প্রত্যেক পরিবার এর বসতির জন্য দেওয়া হয় এক একর করে বাস্তু ভিটার জায়গা। এরপর শুরু হয় জমি দখলের সংগ্রাম। রুদ্রসাগরের জলে প্রচুর রূপালী মাছ পেয়ে উদ্বাস্তুরা তাদের হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমির কথা কিছুটা ভুলতে পেরেছেন। গ্রীষ্মকালে, চৈত্র বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী যখন তার দাপট নিয়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে যায় তখনি পাহাড়ি স্রোতে সাগর থেকে ছুটে আসতে থাকে রূপালী মাছেরা। ঘনিয়া, বোয়াল, স্বরপুঁটি, পুঁটি, টেংরা, গোলাম টেংরা, পাবদা মাছ ধরে জেলেরা তাদের ডুলিগুলি ভর্তি করে নিত। প্রতিযোগিতা হতো কে কত বেশি মাছ ধরতে পারে। রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ রয়েছে। জলের এবং মাছের মালিক হয় কো-অপারেটিভ। সদস্য জেলেরা মাছ ধরতেন টিকিট দিয়ে। বিভিন্ন জালের জন্য বিভিন্ন রকম টিকিটের হার নির্ণয় করা ছিল। মাছ যাতে কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য ছিল পাহারাদার। যারা টিকিট কাটতো না পাহারাদাররা তাদের জাল, নৌকা নিয়ে চলে যেত। শীতে জেলেদের গায়ে গরম জামা কাপড় জোটেনা, কেন না তারা সঞ্চয় জানে না। যা কিছু উপার্জন করে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ফূর্তি করে উড়িয়ে দেয়, ভবিষ্যৎ কি হবে তা তারা চিন্তাও করে না। দারিদ্রতা তাদের জীবন সঙ্গী। যুগে যুগে তারা দারিদ্রতার সাথে একাত্ম হয়ে হাতে হাত ধরে চলে এসেছে। দারিদ্রতা তাদের জীবন সঙ্গী। ধর্মের নামে জাতের নামে হাজার হাজার বছর তাদেরকে বঞ্চিত করে আসা হয়েছে। এছাড়া জেলেদের ওপর মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণের কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

‘গঙ্গার ইলিশ ও নদনদীর ইতিকথা’ (ভাসমান ২০০২) শীর্ষক সংক্ষিপ্ত রচনাটিতে লেখক লক্ষ্মণ কুমার হালদার প্রথমেই ইলিশমাছের জন্মকথা, তাদের গতিবিধি ও জন্মস্থানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ইলিশ সমুদ্রের মাছ। বর্ষাকালে ইলিশ মিষ্টি জলের খোঁজে বড় বড় নদী যেমন গঙ্গা বা পদ্মা ও তার উপনদীতে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানেই তাদের প্রজনন হয় এবং ডিম ছাড়ে। তারপর বাচ্চা ফুটে গেলে ইলিশ দলবদ্ধ ভাবে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। বাংলার মৎস্যজীবীদের ইলিশ ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু নানান বাঁধ নির্মাণ ও নদীর নাব্যতা হ্রাস হেতু এবং জল দূষণের কারণে ইলিশের আনাগোনা গঙ্গা বা তার উপনদীতে নেই বললেই চলে। ফলে মৎস্যজীবীদের আয়ের উৎসে ভাটা পড়ে গেছে। তাই অর্থসংকটে মৎস্যজীবীরা আজ জর্জরিত। গঙ্গার ইলিশের অপ্রতুলতার ও প্রতিবন্ধকতার দিকগুলো লেখক তুলে ধরেছেন। নদীর স্রোত বন্ধ করে দিয়ে এখন বাংলার বিল, বাওড়, জলাশয় গুলোয় ইলিশছাড়া অন্যান্য মাছের উৎপাদন হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়। বাংলার নদীগুলো হেজে মজে গিয়ে, নাব্যতা হারিয়ে যেমন মৃতপ্রায় তেমনি নদীর সন্তান মৎস্যজীবীরাও মৃতপ্রায়।

‘খুলনার মৎস্যজীবীদের সন্ধানে’ (ভাসমান ২০০৩) প্রবন্ধে পরিতোষ বিশ্বাস তার মেয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।জন্মসূত্রেও তিনি নিজেও একজন মালো। ভ্রমণকালে খুলনা জেলায় মালোদের জীবনযাত্রা কেমন তা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তার সুন্দর বিবরণও দিয়েছেন। বয়েলিয়া খেয়াঘাটে কপোতাক্ষ বিধ্বংসী রূপ নিয়েছে। বয়েলিয়া পাড়ে প্রচণ্ড ভাঙন। এই গ্রামে ২৩০০ ঘর মালো সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করত। সাধারণত নদীর ধারেই মালোরা বাস করে। এদের অধিকাংশই দুর্গাপুজোর পর সমুদ্রে আলোর কোলে চলে যায় মাছ ধরতে। কপোতাক্ষর তীরে সাগরদাঁড়ি, চিংড়ে তালানলতা, কপিলমুনি, নোয়াকাটি, মামুদকাটি জেটো, রাড়ুলি, কাটিপাড়া, বাঁকা, কেরমা, সাহাপাড়া, বয়েলিয়ার মৎস্যজীবীরা অধিকাংশই এসময় সমুদ্রে চলে যায়। ওখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ যেমন চিংড়ি, লটকে, ফ্যাসা, চাবড়া, রূপপাতা, আমুদি ইত্যাদি সাদা মাছ কিছু বালির চরায় শুকিয়ে বস্তাবন্দী করে চট্টগ্রাম অথবা সৈয়দপুরে পাঠায়। কিছু আবার স্থানীয় ডিপোতে বিক্রি করে দেয়। মহাজনের থেকে আটক সুদে টাকা পয়সা নিয়ে নৌকা সাজিয়ে কার্তিক থেকে ফাল্গুন মাস অবধি মাছ ধরে মহজনের দেনা পাওনা মিটিয়ে বিশেষ কিছু লাভ আর চোখে দেখতে পায় না এরা। যা সামান্য পয়সা কড়ি থাকে সেটা ভাঙিয়ে চুড়িয়ে এদিকে জাল টাল বেয়ে আর বাকি কটা মাস কাটিয়ে দেয়। অনেকেই একটু লেখাপড়া শিখে হয় - ইণ্ডিয়া নইলে শহরে বাসা নিয়ে চলে যায়। গ্রামের দিকে আর ফিরেও তাকায় না। মাঠে চাষ করা

জমি জায়গা মালোদের খুব কম লোকেরই আছে। তাই দারিদ্রের স্পষ্ট চিহ্ন এদের বাড়ি ঘরে।

কপোতাক্ষ নদী শুকিয়ে যাওয়াতে সমুদ্র ছাড়া এদের গতি নেই। কপোতাক্ষের তীরবর্তী মালোরা অনেকেই জল, জালের ব্যবসা ছেড়ে ওপরের জমি জায়গায় চাষ বাস, মাছ কিনে কেটে বেচার মত কারবারে জড়িয়ে পড়েছে। ২৫/২৬ বছর আগেও বিরাট স্রোতস্বিনী নদী ছিল এই কপোতাক্ষ। কিন্তু আজ তার মৃতপ্রায় অবস্থা। তার শুকনো বুকে চাষবাস হচ্ছে- গুচ্ছ গ্রাম গড়ে উঠছে। সাহাপাড়ার মালোরা সমুদ্রে যাত্রা করলে কপোতাক্ষ তীরে মেলা বসে। মেয়েরা উলু আর শঙ্খধ্বনিতে বিদায় দেয় প্রিয়জনদের, ললাটে এঁকে দেয় চন্দন তিলক, যেন সবাই কোন যুদ্ধ জয়ে চলেছে। যুদ্ধ জয়ই বটে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর হিংস্র জন্তু বাঘ কুমির ও ডাঙ্গার দুর্দান্ত ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থেকে সারা বছরের খাবার যোগাড়ের সন্ধানে বৌ-বাচ্চাকাচ্চা রেখে ৫/৬ মাসের জন্য বিদায় নিতে হচ্ছে। যদি সমুদ্রে ভালোমত আয় রোজগার হয়, তবে খেয়ে দেয়ে আর ৫/৬ টা মাস ভালোই কাটবে। চোখের জলে প্রিয়জনের বিদায়ের এই করুণ মুহূর্তটা সত্যিই বড় বেদনাদায়ক- তবু যেতে তো হবেই।

ঝর্ণা বর্মণ তার ‘চেম্মিন ও তিতাস’ (ভাসমান ২০০৬) নামক প্রবন্ধে তিতাস ও চেম্মিন এই দুই উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি। লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তখন জীবিত ছিলেন না। এই বছরেই সুদূর কেরলে প্রকাশিত হয়েছিল ‘চেম্মিন’ উপন্যাসটি। ‘চেম্মিন’ অর্থ ‘চিংড়ি’। দুটি উপন্যাসই কালজয়ী। জলের কাছাকাছি থাকা জলজীবী মানুষদের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস দুটি। যদিও জল এক কিন্তু জলের আধারটি পৃথক। একটি মোটামুটি শান্ত নিস্তরঙ্গ নদী- যার নাম তিতাস। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস থাকলেও জোয়ার তাকে ফোলালেও উদ্বেল করে না। অন্যটি হল দুরন্ত ঢেউ, ঝড়ঝঞ্ঝা গর্জনে ভয়ংকর সমুদ্র।

মানুষ সভ্য হবার অনেক আগে থেকেই সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করে এসেছে। যেখানেই আমরা প্রতিকূলতা দেখেছি জীবনসংগ্রাম দেখেছি সেখানেই এসেছে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। মাছধরা- মাছমারা একলার কাজ নয়। এটা একটা টিমওয়ার্ক। বড় বড় জাল, বড় বড় নৌকো, ঝড় তুফানের মধ্যে মাছধরা এসবের জন্য একটা বড় দল চাই। তাই গোষ্ঠীজীবন গড়ে উঠেছে নদী বা সমুদ্রের বা অন্য কোনো জলাশয়ের তীরে তীরে। এরকমই গোষ্ঠীজীবন

দেখতে পাই তিতাসের মালোদের জীবনে আর সমুদ্রের উপকূলে জেলেদের জীবনে এই দুটি উপন্যাসেই।

তিতাস পাড়ের মালোরা যেমন মনে করেছে তিতাসই তাদের প্রাণ, তিতাসই তাদের আনন্দ, তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপাদান, নীরকুল্লাথ ও ত্রিকুন্নাপুরার জেলেরাও তাই জানত যে সমুদ্র তাদের মাতা। পার্থক্য একটাই তিতাস পাড়ের মালোরা এই নদী শুকিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো প্রচলিত ধারণা বা লোকবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা নিজেদের ভাগ্যকে দুষতে পারে কিন্তু এজন্য নদী খামখেয়ালিপনার কথাই ভেবেছে। মনের দিক থেকে তারা নীরকুন্নাথ ও ত্রিকুন্নাপুরার জেলেদের চেয়ে যেন অনেক আধুনিক। তিতাস শুকিয়ে যাওয়ার পর শহরের লোভী, স্বার্থান্ধ মানুষেরা বেনোজলের মতো ঢুকে পড়েছে। তাদের প্রতিনিধি হয়ে গাঁয়ে ঢুকে পড়েছে যাত্রাদলের লোকেরা। অপ্রতিরোধ্য এই আধুনিক জীবন। এর অনুপ্রবেশ আমরা চেম্মিন-এ দেখি না। যদিও প্রচলিত বিশ্বাসের বিরূদ্ধে প্রশ্ন করেছে কারুতাম্মা এবং প্রচলিত নিয়ম ভেঙেছে তার বাবা চেম্বনকুঞ্জ।

দুটি উপন্যাসেরই সাধারণ (জেলে) বা মালোদের দেখে মনে হয় তারা বেহিসেবি। যা পায় তা আনন্দ ফূর্তি করে খরচ করে ফেলে। ভাবটা এমন জমাবে কেন ভবিষ্যতের কথা ভাববে তারা। যতদিন জল আছে ততদিন আমরা আছি। তাই তারা খরচের সময় সংযম জানে না। চেমানকুঞ্জের জীবনেও আমরা এমনটি দেখেছি। তিতাসে কিশোরের বাবা, বাসন্তীর বাবা এদের অবস্থা বৈগুণ্য নির্ভর করেছে এমনই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অদূরদর্শিতার জন্য। চেম্মিনেও মেয়েরা ঝগড়া করে। একে অপরকে হিংসে করে ঈর্ষা করে আবার বিপদে সাহায্যও করে। সদ্য ধনী হওয়া গৃহিণী চাকীর সঙ্গে তিতাস-এর কালোচরণের মায়ের অহংকার ও যেন মিলে যায়। তাদের পেশাগত জীবন একই তবে প্রকরণে পার্থক্য আছে। চেম্মিনে ত্রিকোণ প্রেমের কথা বলা হয়েছে। তিতাসে বাসন্তীকে চৌয়ারি ভাসাতে সাহায্য করতো সুবল আর কিশোর। এটাকে ঠিক ত্রিকোণ প্রেমের কথা সেভাবে বলা যাবে না। পরবর্তীকালে কিশোর পরিস্থিতিতে পড়ে হঠাৎ দেখা মেয়েকে বিয়ে করল। কয়েকদিনের মধ্যে ডাকাতরা তার বউকে নিয়ে গেল। কিশোর অতর্কিতে এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে গেল। পরে অনন্তর মাকে দেখে সে চিনতে পেরেছিল হয়তো কিন্তু তার পাগলামি সারে নি। পারীকুট্টির পাগলামি বদ্ধ নয়- অনেকটাই মুক্ত।

চেম্মিনের মূল ঘটনা এককেন্দ্রিক কিন্তু অদ্বৈত তো কেবল এই একটি জুটিকেই বড় করে দেখান নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন আরো অনেককে। নদীতে অনেক স্রোত থাকে। অনন্তর মা ও কিশোর তার মধ্যে একটি স্রোত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বহমানতাই জীবন। তাই এখানে এসেছে অনেক উপকাহিনি। অনন্তকে ঘিরেও রয়েছে আরো কিছু ঘটনা। দুটি উপন্যাসের মধ্যেই প্রকৃতি অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। প্রকৃতি যেমন করে মন ভরিয়েছে তেমন করে প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে অনেকের। চেম্মিনে মারা গেছে পালানি, কারুতাম্মাও পরিকুট্টি। প্রচলিত নিয়ম মানেনি বলে তাদের এই পরিণতি। আর তিতাস নিজের বুকে চর জাগিয়ে পুরো মালোপাড়াটাকেই ধ্বংস করে দিল। এখন অবশ্য খলখল করছে জল- যেন মরীচিকা। চেম্মিন এর শেষে পড়েছিল বঁড়শিগাঁথা বিরাট একটা হাঙর তলার নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ দুটি পুরুষ আর নারী। পালানি নেই- তাকে সাগরমাতা আশ্রয় দিয়েছেন নিজের কোলে।

দিগেন বর্মণ রচিত 'সালতামামি মাছ ও মৎস্যজীবীদের কথা' (২০১৭) প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হয়েছে-

> 'গাঙ্গে মাছ নাই বিলে মাছ নাই
> বাঙালি কী দিয়া ভাত খাবে।
> খালে মাছ নাই জালে মাছ নাই
> মাছ ছাড়া জাল্লারা কেমনে রবে।
> বউ পুলাপান গ কেমনে বাঁচায় রাখে
> বাপ্, ঠাকুরদার নাম যায় বুঝি মুছইয়্যা।'[৬১]

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে গঙ্গার পারে নৃসিংহপুর গ্রামে লেখকের বাড়ি। বর্তমানে পুকুরে, বিলে, দিঘিতে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, গঙ্গায় তো মাছ নেই-ই। অথচ এই গঙ্গার উপর নির্ভর করে কয়েকশো মৎস্যজীবী পরিবার বেঁচে থাকতো। বৃষ্টি নেই, বছর বছর বর্ষা নেই, জল নেই মাছের জন্ম হবে কেমন করে। ছোট ছোট মাছও এখন প্রায় দেখাই যায় না। ধানের মাঠে পোকা-মাকড় মারতে চাষিরা জমিতে যে বিষ ও সার দেয় তার জন্য মাছ আর ডিম দেয় না। স্থানীয় কৃষ্ণ বর্মণ বলেন-

> 'ধানের খ্যাত থিক্কা আমরা কত মাছ ধরতাম। সংসার চালাইত কত জাল্লা। বছর দশ হয়্যা গেল তেমনডাই চলতেছে... মাছের আকাল অখন সব্বোখানে।'[৬২]

জন্মগতভাবে মৎস্যজীবী হলেও ধান সিদ্ধ শুকানোর কাজও করতে বাধ্য হয় সংসার চালাতে। মাছেদের সাথে সাথে এইসব জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও খুব করুণ। তবুও তারা গান গায়। শ্রম-ভারাক্রান্ত জীবনকে হালকা করার জন্য প্রকৃতির রোষ, শিক্ষার দৈন্যতা, অভাবের তাড়নার কথাই উঠে আসে তাদের গানের কথায়। এমনই একটি গান-

'জালুয়াগ কথা আর কয়না, জালুয়ারা টাহা রাখতে জানে না।।
মাছ বেচইয়া টাহা আইলে, বালতি ভইর‍্যা দুধ কিন্যে,
জালুয়াগ কথা আর কয় না...
একটু টাহা বেশি হইলে, তক্তা কিননা বাড়ি আনে
***
জালুয়াগ কথা আর কয় না।'[৬৩]

মৎস্যজীবীরা প্রকৃত বিজ্ঞানী। মাছ শেষ হলে জেলেরাও শেষ। ধান সিদ্ধ করার কাজ না থাকলে নৃসিংহপুরের সব জেলেরা মরে যেত। জীবন ধারণের জল ও কৃষির উপাদান জুগিয়ে কৃষি-সভ্যতাকে এ-গঙ্গা (অন্য নদী) বাঁচিয়ে রেখেছিল। কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীন মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহারের জন্য ধানের জমির মাছ প্রায় শেষ বা অবলুপ্তপ্রায়। বন্যপ্রাণী অবলুপ্তি থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা হলেও মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তেমনভাবে দেখা যাচ্ছে না।

২০-০৩-১৭ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় সোমনাথ চক্রবর্তীর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিং বলেছিলেন যেসব জায়গায় কৃষিজমির জল নদী বা পুকুরে মিশছে সেই সব অঞ্চলের চাষিদের বোঝাতে হবে কৃষি ক্ষেএে জৈবসার ব্যবহার করেন। এছাড়াও মৎস্য-বিজ্ঞানীদের অনুরোধে অনেক কাজ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেগুলো যাতে মাঝপথে মাছেদের মতো হারিয়ে না-যায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এছাড়াও নতুন নতুন পরিকল্পনা নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বড়ো বড়ো খাল বিলের জলে নদীর জল প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের বহু অকুলীন মাছেদের যেমন বাঁচানো যাবে, নতুন করে হারিয়ে যাওয়া মাছকেও বাঙালিদের খাবার থালায় যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি তাদের রসনারও তৃপ্তি দেওয়া যাবে। দীর্ঘদিন ধরে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলে লেখক যেটুকু জানতে পেরেছেন মাছ ও মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে সেই তথ্যই এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

'আলো-আঁধারি' (২০০৪) এবং ঈষৎ রূপান্তর (২০০৮) বই দুটির কারণে বেবী হালদারের নাম আজ সচেতন পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। বেবী হালদার নিজেও একজন মালো। মেধা পাটেকর তাকে বলেছেন 'মেহনতী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী'। অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত, নির্যাতিত 'কাজের মেয়ে' বেবী হালদার আজ নিজেকে ছাপিয়ে উঠেছেন এমন একটা জগতে, যে জগতের কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এযেন ঘুঁটে কুড়ানি মেয়ের রাজরানি হয়ে যাওয়া রূপকথার গল্প।

সাহিত্যের ব্যাকরণ তার জানা নেই, তিনি জেনে বুঝে শিক্ষিত হয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখতে বসেন নি। তাই কোন রচনা কেমন করে লিখলে পাঠকের ভালো লাগবে, কেমন করে লিখলে যুগোপযোগী হবে- এসব ধারণা তার নেই। যদি তিনি পরিশীলিত মনের সুশিক্ষিতা রমণী হতেন তবে জীবন সম্পর্কে তার স্বছ ও সহজ দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো পাল্টে যেতো। এসে যেতো কৃত্রিমতা, এসে যেতো লজ্জা, এসে যেতো কুণ্ঠা এবং অশালীন বা অশোভন জিনিস বা ঘটনাকে ঢাকবার চেষ্টা। বেবীর ক্ষেত্রে সে সব হয়নি। বেবী যা পেরেছেন সে সম্পর্কে আলো-আঁধারির অভিবাদন অংশে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন-

> 'তার স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি দিয়ে চারপাশের জীবনকে সে কত যে ভালো বুঝতে পারে, বিচার করতে পারে, আর সাহস নিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, বিস্ময়কর এই বইটির পাতায় তার চিহ্ন আছে ছড়ানো।'[৬৪]

১৯৭৪ সালে জম্মু কাশ্মীরের কোন এক জায়গায় এক ফৌজি পরিবারে বেবীর জন্ম হয়। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ছোট বেবীকে মুগ্ধ করত। তারপর কিছুদিন মূর্শিদাবাদে তাদের থাকতে হয়েছিল। ওখানে কিছুদিন থাকার পর তারা গেল ডালহৌসি। বাবার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অবিবেচনার জন্য একদিন অতিষ্ঠ হয়ে ছোটভাইকে কোলে করে মা সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। এটা একদিনের ঘটনা নয়। মা অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে ছেলেমেয়েদের পড়া না বন্ধ হয় বা সংসারটা ধরে রাখতে কিন্তু মাসের পর মাস বেবীর বাবা টাকা না পাঠালে একান্ত নিরুপায় হয়েই তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। বেবীর বাবা উপেন্দ্র নাথ হালদার তারপর আরো দুবার বিয়ে করেছিলেন। বালিকা বেবীকে বারো বছর বয়স পার হতেই বিয়ে দেয়া হয়েছিল তার দ্বিগুণ বয়সি ছেলের সঙ্গে। সেই স্বামী তাকে অকারণ নির্যাতন করতো, মারধোর করতো। তার সৎমা, বাবা, দাদা, ভাই, পাড়াপড়শী নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মর্মস্পর্শী সংবেদনশীল ভাষায় সহজ, আন্তরিক ও সাবলীল ভাবে

বর্ণনা করেছেন বেবী তার প্রথম গ্রন্থ 'আলো-আঁধারিতে'। তিনটি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটিতে আছে তার জীবনের প্রাথমিক কাহিনি। তিনটি সন্তান নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিল বেবী। দিল্লীর গাড়িতে উঠে পড়েছিল কারণ ওখানে দাদা ও ভাই থাকে। দাদা প্রাথমিক সুরাহাটুকু করে দিলেও সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি। সেখানে পূর্বের চেনা দুই একজনের সাহায্যে দুবার কাজের লোকের বাড়ি ছেড়ে তৃতীয়বারে এমন এক বাড়িতে কাজ পেল যেখানে বিখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচাঁদের নাতি শিক্ষক-লেখক প্রবোধকুমার তাকে 'কাজের মেয়ে' হিসেবে দেখলেন না। বেবীকে তিনি বললেন-

'তুমি এঘরের মেয়ে। তুমি কখনও ভাববে না যে, তুমি এঘরের কাজের মেয়ে।'[৬৫]

প্রবোধকুমার তাকে আরো বললেন যে সাহেব নয়, বাবু নয়, তার ছেলেরা তাকে যে নামে ডাকে সেই 'তাতুষ' নামেই সে যেন তাকে ডাকে। এই তাতুষ-ই তার মধ্যে যে লেখন ক্ষমতা আছে তার প্রকাশ ঘটালেন নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বেবীকে পড়তে দিলেন তসলিমা নাসরিনের 'আমার মেয়েবেলা' বইটি। 'মেয়েবেলা' বইটি পড়তে পড়তে লেখার আরম্ভ। আশাপূর্ণা দেবীর চার দেওয়ালের মধ্যে বসে লেখার বৃত্তান্ত তাকে অনুপ্রেরণা জোগায়। খাতা কলম দিয়ে লিখতে বলে বাইরে গিয়েছিলেন প্রবোধ কুমার, বেবীর তাতুষ আর মাসখানেক পর তিনি ফিরে আসার মধ্যেই বেবীর ১০০ পাতা লেখা শেষ।

বেবীর লেখা প্রবোধকুমারের অনুবাদে হিন্দি ভাষায় আগেই প্রকাশ পেয়েছিল। সাড়া জেগেছিল সকলের মধ্যে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে লাগল গ্রন্থটি। কাঁচড়াপাড়া রোশনাই প্রকাশন থেকে আলো-আঁধারি প্রকাশ পেতেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনা বেরোলো। বেবী পেল গুণীজনদের সংবর্ধনা, দিল্লী থেকে দুর্গাপুর আসা এবং দুর্গাপুর থেকে কলকাতা এবং কাঁচরাপাড়া, তারপর দিল্লী ফিরে যাওয়ার কথা বেবী শোনালেন। তার জীবনে ঘটে গেছে 'ঈষৎ' নয়, আমূল পরিবর্তন। সফল জীবনে এসে বেবী দেখেছে তার বাবা-মা, রক্তের সম্পর্কিত না হয়েও এক দাদা বৌদিকে যারা অত্যন্ত ভালোমানুষ। তার ফেলে যাওয়া জীবনের বিভিন্ন চরিত্র যারা তাকে দেখে কেউ বিস্মিত হয়েছে তাকে ভাবিয়েছে- কাঁদিয়েছে। এখন সাহিত্যজগতে বেবী হালদার অতি পরিচিত নাম।

তাতুষের বাড়ির সমস্ত কাজ করে দাদার বন্ধুদের নানা রকম ফাইফরমাস পালন করে তাকে পড়তে হত। তাতুষ যদি বারবার না তাকে পড়ার কথা মনে করিয়ে দিতেন,

বড়ছেলেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন না করাতেন- তবে বেবীর পড়া যে হবে না- একথা তাতুষ বুঝতেন। বেবীর জীবনের সাফল্যের পেছনে রয়েছেন তাতুষ।

বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে বেবীর সাহসিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ষষ্ঠীর মায়ের কাছে যাওয়া নিয়ে, অজিতের একতরফা প্রেম নিয়ে তাকে বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল তবুও সে একটুও দমেনি। মার খাওয়ার পরও সে তাদের বাড়ি যাওয়া ছাড়ে নি। পাড়ার পরনিন্দা, পরচর্চা, তার ভালো লাগত না। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে একমাত্র মরুদ্যান ছিল দুলাল- তার একমাত্র ছেলেবেলার ছেলে বন্ধু। একমাত্র তার সঙ্গেই বেবী অভিমান করত, জোর করত, বকতে পারত। দুলালের আসা নিয়ে যখন তার সংসারে ঝড় উঠল তখন দুলাল নিজে থেকেই আসতে না চাওয়ার কথা বললে বেবী গর্জে ওঠে বলে যে কিছু হলে বেবীর আর কিছু জায় আসে না। ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা বলতে গেলে মার খেতে হলেও সে খাবে। এখন আর সে ভয় করে না।

নিজের দিদির জীবন আর পান্নার বউ এর জীবন থেকে সে দুরকমের শিক্ষা পেল। পান্না বৌএর গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে মেরে ফেললেও বউ তাকে নির্দোষ বলেছে আর তার দিদি কিছু বলতে পারে নি- জামাইবাবু দিদিকে গলাটিপে মেরেছে। নানা সময়ে এ দুটি ঘটনা বেবীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, ভাবিয়েছে- ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। দিদির বিপর্যয়ের দিনে তার ছেলে দুটির পাশে যেতে ইচ্ছে করেছে কিন্তু বেবী যেতে পারেনি।

একটি বই লিখে প্রশংসা পেলেও দ্বিতীয় রচনার আগে ভেবেছেন মেয়েদের সঙ্গে কেন এমন হয় তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে কন্যাভ্রূণের প্রসঙ্গে এবং মেয়েদের প্রতি সমাজের অবহেলার কথা ভেবে তিনি বলেছেন যে মেয়ে যখন ছোট থাকে তখন ঘর থেকে বাচ্চামেয়ে খুঁজে খুঁজে ডেকে ডেকে নিয়ে যায়। কত আদর করে ঘরে বসিয়ে মা দেবী বলে পুজো করে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। আর ওই মেয়েই যখন একটুখানি সাবালকের মতো হয় তখন তাকে কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, কত লাথি খেতে হয়। বেবীর মানসিকতায় তার প্রতিবাদ ঝরে পড়েছে। দিল্লীতে বারোঘর এক উঠোনে থাকাকালীন তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তিনি তার বিরূদ্ধে প্রতিবাদও জানিয়েছেন।

বেবী হালদার সহজেই তার লেখায় 'আমি' থেকে 'সে' হয়ে যেতে পারেন। এখানেই তার মৌলিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। যখন তাকে কোন হীনমন্যতা গ্রাস করেছে, যখন তিনি স্বপ্ন

দেখেছেন, কোন ঘটনায় আপ্লুত হয়েছেন, কোন ব্যক্তিগত অনুভূতির বর্ণনা করেছেন, অতীতচারণায়, আত্মবিশ্লেষণে স্রষ্টা বেবী সরে গিয়ে সৃষ্ট বেবীর জায়গা করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থে বেবী যখন তার বাড়িতে ফিরে এলেন, তখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে সাইকেল চালিয়ে এমাঠ ওমাঠ রাস্তা ঘাট পার হয়ে কল্পনার ডানায় সওয়ার হয়ে অতীতে ডুব দিচ্ছেন। তখনই তার দ্বিতীয় সত্তার সম্মুখীন হল সে। বেবীর জীবন আজ সার্থক। দুঃখের দিনগুলিকে তিনি যতই নিরাসক্তি নিয়ে দেখতে চান না কেন, তার মধ্যে স্পৃহা আছে, দুঃখ আছে, করুণা আছে, অনুকম্পা আছে। তিনি যেন এখন সবাইকে ক্ষমা করতে পারেন। এমন কি যে অজিতের জন্য তার জীবন অকারণ বিপর্যস্ত হয়েছিল তাকে নিয়ে আজকের বেবী মজা করেছেন। ব্যঙ্গ করেছেন। এখনকার বেবী যেন সবার সব রকম ঘটনার প্রতিশোধ নিতে পারেন। তিনি যেন আজ সব পারেন। পুরো ঘটনাটি বেবীর মুখে বলানো হয়েছে। বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় সেই বেবী অন্তর্হিত হয়- ফিরে আসে এই আমি। লোভী পুরুষের স্পর্শ নানা ছলনায় তার শরীর খুঁজলে বেবী ক্রুদ্ধ নন, কিছুটা নিরুপায় এবং হাস্যোজ্জ্বল। এদেশের সাধারণ মেয়েদের রোজকার বিপন্নতা আত্মস্থ করেই যেন তিনি অনন্যা। লেখা চলেছে বেবীর, পড়াও চলেছে।

প্রথম গ্রন্থের তুলনায় দ্বিতীয় গ্রন্থ সাবলীল। এইসময় বেবী সফল লেখিকা। নানা ভাষায় অনূদিত তাঁর লেখা, দেশবিদেশ ঘোরা চলছে। এখানে বর্হিজগতের পটভূমি পাওয়ায় তার নিজস্ব ভাব ও ভাবনা সার্বজনিক হয়ে উঠেছে। শব্দের যথাযথ প্রয়োগে, পদের বিন্যাসে তার বক্তব্য, তার স্মৃতি রোমন্থন সহজ ও আন্তরিক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে হিন্দি শব্দের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। মূর্শিদাবাদ নিবাসী বেবীর পাঁচ ছয় বছর দিল্লী থাকার কারণে হিন্দি শব্দ বা বাক্যবন্ধ তো স্বাভাবিকভাবেই তার কথাবার্তায় চলে এসেছে। হিলাচ্ছে (দুলছে/নড়ছে), মজাক, ধ্যান দেয়া, কুড়াদান, টমেটর, জরুর ডাল মে কুছ কালা হ্যায়, কাহানি, খাস করে (নিজের জন্য), আওয়ারা, খালাস, লায়েক ইত্যাদি। কিছু Slang শব্দও বেবীর রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসেছে। শালা, ঘোড়ার মুত, মদ, ইত্যাদি শব্দ প্রথম গ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় গ্রন্থে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

কিছু অনুকার ও ধন্যাত্মক শব্দেও আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন- ট্যাপ্ট্যাপ করে দেখা, লাজুক লাজুক চোখগর্মি, ভিচকোচ্ছে, পুছেপাছে, গদাস্ করে, মিচ্কি হাসি

ইত্যাদি। অনুকার শব্দে 'ঠ' বর্ণের ব্যবহার বিশেষভাবে নজর পড়ে। যেমন- খইঠই, বেড়াতে ঠেড়াতে, পড়েঠড়ে, ভাঙেঠাঙ্গেনি ইত্যাদি।

কিছু কিছু প্রবাদ তথা ব্যঙ্গাত্মক ছড়া, এই বই দুটোতে পাওয়া গেছে। যেমন- এক ঝাঁড়ের বাঁশ, দই খাও বাটি ভরে/ বই পড় জোরে জোরে, আম খেতে ভালোবাসি/ তাই মুখে ফোটে হাসি, যার ধন নেই তার মন আছে/ যার ধন আছে তার মন নেই, যত মুখ তত কথা, যে পাতে খায় সে পাত ফুটো করে ইত্যাদি।

কিছু কিছু ভিন্ন বাক্যবন্ধ বেবীর রচনায় পাওয়া যায় যা আঞ্চলিক হয়েও সার্বজনিক- খুশিতে খসে পড়া, বুকের হাড়্গুলি কাঁপছে, কথার টাল দেয়া, বাচ্চার দুয়ার ফেটে গেছে- এগুলি সবই প্রায় ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যবন্ধ।

তার গ্রন্থের সঙ্গে আনাফ্রাঙ্কের ডায়েরির তুলনা কেউ কেউ করেছেন। আনা তেরো বছর বয়স থেকে শুরু করে পনেরো বছর দুমাস বয়সের মধ্যে তার ডায়েরি লিখেছিলেন। তার রচনাকে যথার্থ ডায়েরিই বলা যায়। বেবীর গ্রন্থটি ডায়েরি নয়- স্মৃতিকথামূলক বা জীবনচরিত মূলক বা আত্মজৈবনিক গ্রন্থ। আনার ডায়েরিতে ছিল জার্মানিতে হিটলারের অত্যাচারে ইহুদিদের লুকিয়ে থাকা দিনগুলির যন্ত্রণা, অবসাদ সন্ত্রাস আর মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার মতো ভয়াল দিনগুলির কথা আর ছিল জীবনের ছোট খাটো নগণ্য বিষয় থেকে জীবন দর্শনের কথা, তার ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগা, ভালোবাসার কথা। বেবীর বইয়ে আছে বাবার অবিবেচনা, তার কুঅভ্যাসের জন্য বেবীদের জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল যে চরম বিপর্যয় তার জন্য সেও বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি। বেবীর আত্মজীবনী অনেকটা স্মৃতি কথন-ডায়েরি নয়। আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির সঙ্গে বেবী হালদারের গ্রন্থের তেমন কোনো মিল নেই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও তার প্রকাশ ছাড়া।

বেবী হালদারের গ্রন্থ দুটি বিশেষ করে তার প্রথম গ্রন্থটি কতটা সাড়া ফেলেছে তার কয়েকটি তথ্য থেকেই জানা যায়। মূল গ্রন্থটি (আলো আঁধারি) ২০০২ এ প্রবোধকুমারের হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়। ২০০৪ এর কলকাতা বইমেলায় তসলিমা নাসরিন উদ্বোধন করেন মূল বাংলায় লেখা গ্রন্থটি। গ্রন্থটির ইংরেজি, ওড়িয়া, কোরিয়া, চীনা, তামিল, ফরাসি ও মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এন.সি.ই.আর.টি র এগারো ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক বিতান এ আলো-আঁধারি স্থান পেয়েছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সপ্তম শ্রেণিতে সাহিত্যচয়ন (নতুন

সংস্করণ) এ ‘আলো আঁধারি’ র নির্বাচিত অংশ পাঠ্য করেছে ‘আলোর পিপাসা’ নাম দিয়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বেবী হালদার আমন্ত্রণ পেয়েছেন, বক্তব্যও রেখেছেন। হংকং ও প্যারিসের সাহিত্য সভায়ও তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তার জীবনের ওপর দুটি তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘আমরা বেবীর পথ চলার সঙ্গী’ লেখায় বেবী হালদারের লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তার ‘ঘরে ফেরার পথ’ (২০১৪) বইটি বাঙালি পাঠকের অপেক্ষাকৃত বেশি চেনা। ২০০২-তে ‘আলো আঁধারি’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বেবীর যে আত্মপ্রকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০১৪-তে এসে তা প্রায় পূর্ণ। নানা দেশ বিদেশ ঘুরে বিশ্ব পরিচয়ের আলো মুকুটে নিয়ে বেবী এসেছেন ছোটবেলার পাড়া জলঙ্গি এবং দুর্গাপুরে। চেনা মানুষদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে দু-দশক পর। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, মানুষজনের কথা নতুন করে লিখছেন একজন মেয়ে, যাঁর মানুষের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর আগ্রহ একটুও বদলায়নি। তার পাড়ার ছেলেমেয়েরা বেবীর জীবনকাহিনি পড়ছে পাঠ্যবইতে, অথচ বেবী তাদের বাবা মায়েদের অনেক দিনের আগের চেনা মানুষ।

এরপর বেবী বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। তার মনের মতো মাথার ওপর ছাদ পেয়েছেন। শ্রমজীবী মায়েদের সন্তানদের দেখাশোনার কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন, তাঁর চোখের সামনে খুলে গিয়েছে নতুন নতুন মুখের মিছিল।

প্রতিটি মানুষের জীবনেই কম-বেশি কিছু সংগ্রামের ইতিহাস থাকে। সাহিত্যপ্রেমী অনেকেই তাঁদের জীবনের ইতিহাস রচনা করে গেছেন- কখনো সরাসরি, কখনো গল্পের মাধ্যমে। শ্রীযুক্ত বিপদভঞ্জন সরকার মহাশয় এরকমই একটি গ্রন্থ ‘জলঙ্গির পদ্মা’ রচনা করেছেন। এই জীবনী গ্রন্থে তিনি নিজের নাম উল্লেখ করেন নি। বিবেক নামটি ব্যবহার করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটিতে তিনি অনেক জায়গাতেই অকপটে বলে গেছেন জীবনের দুঃখ-জর্জরিত দিনগুলির কথা। সংক্ষিপ্ত হলেও এইসব গল্প থেকেই উঠে এসেছে তাঁর যুদ্ধ জয়ের গৌরব-গাথা, যা এই গ্রন্থের পাঠকদের সাহস জুগিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে প্রেরণা দেবে।

তার জন্ম হয়েছিল অখণ্ড বাংলার হাজার হাজার মানুষের অনাহারে মৃত্যুর বছরে। দেড় বছর বয়সেই পিতৃহারা হন। লেখাপড়াও তেমন হয়নি। সে সময় তিনি ও তার মা দাদাদের সংসারে থাকত। দুর্গা পুজোতে জামাকাপড় বানানোর জন্য তাকে দাদার কাছে অনেক মার

খেতে হয়েছিল। জেলেপাড়ার মধ্যেই তাদের বাড়ি ছিল। তার মা অনেক আগে থেকেই তাদের জাল বুনে নিজের হাত খরচের পয়সা জোগাড় করে জমিয়ে রেখেছিল। সেই টাকায় সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে বিবেক ও তার মা দাদাদের সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেল। লেখক ও তার মায়ের দুরাবস্থা দেখে পাড়ার মাতব্বর গণেশ হালদার জানায় লেখকের মাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে জাল বোনাবে না আর তার নৌকায় লেখককে কাজ দেয়। অবশ্য সেই কাজ পরে তাকে ছাড়তে হয় কারণ পদ্মায় রাত্রে নৌকো থেকে জাল ফেলতে গিয়ে জালের সঙ্গে সেও জলে পড়ে যায়। মা চায় না সেইকারণে মায়ের অবাধ্য হয়ে সে আর কারো নৌকায় জাল বাইতে যেতে পারে না। এরপর সে হাটে মাছ বিক্রি করার কাজ শুরু করে। এরপরে দোকানে কাজ করে সে। ইতিমধ্যে তার মায়ের মৃত্যু হয়। সাহিত্যচর্চায় তার অনেক উৎসাহ ছিল। জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চায় অবতীর্ণ হন। স্বার্থপর মানুষ কিভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের ওপর অত্যাচার করে আনন্দ লাভ করে, তার জলজ্যান্ত ছবি অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে লেখকের অকপট লেখনীর স্পর্শে। মানুষের লোভ-লালসার ছবি যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি সভ্য সুশীল মনের মানুষও সময় মতো এসে হাজির হয়েছেন তাদের সহানুভূতি নিয়ে। এভাবেই সুখ-দুঃখময় জীবনকে তুলে ধরেছেন তার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে।

বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মালো জাতির জীবনযাত্রা, জীবিকা, মনস্তাত্ত্বিকতা সবকিছু নিবিড়ভাবে গ্রথিত হয়েছে বা গ্রন্থিত হয়েছে বা মালোদের প্রসঙ্গ রয়েছে এরকম উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনীগ্রন্থগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যারা জাতিতে নিজেরা মালো এরকম কবি, গল্পকার, জীবনীকারদের গ্রন্থকেও এখানে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে মালোদের জীবনচিত্রকে তারা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই আলোচনা থেকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মালো জাতির প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

তথ্যসূত্র

১। ওঝা, কৃত্তিবাস : *সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ,* কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৩৫৩, পৃ. ১৭৪

২। তদেব : পৃ. ১৭৫

৩। তদেব : পৃ. ১৭৫

৪। তদেব : পৃ. ১৭৫

৫। তদেব : পৃ. ৩৪১

৬। তদেব : পৃ. ৩৪২

৭। বিশ্বাস, অচিন্ত্য : *বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল,* কলকাতা ০৯, অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৭৭

৮। তদেব : পৃ. ২০৭

৯। চক্রবর্ত্তি, মুকুন্দরাম : *সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী,* এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২১, পৃ. ৮৮

১০। তদেব : পৃ. ৮৮

১১। তদেব : পৃ. ৯০

১২। দাস, কাশীরাম : *সচিত্র কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব* মহাভারত, কলিকাতা, ১৩৩২, পৃ. ৩১২

১৩। তদেব : পৃ. ৪৫১

১৪। ভট্টাচার্য্য, রামেশ্বর : *শিবায়ন,* কলিকাতা, বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৬

১৫। চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম : *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* কলিকাতা, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস, তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৮, পৃ. ১৫

১৬। তদেব : পৃ. ৮১

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ দাস, সজনীকান্ত : *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* কলিকাতা-০৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৩৫৭, পৃ. ২১০

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* কলকাতা-১২, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮০ পৃ. ৭৭০

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : *পদ্মানদীর মাঝি,* কলকাতা-৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৬ জুলাই, ১৯৩৬, পৃ. ১৩

২০। তদেব : পৃ. ৭

২১। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুন ২০১৩, পৃ. ৩১

২২। তদেব : পৃ. ২৪৯

২৩। তদেব : পৃ. ২১

২৪। ঘোষ, শুভঙ্কর : *নদী : বাংলা উপন্যাস নীললোহিত,* বিশেষ নদী সংখ্যা সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৪১

২৫। বাগচী, আনন্দ : *সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া,* দেশ, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা ১৯৮৮, পৃ. ৫০

২৬। চট্টোপাধ্যায়, সাধন : *উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড),* কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ১৬

২৭। তদেব : পৃ. ১১

২৮। কর, সন্তোষ : মুক্তামাছ, পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৪০১, দিঘলপত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ ২১ এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৭০

২৯। তদেব : পৃ. ১৮৩

৩০। তদেব : পৃ. ১৭৭

৩১। নটরাজন : *ইলিশজোড়,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ২০৮

৩২। মৃধা, প্রশান্ত : *জল ও জালের তরঙ্গ,* ঢাকা-১১০০, রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম রোদেলা সংস্করণ একুশে বইমেলা ২০১৭, পৃ. ৩৯

৩৩। তদেব : পৃ. ৭৫

৩৪। তদেব : পৃ. ৯৯

৩৫। জাহাঙ্গীর, নূরুদ্দিন : *জাল থেকে জালে,* ঢাকা-১১০০, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭৩

৩৬। তদেব : পৃ. ১০৩

৩৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ, কলকাতা ৭৩, সাহিত্যম্ দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৪১৫, পৃ. ২২১

৩৮। জববার, আবদুল : *বাংলার চালচিত্র,* কলিকাতা ১২, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৩৭১, পৃ. ৮

৩৯। তদেব : পৃ. ২৩৯

৪০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *ছড়া,* কলিকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৮০, পৃ. ১২

৪১। তদেব : পৃ. ৩২

৪২। তদেব : পৃ. ৩৩

৪৩। উদ্‌দীন, জসীম : *রাখালী,* ঢাকা-১২১৭, পলাশ প্রকাশনী, পঞ্চদশ প্রকাশ জুন ২০১৬, পৃ. ৩৮

৪৪। উদ্‌দীন, জসীম : *জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১০১

৪৫। তদেব : পৃ. ১১৫

৪৬। হালদার, সুশান্ত (সম্পাদনা) : *ভাসমান-১,* কলিকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ১৯জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১

৪৭। হালদার, সুশান্ত (সম্পাদনা) : *ভাসমান-২,* কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ৩০ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৯৯

৪৮। বিশ্বাস, পরিতোষ : *ঠিকানার খোঁজে,* শিমুরালী, নদীয়া, উদাসীন, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২৭ শে আষাঢ় ১৪০৯, পৃ. ৬৪

৪৯। তদেব : পৃ. ৬৯

৫০। রায়, বিধান : *অমাবস্যায় জ্যোৎস্নার আল্পনা,* আগরতলা -৭৯৯০০১, বুক ওয়ার্ল্ড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১১

৫১। চক্রবর্তী, বিমল : *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার,* ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, অক্ষর পাবলিকেশনস্‌, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১২, পৃ. ২০০

৫২। তদেব : পৃ. ১০২

৫৩। হালদার, লিলি : *গহীন জলে মৎস্যকন্যা,* কলকাতা ৯৫, শব্দহরিণ, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১২ পৃ. ১৮

৫৪। তদেব : পৃ. ২০

৫৫। তদেব : পৃ. ২২

৫৬। তদেব : পৃ. ২৩

৫৭। তদেব : পৃ. ৩৩

৫৮। তদেব : পৃ. ২৭

৫৯। তদেব : পৃ. ৪৫

৬০। দত্ত, উৎপল (সম্পাদনা) : *এপিক থিয়েটার সংখ্যা ৩,* কলকাতা ৯১, নাট্য শোধ সংস্থান, ১৯৮৩, পৃ.২৯

৬১। চক্রবর্তী, মনোনীতা : *চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে,* ইসলামপুর-উত্তর দিনাজপুর, দাগ উৎসব সংখ্যা ২০১৭, পৃ. ৪৩

৬২। তদেব : পৃ. ৪৩

৬৩। তদেব : পৃ. ৪৪

৬৪। হালদার, বেবী : *কবে আমি বাহির হলেম,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ১৫

৬৫। তদেব : পৃ. ১১৫

চতুর্থ অধ্যায়
সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়
সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ

সংস্কৃতির অর্থ কী, এই প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত-মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। তার অর্থ- মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি, এই 'কৃতি'র বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মও বুঝে উঠছে, বাধা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা বেঁচে থাকা। মানুষ এই তাড়নায় চায় আপনার পরিবেশের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে টিকে থাকতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হতে আদায় করে নিতে। এর নাম জীবিকা চেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তা সহজসাধ্য করা। দৈহিক মানসিক প্রয়াস-প্রযত্নে এই জীবিকা সে ক্রমেই আয়ত্ত করেছে। এই প্রয়াস-প্রযত্নেরই নাম পরিশ্রম। এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা উন্নত হয়েছে, স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, শেষে সভ্যতার এক একটি উপাদান সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি, আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।

নগর-সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতির উপাদান-প্রকরণ সমান অর্থাৎ উভয়ই ত্রিসঞ্চয়ের সমন্বয়। তবে উভয়ের মানের ভেদ আছে। নগর-সংস্কৃতি সূক্ষ্ম, জটিল, বিচিত্র, বিমিশ্র, মার্জিত, শোভনীয় ও মননাশ্রিত। সমাগম, যোগাযোগ, সংমিশ্রণ, সাঙ্গীকরণ ইত্যাদি কারণে নগর-সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিকাশের শর্ত যে 'মবিলিটি' এখানে তার সুযোগ-সুবিধা বেশি। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য আধুনিক নগর-সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে।

লোক-সংস্কৃতিতে এসব গুণের অভাব আছে। লোক-সংস্কৃতি স্থূল, সরল, অমার্জিত, গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। যথাযথ শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাব এর অন্যতম কারণ। লোকচর্চায় যত্ন ও শ্রম কম। লোকে সহজ প্রবৃত্তির বশে উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অনায়াসে যা পায় তাই গ্রহণ করে। লোকে আগ্রহাতিশায্যে নতুনকে বরণ করে কিন্তু অবিকলভাবে তা ধাতস্থ করতে পারে না। উপজাতির লোকেরা বিদেশী উপকরণ

সহজে গ্রহণ করে না; বিদেশী উপকরণ গ্রহণে লোকমনে বাধা নেই, কিন্তু সীমিত বোধশক্তিতে সর্বাংশে তা আয়ত্ত করতে পারে না। যেটুকু তার চৈতন্য ও বুদ্ধিতে ধরা পড়ে, সেটুকু গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়। বিদেশী ভাববস্তুকে নিজ অভিরুচি ও অভিলাষ অনুযায়ী সাঙ্গীকরণের চেষ্টা করে। দেশাচার, লোকপ্রথা, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা যা তারা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে দেখে ও শুনে লাভ করে, তাই লোক-সংস্কৃতির সম্পদ। অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি প্রধানতঃ ঐতিহ্যনির্ভর। পৈতৃক সম্পত্তির মত এগুলি বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে গ্রহণ করে ও পালন করে। গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন নেই বলে লোকভাবনার দ্বারা নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয় না। লোক-সংস্কৃতি স্থূল ও জটিলতাহীন। সরলতা ও স্বাভাবিকতা লোকসংস্কৃতির ভূষণ। জনসাধারণের অক্ষরজ্ঞান নেই বলে তারা কোন কিছু গ্রন্থিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করে রাখে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লোকজ্ঞানের প্রধান উৎস। লোকমুখে তা প্রচারিত হয়, লোকশ্রুতিতে গৃহীত ও লোকস্মৃতিতে রক্ষিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব তথা জাতিতত্ত্বের প্রকৃত উপাদান লোক-সংস্কৃতিতে প্রবহমান থাকে। সুতরাং একটি দেশের একটি জাতির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় তার লোকসংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব।

জ্ঞান আহরণে ও আত্মীকরণের সমস্ত পর্যায়েই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক প্রত্যক্ষ সমীক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মানব সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণায় অনুরূপভাবে মানব সমাজভিত্তিক ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্ব সীমাহীন। মানুষের কার্যকলাপ ও তার গতিবিধি সঞ্জাত আচার-আচরণের গতি ও প্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণ, সমাধান ও সরলীকরণ বা সমীকরণ করা ইত্যাদি নৃ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

ক্ষেত্রসমীক্ষাতে নূতন তথ্য, ঘটনা প্রভৃতির আবিষ্কার ও তজ্জনিত বিচার বিশ্লেষণ, পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো, বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে মতবাদের বিকাশ ঘটানো ও তাকে কার্যকারী করানোর চেষ্টা প্রভৃতি হয়ে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষাতে ক্ষেত্র ছাড়াও মানুষের কর্মপদ্ধতি, আয় ব্যয়ের খতিয়ান, মানসিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা হয়ে থাকে।

ভারততীর্থের অন্যতম প্রান্তিক দেশ বাংলা। এই বাংলাতেই মিশেছে গঙ্গা-করতোয়া-আত্রেয়ী-তিস্তা, সাগর-পর্বত, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মিশেছে বিভিন্ন রক্ত ও সংস্কৃতি। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাকে আজও বহন করে চলেছে দিনাজপুর জেলা। লোকবিশ্বাস যে, 'দিনাজ' নামের একজন ব্যক্তি তাঁর পরিবার ও

অনুগামীদের সঙ্গে যেখানে বসবাস শুরু করেন, তখনকার নতুন বসতিসমূহের নামকরণের রীতি অনুযায়ী সেই স্থান 'দিনাজপুর' নামে পরিচিত হয়।

দিনাজপুর নামের শাব্দিক অর্থ দিনাজের শহর। আবার কারও মতে, মুসলমান অধিকারের যুগে একজন হিন্দু জমিদার নিঃশব্দে ক্ষমতা সঞ্চয় করে নিজেকে গৌড়ের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই হিন্দু জমিদারটি ছিলেন দিনাজপুরের প্রভাবশালী ভূস্বামী রাজা গণেশ। তিনি 'দলুজমর্দনদেব' নাম ধারণ করেন। ফার্সি পণ্ডিতেরা 'দলুজ' শব্দটি উচ্চারণ করতেন 'দিনওয়ার' রূপে। শব্দটি ভাষাতাত্ত্বিক ধারায় ক্রমে আবর্তিত হয়ে 'দিনওয়াজ' অর্থাৎ দনুজ < দন-উ-য < দন-ওয়া-য < দিন-ওয়া-জ রূপে পরিণত হয়। সতেরো শতকে মুসলিম শাসকরা 'দিনওয়াজ' শব্দটিকে বেছে নেন, যার বাংলা 'দিনাজ'। তার সঙ্গে 'পুর' যোগ করে স্থানটি দিনাজপুর নামে পরিচিত হয়।

ফার্সিতে গণেশ দলুজমর্দনদেবকে বলা হত 'দিওয়ান-ই-দিন পয়ায'। মুসলিম শাসকরা এর তর্জমা করলেন 'Hakim of Dynwas' অর্থাৎ দিনাজপুরের হাকিম। আবার পরবর্তীতে ইংরেজরা দলুজমর্দনদেব সম্পর্কে লিখলেন- 'perhaps a pretty chief of Dynway' যার অর্থ দিনাজের এক সামন্ত। দিনাজপুর জেলার মানুষ 'র'-কে 'অ' এবং 'অ'-কে 'র' বলেন। এর থেকেই দিনরাজপুর হয়ে যায় 'দিনাজপুর'। এই জেলার জনসাধারণের যোজনব্যাপী দারিদ্র্য লক্ষ্য করে ইংরেজ আমলের শেষদিকে জনৈক ঐতিহাসিক খেদোক্তি করেছিলেন- দীনজনপুর থেকেই সম্ভবত এ জেলার নামকরণ হয়েছিল 'দিনাজপুর'। দিনাজপুর নামের উৎপত্তি পরবর্তীকালে স্থানীয়ভাবেও হতে পারে। কারো কারো অভিমত, 'দীন-ইয়াজ' নামে কোন বিখ্যাত সন্তের নাম থেকেই 'দিনাজপুর' নামটি হয়েছে।

রামগড়, কোটিবর্ষ, পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রভূমি থেকে অখণ্ড দিনাজপুর, খণ্ডিত দিনাজপুর, পশ্চিম দিনাজপুর এবং শেষ খণ্ডিত রূপ দক্ষিণ দিনাজপুর আত্মপ্রকাশ করে। জেলার জনবিন্যাসে নানা রকমের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এখানকার মানুষ প্রধানত কৈবর্ত, মাহিষ্য, রাজবংশী ও আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত। এছাড়া মুসলমান ও খ্রিস্টানও রয়েছে। অনেকে বলেন বাঙালি জাতির উৎপত্তি মোঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে। ইতিহাস গবেষকরা মনে করেন দক্ষিণ দিনাজপুরবাসী এই সংমিশ্রিত জাতির অন্তর্গত। ১৯৫১ সালের জনগণনায় মাত্র ৯ টি সম্প্রদায় এই জেলার তপশিলি জাতি রূপে বসবাস করত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ৯ টি সম্প্রদায় হলো- ভুঁইমালি, ভুঁঞা, মালো, মুচি, নমশূদ্র, নুনিয়া, পলিয়া, রাজবংশী ও তুরী।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ভূপ্রকৃতি রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত। জেলার সীমানার ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে মালদা ও উত্তর দিনাজপুর, উত্তরে বাংলাদেশ ও উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ ও মালদহ জেলা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষি নির্ভরতা প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশি। জেলার বনভূমি মাত্র ০.৩২ শতাংশ। এছাড়া সামাজিক বনসৃজন সহ অন্যান্য ধরলে প্রায় ৮ শতাংশ। যেখানে রাজ্যে রয়েছে ১৩ শতাংশ এবং জাতীয় হার ২৩ শতাংশ। এখানকার বিভিন্ন পুকুর, দিঘি, জলাশয়ে প্রচুর মাছ চাষ হয়। এছাড়া বেশ কিছু খাল ও খাড়ি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য দিঘি হল তপন দিঘি, মহীপাল দিঘি, ধলদিঘি, কালদিঘি ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ খাঁড়ি হল ঘুকসীর খাঁড়ি, আত্রেয়ী খাঁড়ি, কাশিয়া খাঁড়ি, ডাকরা খাঁড়ি, ভবানীপুর খাঁড়ি, পচাকানা খাঁড়ি। বর্তমানে নদীপথের ব্যাপক ব্যবহার না থাকলেও পূর্বে মাছচাষ থেকে পণ্য পরিবহন, চাষবাস এবং বড় বড় হাট, বাজার, গঞ্জ প্রভৃতি নদীর তীরেই গড়ে উঠত। জেলাতে কিছু উল্লেখযোগ্য নদী বন্দর রয়েছে যেমন টাঙ্গন নদীর তীরে বংশীহারী, পুনর্ভবার তীরে দমদমা, নয়াবাজার, গঙ্গারামপুর, করদহ, ইছামতীর তীরে কুমারগঞ্জ, আত্রেয়ীর তীরে সমজিয়া, পতিরাম, বালুরঘাট, শ্রীমতি নদীর তীরে কুশমণ্ডি, হরিরামপুর ইত্যাদি। এই অধ্যায়টিকে দুটি উপ অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

বাংলা সংস্কৃতি ও মালো সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কীভাবে ঘটেছে তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে। মালোদের মধ্যে চড়ক পুজো, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, মনসাপুজো হয় যা বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত। এই উপ অধ্যায়ে বাংলা সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মালোদের লোকসংস্কৃতির নানা উপবিভাগ-ধর্মীয় পূজা এবং তৎসংক্রান্ত, ব্রত, পৌষপার্বণাদি, বারোমাসি গান, বরজের গান, পালা গানের অংশ, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, কৃষ্ণযাত্রা, নামগান, হরি বংশ, ভাটিয়ালি, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, শ্লোক, ছড়া, লোক সংস্কার, জন্ম মৃত্যু বিবাহের উৎসব, সংস্কার, সামাজিক উৎসব নৌকা বাইচ, লোক গল্প ইত্যাদি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

১। বাংলা সংস্কৃতি ও মালো সংস্কৃতির সংমিশ্রণ

মানুষের প্রাত্যহিক সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যে সকল কর্মপদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়, যা কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত এবং যার ফলে সে তৈরি করে এক বিশেষ পরিমণ্ডল তাকেই সংস্কৃতি বলে। অর্থাৎ ইংরেজিতে বলা যেতে পারে 'Sum total of human behaviour'. সামাজিক সকল দিকেই মানুষের ব্যবহারের যোগফল হল সংস্কৃতি। সামাজিক জীব হিসেবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে যে যে কাজ করে সবকিছুই সংস্কৃতি হিসেবে পরিগণিত হয়।

বহুকাল ধরে বহু জনজাতির সাংস্কৃতিক প্রভাব বাঙালি জাতির ওপর পড়েছে। প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকেই মালোরা বিদ্যমান ছিল। তারা শিবের গাজন, বিষ্ণুর গান, রাম সীতার গান, মনসার পালাগান করত। তাদের হাত ধরেই বাঙালি সংস্কৃতিতে এগুলি বিস্তার লাভ করে। মালোদের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবেই সংগীত প্রবহমান। পেশা হিসেবে মালোদের প্রবহমানতার পটভূমিকায় স্বাভাবিক কারণে নদী ও সমুদ্রের প্রভাব অনেক। এর ফলে লোকায়ত যাপনের বহুলাংশে তাদের হৃদয়ের প্রসারতা যেমন ঘটেছে তেমনি বাদ যায়নি তাদের সংগীতও। বিশেষ করে মালোদের সংগীতের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি বিশাল। যুগ যুগান্তর পার হয়ে সেই মৌখিক সংস্কৃতি সময়ের সাথে তাল রেখে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে আজও বয়ে চলেছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমগ্র বাঙালি জাতিকেই পুনরুজ্জীবিত করেছিল। মালোদের মধ্যে সেই প্রভাব যেন একটু বেশিই পড়েছিল। কারণ বৈষ্ণবদের মধ্যে ঘৃণা বঞ্চনার পরিবর্তে সমাজের নিম্নবর্গের হয়েও মালোরা পেয়েছিল ভালোবাসা- একসাথে চলা ও বসার সমানতা। আজও মালোদের সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা যেন বিরাজমান। সমাজ জীবনের "বৈষ্ণব" প্রভাব স্বরূপ মালোরা অধিকাংশই মহাপ্রভুর অনুগামী "বৈষ্ণব"।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় তাদের কাছ থেকে যতটুকু জানা গেছে, তাদের সংগ্রহ থেকে যতটুকু পাওয়া গেছে, তা যদি রাখা না যায়, তার সব কিছুই একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। লুপ্ত হয়ে যাবে মালোদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে আলাদা এবং অনেক অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। মালো সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারবে না তাদের শিকড়ের সন্ধান, জানতে পারবে না তাদের ঐতিহ্য, জানতে পারবে না তাদের ঐতিহ্য, জানতে পারবে না তাদের সামাজিক ইতিহাস। মালোদের হারিয়ে যেতে বসা সেই সংস্কৃতিকে দুই মলাটের মাঝে ধরে রাখার এ এক উদ্যোগ।

মালোদের গানের কথায় সিংহভাগ জুড়ে থাকে জল, জাল, নৌকা, চাষবাস, সমাজ সংসারে সামাজিক দৈনন্দিন ঘটনা, জীবন যাপনের দুঃখ হাসি, কান্না, বেদনা, পূজা পার্বণ, ব্রত, রাধা, কৃষ্ণ, গৌর, রাম, সীতা, মহাদেব প্রভৃতি। মালোদের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ আসা স্বাভাবিক কারণ মালোরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব পদাবলীতে মাছের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। কিন্তু মালোরা বৈষ্ণব হলেও তাদের হৃদয় ভূমিতে জন্ম লাভ করেছে অসংখ্য গীত। সেখানে জাল, মাছ ও মাছ সংক্রান্ত অনেক কিছুই যুক্ত হয়েছে।

'কানু ছাড়া গীত নাই' প্রবাদ বাক্যটি মালোদের জীবনচর্যায় প্রচণ্ড ভাবে সত্য। কারণ তাদের কথকতায় কৃষ্ণ, কালা, কানু, শ্যাম আছে অনেক অংশ জুড়ে। যার শুরু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। শুধু মালোদের কেন ভারতীয় সমাজ ইতিহাসে 'কৃষ্ণ' এমন এক চরিত্র যার প্রভাব দৈনন্দিন চর্চায় ও জীবন চর্যায়, এমনটি মনে হয় অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। মালোদের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ আসা স্বাভাবিক কারণ মালোরা অধিকাংশই বৈষ্ণব।

ক। বোলান

যখন মাছ ধরা থাকে না বা মাঠে কৃষিকাজ থাকে না, সেই সময় মালোরা দুটি বাচ্চাকে রাধা কৃষ্ণ সাজিয়ে অষ্ট সখিরা একত্রিত হয়ে গান গেয়ে পাড়াময় ঘুরে বেড়ায় একেই বলে অস্টক বা বোলান। বর্ষশেষের রাঢ় বাংলার চৈতি-ফসল বোলান। ড. সনৎকুমার নস্কর বলেন যে বাংলার চিরায়ত চলমান ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে সে আমাদের সামাজিক জীবনকে দেয় পূর্ণতা। শৈব উৎসবের সঙ্গে অভিন্নতার সূত্রে তার স্বর-সুর বাঁধা। শিব ভারতীয় পুরাণে গণদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। তাই অনিবার্যভাবে লোকজীবন ও লোকবৃত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত বোলান। এর আঙ্গিক নাগরিকতার স্পর্শযুক্ত। আসলে বাংলার সাবেকী ঐতিহ্যের হাত ধরে গ্রামীণ মানুষের উৎফুল্ল মনের প্রকাশ ঘটেছে বোলানে।

বোলান গান প্রশ্নোত্তরের কৌশলে উপস্থাপিত। অনেকটা তর্জার মতো ছড়া কেটে বলা হয়। সঙ্গে থাকে নাচ। বোলানের বিষয় আগে ছিল পুরাণ আর ইতিহাস। এখন সেসব প্রায় বাতিলের মুখে। কেননা চটকদার সামাজিক নকশা এসে তাদের জায়গা দখল করছে। বোলানের গানে দরিদ্র কৃষক জীবনের টুকরো ছবি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বোধহয় গণদেবতা শিবের উৎসব বলেই এতে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধের স্ফুরণ ঘটে অজান্তে। প্রতিবাদী চেতনার ছাপও বোলানে খুব সুস্পষ্ট। নিরন্ন, দুর্গত শোষিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় এ গান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি যোগায় বোলান। বোলানের লোক শিল্পীরা আসরে

অর্ধবৃত্তের মতো দাঁড়ায়। একই সঙ্গে চলতে থাকে নাচ আর গান। বাজে ঢাক-ঢোল-ঝাঁঝরি-গঙ্গ-সারিন্দা-করতাল-মাদল-ঝুমঝুমি-সানাই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আসে বোলানের রসিক শ্রোতা আর আমুদে দর্শক হয়ে। এ গান রাঢ়ের জনজীবনের শিকড়ে গিয়ে নাড়া দেয়।

বোলান সংগীতবহুল লোকনাটক। হাঁটাচলার মধ্য দিয়ে সংলাপ বলা হয় গানে। মূল অভিনেতা বা গায়ক থাকেন বড়জোর চারজন। বাকিরা দোহারের ভূমিকায়। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে গলা মেলায় কিশোর অভিনেতা অথবা বয়স্ক কোন মেয়েলি পুরুষ। এর পালাকার, সুরকার, শিল্পী সবাই প্রায় সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষ। বোলানের প্রকারভেদও আছে অনেক- দাঁড়ানে, ছল, সাঁওতেলে, পোড়ো। বোলানের নির্দিষ্ট কোন সুর নেই। প্রচলিত লোকগীতি, বাউল, কীর্তন কখনও বা জনপ্রিয় ফিল্মি গানের সুরেই গীত হয়। মাটির সুরভি থেকে ঘ্রাণ নিতে নিতে লোকজ সুরের ঝরনাধারায় নেয়ে বোলান হয়ে ওঠে রাঢ়ের দেহাতি মানুষের প্রাণের উৎস।

‘ওগো বন্ধু, আমাদের একলা ফেলায়ে
কৃষ্ণ, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি গেলে চলে।।
ও সখি গো, কোথায় পাব বীজ কোথায় রোপিব
প্রেম বাতাস, প্রেম জল কে দিবে গো (ধূয়া)।।

ওগো বন্ধু, কেমনে হইবে চাষ, কেমনে সংসার চলিবে গো
কৃষ্ণ কথা কে শোনাবে, কে তাকে আমাদের কথা বলিবে গো।।
সে যেন আমাদের সাথে থাকে তার প্রেমে আমরা যেন থাকি গো,
বন্ধু, তুমি, চলে আস, তোমা বিনা হাহাকার সবে করে গো (ধুয়া)
মাইয়ার ভাল, জানে সিথির সিন্দুরে, চাষী জানে চাষের ফসলে
গাই গরু যেন ভালো থাকে-খালে বিলে মাছ হয় খেয়াল রাখিবে
আস আস বন্ধু কৃষ্ণ-আস আমাদের এই ম্যালে
তোমা বিনা চাষ, খাল বিলে মাছ, জীবন আঁধার হয়ে যাবে, বন্ধু তুমি না আসিলে।।’[১]

শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক এর মতে চৈত্র সংক্রান্তির মরশুমে এ বঙ্গের সর্বত্র নানাবিধ উৎসব হয়ে থাকে- গাজন তার অন্যতম। অঞ্চলভেদে বিভিন্ন স্থানে নানারূপ বিনোদন পদ্ধতির মধ্যে

বোলান গান হল এক বিশিষ্ট মাধ্যম। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-স্টেশন সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এই প্রকরণটি দেখা যায়।

বোলান গানের প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় বন্দনা গান- যা সহজেই আজও গ্রামীণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এর শেষাংশে কখনও দল সদস্যদের পরিচয় ব্যক্ত করা হয়। এর পর বোলানের প্রকৃত অংশ গান- অর্থাৎ পালা। সরল বেশবাসে পাঁচালি জাতীয় কবিতায় এই অংশ গীত হয়। পৌরাণিক বিষয়ের প্রচলন আলাদা থাকলেও এখন শুরু হয়েছে সামাজিক-প্রশাসনিক বিষয়ও।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচারে বোলানকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা শ্মশান বোলান, দাঁড়া বোলান, সাঁওতেলে বোলান, পালা বোলান, ছল বা রঙ পাঁচালি। কোনও বছর চৈত্রমাসের দিনসংখ্যার ভিত্তিতে ২৭ অথবা ২৮ শে চৈত্র 'শ্মশান বোলান' এর যাত্রা শুরু। শ্মশান বোলানের অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের বলা হয় 'শ্মশান ভক্ত'। 'দাঁড়া বোলান' মূলতঃ গীতিনৃত্য। দাঁড়া বোলান আবার বন্দনা, পালা, পাঁচালি ও পয়ার এই চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। সাঁওতেলে বোলান মূলতঃ যৌথনৃত্য এবং এতে শারীরিক উদ্দামতাই প্রকট। তাই দলে যুবকদেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। 'পালা বোলান' কিছুটা যাত্রাপ্রধান। পালা বোলানের শিল্পীদের তাই ভালোরকম অভিনয় দক্ষতার দরকার হয়। পালা বোলান বন্দনা গান দিয়ে শুরু করে ক্রমে তা বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে। রাত জাগা বোলান প্রিয় গ্রামীণ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে 'ছল' বা 'রঙ' পাঁচালি' র জন্য। এর জন্য স্বতন্ত্র কোনও দলের প্রয়োজন হয় না। বোলান শেষে প্রত্যেক দলের দলপতি তার কয়েকজন বাছাই করা শিল্পীকে নিয়ে 'ছল' বা 'রং' পরিবেশন করে।

খ। ভগবতী পূজা

সাধারণত পাবনা, যশোহর জেলার অবিবাহিত মহিলারা ১লা বৈশাখে এই পূজা করে। গোয়াল ঘর পরিষ্কার করে তাতে আলপনা দেয় তুলসী মঞ্চকেও ধুয়ে পরিষ্কার করে। গরুকে স্নান করিয়ে খুরে তেল দেয় কপালে সিঁদুর দেয়, গলায় মালা পরায়। দুপুরে বাড়ির কর্ত্রী বেল পাতা তুলসী পাতা এনে রেখে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা দেয়। মেয়েরা তুলসী মঞ্চের সামনে নাচে আর গান করে। গরুকে প্রসাদ খাইয়ে তারপর অন্যান্যদের দেওয়া হয়। চাষের কাজে ব্যবহৃত সব কিছুতে জল ছেটায় সিঁদুরের টিপ দেয়।

এই পূজার একটি গান-

‘কৃষ্ণের সাথী ভগবতী, তারে করি পুজন
তার জন্যি এ সংসারের মান সমমান
তারই কল্যাণে ঘরই আসবি ধান
নদীতে হবই মাছ, গৃহস্থের হবই কল্যাণ।’[২]

গ। গোপালের গান বা আরতির গান

গান ছাড়া কোনও অনুষ্ঠান মালোরা ভাবতে পারে না। মালোদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গান। বাড়িতে নতুন অতিথি বা সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর যে অনুষ্ঠান করে সেখানে যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে গোপালের বা আরতির গান। বাংলাদেশের কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলার মালোদের এমন দুটি গান-

‘মা যশোদার কোলে দোলে
নন্দদুলাল রে জয়-জোকারে উলু উলুতে।
আনন্দতে পুলোকিত সব ত্রয়োতি
সবাই তারে খাওয়াইতে চায় ক্ষীর সর ননী।।

আজ নন্দদুলালে লয়ে নাচব সকলে
আজ নন্দদুলালে বাঁধব সোনার ডোরে।
এমন কারো শক্তি নাইরে
আমাদের কাছ থেকে সে বাঁধন ঘুচাবে।।

ধামামা, সিঙ্গা, বেণু, চারিদিকে তোলে ধ্বনি
ফুলেরও সিংহাসনে বসবে আমাদের রত্নমনি।।’[৩]

‘নাচ নাচ গোপাল নাচ এই খানে
একবার নাচ দুইবার নাচ
নাচরে গোপাল নাচ

খায়া ক্ষীর সর ননী...
নাচিলে বানাইয়া দিব সোনার মুরলী
তার থিক্কা বাহির হইবে
শুধু মা মা ধ্বনি
নাচ গোপাল নাচ এই খানে...
সকলে দেখিবে সকলে শুনিবে
সকলে হাসিবে চমকে যাবে
তোমারও গান শুনি, নাচ দেখি
নাচ গোপাল নাচ খায়া ক্ষীর সর ননী...'[৪]

ঘ। হোলির গান

হোলি উৎসব বা বসন্ত উৎসব বৈষ্ণবদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব। হোলিকে বাংলায় জনপ্রিয় করার কারিগর স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু। মালোরা বেশিরভাগই বৈষ্ণব। তাই হোলি উৎসব তাদের কাছে অতি প্রিয় উৎসব। এই উৎসবের গানে নদীয়া রাজ "গৌর" হয়ে যান কৃষ্ণ। কখনও অতিপ্রিয় সন্তান। "লাল" বলেই তাকে সম্বোধন করে। তাদের গানে তাই লাল, গৌর, কৃষ্ণ বন্ধু। সবই যেন এক। এ তাদের অন্তরের কথা।

'বসন্ত এলি, আমার লাল এল না
শান্ত বিনে অশান্ত মন পরাণে ধৈর্য্য মানে না
রাধার প্রেমের, গৌর প্রেমের এতই লাঞ্চনা।। (ধুয়া)
যখন রাধা যায় গ গাঙ্গে, বাঁশি বাজে রাধা রাধা বলে
হোলি খেলতে কদম গাছ থেকে সে নামে না
রাধার প্রেমের, গৌর প্রেমের এতই লাঞ্চনা।। (ধুয়া)
যখন লালে মথুরায় থাকে, সবাই দেখে রাধার বদন
রাধার অন্তর বোঝে না, রাধার মন বোঝে না
বসন্ত এল, আমার লাল এল না, (শী-রাধা)
কেমনে রঙ খেলে তোমরা বল না...
রাধার প্রেমের গৌর প্রেমের এতই লাঞ্ছনা (ধুয়া)
বসন্ত এল আমার লাল এল না...'[৫]

ঙ। শীতলা মা-র গান

বসন্ত রোগ যাতে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য মালোরা শীতলা তলায় শীতলা পূজা দেয়। শুধু তাই নয় অনেক সময় মাছ ধরতে যাবার সময় মাছ ধরে ফিরেও শীতলা পূজা দেয় সেই শীতলা পূজার নোয়াখালি ও ফরিদপুর জেলার মালোদের একটি গান হল-

'ঢোল বাজে কাসী বাজে শীতলা মন্দিরে
বৈশাখ মাসে মা শীতলারে পুজে পুর নারী গণে।।
আমাগ পরনাম নাও গ মা শীতলা দেবী
হাত জোড়ি, বাঁচায়া রাইখ সকলেরি।
আমাগ সব দুষ ভুলি মা
আমাগ আন্ধার দাও দুর করি
আমাগ ঘরে, গ্রামের সকলে, থাকে সুস্থ শরীরি
মা, আমাগ সব দুষ দিও মা ক্ষমা করি।'[৬]

সুন্দরবনে জঙ্গল এলাকায় মাছধরা যাদের মূল জীবিকা তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ নির্মম প্রকৃতি। তাদের সংস্কৃতির ধারাই তাদের সংঘবদ্ধ করে শক্তি জোগায়। কৃষিজীবী মানুষের সংস্কার একদিন তারা গ্রহণ করেছিল যাদু-বিশ্বাস হিসেবে। সেই যাদু-বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনে জাগরণ-গান বিশেষ করে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে এখনও। তবে অনেক জায়গাতেই তিনি এখন বসন্ত-রোগের আরোগ্য দেবী। তাঁর হাতের শস্যের প্রতীকটি এখন ঝাঁটারূপে পর্যবসিত হয়েছে। আর কাঁখের কলসিটি শান্তির জলে পূর্ণ। পুরনো ঐতিহ্যকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

চ। নাম গান বা আগমনী নামগান

অনুষ্ঠান শুরুর সময় বন্দনা ধরনের গান গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তাকে কুষ্টিয়া অঞ্চলের মালোরা বলে 'আগমনী নামগান'। আবার অনেক সময় জ্ঞান, উপদেশ বা কোনও দেবতাকে নিয়ে যখন গান গায় (শিব, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ) তখন তাকে বলে নাম গান তেমনই গান-

'আমার মন চলবে গৌউর দেশে যে
যে দেশে নাই ভাবনা জন্ম যাতনা নিরানন্দ
নাই সে দেশে।।'[৭]

'এ দেশেতে দ্বেষ হয়েছে থাকবো না-

এদেশে, গৌর দেশে যাব, প্রাণ জুড়াব,
ভাসবো প্রেম রসে।।'[৮]

ছ। রাম বনবাস গান

রামায়ণ দিনাজপুরের জনজীবনে বিস্তৃত। রামায়ণে বিভিন্ন ঘটনাকে লোকগানের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়। রামবনবাস পালায় গায়েন গাইছেন-

'আকাশে বন্দনা করি আকাশের কামিনী
পাতালে বন্দনা করি পাতালের বাসকি।
গাও মধ্যে বন্দনা করি এ গায়ের গারাম
আসরে বন্দনা করি দশ ভাইর চরণ।
ওহো রাম তোর লবীন (নবীন) জটাধারীরে।'[৯]

জ। রামের দেহত্যাগ

'লক্ষ্মণ কে চির বিদায় দিয়ে শোকে অধীন হন রাজা রাম।
এ প্রাণের কি বা প্রয়োজন, লক্ষ্মণ ছাড়া এ জীবন...
(পদ) এ প্রাণের আর প্রয়োজন নাই গো, লক্ষ্মণ ভাইকে ত্যাগ করিলাম
নিজ বুকে পাসান লইলাম, সরযুর জলে প্রাণ ত্যাজিব...'[১০]

তখন ভরত শত্রুঘ্ন রামকে বলে শুনগো অগ্রজ
তব সাথে যাব মোরা আর না রব এথা গো অধিককাল।।
(পদ) তোমা ছেড়ে থাকিব কেমনে, তুমি যে মোদের প্রাণের অগ্রজ
তোমার সঙ্গে মোরা প্রাণ ত্যাজিব, চির সত্যের সাথী হব।।'[১১]

ঝ। লক্ষ্মীর গান

সাধারণত দশমীর পর লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকেই গান শুরু হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকে এই লোকগান অনুষ্ঠিত হয়। এই লোকগান সাধারণত শুরু হয় বিকেল চারটায় এবং রাত ১১-১২ টা অবধি চলে। বন্দনা গান দিয়ে পালা শুরু হয়-

'অজিত ও বল্লভা দেবী ব্রহ্মার ও জননী
করজোড়ে বন্দী মা তোর চরণ ও দুখানি
সেইকালে প্রভু করিল অনন্ত শয়ন
তাহার অদূরে ছিল এ তিন ও ভুবন।'[১২]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে উল্লিখিত গোকর্ণঘাট, শুকদেবপুর, নয়াকান্দা, বাসুদেবপুর, বৈকুণ্ঠপুর, নবীনগর ইত্যাদি গ্রামের সব মালোই কৃষ্ণমন্ত্রী অর্থাৎ বৈষ্ণব। মালোদের ব্যক্তিনামের মধ্যেও বৈষ্ণব ভাবাপন্নতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণ- কিশোর, সুবল, নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ, অনন্ত, ছিনিবাস (শ্রীনিবাস), দয়ালচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, হরিমোহন, নিতাইকিশোর, শ্যামসুন্দর, বনমালী ইত্যাদি নাম উল্লেখ করা যায়। এই নামগুলো কৃষ্ণ ও চৈতন্য মহিমায় আকীর্ণ।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আচারনির্ভর হিন্দুসম্প্রদায়ে বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগে থাকলেও তার সবগুলোর ছোঁয়া জেলেপল্লীর মানুষের গায়ে এসে লাগে না। দুর্গোৎসব তাদের জীবনে বয়ে আনে বিপুল আনন্দ ও বৈচিত্র্য। এ অঞ্চলে দুর্গাপুজো হয় মেজকর্তার বাড়িতে। সেখানে জেলেপল্লির আবালবৃদ্ধবণিতা দলবেঁধে ঠাকুর দেখতে যায়। চারদিন পূজা ও উৎসব চলে। এই চারদিন জেলেজীবনে স্বর্গীয় সুখ বিরাজ করে।

মালোদের চিন্তায়-আচরণে বৈষ্ণবীয় বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষণীয়। দোললীলা কৃষ্ণসংশ্লিষ্ট একটি পার্বণ। দোলযাত্রার ফাগের রঙে মালোরা রঞ্জিত হয়েছে, রাঙিয়েছে তিতাসের জলকে। প্রবাসজীবনে এই হোলির অনুষ্ঠানেই কিশোর প্রেমে পড়েছিল একজন কিশোরীর। আবার বহুদিন পরে, সেই নারী পাগল-কিশোরের সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল- সেও এক হোলির দিনে।

শুকদেবপুরের গানের আসরকে কেন্দ্র করে অদ্বৈত মালোদের বিষ্ণু-প্রাণতার এক চমৎকার বিবরণ উপস্থিত করেছেন এই উপন্যাসে। শুকদেবপুরে গানের আসরে গাঁজা খেয়ে তিলকচাঁদ 'কাশীনাথ যোগিয়া-তুমি নাম ধর নিরঞ্জন, সদাই যোগাও ভূতের মন'[১৩] গানটি শুরু করলে আসরেরই এক মালো মোড়লের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর প্রতিবাদ করে। বলে-

"গান বড় বে-ধারায় চলছে মোড়ল। ইখানে এই গানটা মানাইত-

'এক পয়সার তেল হইলে তিন বাতি জ্বালায়। জ্বেলে বাতি সারা রাতি ব্রজের পথে চলে যায়।''[১৪]

নয়াকান্দার সাধুর মুখেও গৌরাঙ্গ-অবতারের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-

'আছে মানুষ গ সই, আছে মানুষ গ ওরচান্দের ঘরে,
নিগূঢ় বৃন্দাবনে গ সই, আছে মানুষ। এক মানুষ বৈকুণ্ঠবাসী,
আরেক মানুষ কালোশশী, আরেক মানুষ গ সই, দেহের মাইঝে
রসের কেলি করে- নিগূঢ় বৃন্দাবনে গ সই আছে মানুষ।'[১৫]

মালোসমাজে রামায়ণ-মহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনি প্রচলিত আছে। তবে পৌরাণিক এই কাহিনিগুলোর সঙ্গে লোকাচার-লোকবিশাসের নানা অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে। ফলে কাহিনি সর্বদা মূলানুগ থাকেনি। জেলেরা পুরাণকথাকে নিজেদের প্রয়োজন মাফিক তাদের চিন্তায় ও কথকতায় ব্যবহার করেছে।

বাঁশিরাম মোড়লকে কিশোরের প্রথম দর্শনেই তার ছেলেবেলার গল্পে শোনা হনুমান ভীমাদি কোনও বীরের মতো মনে হয়েছে, আবার কখনও মনে হয়েছে শিবঠাকুরের মতো। মোড়লের বউকে মনে হয়েছে বিশালকায় মহাদেবের পাশে বালিকা-বধূ গৌরী বলে। দশজনের সভায় নিজের মান বাঁচানোর জন্য দয়ালচাঁদের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণচন্দ্র বলেছে-

'দশের বৈঠকে লক্ষ্মণ-বর্জনের পালাখান তুমি কইর না দয়াল বেপারী।
ব্রজলীলার দিনে কুরুক্ষেত্তর ঘটাইয়া লাভ নাই।'[১৬]

অনন্তর ভাবনায়, উদয়তারার সংলাপে রাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, শিবঠাকুর, বেহুলা, লখিন্দর প্রমুখ পৌরাণিক চরিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'গহিন গাঙ' উপন্যাসে বিবৃত আচার-প্রধান মালোসমাজে ধর্মদ্বন্দ্বের উপস্থিতি দুর্নিরীক্ষ নয়। মালোরা সহজাতভাবে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বেতনাতীরস্থ মালোরা একচেটিয়া বৈষ্ণব নয়। এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যেও ধর্মান্তর-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হারান, মধু, আলতা ধর্মান্তরিত হয়ে ভোলা বিশ্বাস ও কুঞ্জ হালদারের সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করছে। আবার

দুর্বৃত্ত কিশোরী পাল ভোগে অতৃপ্ত হয়ে বৈষ্ণব হয়েছে। তার প্রণোদনায় বৈষ্ণব ধর্মের নিবিড় প্রভাব পড়েছে দয়াল মালোর পোশাকে ও আচরণে।

ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করে মালোপাড়ায় দীর্ঘদিন বর্ণহিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে চাপা বিরোধ ছিল। বই, কম্বল, অর্থ, ঘর তৈরির নানা উপকরণ দিয়ে পাদরিরা মালোদেরকে খ্রিস্টান হবার জন্য প্রলুব্ধ করেছে। জেলেপাড়ায় একটা স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই ব্রাত্যমানুষদের আত্মিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য কিছু না করলেও ভয়ডর দেখিয়ে তাদের শিক্ষাবিস্তার-কল্পে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, মালোদের হাত করতে হিঙ্গলগঞ্জের মঠের মোহান্তকে নিয়ে এসেছিল তারা। এই ধর্মদ্বন্দ্বে মালোরা বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদের কেউ হয়েছে খ্রিস্টান, কেউ বেশি করে ঝুঁকেছে বৈষ্ণব ধর্মের দিকে।

সরস্বতী পুজোর দিন জোড়াইলিশ মাছ বাড়িতে আনলে নোয়াখালি জেলায় মালো সম্প্রদায়ের মহিলারা তাকে বরণ করে ঘরে তোলার সময় যে গান করতো তার একটি-

‘মাছ ইলশারে
জালইয়া ধরুন্যা মাছ
ইলশারে। (ধুয়া)
ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা
বুয়াল মাছের দাড়ি
...
আমি পদ্মায় যাই
মাছ ইলশারে (ধুয়া)
ছেলে কান্দাইন না মাছ
জামাই ভুলাইন না মাছ
ইলশারে।’[১৭]

নটরাজনের লেখা ‘ইলিশজোড়’ উপন্যাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পুজোর দিন জোড়া ইলিশ খাওয়ার নিয়ম দেখা যায়। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই মাছ। এই পবিত্র মাছের আঁশ মেটে বাড়ির বাঁশের খুঁটির নিচে মাটিতে পুরে রাখা। এতে নাকি

গৃহস্থের কল্যাণ। সিঁদুর-ধান-দুর্বা দিয়ে ইলিশ বরণ। চকচকে রূপোর মত মাঝারি আকারের দুটো মাছ একটি থালায় পাশাপাশি রাখে পদ্মরানি। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়েছে একপাশে। অন্য পাশে জ্বলছে মাটিতে পোঁতা ধূপ কাঠি। আর সেই সঙ্গে ঘন ঘন উলুধ্বনি। তারই মধ্যে পদ্মরানি হাসিমুখে তেল-হলুদ মেখে স্নান করায় 'শফরাধিপ' অর্থাৎ মৎস্যরাজ ইলিশকে। তারপর বরণ করছে ধান-দুর্বা ও সিঁদুর দিয়ে। তারপর ছেলে বৌকে বরণ করে ছেলে-ছেলেবৌয়ের নামে মাছ দুটোকে কেটে আগেই যমরাজের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে রাখলো।

মালোরা যে বৈষ্ণব তার পরিচয় পাওয়া যায় হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' উপন্যাসে। গঙ্গাপদ পুকুরে স্নান করে ফিরে টিকিতে তুলসী পাতা ও দূর্বা বাঁধে। কপাল থেকে নাকের মাথা পর্যন্ত গঙ্গামাটির ফোটা কাটে। তারপর হাঁটু-উঁচু ধুতি পরে খালি গায়ে পাড়া ভ্রমণে বের হয়। হাতে মন্দিরা, মুখে কৃষ্ণের নাম। মৃদুভাবে ডানে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে সে জেলেপাড়ার উঠানে উঠানে ঘোরে। ঘুরে ঘুরে সেই ভোর সকালে ভোলানাথ ঘুমন্ত, অর্ধজাগ্রত মানুষদেরকে কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সুর করে শোনায়-

'শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন ।।
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ।।
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই ।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখালরাজা ভাই ।।'[১৮]

হরিশংকর জলদাসের 'দহনকাল' উপন্যাসে বৈষ্ণবভাবাপন্ন জেলে হরবাঁশির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, সুবল, বৃন্দা, উদ্ধব, নন্দরাজা, যশোমতী, ব্রজধাম, মথুরা প্রভৃতি নাম-স্থান হরবাঁশিকে ঘিরেবেড়ে রাখে। তার ভেতরে এক নিবিড় বৈষ্ণবীয়বোধ হরহামেশা খেলা করে।

ইচাখালির জেলেপাড়াটি বিষ্ণু-ভাবাপন্ন। এপাড়ার অধিকাংশ নরনারীর গলায় তুলসীমালা। প্রত্যেক বাড়ির উঠানে মাটির বেদিতে সযত্নে তুলসীগাছ রক্ষিত। জেলে নারীরা সকাল-সন্ধ্যা সেই তুলসীতলে ধূপ-প্রদীপ জ্বালায়। প্রতি সন্ধ্যায় কারও না কারও বাড়িতে কৃষ্ণনামের আসর বসে। সেই আসরে পাড়ার নানা বয়সের নরনারী অংশ নেয়। প্রথমে বেশ

কিছু সময় ধরে সবাই ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে’ গায়। শেষের দিকে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ গানের দিকে ঝুঁকে পড়ে গোটা আসর। ইচাখালির জেলেপল্লীর কেউ মাংস খায় না। মাংস খাওয়াকে তারা মহাপাপ মনে করে। ছাগলের মাংস তো দুরের কথা, মুরগির মাংসও নয়। মুরগিকে এরা বলে রামপক্ষী। অবতার রামের অনুগত পক্ষী হিসেবে তারা মুরগিকে ভক্তি করে।

ঞ। মনসা

দেবী মনসাকে অর্বাচীন পুরাণে পাওয়া গেলেও আসলে তাঁকে লৌকিক দেবী হিসেবেই গণ্য করতে হয়। অনেক পরে তিনি উচ্চকোটির দেবমণ্ডলে স্থানলাভ করেন। পদ্মাবতী, নাগেশ্বরী ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিতা। একাদশ দ্বাদশ শতকের ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবত পুরাণ দুটিতে তাঁর ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি নিবন্ধকার রঘুনন্দন তার তিথিতত্ত্বে পদ্মপুরাণ থেকে যে ধ্যান মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন সেখানে দেখা যায় এই দেবী হংসবাহনা, নাগরত্নদের দ্বারা বিভূষিতা ও অষ্টনাগসমন্বিতা, তিনি ভোগিনী অর্থাৎ সর্পিনীদেবী নামাঙ্কিতা।

উত্তরবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই রয়েছে মা মনসার থান। ঐ থান কোথাও রয়েছে উন্মুক্ত স্থানে কোথাও মা মনসা গাছের নীচে। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে মনসার ঘটে বা মূর্তি তৈরি করে সাড়ম্বরে পুজো করা হয়। মূর্তি না হলে ঘটে সিঁদুর লেপে, ঘটের চারধারে সাপের ফণা তৈরি করে সাজানো হয়। ঘটের ওপরে থাকে মনসার ডাল। কোথাও বা থানের ওপরে মনসার ডাল পুতেও পুজো করা হয়ে থাকে। মালোরা মাছ ধরতে গিয়ে অনেকসময় সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। তাই তাদের প্রাণরক্ষার জন্য দেবী মনসার আরাধনা করা হয়। কোথাও কোথাও ঝাঁপান হয় এই সময়। মনসার পালাগানও হয়ে থাকে কোথাও কোথাও।

পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় শ্রাবণ অথবা ভাদ্রে সারা মাস ধরে মনসার ভাসান গাওয়া হয়। এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে মূলত মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে। রাত্রি জাগরণ করে মেয়েরা যে অনুষ্ঠান করে তার সঙ্গে প্রজনন বা কৃষির সম্পর্ক থাকবেই। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালির ইতিহাসে লিখেছেন যে সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌমসমাজের প্রজননশক্তির পূজা থেকেই মনসাপূজার উদ্ভব। মালোদের মধ্যে এই যে ভাসান গান প্রচলিত আছে তা মহিলাদের নিজস্ব। এই গানগুলির লিখিত রূপ নেই। মুখে মুখে বংশপরম্পরায় এই গান এদের মধ্যে চলে আসছে। এই উপলক্ষে আসরে মেয়েরাই নাচ-গান করে। প্রয়োজনে

মেয়েরাই পুরুষ সাজে। মনসার ভাসানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে মনসাপূজা উপলক্ষে যে রান্নাপুজো হয় তা এদের মধ্যে প্রচলিত নয়। বিসর্জনের দিন হাসনাবাদ, ন্যাজাট, সাতজেলিয়াতে মেয়েরা বাইচ খেলে। কচুখালিতে মনসাপূজা উপলক্ষে সবচেয়ে বড় মেলা হয়। জেলেদের মধ্যে শীতলাপূজা, মনসাপূজা, কালীপূজা উপলক্ষে মাগুনের প্রচলন আছে। এছাড়া জেলেদের ঘরে ঘরে প্রত্যেকদিন ঠাকুরকে জল মিষ্টি দেওয়া হয়। কার্তিক থেকে পৌষমাস পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয়।

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখা যায় যে মনসা জেলেদের অন্যতম দেবী। সর্পের দেবী মনসাকে তাদের বড় ভয়। তাঁর জন্যে তাদের বড় সম্ভ্রম। সর্প জলজ হিংস্র প্রাণী। জেলেরা জলচর। সর্পের দংশনে অনেক জেলের মৃত্যু ঘটে। তারা বিশ্বাস করে- মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সর্পের কোপানল থেকে তাড়া রেহাই পাবে। তাই গোটা শ্রাবণ মাস জেলেদের ঘরে ঘরে সর্পদেবী মনসার পূজা হয় সাড়ম্বরে। প্রতিরাতে মনসাপুঁথি পাঠ হয়-এর বাড়ি, ওর বাড়ি। মনসাপুঁথি পাঠের সঙ্গে বিচ্ছেদ গান হয়। মেয়েদের পোশাক পড়ে মুখে কড়া পাউডার মেখে ছেলেরা আসরে ঘুরে ঘুরে নাচে। এদের নাউট্যাপোয়া বলে।

ট। চড়ক

ভারতের সর্বত্রই কোন না কোনভাবে বিশেষত হিন্দু জনপদে শিবের আরাধনা হয়ে থাকে। চৈত্রমাসের চড়ক পুজো শিবভক্তদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুজো ও উৎসব। বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও চড়ক ও গাজনের উৎসব বেশ আড়ম্বর করেই হয়ে থাকে বিভিন্ন জেলায়।

চৈত্রমাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শোনা যায় ঢাকের আওয়াজ। মেতে ওঠে গাঁয়ের মানুষ। সাড়া পড়ে যায় দিকে দিকে। সাধারণত নিম্ন শ্রেণি থেকেই মূল সন্ন্যাসী নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তিনিই অন্যান্য সন্ন্যাসীদের দীক্ষা দেন। সন্ন্যাসীরা আটদিন থেকে একমাস পর্যন্ত ব্রত পালন করে থাকেন। মাথায় তেল না মেখে গেরুয়া পরে ফলমূল খেয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির এগারো দিন আগে সাধারণত ঘটস্থাপন ও 'দেইলপাট' অনুষ্ঠান হয়। ঐ দেইলপাট তৈরি হয় বেলকাঠ দিয়ে। নদী বা পুকুর পাড়ে দেইলপাটটি কোন কিছুর ওপর বসিয়ে তার সম্মুখে জলভর্তি ঘট বসিয়ে পুজো করা হয়। সংক্রান্তির আগের দিন সন্ন্যাসীরা যে পুকুরের জলে চড়ক গাছ ডুবানো আছে সেই পুকুরের জলে নেমে চড়ক গাছটি ওপরে তুলে তেল মাখিয়ে বাদ্য সহকারে নিয়ে আসেন পুজোমণ্ডপে। সন্ধ্যায় চলে মুখানাচ। হরগৌরী বা ভূতপ্রেত, নন্দি-ভৃঙ্গি সেজে চলে নাচ। ঢাক বাজে। কাঁসর বাজে। চলে গানও।

সংক্রান্তির দিন হরগৌরীর পুজো ও দেইলপাট পুজোর পরে হয় চড়ক পুজো। চড়ক গাছটি এবার মাটিতে পুঁতে তার ওপরে সমকোণ করে দশ বারো হাত লম্বা বাঁশ বা কাঠ জুড়ে দেওয়া হয়। দুপ্রান্তে দড়ি ঝুলে থাকে। দুজন সন্ন্যাসী দুদিকে ঐ দড়ি ধরে বা দড়িতে বাঁশ বা কাঠ বেঁধে বসে থাকে। এবার বনবন করে ঘুরানো হয় তাদের। আগে পিঠে বড়শী বেঁধেও ঘুরতো অনেকে। আগুন, বটি, কাঁটার ওপরে ঝাঁপও দিত। তবে এখন সেসব বিশেষ দেখা যায় না বড় একটা। অনুষ্ঠান শেষে মূল সন্ন্যাসী মাথায় শান্তি জল ছিটিয়ে দেন সবার। চড়ক গাছটি তুলে পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। দেইলপাটটি স্থায়ী মণ্ডপে রেখে দেওয়া হয়। মূল সন্ন্যাসীর বাড়িতেও রাখা হয় অনেক সময়। পুজোর শেষ দিনে মেলা বসে। হৈ হৈ রৈ রৈ উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে আবাল-বৃদ্ধ-জনতা। দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার বেশ কিছু অংশে জ্যৈষ্ঠ মাসেও চড়ক পুজো হয়ে থাকে। তবে চৈত্রমাসের চড়ক পুজোরই আকর্ষণ বেশি।

চৈত্রসংক্রান্তির দিনকে মালো বা জেলেরা বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করে। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ- এই তিন মাসে খাল-বিল-নদী-সমুদ্র জলশস্যশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে জেলেজীবনে নেমে আসে খাদ্যাভাব। এই অভাব চৈত্রের শেষে এমন রূপ নেয় যে, একে দুর্ভিক্ষ বললেও ভুল হবে না। অভাবের দিনে জেলেজীবনে চৈত্রসংক্রান্তি আসে। ৩১-এ চৈত্রে অনুষ্ঠেয় চৈত্রসংক্রান্তিই জলপুত্রদের জীবনে বেঁচে থাকার প্রাণরস যোগায়। চৈত্রের শেষদিনে জেলেপাড়ার প্রত্যেক পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে যাকের উপকরণ সংগ্রহে নেমে পড়ে। বেতগাছের আগা, বটের পাতা, পাতাসুদ্ধ আমের ছোট্ট ডাল, কেয়ার ঝোপ, নিমপাতা, থানকুনিপাতা, বাসক পাতা, কাঁচা বাঁশপাতা ইত্যাদি উঠানের মাঝখানে এনে জড়ো করে। চৈত্রসংক্রান্তির ভোরসকালে প্রত্যেক সন্তানবতী জেলেনি তার সন্তানের মঙ্গলকামনায় পূর্বমুখী হয়ে ভক্তিভরে সেই স্তূপীকৃত সংগ্রহে আগুন দেয়। একে বলা হয় 'যাক দেয়া।' সকালে উঠেই নারীরা প্রথমে স্নান সেরে সন্তানদেরকে বিছানা থেকে তুলে সেই যাকের পাশে এমনভাবে দাঁড় করায়, যাতে যাকের ধোঁয়া সন্তানদের গায়ে লাগলে তাদের সমস্ত বিপদ আপদ দূরীভূত হয়ে যায়- এটা জেলেনারীদের চিরন্তন বিশ্বাস।

২। মালোদের লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি এক ঐতিহ্যসম্পন্ন ব্যক্তি বা লোকসমাজের অলিখিত মানস ও বস্তুসম্পদ। লোকসংস্কৃতি একটি জনপদের হৃদয়কলরব ও সমষ্টির জীবনচক্রে আবর্তিত কালাতিক্রমী জীবনসংগীত ও বাস্তব সামগ্রী। আদিম বর্বর স্তরের মানবসমাজ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার

প্রতিঘাতে বহুযুগ ধরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। যাযাবর জীবন থেকে ফল চয়ন, আহরণ ও ফসল উৎপাদনের স্তরে যে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তারই ঐতিহাসিক ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকাচার এবং লোকউৎসব, লোকদেবতা ইত্যাদি। ক্রমশ সরল থেকে জটিলতর সমাজ বন্ধনের দিকেই মানব সমাজ এগিয়ে চলেছে। এরই পটভূমিতে লোকসংস্কৃতির উপাদান এবং রূপ বদলাচ্ছে দেশে দেশে, সমাজে সমাজে। পরিবর্তনশীল সমাজভূমিতে মূলত ঐতিহ্যপুষ্ট মৌখিক শ্রুতিবাহী সাহিত্য, শিল্প, উৎসব, দেবধারণা, লোকধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি 'ফোক্‌লোর' বা লোকসংস্কৃতির উপাদান। মালোদের লোকসংস্কৃতির নানা উপবিভাগ-ধর্মীয় পূজা এবং তৎসংক্রান্ত, ব্রত, পৌষপার্বণাদি, বারোমাসী গান, বরজের গান, পালা গানের অংশ, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, কৃষ্ণযাত্রা, নামগান, হরি বংশ, ভাটিয়ালি, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, শ্লোক, ছড়া, লোক সংস্কার, জন্ম মৃত্যু বিবাহের উৎসব, সংস্কার, ধর্মীয় সার্বজনীন দোল উৎসব, সামাজিক উৎসব নৌকা বাইচ, লোক গল্প ইত্যাদি।

ক। লোকসংগীত

লোকসংগীতের আলোচনা কার্যত মানবসমাজ ও সভ্যতার উষালগ্নের দিকে তীর্থযাত্রা। লোকসংগীত হল লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি ও সুর সহযোগে গীত, সাধারণত কর্ম, প্রেম ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একজাতীয় গান যা স্মৃতির মাধ্যমে বাহিত বলিষ্ঠ জীবনচেতনা ও সুরের ও গায়নরীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে জীবনমুখী। সংহত গোষ্ঠীগত লোকসমাজের রসচেতনা ও শিল্পবোধের স্বতঃস্ফূর্ত সুর ও বাণী নির্মিতির অন্যতম লৌকিক উপাদান লোকসংগীত। লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়, ব্যাপক প্রচারিত, সহজ সরল ভাবরসের সাবলীল প্রকাশ, শ্রুতি-স্মৃতিনির্ভর মৌখিক রচনা লোকসংগীত।

গম্ভীরা

মালদহ জেলার জাতীয় উৎসব হিসাবে লোকসংস্কৃতির যে শাখাটি চিহ্নিত তা হল গম্ভীরা। গম্ভীরা আদতে একটি অতি প্রাচীন আচার বা প্রথা। যা প্রাচীনকালে তো বটেই আজও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের মধ্যে উৎসব আকারে পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত আছে। বর্তমানে গম্ভীরা পূজার চাইতে গম্ভীরা গানের অংশটিই বেশি জনপ্রিয় এবং সেখানে সবধর্মের মানুষই অংশগ্রহণ করে থাকে। পালাধর্মী গম্ভীরা গানের মোটামুটি চারটি পর্ব যেমন- বন্দনা, ডুয়েট বা টপ্পা ঠুংরি, চার-ইয়ারি, রিপোর্ট বা সালতামামি। গম্ভীরা গানের শুরুতে বন্দনা অংশে থাকে শিব-বন্দনা ব্যাতিক্রমে কোথাও কার্তিক বন্দনা। এরপর চার ব্যক্তি আসরে প্রবেশ করে পারস্পরিক

সমস্যাদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। আলোচনা তুমুল বিতর্কে পরিণত হয়ে শেষপর্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেবকে আহ্বান জানানো হয়। উচ্চারিত ব্যবহারিক নাম হল শিবহে, নানা হে ইত্যাদি। এই ডাকে জটাজুটে সেজে ছাই মেখে শিব শাসকদলের প্রতিনিধি হয়ে আসরে উপস্থিত হন। চলে দেবতা তথা সরকারের দরবারে দারিদ্র্য পীড়িত সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ। গম্ভীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে তার উদ্দেশ্যে গানের প্রচলন খুব বেশিদিনের নয়। গম্ভীরা গান শেষ হয় একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা থেকে জাত হয়ে এই লোকআঙ্গিকটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে সর্বভারতীয় চরিত্র হয়ে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে রয়েছে।

নৌকা বাইচের গান

বাংলাদেশের অধিবাসীরা বহু প্রাচীন কাল থেকেই যে নৌকা চালনায় পারদর্শী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নৌকার জনপ্রিয়তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নৌকাবাইচ। নানা জায়গায় এই বাইচ সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ সংক্রান্তি, ভাদ্র সংক্রান্তি, বিশ্বকর্মা পূজা, দশহরা, পৌষ সংক্রান্তি প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে। আনুষ্ঠানিক বা উৎসবীয় নৌকা বাইচ ছাড়াও কখনও কখনও শুধু নিছকই খেলার জন্য বা আমোদ স্ফূর্তির জন্য ও উন্মাদনাময় এই নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জলের সঙ্গে যাদের নিবিড় যোগাযোগ সেই মাঝি মাল্লারা নিজেদের দক্ষতা প্রকাশের কারণে অথবা পরবর্তী প্রজন্মকে এই কাজে দক্ষ করে তোলার অন্যতম উপায় হিসাবেও এই ধরনের খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। সারিবদ্ধভাবে বসে থাকা সেইসব মাল্লারা দ্রুত লয়ে একধরনের ছন্দ মধুর গান গেয়ে থাকে তাকে কোথাও বলা হয় সারি গান, বাংলাদশে বলা হয় নৌকা বাইচের গান। ‘বাইচ’ বা বাচ অর্থে খেলা বা প্রতিযোগিতা। বাইচের নৌকাকে চলতি কথায় ‘বাচারী নৌকা’ বলে। বাচারী নৌকা সাধারণত দু-ধরনের- ক) প্রকৃত বাচারী, খ) জেলে বাচারী। জেলে বাচারী নৌকাগুলি লম্বায় স্বল্প হয়। গলুই-ও দীর্ঘ হয় না। এর ডগার দিকটাতে প্রয়োজনে মাল বহন করার জন্য খানিকটা ফাঁকা রাখা হয়। বাচারী নৌকাগুলি মালিকের নামে অথবা মূল মাঝির নামে হয়ে থাকে। নৌকার দুই ধারে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে হাত বৈঠা নিয়ে সমস্ত আরোহীগণ বা মাঝি-মোল্লারা বসে। নৌকা দৌড়ের নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রতিযোগীরা একই সঙ্গে বৈঠা তুলে ধরেন এবং ঝাঁঝর-কাঁসর বাজাতে থাকেন। বৃহৎ বাচারীতে দুজন করে মাঝি হাল আর বৈঠা ধরেন নৌকায়। প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে নৌকাগুলিকে বিভিন্ন রঙে সাজান হয়। নৌকা বাইবার সময় যে গানগুলি গাওয়া হয় তারই একটি হল-

‘বঙ্গে নাও রঙ্গে বৈঠা
বঙ্গে রঙ্গে বাও
পাতাম কাঠের বৈঠা আমার
উড়ান দিয়া যাও।
...
আগের নাও পাছে গেল হেইয়ো।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো’[১৯]

ত্রিনাথের গান

ত্রিনাথের গান একটা সময় পূর্ববাংলার গ্রামগুলিতে প্রচলিত ছিল। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা জেলায় সারাদিন প্রচুর পরিশ্রমের পর রাত্রে ত্রিনাথের মেলায় অংশ নিত। নদিয়া, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহে এই গানের প্রচলন আছে। গাঁজা কলকেয় সাজিয়ে ত্রিনাথের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে গান আরম্ভ করা হয়। পরে একটা গানের বিরতির মাঝে প্রসাদ হিসাবে সকলে গাঁজা খেয়ে আবার গান আরম্ভ করে। সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত এই গান চলে। যদিও ত্রিনাথের গানের সংখ্যা খুব বেশি নয়। গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খোল, করতাল, দোতারাই প্রধান। প্রথমে একজন পরে সকলে মিলে সেই গান গায়। ভক্তিরসে পূর্ণ এই গানে সুরের কোনও বৈচিত্র্য নেই। ত্রিনাথের গানে বন্দনা অংশটি হয় এই রকম

‘আসরেতে করা আগমন
ত্রিলোকের জীবন প্রভু কর আগমন।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন
ত্রিনাথ রূপে প্রভু বসিলেন আসনে।’[২০]

সোনা রায়ের গান

মালদহ জেলার সাট্টারী, মিলকী, বাগান পাড়া কাগাচিড়া, বড় সাঁকো প্রভৃতি জায়গায় সোনা রায় নামে এক লৌকিক দেবতার পুজো হতে দেখা যায়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন এই দেবতা পূজিত হন। অধিকাংশ পল্লীতে অনুন্নত শ্রেণিদের বসতি অঞ্চলে সোনারায়-এর পুজো ক্রমাগত বা সমাজগতভাবে পল্লীর মোড়লের নায়কত্বে এবং মাঙন দ্বারা সংগৃহীত অর্থে কেনা ফলমূল দ্বারা সম্পন্ন হয়। পুজোর প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে এই মাঙন শুরু হয়। এই

সময় দলটিতে পাটের আঁশ ও শোলার ফুল সজ্জিত একটি বাঁশের দণ্ড একটি চামর ও এক ঘটি দুধ মেশানো জল থাকে। তারা এগুলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গায়-

‘সোনা রায়ের দক্ষিণা নাগে পূর্ণকলা ধান,
তাহার উপুরা নাগে জোড় গুয়া পান।’[২১]

সোনা রায়ের গানে আর একজন দেবতার প্রভাব আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি তিনি হলেন গোরখনাথ। উত্তর-বাংলায় গোরখনাথের পুজো বিশেষ ভাবে প্রচলিত, তিনিও হলেন গো-দেবতা।

জালিয়া, জেলে

জল বা জাল যাদের জীবিকার অন্যতম উপায় বা মাধ্যম তাদের বলা হয় জালিয়া বা জেলে। এরা কোনও নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায় নয়। জলজীবী বা মৎস্যজীবী অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন মালো, তিয়র, কৈবর্ত, বাউরি, বাগদি, রাজবংশী, এমনকি ‘নিকিরী’ সম্প্রদায়কেও জেলে বলে চিহ্নিত করা হয়। জালিয়া সম্প্রদায়ের যেহেতু নির্দিষ্ট কোন আচার বিধি নেই তাই বিবাহের সময় প্রচলিত জনপ্রিয় আচারগুলিকেই মেনে চলে। বিবাহে বরপক্ষ মেয়েকে দেখে পছন্দ করে আসার পর পাড়া প্রতিবেশীরা গান গায়-

‘হলুদের বনে গেলি রে ছ্যালা বোর (বর)
সেখানে হল ছয় মাসু
না গেলাম হাটেরে বাবা, না গেলাম বাজারে
না গেলাম সুন্দরীর মাহলে (মহলে)
এখানে কামিনী (মেয়ে) এল সঙ্গে ধরে।’[২২]

বিবাহের আগে বরের চুল কাটার সময় তার বোন গান গায়-

‘লাড়িয়া নাপিত রে, লড়িয়া নাপিত রে
মোর বাছাকে ভালো করে কামোইয়ো ভাল করে।’[২৩]

নাউবরন্যা বা নাউভাসানী

নৌকা বানানো হয়ে গেছে এবার নৌকাকে জলে ভাসাতে হবে। আর এক হল, প্রবাসে মাছ ধরতে যাবে তখন নৌকাকে বরণ করা হবে। বরণ করার সময়কার গানকেই বলা হয় 'নাউবরন্যা বা নাউ ভাসানী'। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয় তার নাম 'নাউ বরন্যা'র গান। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শ্রী রায়ের চর গ্রামের একটি গানের উল্লেখ করা হল-

'কাষ্ঠের দেশে থাক কানাই
কাষ্ঠের কি বা দুখ।
নয়া নাউয়ের খেয়া দিয়া
কানাই কত পাইলা সুখ।
...
ছোট থাকতে তর মায়েরে ডাকছে বাবা বলে
সেই লিগা করছ মশকরা আমি তা জানি ।।'[২৪]

নাইয়রের গান

নববধূ বা সদ্যবিবাহিত কন্যাকে বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে পতিগৃহ হতে পিতৃগৃহে কিছু দিনের জন্য আনয়নকে বলে নাইয়র বা নাইয়র আনা। এই সময় কন্যা বা নববধূকে বলা হয় 'নাইয়রী'। কন্যা বা নববধূ গৃহে এলে তাকে বরণ করে গৃহে তোলা হয়। বরণ করা উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয় বা বিবাহ উপলক্ষে অতিথির আগমনে যে গান গাওয়া হয় তাকেই বলা হয় 'নাইওরের গান।' এই গানের কথা কখনও বেশি হয় না। গানের কথা মর্মস্পর্শী তাই একই কথা কয়েকবার করে ঘুরে ফিরে আসে। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে এই গান এক সময় ভীষণ সমাদৃত ছিল। এই গানের বেশির ভাগ কথা, কন্যার পিতৃগৃহে যাবার উন্মুখতা। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি গানের উল্লেখ করা হল-

'বন্ধু, নাইয়র যাইতে দাও
নাইয়র না যাইতে দিলে
দুঃখ পাবে বাপ মায়।।'[২৫]

ট্যাপা গান, ট্যাপা নাচ

মূলত মৎস্যজীবীদেরকে কেন্দ্র করে এক সময়ের জনপ্রিয় গান ও নাচ। নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে এই গানের প্রচলন এখনও শোনা যায়।

'মাছ ধরি, মাছ ধইর‍্যে প্যাট ভরি মা জলাইশরী
মোহক দ্যাখে মাছ ফাল দেয় এদিক উদিক।
জালিয়ার সুখ শান্তি যদি মাছ ধরি
হামেরা জালিয়া মাছের কাঙালী।।'[২৬]

পাখির গান

প্রিয় সখা বা বন্ধু প্রবাসে মাছ ধরছে। দীর্ঘদিন তার কোনও খবর নেই, মন উতলা, তখন পাখিকে দূত হিসেবে ভেবে পাখির কাছে অভাগি দুঃখের কথা বেদনার কথা জানায়, অভাগির আশা পাখি ঠিক সখাকে দুঃখের কাহিনি বলবে তাহলে নিশ্চয়ই বন্ধু ফিরে আসবে: এই জাতীয় গানকে মৎস্যজীবীরা 'পাখির গান' বলে। তেমনই একটি গীত-

'এক জনমে যদি না পাই দেখা
বিচ্ছেদ মোর মরণ জানলেম
এই কপালে লিখা, বিচ্ছেদ অনল রেখা-
পুড়ে যায় মোর অঙ্গরে রাই
শুধু একটু পরশ চায় রে...'[২৭]
-নদীয়া কুষ্টিয়া।

চটকা

ভাওয়াইয়া গানের মতোই হাল্কা চটুল গান চটকা, ময়মনসিং অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই গানের প্রচলন একটু বেশি ছিল। এপার বাংলার উত্তরবঙ্গে এই গান খুব জনপ্রিয়। মৎস্যজীবী আর রাখাল বালকদের মধ্যেই এই গানের প্রচলন বেশি দেখা যেত। ময়মনসিংহের একটি চটকাঃ

'মাছ মোর ইলিশারে
শুকল সুতা শুকল বড়শি দরিয়ায় ফেলানু
ও কি উজানে তুলিনু

মাছ মোর ইলিশারে।।

...

কেমনে পরসীম মাছ মুই ইলিশার তরকারি
ভাসুর বসিয়া চালিত করিছে কাছারি
মাছ মোর ইলিশারে।।’[২৮]

জারিগান

ফার্সি ‘যারী’ শব্দ থেকে জারি কথাটি এসেছে। যার অর্থ আর্তনাদ, বিলাপ, খেদ। অর্থাৎ জারি গান হচ্ছে বিলাপের গান। শোকের আর্তনাদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের মহরম পরবের সময় এই গান গীত হয়ে থাকে। জারি গান নৃত্য-সম্বলিত। এর একটি অংশ বীররসের সম্মেলক গান। জারি গানের তিনটি অংশ থাকে। যেমন বন্দনা, পালা শেষাংশে পরিচয় পর্ব। জারি গানে কোনও বিশেষ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

ধুয়া ‘হায় আল্লা কি হইল কারবালা!
পানি নাহি দেয় পাপী, আরও ধূপের জ্বালা।।
শাহ হুসন কহিল, নানার উম্মত হইয়া দেও এত জ্বালা,
নবীবংশে পানি নিতে উম্মতে না দিলা রে কারবালা।।
হায় আল্লা কি হইল কারবালা।।’[২৯]

সারিগান

সারিগান মূলত নদীর গান যা বাইচের সময় সারি-সারি দাঁড় টেনে চলার সময়ে মাঝির দল বৈঠা ফেলার তালে তালে গেয়ে থাকেন। সাধারণভাবে নৌকা চালানোর সময় বৈঠা ফেলার ঝোঁকের সঙ্গে গাওয়া দ্রুত কিংবা মধ্যলয়ের গানই ‘সারি’ বলে গণ্য করা হয়। ভাটিয়ালির ধীর লয়ে কিংবা লয়হীন সুরেলা টানের সঙ্গে ঐ ঝোঁক ও তালের সারিগানের এখানেই পার্থক্য। তাছাড়া, ভাটিয়ালি একক কণ্ঠের গান, সারি বৃন্দগীত। নানা ধরনের লৌকিক প্রেম-ভালোবাসা, মিলন-বিরহ, রাধা-কৃষ্ণলীলা, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি বিষয়ের প্রচলন থাকলেও পরস্পরের প্রতি বিদ্রুপাত্মক গান, হাসির গান, দেবদেবীর বন্দনা গান বেশ প্রচলিত।

ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া সংগীত উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকসংগীত। ভাওয়াইয়া গানের প্রধান বিষয়বস্তু মানবিক প্রেম। প্রেম-বিরহের অপরূপ অভিব্যক্তি এর অবয়বকে ঘিরে রয়েছে। কথা ও সুরের এমন আশ্চর্য মেলবন্ধন বাংলার ভাটিয়ালি ছাড়া আর কোনও সংগীতে পাওয়া যাবে না। মানুষের জীবনের প্রেমের অনুভূতি, গভীরতা, ব্যাঞ্জনা, বিরহ-কাতরতা ও অনুভব এ-সংগীতকে স্বর্গীয় মাধুর্য দান করেছে। প্রেমে যার শুরু, প্রেমে যার পথ চলা, বিরহে যেন তার অনিবার্য পরিণতি। ভাওয়াইয়া সুরের মধ্যে একটি মাদকতা আছে। কিন্তু সেই মাদকতায় কোন বিকৃতি ও মলিনতা নেই। চিত্র ও সুর, কথা ও মাধুর্যের সমন্বয়ে ভাওয়াইয়া সংগীতে একটি সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

> ‘ও হো...
> বড় বাপই, মাইঝলা বাপই, ছোট বাপই ও
> নয়া ডাড়াদি মাছ উজাইচে
> হ্যাঙ্গা পাতেয়া থে।।
> ...
> চ্যাং, চ্যাংগা উপচৌকা, মাছ নাগিল ঐ হ্যাঙ্গাতে
> নয়া ডাড়াদি মাছ উজাইছে হ্যাঙ্গা পাতেয়া দে।।’[৩০]

ভাটিয়ালি

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মূল লোকসংগীতের সুর ‘ভাটিয়ালি’। এরই মধ্য দিয়ে সাধারণ কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ ও মাঝি-মাল্লার সুখ-দুঃখ প্রেম-ভক্তি-ভালোবাসা নানা কথা সরল-সৌন্দর্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। ভাটিয়ালির সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বর্তমান। গানের উপজীব্য বিষয় শুধু প্রেম নয়, প্রেমকে অতিক্রম করে কখনও কখনও অধ্যাত্ম উত্তরণ ঘটেছে। তবে তত্ত্বকথার প্রশ্রয় নেই বললেই চলে। প্রাক স্বাধীনযুগে পূর্ববঙ্গের মহিলা শিল্পীরা ভাটিয়ালি সুরের ভাঙ্গানিতে যে গান গাইতেন তা ‘হাঁওলা’ ও ভাওয়াইয়া সুর- ভাটিয়ালি নয়।

> ‘ আমার কাখের কলসি গিয়াছে ভাসি
> মাঝি তোমার নৌকার ঢেউ লাগিয়া
> কলসিখানি দিয়া যাও আনিয়া

...

নৌকাখানি রাখিব বান্ধিয়া
কলসিখানি...আনিয়া।'[৩১]

বারোমাসি গান

বারোমাসি গান এক ধরনের কাহিনি মূলক লোকসংগীত। বৎসরের বারো মাস বা ছয় ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নায়ক বা নায়িকার হৃদয়ে যে বিচিত্র ভাবের সঞ্চার হয়, সেই ভাব অবলম্বন করে রচিত হয় বারোমাসি গান। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রাদেশিক লোকসাহিত্যেই বারোমাসি গানের অস্তিত্ব বর্তমান। বারোমাসি মূলত নারী জীবনাশ্রিত সংগীত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বারোমাসি গানগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়- লৌকিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং রূপকাশ্রিত বারোমাসি। লৌকিক বারোমাসির বিষয়বস্তু দ্বিবিধ- প্রবাস থেকে আসা স্বামী কর্তৃক প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা এবং দয়িতের অনুপস্থিতিতে নায়িকার বিরহ বেদনা। ঐতিহাসিক পুরুষ চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে মাতা এবং স্ত্রীর দুঃখ নিয়ে রচিত হয়েছে কিছু সংখ্যক বারোমাসি গান। লোকসংগীতের বিষয় বিন্যাস করতে গিয়ে বারোমাসি গানকে অনেকেই বিরহ সংগীতের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু বারোমাসি গান এক ধরনের আচার-মূলক গান। উদ্ভবের যুগে বারোমাসি গান সৃষ্টি-কামনা আচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের পালাগানগুলিরও সাধারণ পরিচয় বারোমাসি গান। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি নামানোর উদ্দেশ্যে এই পালাগানগুলি গাওয়া হত। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের এক বারোমাসিতে পাওয়া যায়-

'কোন মাসে কোন রাশি
চৈত্র মাসে মীন রাশি।'[৩২]

লহনা, ফুল্লরা শান্তি এমন অনেক বারোমাস্যা বাংলা লোকসাহিত্যে বিরাজমান। মালোদেরকে কেন্দ্র করেও আছে 'বারোমাসি'। বৈশাখ মাসে বছরের প্রথম দিনে বাড়ির কর্তা তার স্ত্রীকে বলছেন গণেশকে কিভাবে আপনার করতে হবে, আর মাছ শিকারিরা প্রবাসে মাছ ধরছে, তাদের কোনও খবর নেই স্ত্রীর মন উতলা-

'আরে শুন শুন শুন না
বছরের প্রথম দিনে গণেশের লিগ্যে

...

পানটি দিতে ভুলে নয়া ; গণেশ বাবাজী
ঘরে আসবে এটি যেন ভুল না'[৩৩]

বাংলাদেশের নদীনির্ভর জনগণের কতগুলো নিজস্ব সম্পদ আছে, এদের অন্যতম হল- গান, লোকগান। নদী-নৌকা-মাঝি- এই তিনটি অনুষঙ্গে স্বতঃই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠের গান। তাইতো দেখা যায় কোনও ঘাটে একরাতের জন্য আশ্রয়রত নানা নৌকা থেকে বিচিত্র সংগীতের মূর্ছনা ধ্বনিত হয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ব্যবহৃত মালোজীবন-সংশ্লিষ্ট সংগীতগুলোর মধ্যে দুটো ভাগ লক্ষণীয়, এক. বৈষ্ণবভাব পুষ্ট, দুই. মনসামঙ্গলের ঐতিহ্যলগ্ন। নৌকাবাইচের সময় গীত সারিগানগুলোর মধ্যেও মালোজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার তরঙ্গ লক্ষ করা যায়। এই সারিগানের মধ্যেই ফুটে উঠেছে বন্ধুর ভোজনের জন্য ঝাগুর মাছ কেনা, গাঙপাড়ে রেঁধে খাওয়া, জোয়ারে হাঁড়িকুড়ি ভেসে যাওয়া, হাওড়ে টঙ্গি বাঁধা, দুয়ারে খিল না দেয়ায় ধন-যৌবন চুরি হয়ে যাওয়ার কথাসমূহ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ব্যবহৃত গানগুলোর অধিকাংশই মালোদের সামগ্রিক জীবনচর্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাদের প্রাণের গভীর হতেই এই গানগুলোর উৎসারণ ঘটেছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খিদিরপুর হালদারপাড়া অঞ্চলে ফণীন্দ্রনাথ হালদারের কাছ থেকে জানতে পারি যে মালোসমাজে শিশুর জন্মের সময় নবসুন্দরকে দিয়ে কামান করানো হয়। স্নান করে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পঞ্চগব্য ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হয়। শিশুর জন্মের ছয়দিন হয়ে গেলে যে গান হয় তা হল কীর্তনগান।

বৈঠকি গান

'এই আসরে এসো প্রভু নবদ্বীপের চাঁন
গৌর আসিলে আনন্দ হবে
প্রেমানন্দ কর দান
...
আমি এবার মলে জনম পেলে গোঁসাই পাই যেন বলাইচাঁদ
এই আসরে এসো প্রভু নবদ্বীপের চাঁদ।'[৩৪]

শ্লোকগান চড়কপুজোয় প্রথমে এটা হয়

‘বাজত ঈশান বাদ্য বাজ হিমালয়
ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, নাচেন ভগবতি
মোর কণ্ঠে ভর করে সরস্বতী
...
হরগৌরী নিদ্রাভঙ্গ
সেবকের গড়প্রণাম হই।’[৩৫]

খ। লোকনৃত্য

লোকনৃত্যের উদ্ভবের ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণ যে ধারণাটি প্রচলিত তা হল, মানুষ যখন ক্রমবিকাশের স্তরে শিকারজীবী থেকে পশুপালক এবং পশুপালক থেকে কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হল সেই কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই লোকনৃত্যের জন্ম। অরণ্য ছেড়ে মানুষ যখন বাইরে এসে চাষ আবাদ করে লোকালয় সৃষ্টি করে বসবাস শুরু করল তখন থেকেই বলা যায় সে লোক পর্যায়ভুক্ত হল। তাই বলা যায় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ দ্বারা চর্চিত নাচই লোকনৃত্য।

গম্ভীরা উৎসবের কালী নৃত্য

গম্ভীরা উৎসবের কালীনৃত্য একটু ভিন্ন আঙ্গিকের হয়। নৃত্যশিল্পীর পরনে থাকে ঘাঘড়া, ঊর্ধ্বাঙ্গে ব্লাউজ, মুখে মুখোশ, এই নাচের গতি ধীর। দক্ষিণা কালীর মুখোশ কালীঘাটের কালীর অনুকরণে তৈরি হয়। মুখোশ নর্তকের মুখে বেঁধে পোড়ানো ধূপের গন্ধ শোঁকানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেবীর ভর হয়। নর্তক শুয়ে পড়ে। তারপর ঢাকের বোলের গীত-ছন্দ তালের সঙ্গে চলে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কালীর নৃত্য। শুরু হয় ধীর লয়ে, মাঝে মধ্যম লয় তারপর শেষে উদ্দাম গতিতে শেষ হয় এই নাচ।

জারিগানের নৃত্য

কারবালা যুদ্ধ প্রান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত জারি গানের সঙ্গেও প্রচলিত আছে লোকনৃত্য। জারি গানের সহযোগী সমবেত শিল্পীরা রুমাল হাতে সার বেঁধে একধরনের নৃত্য পরিবেশন করে।

কখনও আবার বস্ত্রাঞ্চলের প্রান্তভাগ হাতে ধরে পায়ে নূপুর বেঁধে সমবেত ছন্দে তাল দিতে দিতে নৃত্য পরিবেশন করে।

গ। লোকশিল্প

মাছ মঙ্গলদায়ক শুভ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতীক। প্রাচীনকাল থেকেই তাই মাছ এর স্থান বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাংলার যেকোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মাছ থাকে। বাঙালি তার লোকসৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রে- মাটির কাজে, ধাতুদ্রব্যের কারুকৃতিতে, ব্যবহার্য বস্ত্রাদিতে, বলতে গেলে সবকিছুতেই মাছের ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করেছে সচারু দক্ষতায়। তাই অনেকেই বলে থাকে মাছ ছাড়া বাঙালি হয় না, যেমন জল ছাড়া মাছ বাঁচে না। সেই প্রাচীনকাল থেকেই পরম্পরাগতভাবে চলে আসা বাংলার অন্যতম এক লোকশিল্প ‘নকশি কাঁথা’ তৈরি হত মর্যাদা সহকারে। আর কাঁথাগুলির নকশায় সুতো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাছের প্রতীক থাকতোই থাকতো। পটশিল্প বাঙালির নিজস্ব চিত্রাঙ্কন রীতি। পটশিল্পেও মাছ বহাল তবিয়তে বিরাজমান। বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে মাছ বিষ্ণুর প্রথম অবতার। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও উড়িষ্যার অনেক জায়গায় এই দশ অবতারকে নিয়ে তাস তৈরি করে রীতিমত ভাল খেলা হয়ে থাকে। আমসত্ত্বের সন্দেশ, নাড়ু তৈরি, ছাঁচে ফুল, ফল এর সাথে মাছও আছে। ছোট বেলায় আমাদের অনেকেরই প্রিয় ছিল মাছ লজেন্স ও মাছ বিস্কুট। আজও বাংলার অনেক বাড়ির গৃহসজ্জায় উপকরণের মধ্যে লোকশিল্পীর মাছের ছাঁচ ছবি বা নকশা খুব দেখা যায়। এছাড়াও গৃহের দেওয়ালে মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি নানা রকম শিল্পকর্মের মধ্যে বহাল তবিয়তে মাছ বিদ্যমান।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে রয়েছে লোকশিল্পের এক সমৃদ্ধ জগৎ। ‘চারুকলা ও লোকশিল্প’ কলা সৃজনের দুটি অধ্যায়। লোকশিল্প ‘চারুকলা’র নিম্নস্তরের জ্ঞাতি নয়। বরং লোকশিল্প নিজস্ব বৃত্তে ভাস্বর। লোকশিল্প নির্মাণের উপকরণ অত্যন্ত সাধারণ। উপন্যাসে লোকশিল্পের উপাদান হিসেবে হুঁকো-র উল্লেখও রয়েছে। লোকজীবনে হুঁকোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে লোকশিল্প হিসেবে কাঁথার উল্লেখ যেমন রয়েছে তেমনি আল্পনার কথাও বলা হয়েছে। উপন্যাসে লোকশিল্পের উপাদান জালকে ব্যবহার করার কথা বিভিন্নভাবে এসেছে। সর্বোপরি জাল নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তির কথাও এখানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। তিনি জানিয়েছেন তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। উপন্যাসে লেখক যে সব জালের নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হল- ভেসাল জাল, ভৈরব জাল, ছান্দি জাল, জগৎবেড় ইত্যাদি।

ঘ। লোকসংস্কার

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী নিরক্ষর কিংবা অলিখিত মানুষই সংস্কারে বিশ্বাসী। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। অজ্ঞানতা অনেক সংস্কারের মূল ঠিকই কিন্তু সব সংস্কারের নয়। আসলে মানুষ বিজ্ঞানে কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যায় যতই উন্নতি করুক, এমন কিছু ব্যাপার আছে যেক্ষেত্রে সে বড় অসহায়, অনিশ্চয়তার শিকার। অনিশ্চয়তাবোধ থেকেও সংস্কারে বিশ্বাস জন্মায়। সাধারণভাবে সংস্কারকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়- ব্যক্তিগত এবং সমাজগত। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত অপেক্ষা সংহত সমাজ যে সব সংস্কারে বিশ্বাসী সেগুলির প্রতিই সঠিক গুরুত্ব আরোপ করে। সংহত সমাজের এক বিরাট অংশ যখন দীর্ঘকাল ধরে বিচার না করেই কিছু আচার আচরণ মেনে চলে এই ধারণায়, যে এগুলিকে মেনে চললে তাদের সফল এবং না মানলে অমঙ্গল, এদেরই বলে সংস্কার।

সংস্কার বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতো। পৈতৃক সম্পত্তির মতই এগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা প্রাপ্ত হই।

মাকাল ব্রত

উত্তর চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত ব্রত। যে-কোন জলাশয়ের ধারে মাটির স্তূপ করে চার কোণে তীর কাঠি পুঁতে সেগুলিতে লাল সুতো জড়িয়ে বেড়া করা হয়। স্তূপের ওপর লাল রং-এর চাদোয়া টাঙানো হয়। স্তূপের ওপর সিঁন্দুর লেপে দেওয়া হয়। তার ওপর ফুল বেলপাতা বা তুলসীপাতা রাখা হয়। উপকরণ- চুষিকাঠি, লাট্টু, ঘুনসি, ধান, দূর্বা, তুলসীপাতা, কলকে গাঁজা, একছড়া পাকা কলা, বাতাসা ও আলোচাল। মৎস্যজীবীরা ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্রত করে থাকে।

নাটাইব্রত

যখন ধান ওঠে বা ঘরে আসে। সেই ধানের চাল দিয়ে পিঠে তৈরি করে ‘মা নাটাই চণ্ডীর’ নামে প্রথমে উৎসর্গ করা হয়। তারপর সেই ধানের চাল দিয়ে পিঠে তৈরি, ধান বা চাল বিক্রি ও ভাত খাওয়া শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য বা বিশ্বাস মা নাটাই চন্ডীকে তুষ্ট রাখতে পারলে সন্তানসন্ততিরা সুখে থাকবে এবং আগামীতে আরো ভালো ফসল হবে। এই অঞ্চলে এই ব্রতকে বলা হয় ‘নাটাই ব্রত’ বা নাটাই বরত এবং নাটাই চণ্ডী বরত বলতেও শুনেছি।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে এই ব্রতটি করতে হয়। এই ব্রত পালন করতে ৭+৭ করে মোট ১৪ টি পিঠে লাগে। সাতটা পিঠে নুন দেওয়া, আর সাতটা নুন না দেওয়া। একে তারা বলে 'আলুনা পিডা'। ১৪ টা দুর্বা, ১৪ টা তুলসীপাতা, ১৪ টা কঁচু পাতার ওপর দিয়ে, এই ১৪ টা কঁচুপাতাকে আবার ১৪ টা ডালা বা পাত্রর উপর রাখে। নতুন ধান থেকে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে চাল বের করে একটি একটি করে সেই পিঠের উপর দিতে হয়। এবার ঘরের পরিষ্কার করা জায়গায় মাটি খুঁড়ে ছোট একটা দিঘি বানায়। আর দিঘির সামনে ১৪ টা পিঠে রাখার ডালা বা পাত্রটিকে রাখতে হয়। আলাদা করে একটা একটা করে দুটো পিঠে দিঘিতে দেয়। যারা এই ব্রত দেখতে আসে তাদেরকে সামনে বসিয়ে ঠাকুমা শ্রেণির কেউ পরস্তাব বা গল্প বলে। এই অনুষ্ঠানে কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। দুপুরে এই অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় হল "পরস্তাব" বলা। এই পরস্তাব হল এক ধরনের নীতি কথা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের সংসার জীবনে সুখে থাকতে কাজে লাগবে।

"ব্রতর পরস্তাব শুনে যত জন
সংসারে রয় সকলের মন।।'[৩৬]

ক্ষেত্রব্রত

"স্বর্গের জল মর্তের জল
মাঠে ধান হবে গল গল
গাঙের মাছের পয়সা দিয়ে
মাইয়্যার দিব বিয়ে।।"[৩৭]

কুলা বা ডালা সাজিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে পূর্ণিমার আগের দিন পর্যন্ত মাঠে কোন জমির খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে একটি সিটকি গাছ পোতা হয়। কলাগাছের ডোঙ্গা খানিকটা করে কেটে চুড়ির মতো করা হয়, তার উপর চালের গুঁড়ো দিয়ে শাঁখার মতো দাগ দেওয়া হয়। এবার পরিষ্কার কাপড়ের দুটো টুকরো বানানো হয়, একটি কাপড়কে রঙ করা হয়, আর একটি কাপড় সদাই থাকে। সাদা কাপড়টার মধ্যে চালের গুঁড়ো মেশানো হয়। নতুন জমির ধান থেকে কিছু চাল ভেজে তাতে চিনি বা গুড় মিশিয়ে মুঠো মুঠো করে সিটকি গাছের, গোড়ায় বর্তিনীরা দেয়। এর সাথে নূতন ধান থেকে বানানো চালের গুঁড়োর পিঠে দেয়। এই পিঠে অনেকে তিন-চার রকমের দেয়, অনেকে এর বেশিও দেয়। কলা গাছের ডোঙ্গার কড়ি আর কাপড় সিটকি গাছের গোড়ায় দেয়। একটা পাত্রে

যতরকম পিঠে বানানো হয় তার একটি দুটি করে থালায় সাজিয়ে গাছের সামনে রাখে। ব্রতর অনুষ্ঠানটা হয় ঠিক দুপুরে, এবার যে ব্রত পালন করে সে এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত সকলের সামনে ভক্তি বিনম্র চিত্তে করজোড়ে ব্রত কথা বা পরস্তাব বলে। এই ব্রতের পর থেকে নূতন ধানের ব্যবহার শুরু হয়। চাল তৈরি করা, পিঠে তৈরি করা বা ধান বিক্রি করা। ক্ষেত্রব্রতের আগে কোনও কিছুই হয় না।

ওপার বাংলার কুমিল্লা জেলার মালো কুমারীদের একটি ব্রত মাঘস্নান, মাঘমণ্ডল, মাঘডুব, কৃষ্ণব্রত। মূলত এটি কুমারী মেয়েদের ব্রত হলেও বাড়ির বয়স্কদের পরোক্ষ সহযোগিতায় পরম্পরাগতভাবে এই ব্রত পালন করা হয়। এপার বাংলার বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। তার নাম তুষল, তোষলা, তুষু, মাঘস্নান ইত্যাদি।

মাঘমণ্ডলের মন্ত্র

'মাঘমণ্ডল সোনার কুন্তল/বাপ রাজা ভাই বাদশা
মা বিদ্যা ধরি/বছর বছর পূজা করি।'[৩৮]

৬। লোকউৎসব

উৎসব জাতির প্রাণ। উৎসব জাতির সৃষ্টির চৈতন্য। যে জাতির উৎসব নেই, সেই জাতির প্রাণও নেই, চলার শক্তি নেই। মানুষের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দিন থেকে সমষ্টি জীবনের উত্তরণের পথেই উৎসবের সৃষ্টি হয়। প্রতিদিনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উৎসব। লোকউৎসব ইংরেজি folk শব্দের প্রতিরূপ বাংলায় 'লোক' কথাটি প্রচলিত। 'লোক' কথাটি সাধারণ অর্থে বৃহৎ জনসমষ্টি বোঝালেও বিশিষ্টার্থে শব্দটি আদিম জীবনাবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে যাদের চিন্তা ও আচরণে বিদগ্ধ পরিশীলিত সমাজের ছাপ বা প্রভাব পড়ে নি। লোকউৎসব হল লোককেন্দ্রিক জীবনধারার বা লোকজীবনের অনুগত সমবেত উল্লাসমুখরিত অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম। সাধারণভাবে লোকউৎসব বলতে বোঝায় গ্রামীণ জনগণের উৎসব।

হাজরা পূজা

চড়ক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে সব লৌকিক দেবতার পূজা প্রচলিত হাজরা ঠাকুর বা দালো বারাণোর পূজা তাদের অন্যতম। নীলপূজার পূর্বদিন, স্নান বিশেষে নীল পূজার দিন হাজরা ঠাকুরের পূজা করা হয়। ইনি শ্বেতবর্ণ, চতুর্ভুজ, দিগম্বর এবং জটাজুটধারী, সাধারণে শিবের চেলা বা ভূত-প্রেতের অধিনায়ক রূপে পরিচিত। শ্মশানে বা গ্রামের বাইরে অন্য কোনও

স্থানে হাজরা ঠাকুরের পূজার আয়োজন করা হয়। পূজায় পোড়া শোল মাছের ভোগ দেওয়া রীতি। চড়কের সন্ন্যাসীরাই হাজরাপূজার হোতা।

নীল পূজা

চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন সন্ধ্যায় সন্তানবতী হিন্দু রমণীদের পালনীয় ব্রত বা অনুষ্ঠান বিশেষ। এটা চড়ক অনুষ্ঠানেরই অঙ্গ। নীলপূজা উপলক্ষ্যে নীল, নীলকণ্ঠ, বা নীললোহিত এবং নীলচণ্ডিকা, নীল পরমেশ্বরী, নীলা বা নীলাবতীর পুজা করা হয়। নিম বা বেলকাঠ থেকে নীলের মূর্তি তৈরি করা হয়। চড়কের অনুরূপ নীল পূজায়ও সন্ন্যাস গ্রহণের রীতি আছে।

গাজনের মেলা

চৈত্র শেষে পুজো-পার্বণের মধ্য দিয়ে শিবের আবাহনকে গাজন বলে। গাজনের সঙ্গেই যুক্ত চড়ক, গম্ভীরা, মুখোশ নাচ, ছিরুয়া উৎসব, গমিরা ইত্যাদি। চৈত্র মাসের অনেক পুজো-পার্বণ অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হল চড়ক পুজো। এটি দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যতম লোক উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তির দিন অনেকে শিব-নারায়ণ অশ্বত্থ ও তুলসী গাছের ওপর ঘট টাঙিয়ে দেয়। সংক্রান্তির আগের দিন চড়কের নীল পুজো হয়। চড়ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ধাবেলিপাড়া, খিদিরপুরের চড়ক বেশ পুরনো।

গ্রাম্যমেলা গ্রামীণ জীবনের একটি অচ্ছেদ্য বিষয়। গ্রাম্যমেলা গ্রামবাসীদের মিলনমেলাও। এই মেলায় বিক্রি হয় গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের প্রায় সমস্ত পণ্য। মূলত রথের মেলাকে কেন্দ্র করে কৈবর্তজীবনের একটা অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে এই উপন্যাসে। রথের মেলায় জলপথ, স্থলপথ দিয়ে দল বেঁধে মানুষ আসে, আনন্দের নানা উপকরণ সংগ্রহ করে।

চ। লোকদেবতা

আদিমযুগের মানুষ নৈসর্গিক জগৎ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি প্রভৃতিকে একদিকে যেমন বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে করত, অন্যদিকে তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ভীতিবিহ্বল চোখে দেখত। শুধু তাই নয় দৃশ্য শরীরী ও অশরীরী বস্তু ও প্রাণীতে আত্মা আরোপ করে মানুষের মত প্রাণবন্ত করে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। প্রাণবন্ত শক্তিসমূহ ভয় বিস্ময়ের সীমানা পেরিয়ে কালক্রমে মানুষের ঘরের আঙিনায় প্রবেশ করেছিল। ফলে এই প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের শুভ ও অশুভ ক্রিয়া সংগ্রামশীল যাযাবর অরণ্যচারী কিংবা গুহাবাসী মানুষকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত করেছিল। এই আদিম মানবগোষ্ঠী শুভ ও

অশুভ শক্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আবিষ্কার করেছিল জাদুবিদ্যা। গাছ, গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পল্লব, পাথর, জল, জলাশয়, নর-নারী, আকাশ, সূর্য, থান, ফসল, প্রতীক আর অসংখ্য জড়বস্তু দেবতার সম্মানিত আসন অলঙ্কৃত করেছিল। কালক্রমে ক্ষেত্রদেবতা, ক্ষেত্রপাল, দিগ্‌রক্ষক, উর্বরতার মাতৃদেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা ইত্যাদি বহু দেবতার জন্ম হয়েছে লোকসমাজে। এর সঙ্গে উদ্ভাবিত হয়েছে মারণ, উচাটন ও বশীকরণ। অর্থাৎ দৃশ্যমান সমস্ত শক্তিকে আপন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার এক জড়বাদী, প্রাণবাদী ও প্রতিবাদী প্রক্রিয়া মানবমনকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই প্রক্রিয়ার সার্বিক ফলশ্রুতি অসংখ্য লোকদেবতার জন্ম।

মাকাল

মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনায় বাঙালির মৎস্যপ্রীতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মাছের লৌকিক দেবতার বিস্তারের বেশিরভাগ চব্বিশ পরগণা জেলায়। তবে মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় মালোদের মধ্যেও এর প্রভাব দেখা যায়। তিনি হলেন মাকাল, মাকাল ঠাকুর বা মাখাল ঠাকুর।

মাকালঠাকুর বা মাখালঠাকুর মূলত জলাজমি অঞ্চলের দেবতা। এইসব অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের উপাস্য লৌকিক দেবতা এই মাকাল, মাকালঠাকুর বা মাখাল ঠাকুর। মাকাল ঠাকুরের মূর্তি অর্থাৎ মানুষের আকৃতির মূর্তি নেই। বাংলার অনেক জায়গায় মৎস্যজীবীদের মধ্যেই মাকাল ঠাকুর পরিচিত। এই ঠাকুরের নির্দিষ্ট কোনও থান বা মন্দির নেই। মাছ ধরতে যাবার আগে জলাশয়ের পাশে, নদীর ধারে একটি মাটির বেদী তৈরি করে তার উপর দুটি মাটির ঢিবি বা স্তূপ তৈরি করে দেবতার প্রতীকরূপে যা দেখতে অনেকটা টোপরের মতো, মাকাল ঠাকুর জ্ঞানে পুজো করে। আদিম মানুষ যখন দেবতার মানুষরূপ দিতে শেখেনি, মাটির ঢেলা, পাথরের চাঁই কেটে কেটে দেবতা বানিয়ে নিত, মাকাল ঠাকুরের প্রতীক দেখলে সেই কালের কথা মনে হয়।

এই পুজো নদী বা জলাশয়ের ধারে হয়। প্রথমে গজ খানেক জমি বেশ ভালভাবে পরিষ্কার ও সমতল করে তার ঠিক মাঝখানে মাটি দিয়ে একটা ছোট বেদী তৈরি করে। এই বেদীর তিনটি থাক। চারটি কাঠি কোণে পুঁতে সেগুলি পরস্পর লাল সুতো দিয়ে সংযুক্ত করে। কখনও কখনও বেদীর উপর একটা লাল রঙের চাঁদোয়াও টাঙ্গাতে দেখা যায়। প্রতীকটির উপর অংশে সিঁদুর লেপে তার উপর ফুল, তুলসী পাতা বা বেলপাতা রাখা হয়।

সামনে একটা ঘট থাকে। পুজোর সময় একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ধূপকাঠি জ্বালাতে দেখা যায়। পুজোর আয়োজন অতি সামান্য। একটি মাটির থালা বা অন্যকিছুতে আলোচাল, পাকা কলা, খানকতক বাতাসা দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। অপর একটি থালায় থাকে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারের উপযোগী চুষিকাঠি, লাট্টু, ঘুনসি, ধান-দূর্বা, তুলসীপাতা আর থাকে একটা নতুন কলকে, আর কিঞ্চিৎ পরিমাণ গাঁজা। পুজোর আগে প্রতীকের উপর একটা ফুল রাখা হয়। ভক্তদের ধারণা বা বিশ্বাস যদি ওই ফুলটা পুজোর পরই আপনা থেকে মাটিতে পড়ে যায় তাহলে তারা ভাবে তাদের জালে অনেক মাছ পড়বে। একে বলে 'ফুল চাপানো'।

এই পুজোয় ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। দু-একটি ক্ষেত্রে যেখানে দেয়াসি শ্রেণির ব্রাহ্মণ পুরুত হয় তারা পুজোর সময় তিনবার 'গুরুসত্য' এই কথা উচ্চারণ করে। স্থানীয় লোকের ধারণা মাকাল ঠাকুরের নাম করে বঁড়শি ফেললে সেই বঁড়শিতে মাছ গাঁথবেই। এইসব অঞ্চলে ছোট ছোট ছেলেরা যারা বর্ষার সময় বঁড়শিতে মাছ ধরে, তারা বঁড়শি ফেলবার আগে মাকাল ঠাকুরের নাম নিয়েই বঁড়শি জলে ফেলে। সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু জায়গায় মাকাল ঠাকুরের সহচর আর একটি দেবতার পুজো হতেও দেখা যায়। তারা তাকে বলে 'আট মাকাল পুজো'।

দক্ষিণরায়

স্বনামখ্যাত একজন লৌকিক দেবতা। ইনি দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণরাজ, দক্ষিণদ্বার নামেও পরিচিত। ইনি বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে বাঘের দেবতা হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁর পূজা কেবল দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলেই নয় হুগলী, হাওড়াতেও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের মূর্তি যোদ্ধৃবেশধারী ও বীরত্বব্যঞ্জক, পরিধানে কাষায় বস্ত্র। গলায় উত্তরীয়, মস্তকে উষ্ণীষ, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, হাতে সুবর্ণ বলয়। পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণীর ও ধনু, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ এবং কোমরবন্ধে ছুরিকা। কোন মূর্তিতে হাতে বন্দুকও দেখা যায়। এঁর বাহন কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও বা অশ্ব।

দক্ষিণরায় সাধারণত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা বৃক্ষতলে অথবা পর্ণকুটিরে পৌষ সংক্রান্তি অথবা ১লা মাঘ এর পূজা পেয়ে থাকেন। পূজার উদ্দেশ্য এই যে, এঁকে পূজা করলে রোগ-ব্যাধি, বিশেষ করে বাত-ব্যাধি দূর হয়, হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, সুন্দরবনে নির্ভয়ে মধু-কাঠ, মাছ সংগ্রহ করা যায় ইত্যাদি।

সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে দক্ষিণরায় এর প্রসঙ্গ আছে। বাঘ বা দানোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গঙ্গায় মাছ ধরতে যাওয়ার আগে মালোরা এই পুজো করে থাকে। এই দক্ষিণরায় মেয়ে মানুষের রূপ ধরে জলের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তার এক পিঠ চুল, ফুটফুটে মুখ, ডাগর চোখ জলে ভেসে যায়। যেই না কোনও জেলে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাঙায় ওঠে, তো ওই-ই হয় তার শেষ যাত্রা। কারণ ওটা যে মেয়েমানুষ নয়, বড় শেয়াল-দক্ষিণরায়।

মঙ্গলা

‘গ্রাম দেবি বন্দো সবে শরপাইর মঙ্গলা,
ভক্তজন জানে যাঁর বহু ছলকলা।
সর্বত্র সর্বতোমুখ করিলা প্রমাণ,
পূর্ব ও পশ্চিম যাঁর কাছেচে সমান।।’[৩৯]

মেদিনীপুরের কাঁথি থানার শরপাই গ্রামে মঙ্গলানাথ মন্দিরে মঙ্গলাচণ্ডী পাথরের মূর্তি। জাগ্রত দেবী, বয়সে পাহাড়পুরের মাকাল ঠাকুরের সমান। তিনি পশ্চিমমুখী। দুর্গা-পূজা ও পৌষ-পার্বণ বছরে এই দুবার মঙ্গলার পূজা হয় ও দুবারই বিরাট মেলা বসে। পার্বণের সময় ‘জালি’ কীর্তনীয়া কীর্তন গান করে। কিংবদন্তী আছে – দেবী নাকি আগে পূর্বমুখী ছিলেন। একবার পৌষ পার্বণে জেলে-কীর্তনীয়ার দল সময় মত উপস্থিত হতে না পারায়, অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত কীর্তনীয়ার দল কীর্তন শুরু করে। কিছু সময় পরে জেলে কীর্তনীয়ার দল এলে তাদের কীর্তন পরিবেশনে নিষেধ করা হয়। তারা তখন মন্দিরের পশ্চাদদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে কীর্তন শুরু করে। দেবী মঙ্গলা, যিনি পূর্বমুখী ছিলেন, জীবন্ত হলেন, সচল হয়ে জেলে কীর্তনীয়ার দলের দিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তারপর পূর্বদিকের দরজা বন্ধ করে পশ্চিমদিকে দরজা তৈরি করা হয়। সেইদিন থেকে মঙ্গলার পূজা উপলক্ষে জেলে কীর্তনীয়ার দলের কীর্তনগান পরিবেশন করা হয়ে আসছে। ভক্তরা তাদের ‘মানসিক’ সফলতায় দেবীর কাছে পাঁঠাবলি দেন। মেলায় নানারকম কুটির ও মনিহারি সামগ্রীর কেনাবেচা হয়।

সন্তোষ করের লেখা ‘মুক্তামাছ’ উপন্যাসে জেলেপাড়ার লৌকিক দেবতা ‘মঙ্গলা মা’, ভয়ে-আতুরে দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়ান। প্রত্যেক অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, শনিবার-মঙ্গলবার পূজা পান তিনি। ‘মঙ্গলামা’র সেবক গজপতি পণ্ডা ও তার ছেলে রঘুপতি পণ্ডা,

জেলেপাড়ার পুরোহিত। জেলেপাড়ার দক্ষিণের কেয়া জঙ্গলটা তাদের কাছে শুভ। মঙ্গলামায়ের বাহন এক জোড়া কেঁদো বাঘ থাকে এই কেয়া জঙ্গলে। বড্ড শৌখিন এই জোড়া বাঘ। কারোর অনিষ্ট করে না। এমনকি, খুঁটিতে বাঁধা গরু ছাগলের পাশে এসে দাঁড়ায়। আহ্লাদি ঠাকুমা সুবলকে বলেছিল যে সে দেখতে পাবে না মঙ্গলামায়ের জোড়া বাহন বাঘকে, দেখতে গেলে অশেষ পুণ্য করতে হয়। ভাগ্য করতে হয়, তার ডাক শুনতে। মঙ্গলামা'র জোড়া বাহন বাঘকে ঘিরে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

কলেরা কিংবা বসন্তে মারা গেলে, বলা হয় মঙ্গলামা'র দয়া। মায়ের দয়ার আতিশয্যও ঘটে। তখন মড়ক ধরে। জেলেপাড়ার জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। তখন মৃতদেহ পোড়ানোর প্রশ্ন নেই। ভাটির টানে তেবাঁকি খালে ছেড়ে দিলেই হল। সমুদ্র তখন তাদের নতুন দেশ দেখাবে।

সান্ঝা

উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে লক্ষ্মীদেবীর এক লোকায়ত প্রকাশ সান্ঝা। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ মাস ধরে এর পূজা ও গান করা হয়। তুলসী তলায় বেদি প্রতিষ্ঠিত করে কুমারীরাই এ গান গেয়ে থাকে। মন্ত্র নেই, মুড়ি-মুড়কি জল-ফুল দেওয়া হয়। ইংরেজ বাজার হবিবপুর, কালীয়াচক, সুজাপুর অঞ্চলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, জেলে, মালো, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি নিম্নবর্ণের কুলীনের দ্বারাই এ ব্রতকথা (সন্ধ্যা>সনসা>সান্ঝা) উর্বরশক্তিরও প্রতীক। সান্ঝাদেবী বিসর্জন এবং বহিচন্ত খেলা হয়। মাংলক 'ভাসু'র ন্যায় ছোট ছোট সুখ আহ্লাদ, বেদনা-পুলকে-বিরহের গানের আবেদন মর্মস্পর্শী।

সোনা রায়

সারা পৌষমাসে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ মালদহ জেলা থেকে উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা পর্যন্ত সোনা রায়ের গান ও পাঁচালি গীত হয়ে থাকে। বর্তমান উত্তর বাংলা ছাড়া পূর্ব বাংলার রংপুর, রাজশাহী, পাবনা ও মৈমনসিংহ জেলায়ও এ পূজার প্রচলন আছে। এমন কি বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী রাজ্য বিহারের পূর্ণিয়াতেও সোনা রায়কে দেখা যায়।

সোনা রায়ের পূজা-গান ও পাঁচালির উদ্ভবের ইতিহাস রহস্যে ঘেরা। কিন্তু এর উৎপত্তির উৎস খুঁজে পেতে দেরি হয় না। কারণ, প্রতিটি পাঁচালির উদ্ভবের মধ্যে গৃহস্থের মঙ্গল-কামনা জড়িয়ে থাকে, আপদ থেকে উদ্ধার ও ঐহিক ঋদ্ধিই যার একমাত্র লক্ষ্য বলা

যায়। সুতরাং এ-বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মঙ্গলকাব্যের যুগ-সীমায় অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেই এর জন্ম।

সোনা রায়ের পূজক ছোট ছোট রাখাল বালকেরা। সারা পৌষ মাসের রাত্রি বেলা তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগন পদ্ধতিতে চাল, ডাল, পয়সা সংগ্রহ করে। মাগনের সময় তারা সোনা রায়ের ছড়া সুর করে আবৃত্তি করে। একজন মূল গায়ক, অন্যরা সব দোহারকে। দক্ষিণ বাংলার চব্বিশ পরগণা এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে বিখ্যাত ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের অন্য সংস্করণ উত্তর বাংলার সোনা রায়। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায়ের লৌকিক দেবকুলে যে আধিপত্য উত্তরবঙ্গের সোনা রায়ের তা নেই বটে, তবে এক সময়ে এই অঞ্চলের লোকায়ত জীবনে সোনা রায়ের ব্যাপক অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। বিশেষ করে আধুনিক কালে বসতিস্থাপন ও অরণ্য-সম্পদ ব্যাপক ব্যবহারে এই অঞ্চলে ব্যাঘ্রভীতি দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষা অনেক কমে গিয়েছে। ফলে, সোনা রায়ের মাহাত্ম্য ও প্রচার দক্ষিণ রায়ের মতো বিদগ্ধজনের কাছে তেমন করে পৌঁছায়নি।

পৌষ সংক্রান্তিতে একটি গাছতলায় এই পূজা হয়। এই পূজায় আতপ চাল, গঙ্গাজল, বেলপাতা, ফুল, ঘট, কড়াই, কলা, পায়রার বাচ্চা ইত্যাদি উপচার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বন্দনা অংশে আছে তুলসী বন্দনা, গাভী বন্দনা, রাখাল বন্দনা, বুড়াবুড়ি বন্দনা প্রভৃতি। গানগুলিকে বলে 'শাকবোল'। রাখাল ও গোয়ালাদের জীবনের সঙ্গে বৈষ্ণবী ধারণার সংযুক্তিকরণের ফলেই যে সোনা রায়ের উৎপত্তি তা বোধ হয় খুব সহজেই ধরা পড়ে তাদের গানগুলিতে।

সমুদ্রযাত্রার আগে মালোরা জীবন সংস্কার মেনে কতগুলো পুজো করে থাকে।

নৌকা বরণ

নৌকো তৈরি শুরুর আগে পাঁজিপুথি দেখে শুভদিন স্থির করা হয়। ঐ শুভদিনে একটা পুজো দিয়ে তবেই নৌকো তৈরি শুরু হয়। এই পুজোতে একটা নতুন কাপড় অথবা একটা গামছা লাগে। এছাড়া অন্যান্য উপকরণ যেমন ধূপ-দীপ, ফল-মূল, ফুল, দূর্বা, বাতাসা, সন্দেশ ইত্যাদি লাগে। এ পুজোতে কুল-পুরোহিতের দরকার হয়। নৌকো তৈরির সময় গলুই-এ একটা ফুটো করে তার মধ্যে সোনা-রূপোর পরিবর্তে সোনা ও রূপো চেঁছে তার ধুলো দেওয়া হয়। পরে কাঠের টুকরো দিয়ে সেই ফুটোটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। নৌকো তৈরির পুরো

সময়টা নৌকোর মালিককে যৌন-মিলন থেকে বিরত থাকতে হয়। নৌকো তৈরি সম্পূর্ণ হলে আরও একবার পুজো দেওয়া হয়। নৌকোর গলুই-এ তেল-সিঁদুর দিয়ে পাঁচজন সধবা মহিলা বরণডালা নিয়ে নৌকোকে বরণ করে নেয়। বরণডালাতে থাকে পঞ্চপ্রদীপ, ধান, দূর্বা, কলা ইত্যাদি। নৌকোর মালিক যে-মিস্ত্রী নৌকো তৈরি করেছে তাকে পেতলের কলস এবং নতুন কাপড় উপহার দিয়ে সম্মান জানায়। নতুন নৌকো পুজোর সময় যারা উপস্থিত থাকে, তাদের সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। দিনাজপুরে নৌ-কারিগর নৌকো তৈরির আগে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নদীর জল এনে নৌকোর সরঞ্জাম এবং তক্তায় ছিটিয়ে দেয়। তারপর নদী থেকে একতাল কাদা এনে তাতে সিঁদুর লাগিয়ে ধূপ, দীপ, ফুল, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে পুজো করে তবেই নৌকো তৈরি শুরু করে। বিশ্বকর্মার নাম স্মরণ করে নৌকোর প্রথম কাঠে ঘা দেয়।

ডালা পুজো

জেলেরা জালকেও পুজো করে। একে বলে ডালা পুজো। নদী বা সমুদ্রে জাল পাতার আগে, বিশেষ করে ছাঁদি বাঁ শেলে জাল, জালের টুকরোগুলোকে জুড়তে হয়। পাঁজি দেখে শুভদিন ঠিক করা হয়। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে দুটুকরো জালকে জোড়া হয়। বাঁধনের ওপর গোলা সিঁদুর এবং বাটা হলুদ লেপে দেওয়া হয়। তারপর ধান, দূর্বা, ফুল, তুলসীপাতা এবং গঙ্গাজল দিয়ে জালকে পুজো করা হয়। এতে কোনও পুরোহিত দরকার হয় না। মাঝি বা জালের মালিক নিজেই পুরোহিতের কাজ করে। জেলেদের বিশ্বাস জালকে যদি পুজো করে শুদ্ধ না করা হয় তাতে বেশি মাছ পড়বে না। সুতরাং দেবতাদের যেমন তুষ্ট রাখতে হবে, জাল দড়িকেও শুদ্ধ রাখতে হবে। জাত-জেলেরা যদি আগের দিন রাতে সহবাস করে থাকে তবে পুরুষ ও মহিলা সকালে স্নান না করে জাল কিংবা নৌকো ছোঁয় না। মেয়েরা অশুচি হলে এ-নিয়ম মেনে চলে। জেলেদের দৃঢ় বিশ্বাস এ-নিয়ম অমান্য করলে ব্যবসার ক্ষতি হবে।

হরির লুট/ ত্রিনাথের পুজো

মরশুমের প্রথম যাত্রার আগে নৌকোর মালিকদের, বিশেষ করে বাংলাদেশী জেলেদের মধ্যে, বাড়িতে হরির লুট নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। সাধারণত ঘরের মধ্যে গৃহদেবতার সামনে একটা কাঠের পিঁড়ির উপর নতুন কাপড় পেতে তার ওপর জলভর্তি মাটির ঘট বসানো হয়। ঘটের উপর একটা ছোট আমের ডাল রাখা হয়। ঘটের সামনে তিনটে গাঁজার কল্কে গাঁজা দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। গাঁজাই এই পুজোর প্রয়োজনীয় উপাচার। আরও লাগে ফুল, দূর্বা, বাতাসা ইত্যাদি। এ পুজোয় কোনও পুরোহিত লাগে না। পুজোর শেষে উপস্থিত জেলেরা গাঁজা টানতে থাকে। যদিও এ অনুষ্ঠানের নাম হরির লুট, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে

ত্রিনাথকে পুজো করা হয়। অনেকের বাড়িতে ত্রিনাথের ছবি আছে। ত্রিনাথ হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমাহার। তাই ত্রিনাথের তিনটে মাথা। এই অনুষ্ঠানে পাড়াপড়শিরা উপস্থিত থাকে। তাদের সামনে ত্রিনাথ পাঁচালি পাঠ করা হয়। ত্রিনাথ পূর্ববঙ্গীয় জেলেদের কাছে খুব জনপ্রিয় দেবতা। এদের বিশ্বাস ত্রিনাথকে খুশি করতে পারলে, মাছ মারতে গিয়ে কোনও বিপদ আপদ ঘটবে না। ব্যবসাও ভাল হবে।

বুড়োঠাকুরানির পুজো

পূর্ববঙ্গীয় জেলেদের মধ্যে আরও একটা পুজো প্রচলিত আছে। তার নাম বুড়োঠাকুরানির পুজো। এই দেবীর পুজোর জন্য জেলে পরিবারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই পুজোয় নৌকোর মালিক তার দাঁড়ি-মাঝিকে নিমন্ত্রণ করে। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশীও থাকে। সমুদ্রযাত্রার আগেই এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজোয় পুরোহিতের কাজ করার অধিকার আছে এমন একজন মহিলার যে বিধবা এবং যার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে। সেই বিধবা যৌন-কামনামুক্ত। সুতরাং ঈশ্বর উপাসনার উপযুক্ত। পুজোর আয়োজনকারীদের এটাই বিশ্বাস। মহিলাকে উপোস করে পুজো করতে হয়। এই পুজোয় পায়েস প্রধান নৈবেদ্য। মহিলা পুরোহিতকে উপোস করে পুজো করতে হয়। এই পুজোয় পায়েস প্রধান নৈবেদ্য। মহিলা পুরোহিতকে উপোস করে এই পায়েস রান্না করতে হবে। এই পায়েসের উপকরণ এবং তার পরিমাণও নির্দিষ্ট। একটা নৌকোর জন্যে লাগে সোয়া এক কিলো চাল, সোয়া এক কিলো গুড় এবং সোয়া একটা নারকেল। একাধিক নৌকো থাকলে নৌকোর সংখ্যার সঙ্গে সমতা রেখে পায়েসের উপাদানগুলোও আনুপাতিক হারে বেড়ে যাবে।

বুড়োঠাকুরানির পুজোয় নৌকোর মাঝিদেরও নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এই অনুষ্ঠানে মাঝিরা শুধু নিমন্ত্রিত অতিথি নয়, আমন্ত্রিত পুরোহিতও বটে। মাঝিদেরও উপোসে থাকতে হয়। তাকে পুকুর থেকে কাদা তুলে উঠোনের এক কোণে তিনটে ছোট ছোট ঢিবি করে রাখতে হবে। তিনটে ঢিবির মাথায় সর্ষের তেলে সিঁদুর গুলে টিপ পরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া লাগবে ঘট আর পান। তারপর ফুল, দূর্বা, আর নৈবেদ্য দিয়ে পুজো সারা হবে। পুজো শেষ হলে, মাঝিকে ঐ তিনটে পুজো-করা মাটির ঢিবিকে পুকুরে বিসর্জন দিতে হয়। তারপর মহাজন পুরোহিতকে ভোজন করাবে। অন্যান্য অতিথিদেরও আপ্যায়ন করবে।

গলুই পুজো

কুলপুরোহিতের পরামর্শ নিয়ে এবং পাঁজি দেখে শুভদিন ঠিক করে তবেই মরশুমের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা শুরুর ঠিক আগেই আরো পুজো হয়।তাকে বলে গলুই পুজো। যাত্রা শুরুর আগে নৌকোকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো হয়। নৌকোর গলুইকে গঙ্গার জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়।তারপর গলুই-এর উপর ডাবের জল ঢালা হয়। তারপর তেল-সিঁদুর মাখানো হয়।

সমুদ্রে থাকাকালীন জেলেরা কিছু নিয়ম পালন করে থাকে-

তেল-সিঁদুর প্রদান

পুরুষেরা যখন সমুদ্রে মাছ মারতে ব্যস্ত থাকে তখন বাড়ির মেয়েরা একটা শুভ দিনে জোয়ারের সময় নদীতে গিয়ে তেল-সিঁদুর ঢালে। জেলে পাড়ার মেয়েরা অনেকে একসঙ্গে এই অনুষ্ঠান করে। দলবেঁধে শাঁখ বাজাতে বাজাতে নদীর পাড়ে আসে। তারপর পান, সুপারিসহ তেল-সিঁদুর সমুদ্রে ঢালে পুরুষদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের আশায়। তেল সমুদ্রের ঢেউকে প্রশমিত করবে। সিঁদুর, পান, সুপারি ইত্যাদি গঙ্গাদেবীকে তুষ্ট রাখবে। এর ফলে মাছ মারারা সমুদ্রে নিরাপদে মাছ মারতে পারবে। জেলে-বৌরা আগে থেকেই স্বামীদের কল্যাণ কামনায় তেল-সিঁদুর মানত করে থাকে। তারপর স্বামীরা সমুদ্রে চলে স্ত্রীরা মানত চুকোতে নদীতে আসে।

মুদো ধরা

সমুদ্র বা নদীতে থাকাকালীন কোনও বিপদে পড়লে বা বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে, জেলেরা গঙ্গা, শনি, নারায়ণ অথবা গাজী সাহেবের নামে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা মুদো ধরে। পরে মাঝির বাড়িতে ঐ টাকায় পুজো হয়। সেই পুজোয় সব দাঁড়ি-মাঝি উপস্থিত থাকে। পুজো শেষ হয়ে গেলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনেক সময় কোনও মন্দিরে অথবা ঠাকুরের থানে পুজো দেওয়ার জন্যে মুদো ধরা হয়। তখন মুদোর টাকা নিয়ে সেখানেই পুজো দেওয়া হয়।

তুকতাক করে অশুভ শক্তিকে তাড়ানো

যখন জালে মাছ পড়ে না, বা খুব অল্প পড়ে তখন জেলেরা অশুভ শক্তির ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কা করে। অশুভ শক্তির ক্ষতিকর প্রভাব কাটাবার জন্যে হলুদ গোলা জল নিয়ে জালে,

নৌকোয় এবং অন্যান্য মাছ ধরার সরঞ্জামের উপর ছিটিয়ে দেয়। কখনও কখনও নৌকোর উপর ইষ্টদেবতাকে পুজো দিয়ে, পুজো করা ঘটের জল নৌকো, জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম এবং জালপাতার জায়গাটিতে ছড়িয়ে দেয়। জেলেদের বিশ্বাস, এর ফলে অশুভ শক্তির ক্ষতিকর প্রভাব কেটে গিয়ে জালে মাছ পড়বে।

মাছ মারার পর জেলেরা কিছু পুজো করে থাকে-

মাছ পুজো

সুন্দরবনের মাছ মারারা, মাছ মারার পরেও, নানা আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে। মাছ বিক্রি করে যতদিন না প্রথম চালান হাতে পায় ততদিন শুকনো মাছ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত জেলেরা, বিশেষ করে বহরদার এবং তার ম্যানেজার, চুলদাড়ি কাটেনা, নখ কাটেনা, এমনকী তেল সাবানও গায়ে তোলে না। মাছ শুকনো করে বিক্রি করতে যাওয়ার আগে পাঁচটা ঝুড়িতে করে মাছ গঙ্গাদেবীর থানে রেখে ফুল, ফল, মিষ্টি সহযোগে পুজো দেওয়া হয়। মালিক উপোস করে গঙ্গায় স্নান করে পুজো দেয়। মাছের ঝুড়িতে সিঁদুর লাগানো হয়। পুজোর সময় কাঁসর ঘন্টা বাজানো হয়। অনেক সময় বহরদারেরা গঙ্গাদেবীর কাছে মাথার চুল উৎকর্ষ করে এবং মানত করে। যে-নৌকো মহাজনের ঘরে প্রথম মাছ বিক্রির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বহরদার নিজেই পুজো শেষে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সেই নৌকোয় ওঠে। বাংলাদেশী জেলেদের মধ্যে চালু রীতি হল মরশুমের প্রথম ধরা মাছ নিয়ে নৌকো যখন ঘাটে পৌঁছয়, তখন পাঁচ জন সধবা মহিলা বরণডালা নিয়ে তাকে বরণ করে নেয়। মহিলারা উলুধ্বনি দিতে দিতে মাছের ঝুড়িকে স্পর্শ করে। জেলেরা এভাবেই মরশুমের প্রথম ধরা মাছকে স্বাগত জানায়।

গঙ্গা পুজো

মরশুমের প্রথম চালান হাতে পাবার পর বহরদার ফুল, ফল, মিষ্টি দিয়ে গঙ্গাদেবীকে পুজো দেয়। উপস্থিত জেলেদের মধ্যে প্রসাদ বিলি করা হয়। বেশি মাছ পড়লে বহরদার ঘটা করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। বহরদার শুধু নিজের খুটির লোকেদের খাওয়ায় না, প্রতিবেশী খুটির জেলেদেরও নিমন্ত্রণ করে। মাছ বিক্রি করে প্রথম চালান বা রসিদ হাতে পেলে গঙ্গাদেবীকে পুজো দেওয়া সুন্দরবনের জেলেদের কাছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আবার অনেকেই প্রতিটি ক্ষেপে চালান পাওয়ার পর গঙ্গাদেবীকে পুজো দেয়। বেশি লাভ হলে ইষ্টদেবীর কৃপার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। লোকসান হলে, যাতে পরের ক্ষেপে লাভ হয় তার জন্যে প্রার্থনা জানায়।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে গঙ্গাপূজাকে 'সাজার' বলা হয়। 'সাজার' হল মাছমারাদের সর্বজনীন গঙ্গাপূজা। সবাই মিলে চাঁদা দেয়। হাতে ধরে কেউ টাকাপয়সা দেয় না। মাছ ধরার একটি ভাটার পাওয়া মাছ সব দিয়ে দেয়। যাদের ওপর সাজারের ভার দেওয়া হয় তাকে বলে 'সাজাভাটা'। সেই মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তাতেই সর্বজনীন গঙ্গাপূজা হয়। তাতে কে কত বেশি দিয়েছে, কম দিয়েছে, সেটা কোনও কথা নয়। যে যা পায়, তাই দেয়। যে যত বেশি গড়ান মাছ মারতে পারে সে তত বেশি দিতে পারে। তার নাম হয় মান বাড়ে। এই গঙ্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পালাগান অনুষ্ঠিত হয়েছে- শান্তনু ও গঙ্গাদেবীকে নিয়ে পালা।

হরিশঙ্কর জলদাসের 'জলপুত্র' উপন্যাসে গঙ্গাপুজো সেরেই জেলেরা জাল নিয়ে সমুদ্রে নামে। আষাঢ়ে মা গঙ্গার পূজা। জলপুত্রদের কাছে মা-গঙ্গা সকল দেবীর সেরা। তিনি মৎস্যদেবী, তিনি তাদের অন্নদাত্রী। এই গঙ্গাপূজায় সকল শ্রেণির নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। এই গঙ্গাপুজোয় পাঠাবলি দেওয়ার রীতি দেখা যায়। বালির চরে মাছধরার নৌকাগুলোকে পূর্বমুখী করে সারি বেঁধে রাখা হয়। নৌকাগুলোর সমস্ত গায়ে ঘন কালো আলকাতরা মাখানো হয়। ভিতরেও তাই। কিন্তু নৌকার আগা এবং পাছা বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। প্রত্যেক নৌকার আগায় মানুষের দুটো চোখ আঁকা। অনেক কৌশলে সে-চোখ আঁকা হয়েছে। জলপুত্রদের বিশ্বাস- এই চোখ দিয়ে নৌকা গভীর সমুদ্রে তাদের মালিকের জাল খুঁজে নেয়। চোখগুলোর পাশেই মা-গঙ্গা, মা গঙ্গাদেবী পদেসু' ইত্যাদি কথাংশ লেখা। পাছার দিকে নানা ফুল-পাতা আঁকা। তারই ফাঁকে ফাঁকে নৌকার মালিকের নাম লেখা। সবই অদক্ষ হাতের কাজ। নৌকোগুলোর প্রত্যেকটির আগায় একটা করে কচি কলাগাছ বসিয়ে দেওয়া হয়। এয়োতিরা কুলার আগায় পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে সেখানে সিঁদুরের কৌটো থেকে ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে সিঁদুর নিয়ে নৌকাগুলোর আগায় টিপ দিতে লাগল তারা। আর কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রার্থনা করল।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালোরা প্রতিদিনের জালিক কাজকর্মে নদীকে নমস্কার করে এবং তার জলে হাত পা ধুয়ে নৌকায় ওঠে। নদীযাত্রায় তারা গঙ্গামায়ের নাম স্মরণ করে, কখনও কখনও নদীর বুকে নৌকা ভাসানোর সময় পাঁচপীরের ধ্বনি দেয়। তিতাসপাড়ের মালোদের দৃঢ় বিশ্বাস-

'বার গাঙে মা-গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে।'[৪০]

মাছের আঁশের টিপ

যে মরশুমের প্রথমে যে-ইলিশ মাছ পাওয়া যায় তার আঁশ নিয়ে নৌকোর সমস্ত জেলে কপালে টিপ পরে। জেলেরা এইভাবে মাছকে সম্মান জানায়। আশা করে এর ফলে তারা বেশি বেশি মাছ পাবে। আঞ্চলিক বিশ্বাস এভাবে জেলেরা জাদুশক্তি ব্যবহার করে। তাদের ধারণা সদৃশ বিষয় সদৃশ ফলাফল সৃষ্টি করে। জেলেরা কপালে ইলিশের আঁশের টিপ পরে ইলিশকে তাদের জালে আহ্বান করে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরে গোকর্ণঘাট গ্রামের মানুষেরা তাদের নিত্যদিনের জীবনাচরণে মান্য করে চলে যাবতীয় লোকাচার লোকবিশ্বাস সংস্কারকে। গ্রাম্যজীবনে জোকার বা উলুধ্বনি একটি মাঙ্গলিক লোকাচার। বাঙালি বিবাহে একসময় 'গুরুবচন' উচ্চারণ না করলে বিবাহ কর্ম সম্পূর্ণ হত না। অদ্বৈতের উপন্যাসে একটি গুরুবচনের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'শুন শুন সভাজন শুন দিয়া মন,
শিবের বিবাহ কথা অপূর্ব কথন।
কৈলাশ শিখরে শিব ধ্যানেতে আছিল,
উমার সহিতে বিয়া নারদে ঘটাইল।
...
সাঙ্গ হইল শিবের বিয়া হরি হরি বল।'[৪১]

মৃতের উদ্দেশ্যে হবিষ্য প্রদান করা মৃত্যুকালীন একটি বিশেষ লোকাচার। অনন্তর মা মারা যাবার পর সে প্রতিদিন হবিষ্য সাজায়। বাঙালি-হিন্দুরা পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যু হলে অশৌচ পালন করে। মৃতের উদ্দেশ্যে তার প্রিয়জনেরা খাদ্য নিবেদন করে। বিশ্বাস করা হয় মৃতের আত্মা কাকের বেশ ধরে সেই খাদ্য গ্রহণ করে। অনন্তর মা মারা যাওয়ার পর কলার খোলে খাদ্যের সঙ্গে, খোলের এককোণে একটু পান সুপারি একটু তামাক টিকাও দেওয়া হল।

তিতাস নদীর তীরে বসবাসকারী মালোরা দিনাবসানে কীর্তনের আসনে মিলিত হয়। তারা শুধুমাত্র গানই গায় তা নয়, গানের সঙ্গে তারা সংগীতের জন্য ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্য। এখানে কয়েকটি লোকবাদ্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন

গোপী যন্ত্র, খোল, বাঁশি খঞ্জুরী, রসমাধুরী, করতাল, রামকরতাল, ঘুঙুরা, ঢোলক, সারিন্দা, তবলা-বায়া, বেহালা, হারমোনিয়াম। এখানে বেহালা ও হারমোনিয়ামকে বাদ দিলে অন্যান্য সবগুলো বাদ্যকেই আমরা লোকবাদ্য বলতে পারি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে লোকদেবতা বাউচণ্ডি, সুবচনীর কথা যেমন উল্লেখ করেছেন পাশাপাশি লোকক্রীড়ার প্রসঙ্গও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে ব্রহ্মদৈত্যের ওপর মালোদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে – বামুন মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়। মেছোনৌকার প্রতি এই দৈত্যের খুবই লোভ। এই ব্রহ্মদৈত্য, সমুদ্র থেকে গঙ্গায়, গঙ্গা থেকে ইছামতীর কোল, কূলেকূলে, ফোড়নের মুখে সর্বত্র আছে নৌকার সঙ্গে। বাগে পেলে ছাড়ান নেই। ঘাড় মটকে ছেড়ে দেবে। অনেককে দিয়েছে। কখনও সে জানান দিয়ে আসে, না দিয়েও আসে। এই অতিলৌকিক কাহিনি জেলেসমাজ একান্তভাবে বিশ্বাস করে।

এই বিশ্বাস বা সংস্কারের পথ ধরেই মালোজীবনে এসেছে মেছোপত্নী-বিষয়ক লোকজ কাহিনি। চৈত্রমাসে সর্বত্র দুর্দিন। সমুদ্র উত্তাল ও নিস্ফলা, গঙ্গা নিষ্ঠুর। কোথাও মাছ পায় না জেলেরা। এই অভাবের দিনে মেছোপত্নী ভর করে রুক্ষ চুলের কানিপরা জেলেনির ওপর। পেত্নী ভর করলেই বউটি অচৈতন্য হয় বারবার, কাঁদে পেত্নীর মতো। গুণিনের অশেষ অত্যাচারের পর পেত্নীধরা জেলেনি স্বীকার করে যে তার নাম মাছখাগি, সে জাতে পেত্নী, তার বাস নরকে। মালোরা আজও বিশ্বাস করে যে পেত্নীতাড়ক গুণিন মরলে দানো হয়।

বিভিন্ন পীর, বনবিবি, স্বয়ং গাঙজননীর আবির্ভাব ও তাঁর অনুগ্রহ বিষয়ক গল্প গাথাগুলোতে জেলেসমাজজীবনের মূলকাঠামো দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে আছে। পুরুষানুক্রমে শোনা কিংবা জীবিকার সন্ধানে জলপথে চলতে চলতে জেলেরা এই অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রহ করে। পীরে তাদের নিবিড় ভয় ও বিশ্বাস। গঙ্গায় আছে মীয়াজী পীরের দহের কথা। পীর কখনও ডাঙায়, কখনও দহে থাকেন। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায় না, গেলে নৌকার তলা ফেঁসে যাবে। তারপর আছেন ঘোড়াপীর। তিনি জলে নামলে আওড় হয়, জল ভীষণ পাক খেতে থাকে।

গঙ্গাকে নিয়ে জেলেসমাজে আরও নানা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। অম্বুবাচীর দিনটিকে নিয়ে জেলেসমাজে আরও নানা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। অম্বুবাচীর দিনটিকে নিয়ে

জেলেসমাজে আরও নানা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পাঁজিকে মালোরা অভ্রান্ত বলে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। মাছধরা বিষয়ক সকল প্রকার নির্দেশনা তারা এই পাঁজি বা পঞ্জিকা থেকে সংগ্রহ করে। মাছধরার জন্য যাত্রা বা দূরে কোথাও যাত্রার দিনক্ষণ এরা পাঁজি দেখে ঠিক করে। এ ব্যাপারে সময়ের কোনও হেলদোল এরা সমর্থন করে না। জীবনের অনেক সংকটময় মুহূর্তকেও এরা পাঁজি-নির্দেশিত সময়ের চেয়ে কম গুরুত্ব দেয়। এই সমাজেই দেখা যায়, পাঁজি-নির্ধারিত সময়কে মান্যতা দেয়ার জন্য সংকটাপন্ন অবস্থায় পোয়াতি বউকে আঁতুড়ঘরে রেখে নিবারণ-পাঁচুরা সমুদ্রযাত্রা করে। পাঁজির ওপর কারও অবিশ্বাসকে জেলেরা মহাপাপ বলে মনে করে। তাই বিলাস পাঁজিপুঁথির লেখাকে অবহেলা দেখালে কাকা পাঁচু তার ওপর ক্ষেপে ওঠে এবং নানা রকম গালিগালাজ করে। মৎস্যশিকারের যাত্রার সময় মালোরা নানা সংস্কার মেনে চলে। কচ্ছপকে এরা যাত্রানাস্তির প্রতীক বলে মনে করে আর টিকটিকিকে মনে করে সত্যকথক। যাত্রার সময় কচ্ছপ, কলা, কাঁকড়া-কে অলক্ষুণে চিহ্ন বলে মনে করে। নিবারণ-পাঁচু সমুদ্রযাত্রাকালে খালের পশ্চিম পাড়ে রমণরত মাদি-মদ্দা কচ্ছপ দেখেছে এবং সেবারই নিবারণ বাদায় নিখোঁজ হয়ে যায়। নিবারণের এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি জেলেদেরকে অলৌকিকতায় আরও বিশ্বাসী করে তোলে। টিকটিকির ওপর জেলেদের অগাধ বিশ্বাস। তারা মনে করে- খনার জিভ টিকটিকির মুখে বসানো। তাই সে সর্বদা সত্য উচ্চারণ করে। টিকটিকি মালোদের কাছে মাননীয়। এর অপমান জেলেরা সহ্য করে না। তাই বিলাস নৌকাতে একটি টিকটিকি হত্যা করলে প্রবীণ পাঁচু হাহাকার করে ওঠে। জলে-জঙ্গলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াবার সময় জেলেরা নানা আচার এবং বাচনিক নিষিদ্ধতা মেনে চলে। জলজীবনে তারা সাপকে বলে 'লতা', বাঘকে বলে 'দক্ষিণরায়' বা 'বড় শেয়াল'। বাদাতে কারও মৃত্যু হলে বলে 'ভাল হয়েছে'। জেলেরা নদীতে মাছ ধরার সময় সাধারণত মাছের নাম ধরে না। মাছের নাম উচ্চারণ করলে মাছ পালিয়ে যাবে- এটাই মালোদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তারা 'কেমন হচ্ছে', 'পেয়েছো তো', 'আছে', 'কেমন পড়ছে'- এরকম বাক্যাংশ দিয়ে মৎস্যশিকারের ব্যাপারটি অন্য জেলের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। 'গঙ্গা'য় গোষ্ঠীবদ্ধ জেলেজীবনের নানা প্রসঙ্গে মিথ-পুরাণের কথা এসেছে। শান্তনু-গঙ্গা, জগন্নাথ ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ-রাধা, কালীসঙ্গী, ডাকিনী, বাসুকি প্রমুখরা ক্রোধের বা প্রসন্নতার প্রতীকতায় মালোসমাজ-লগ্ন হয়ে এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে আধিদৈবিক শক্তির ওপর মালোদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। পীরের ক্ষমতার ওপর তাদের অশেষ শ্রদ্ধা। মাছধরার উদ্দেশ্যে রওনা দেবার আগে

জেলেরা বদর পীরের নাম ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করে। উপন্যাসের শেষাংশে নৌকা ভাসানোর সময় বদর পীরের উদ্দেশ্যে শ্রীপদ বলেছে-

'বদর! বদর! নৌকা ছাড় ভূষণা! বাতাসের তেজটা কম।'[৪২]

এই মালোদের বিশ্বাসের একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে বনবিবি। তারা মনে করে বনবিবি তাদের চালিকাশক্তি। এই বনবিবিকে নিয়ে মালোসমাজে নানা জল্পনা-কল্পনা, তাকে ঘিরে নানা বিশ্বাস-কিংবদন্তী। দয়াল মালোপাড়ার প্রাচীন ব্যক্তিদের একজন। এই দয়াল সর্দার জঙ্গলে দুবার বনবিবির সাক্ষাৎ পেয়েছে। বড় কষ্টে আছে বনবিবি, তার নামে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে তার সে কষ্ট কেটে যাবে। দয়ালের তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বনবিবি-দর্শনের কথা গাঁয়ে-গঞ্জে প্রচারিত হয়েছে। চাঁদা তুলে মালোরা ওই গভীর জঙ্গলে বনবিবির মন্দির তৈরি করেছে। বছরে একবার তারা সে-মন্দিরে পুজো দেয় এবং খাওয়া-দাওয়া করে ফের নৌকা ছাড়ে। বনবিবির সঙ্গে সঙ্গে জলদানোতেও জেলেদের গভীর বিশ্বাস। জলদানো আর কেউ নয়, গাঙের ভূত। প্রাচীন মালোরা বলে, সুযোগ পেলে এই দানোরা জেলেদের নৌকা ডোবায়। জলভাসী জেলেদের ধ্বংস করেই তারা শান্ত হয়। সুন্দরবনের খাড়িতে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় মালোরা সঙ্গে গুণিন নিয়ে যায়। গুণিন মাছ ধরে না, কিন্তু জেলেদের শ্বাপদের ভয় দূর করে। গুণিন মন্ত্রবলে বাঘের মুখ বেঁধে দিতে পারে। গুণিনের মন্ত্রের প্রতাপে বাঘরা মানুষ খাওয়ার ক্ষমতা হারায়। এই উপন্যাসে ঠ্যানা শেখ গিয়েছে খাড়িতে। সদ্য জন্ম নেওয়া সন্তানকে ঘিরে মালো পরিবারে নানা আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। কুলীন সমাজের মতো মালোসমাজেও নবজাতকের ছয়-ষষ্ঠী হয়। সন্তান জন্মের ষষ্ঠদিনে ভাগ্যদেবী শিশুর ভাগ্য নির্ধারণ করেন। এই ছয়-ষষ্ঠীর দুপুরে শ্রীপদর বাড়িতে বড়ঠাকুরের পুজো হবে, পাড়ার এয়োস্ত্রীরা এসে প্রসাদ খাবে। সারারাত জননীর শিয়রে আলো জ্বলবে। গভীর রাতে ঠাকুর আসবেন এবং নবজাতকের ভাগ্য নির্ধারণ করে অন্তর্ধান হবেন।

সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ' উপন্যাসে চৌধুরীদের সিদ্ধেশ্বরী বোটের গল্প বলেছে বাবা হারাধন মাঝি, ছেলে সুবলকে। সিদ্ধেশ্বরী নাকি শৌখিন ছিল বড্ড। সুকুমারী মাইয়া-উঁচকপালী, গুমুরমুখী মাইয়া। বারো তেরো বছরের একটি কালো মেয়ে। চুল ছাড়া-লম্বা চুলের গোছা। পরনে হলুদ রঙা লাল পেড়ে শাড়ি। সিদ্ধেশ্বরী বোটে যা তা বোঝাই নিত না। বিশেষ করে নুন, নেওয়া যেত না বোটে। নুন লাগলে নাকি গা জ্বালা করতো সিদ্ধেশ্বরীর। একটু ভুলচুক হলেই আর রক্ষা নেই। বার গাঙের মরা জলে পড়লেই, ভরাডুবি করার ফিকিরে

থাকবে। কাপড় ছেড়ে গলবস্ত্র হয়ে, হারাধন মাঝিকে তখন বাঁধতে হবে সালামির পয়সা। কূলে ভিড়লে আগে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের পুজো, তারপর হারাধন মাঝির জল-অন্ন গ্রহণ। মাঝিদের লৌকিক দেবতা এই 'সিদ্ধেশ্বরীমা'। মাঝিদের চালচলনের ওপর কড়া নজর রাখে। খারাপ কিছু দেখলে মাঝিদের শাস্তিও দেয় 'সিদ্ধেশ্বরসীমা'। মাঝিদের দেবতা 'সিদ্ধেশ্বরীমা' মাঝিমাল্লাদের স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে তাঁর রুচি-মর্জি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধার কথা জানায়। ছোটবেলায় সুবল স্বপ্ন দেখতো, বড় হলে বাপের মতন সেও মাঝি হবে। জেলেপাড়ায় শাঁখ বাজে। ত্রি-সন্ধ্যা বেলায় আহ্লাদি বুড়ি ভুঁই নাগের গল্প বলে না। মুক্তামাছের গল্প সত্যি গল্প। বড় শৌখিন মুক্তামাছ। মুক্তামাছ যে পায়, রাতারাতি তার ভাগ্য ফিরে যায়। মুক্তামাছ যার ঘরে থাকে তার ঘরে রোগ-শোক থাকে না। সর্বকামনা সিদ্ধ হয়।

নৃপতি জেলের বউ রাধা জেলেনি সন্তান কামনায় কালো বিড়ালের হাড় কোমরে বেঁধেছে। বাদুড়ের মাংস খাওয়ার কথা ভাবছে। শুধু সন্তান কামনায় নয়। নৌকাযাত্রায় মঙ্গলা মাকে পুজো দিয়ে জলযাত্রা। জেলেপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই উপস্থিত হয়। নৌকাযাত্রা, জাল যাত্রায় যেন জেলেপাড়ার মিলন মেলা। মঙ্গলামা'র মাথার সিঁদুর নিয়ে, সমস্ত নৌকায় ছোঁওয়ালো জেলেপাড়ার পুরোহিত রঘুপতি পণ্ডা। ফুল দিয়ে নৌকা পুজো হল। তারপর জয়ধ্বনি করা হল- জয় মঙ্গলামা'র জয়।

সংস্কার ভীরু জেলেরা, সুবলের অনাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পায় না। এমনকি সুবলের দোস্ত নগেন মাঝিও নয়। সুবলকে সাত-কলমা পড়তে হল মঙ্গলা মায়ের সামনে। শুভ নৌকাযাত্রায় শরীর শুদ্ধ করে নৌকায় ওঠেনি সুবল জেলে। তাই সুবলের নৌকা কাত হয়ে জল ঢুকে গেল। লখা পালকে সমর্থন করে কেউ কেউ। সুবলকে দেখিয়ে বলে-

> 'এই শালা অপযশিয়াটার জন্য মাছের মুখ দেখতে মিলচেনি। আমাদের শুভযাত্রা নষ্ট করচে শালা।'[৪৩]

সামুদ্রিক জেলেদের কাছে, মদন ভঞ্জন পূর্ণিমার মহাকালদেবের পুজো গুরুত্বপূর্ণ। চৈত্র মাসের শেষ থেকে প্রথম বৈশাখের এই পূর্ণিমার তিন-দিন, তিন-রাত্রি জাল ছোঁবে না জেলেরা। মাছ ধরবে না। এমনকি মাছও খাবে না জেলে পরিবার। বিশেষ করে সাবাড় জালের জেলেদের কাছে- মদন ভঞ্জন পূর্ণিমায় মহাকালদেবের পুজোয় তাই আনন্দ আশা পূরণে পরিপূর্ণ। ভালোয় ভালোয় সমুদ্র থেকে ফিরে এসেছে জেলেরা। সারা মাছ-মরশুমের

টাকা-পয়সার লেনদেনের হিসাব হয় এই মিলন পূর্ণিমায়। লখা পালের ভেটিতে জেলেপাড়ার সবাই টাকার ভাগ পেয়েছে। সুবল ছাড়া সবাই আজ যথেষ্ট টাকা পেয়েছে। জেলেপাড়ার সবার ঘরে আজ টাকার আনন্দে মশগুল। এতটাকা সইবে, ভাত-ভিখিরি দরিদ্র জেলে পরিবারে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখা যায় যে স্বামী সমুদ্রে নিখোঁজ হলে স্ত্রী বারো বছর সধবা জীবন যাপন করবে। এটা সমাজের নিয়ম। তারপর স্বামী ফেরার সকল আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, শাখা ভেঙে, কপাল থেকে সিঁদুর মুছে সাদা কাপড় পরবে স্ত্রী। ভুবনও তার স্বামীর ফিরে আসার পথ চেয়ে আছে। এমনি করেই সময় কেটে যাচ্ছে। এরপর বারো বছর কেটে গেলে ভুবনও বিধবার বেশ ধারণ করে।

'দহনকাল' উপন্যাসে হরিদাসের কথা থেকে জানা যায় যে ফিসারম্যানদের নাম দেবতার নামের মত হয়। জেলেদের নাম দেবতার নামের মত হয়। সেই কারণেই তার বাবার নাম রাধানাথ।

ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খিদিরপুর এলাকার বাসিন্দা মালো ফণীন্দ্রনাথ হালদারের কথা থেকে জানতে পারি যে মালোদের কতগুলো বিশ্বাস সংস্কার রয়েছে। কাঁটাজাল দেওয়ার পর তারা কতগুলো নিয়ম মেনে চলে। নদীতে তারা বাঁশ পুতে দেয়। আগাছা, বাবলা, তেঁতুল গাছ জলে ফেলে দেয়। সেই আগাছা, গাছের আড়ালে মাছ ঝাঁক বাধে। ১৫, ২০ দিন পর খাদ্য দেয়। জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়। যতদিন কাঁটাজাল দেওয়া থাকবে মালোরা চুল কাটতে পারবে না। রান্নায় মাংস পেঁয়াজ চলবে না। মাথায় তেল দেওয়া যাবে না। গায়ে সাবান মাখা যাবে না। দিনের বেলা বাড়ি আসা যাবে। রাতের বেলা বাড়ি আসা যাবে না।

মাছ ধরতে যাওয়ার সময় ভরা কলসী যেন চোখে পড়ে। কালো গরু বা ফাকা কলসী যেন চোখে না পড়ে।

ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ থানার দক্ষিণ বালুপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মালো কানাই হালদারের কাছ থেকে জানতে পারি যে জ্যৈষ্ঠ মাস বা আষাঢ় মাসে দশহরা গঙ্গাপুজো করা হয়ে থাকে। কাঁটাজাল পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসে পাতা

হয়। কাঁটাজাল মারলে গঙ্গাপূজা করা হয়। মূর্তি তুলে পুজো করা হয়। পুজোর সময় ২ দিন নিরামিষ খেতে হয়। কচ্ছপ আর কুমীর তৈরি করা হয়। কাঁটা জাল পাতার সময় থেকে তোলার আগে পর্যন্ত আয়নায় মুখ দেখা যায় না। চুল দাঁড়ি কাটা যায় না। কাঁটা জালে মাছ মেরে এনে স্ত্রীরা শিব, ব্রহ্মা, মহেশ্বরের পূজা করেন।

গলুইকে মালোরা রাধামাধব বলে। নৌকোকে রাধা মাধবের তরী বলা হয়। গলুইয়ে পা দিয়ে কখনও মালোরা নৌকায় ওঠে না। নৌকাকে আগে ধুয়ে নিতে হয়। গলুইকে পুজো করা হয়। ব্রাহ্মণ ডেকে ফলমূল, মিষ্টি দেওয়া হয়। ধূপকাঠি দেওয়া হয়।

ছ। মালোদের ব্যবহৃত মন্ত্র

মালোদের কাছে মাছ ধরা এক রকম পূজা। এই পূজার দেবী যাতে রুষ্ট না হয়, তার জন্য তাকে নানা ভাবে যেমন পূজা করে তেমনি নানা ভাবে স্মরণ করে। এই স্মরণ করা হয় মন্ত্রের মাধ্যমে। তাদের মন্ত্রও শুনতে একেবারে গানের মতোই। নিম্নে তেমনই কিছু-

ক) মাছ ধরতে যাবে বা যাচ্ছে, কিংবা জাল ফেলবার আগে যা বলেঃ

"গুরু সত্য, গুরুসত্য, গুরু সত্য
বাবা মাকাল, মাছেদের রক্ষা করতে-
তুমি তাদের নাও রসাতলে
রক্ষা কর বাঁচাও আমাদেরে
জালে তাদের ধরে-
গুরু সত্য, গুরু সত্য, গুরু সত্য।"[৪৪]

সমুদ্রে জাল ফেলেছে, জালটা ঘন্টা দেড়, দুই জলে ভেসে থাকবে। তারপর জাল তুলবে। পুরো প্রক্রিয়ার নাম 'খেউ'। জাল ফেলা শেষ হলে নৌকার প্রধান মাঝি মুখে জল নিয়ে সেই জল জালে ছিটায় আর বলে-

'জয় মা মনসা, জয় মা বিষহরি/তোমার ও চরণে নমস্কার করি/ফেললাম জালই।'[৪৫]

গাজন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কিছু বন্ধন মন্ত্র

“জল বন্দ, স্থল বন্দন, দেব দেবী বন্দন
ঘাট, বাট, মাঠ বন্দন, ডাইনে সাগর বন্দন,
বামে বীর হনুমান, সম্মুখে গঙ্গা আছে
তার চরণে প্রণাম।।”[৪৬]

গৃহরক্ষা করার মন্ত্র

নিশিকুটুম্বরা যাতে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য মালো গৃহস্থরা যে সব মন্ত্র বলে বাড়ি বা গৃহ বন্ধন করে তেমন কিছুঃ

‘ঘর থিকা বাহিরে পা, বসুমতী আমার মা
সরবের মাথায় দিয়া পা, যথা ইচ্ছা তথায় যা
আশ বন্ধ করি পাশ বন্ধ করি, কার আজ্ঞায়?
বড় বীর নরসিংহের আজ্ঞায়। শীঘ্র লাগ
শীঘ্র লাগ, এইবার ঘর বন্ধ : একেবারে ঘর বন্ধ ।।’[৪৭]

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা মন্ত্রের উপর অগাধ আস্থা রাখে। জলজীবনে প্রকৃতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্যই অধিক। তাই তারা পাঁচ পীরের ধ্বনি দিয়ে নৌকা জলে ভাসায়। তিলকের মতো মানুষ কৃষ্ণমন্ত্র বা বীজমন্ত্রে দেহ শুদ্ধ রাখে। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে চালান মন্ত্রে, ঝাঁপান মন্ত্রে।

ঝ। হেঁয়ালি ছড়া ধাঁধা প্রবাদ

মালোদের মধ্যে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ ছড়া, হেঁয়ালি ধাঁধা প্রবাদ প্রচলিত। এগুলো যখন বলে তখন তার আলাদা এক সুর থাকে। কিছু কিছু ছড়াকে, কখনও কখনও গান হিসেবেও ব্যবহার করে থাকে আবার কিছু গান আছে, তাকে তারা গান বলে না, বলে ছড়া।

ছড়া

'তুমার বাড়ি আমার বাড়ি, একই আঙনা।
নিশি হইলে হও সোনার বন্ধু, সুয্যি আইলে হও ভাগিনা।।'[৪৮]

-নারী বিষয়ক (মন ভুলানি)

'কাঁচা গুয়া কুশিপান, আগোৎ খাইলেন ক্যান।
আমারে যদি বালা না বাসেন বন্ধু হইলেন ক্যান।।'[৪৯]

-প্রণয়/প্রেম বিষয়ক,

'ফরিদপুরের বাজারে ইলিশ নাই, মাদারিপুর থিকা আনছে তাই।
আইতে আইতে ইলিশ গেছে ছুডা (ছোট) হইয়া, গাইল দিও না জামাইবাবুরে কিছু কইয়া।।'[৫০]

-শালীদের মশকরা

অনেক সময় ঠিক সময়ে সাধ অন্ন বা সাধ ভক্ষণ দিতে না পারলে পরে যখন দেয় তার নিমন্ত্রণের ছড়া-

'মা তুমি মনে কিছু করো না
ভাদ্র গেলো আশ্বিন গেলো
তোমার ধানের সাধ অন্ন হোল না
আজ মা সাধ তন্ন দেবো, গ্রহণে না করো না'[৫১]

তিতাস নদীর তীরে বাস করে যে মানুষেরা, তাদের সাংস্কৃতিক জীবন আলেখ্য রচনা করতে গিয়ে তাদের মুখে ছড়া প্রয়োগ করতে লেখক কোন ভুল করেননি। উপন্যাসের নারী চরিত্র অনন্তবালার বিয়েতে মত নেই। সে মনে মনে অনন্তকে ভালোবাসে। অনন্তর জন্যই সে প্রতীক্ষা করে চলেছে। কিন্তু গ্রামের লোকেদের চোখে অনন্তবালার বয়স বেড়ে গেছে।

আবার কেউ কেউ বলে- 'অনন্তবালা ঘরের পালা
তারে নিয়া বিষম জ্বালা।'[৫২]

হেঁয়ালি/ধাঁধা

এর মধ্যে থাকে প্রশ্ন। তার উত্তর দিতে হয়, সাধারণত এ এক ধরনের মজা।

‘ট্যাংরা বাটা, ট্যাংরা বাটা, তোর আছে তিন কাঁটা
আমার যদি থাকতো তিন কাঁটা, জলে নামতো কোনবেটা?’[৫৩]
উত্তর- সিং মাছ (বরিশাল)

‘হাত নাই পাও নাই প্যাট জিল জিল করে
মুখ নাই, মাথা নাই, আস্ত মানুষ ধরে।’[৫৪]
উত্তর- পলো, (মাছ ধরার খাচা) (বীরভূম)

‘দুই হাত দিয়ে দিলাম ভরে
এক হাত দিয়ে নিলাম বেছে।’[৫৫]
উত্তর- মাছধরা, নদীয়া।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে উদয়তারা একটি বিশেষ চরিত্র যে ধাঁধা বলতে ওস্তাদ। সে ধাঁধা বলছে যে সুফুল পড়ে আছে তোলার লোক নেই তেমনি বিছানা পড়ে আছে শোবার লোক নেই। ধাঁধার মধ্যে যে উত্তরটি লুকানো থাকে, এখানে তার উত্তরটি হল ফুলগুলো হল আকাশের তারা, আর সুশয্যা হল নদীর জল। এমনই আর একটি ধাঁধা হল- চাকচাক অর্থাৎ গোলাকার আদা, যার বর্ণ সাদা দুধের মত, সেটি কি বস্তু? ভাঙ্গাতে না পারলে জন্মই বৃথা। এর উত্তর হল টাকা।

প্রবাদ

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ কথাই ‘প্রবাদ’। যা ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রবাহিত ও চিরন্তন সত্য।

ক) যেখানে দেখবে ভাঙ্গা বেড়া, সেটাই বুঝবে মালো পাড়া ।।
খ) জোলামরে তাঁতে জাল্লামরে জলে আর জালে।
গ) মাছের মধ্যে ইলিশ বাতির মধ্যে ফিলিপস।
ঘ) মায়ে জানে পুতের মায়া, জীয়ে যত কাল।
   মাছ চেনে গভীর জল। পাখি চেনে ডাল।।
ঙ) পুস্ত পুস্ত করিস? খায়্যে দেখ ইলিশ!

চ) পায় না পচা পুঁটি
খেতে চায় দুধে রুটি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ পাত্র-পাত্রীদের মুখে চল্লিশটিরও বেশি প্রবাদ প্রবচনকে স্থান দিয়েছেন। তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

উপন্যাসে রয়েছে গ্রাম্যসভা বসেছে। কিন্তু গ্রাম্যলোকের সভাকে বলা হয়েছে দশজনের সভা। দশজন কোন বিষয়ে যা মতামত দেন সেই রায় ঈশ্বরের রায়ের সমান। তাই উপন্যাসে বলা হয়েছে দশজন পরমেশ্বর। সুশীল কুমার দে'র বাংলা প্রবাদ গ্রন্থে তুলনীয় দুটি প্রবাদ হল, দশের কথা যেখানে, মরণ ভাল সেখানে এবং দশজন রাজি যেখানে খোদা রাজি সেখানে। দুর্ভাগা মানুষের দুঃখের সময় অতিক্রান্ত হতে চায় না। সুবলের বউ ঝগড়া করতে গিয়ে তার দুঃখময় পরিস্থিতিকে ধরতে চেয়েছে একটি প্রবাদের মাধ্যমে। প্রবাদটি হল- দুঃখের গাঙ কত গহীন। এর সঙ্গে একটি তুলনীয় প্রবাদ হল- দুঃখের রাত পোহায় না।

পরিশেষে বলা যেতে পারে মালোদের নানারকম আচার উৎসব এবং বাঙালিদের পালিত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। মালোদের বিভিন্ন পুজো, লোকদেবতা, লোকশিল্প, লোকউৎসব, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, ছড়া, ধাঁধা, ব্রতকথা, প্রবাদ, ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে মালোদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।

তথ্যসূত্র

১। বর্মণ, দিগেন : *মল্ল-গীতিমাল্য,* পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩৮৬, যোধন প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ২১

২। তদেব : পৃ. ৩৩

৩। তদেব : পৃ. ৪৫

৪। তদেব : পৃ. ৪৫-৪৬

৫। তদেব : পৃ. ৪৯

৬। তদেব : পৃ. ৫০

৭। তদেব : পৃ. ১০৩

৮। তদেব : পৃ. ১০৩

৯। ঘোষ, সমিত : *দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি,* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস, কলকাতা ৭০০০০৯, অমর ভারতী, দ্বিতীয় সংস্করণ মে, ২০২২, পৃ. ৩৯৩

১০। বর্মণ, দিগেন : পৃ. ৯২

১১। তদেব : পৃ. ৯২

১২। ঘোষ, সমিত : *দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি,* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস, কলকাতা ৭০০০০৯, অমর ভারতী, দ্বিতীয় সংস্করণ মে, ২০২২, পৃ. ৩৯৫

১৩। মল্লববর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭০০০৭৩, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম দে’জ সংস্করণ জুন ২০১৩, পৃ. ৪৮

১৪। তদেব : পৃ. ৪৮

১৫। তদেব : পৃ. ৪২

১৬। তদেব : পৃ. ৯১

১৭। বর্মণ, দিগেন : *মীনমঙ্গল,* কলকাতা ৯, প্রান্তর, প্রথম প্রকাশ মে ২০১০, পৃ. ১৭১

১৮। জলদাস, হরিশংকর : *জলপুত্র,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ২০০৮ পৃ. ২০

১৯। সোম, সুস্মিতা : *মালদহ ভাষা-শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি,* কলকাতা-৭০০০০৬, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, পৃ. ৩৬১

২০। তদেব : পৃ. ৩৬৩

২১। তদেব : পৃ. ৩৭৪

২২। তদেব : পৃ. ৪৫১

২৩। তদেব : পৃ. ৪৫১

২৪। বর্মণ, দিগেন : *মল্ল-গীতিমাল্য,* পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩৮৬, যোধন প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৪৬

২৫। তদেব : পৃ. ৫১

২৬। তদেব : পৃ. ৬৯

২৭। তদেব : পৃ. ৭৪

২৮। তদেব : পৃ. ৭৬

২৯। আহমদ, ওয়াকিল : *জারি গান,* ঢাকা ১১০০, বইপত্র, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৩৪

৩০। সম্রাট, আলী মোহাম্মদ : *প্রাণের সুর ভাওয়াইয়া,* ঢাকা ১১০০, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৫৩-৫৪

৩১। দে, সূর্য্যেন্দু : *মাছ জল মৎস্যজীবী ১ম খণ্ড,* খাঁটুরা-৭৪৩২৭৩, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, পৃ. ১৯৪

৩২। বর্মণ, দিগেন : *মল্ল-গীতিমাল্য,* পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩৮৬, যোধন প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৪৬

৩৩। তদেব : পৃ. ১৪৬-১৪৭

৩৪। হালদার, ফণীন্দ্রনাথ : *ক্ষেত্রসমীক্ষা,* খিদিরপুর হালদারপাড়া, বালুরঘাট, সময়কাল ১৯শে জুন,২০২২

৩৫। হালদার, ফণীন্দ্রনাথ : *ক্ষেত্রসমীক্ষা,* খিদিরপুর হালদারপাড়া, বালুরঘাট, সময়কাল ১৯শে জুন,২০২২

৩৬। বর্মণ, দিগেন : *মল্ল-গীতিমাল্য,* পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩৮৬, যোধন প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৩৯

৩৭। তদেব : পৃ. ১৪৩

৩৮। তদেব : পৃ. ১৭৫

৩৯। চৌধুরী, দুলাল সেনগুপ্ত, পল্লব : *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* কলকাতা ৯, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩, পৃ. ৫০১

৪০। মল্লববর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ জুন ২০১৩, পৃ. ৩৯

৪১। তদেব : পৃ. ১০৮

৪২। চট্টোপাধ্যায়, সাধন : *উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড),* কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১ লা বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ৪৫

৪৩। কর, সন্তোষ : *মুক্তামাছ,* পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪০১, দ্বিতীয় সংস্করণ ২১ এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১৬৭

৪৪। বর্মণ, দিগেন : *মল্ল-গীতিমাল্য,* পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩৮৬,যোধন প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৭৯-৮০

৪৫। তদেব : পৃ. ৮০

৪৬। তদেব : পৃ. ৮০-৮১

৪৭। তদেব : পৃ. ৮১

৪৮। তদেব : পৃ. ৮২

৪৯। তদেব : পৃ. ৮২

৫০। তদেব : পৃ. ৮২

৫১। তদেব : পৃ .৮৩

৫২। মল্লববর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭০০০৭৩ দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ জুন ২০১৩, পৃ. ২৪৪

৪৮। তদেব : পৃ. ৮২

৪৯। তদেব : পৃ. ৮২

৫০। তদেব : পৃ. ৮২

৫১। তদেব : পৃ. ৮৩

৫২। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭০০০৭৩ দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ জুন ২০১৩, পৃ. ২৪৪

৫৩। বর্মণ, দিগেন : *মল্ল-গীতিমাল্য,* পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩৮৬, যোধন প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ.৮৩

৫৪। তদেব : পৃ. ৮৩

৫৫। বর্মণ, দিগেন : *মীনমঙ্গল,* কলকাতা ৯, প্রান্তর, প্রথম প্রকাশ মে ২০১০, পৃ. ১৮৫

পঞ্চম অধ্যায়

মালো জাতি ও বিশ্বায়ন

পঞ্চম অধ্যায়

মালো জাতি ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন বিংশ শতকের শেষভাগে উদ্ভূত এমন একটি আন্তর্জাতিক অবস্থা যাতে পৃথিবীর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তঃদেশীয় পরিসরে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। এর ফলে সারা বিশ্ব একটি পরিব্যাপ্ত সমাজে পরিণত হয়েছে এবং অভিন্ন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশ যুগপৎ অংশগ্রহণ করছে। এটি পারস্পরিক ক্রিয়া এবং আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন জাতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। এই পদ্ধতির চালিকা শক্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, আর এর প্রধান সহায়ক শক্তি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। পরিবেশ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পদ্ধতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রগতি এবং মানবিক ও সামাজিক অগ্রগতি সকল কিছুর উপরই এর সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। জোসেফ স্টিগলিৎস বলেছেন যে বিশ্বায়ন হল প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় একাত্মতা বা একীভবন যা ঘটেছে তা প্রধানত দুটি কারণে-ক) পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ব্যয়হ্রাস, এবং খ) এ যাবৎ প্রচলিত এক দেশ থেকে আর এক দেশে দ্রব্য, সেবা, পুঁজি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, মনুষ্যসম্পদ প্রভৃতি আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাধানিষেধের অন্তর্ধান। পিটার মার্কাস-এর মতে বিশ্বায়ন নতুন কোনো বিষয় নয়, এটা এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদ, সারা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিস্তার। দীপক নায়ার-এর মতে, বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং বিশ্ব অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে গভীর অর্থনৈতিক সমন্বয় জড়িত থাকে। বিশ্বায়ন শব্দটি প্রথম বিশ শতকের প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিল, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সময় এর বর্তমান অর্থ বিকশিত হয়েছিল এবং ১৯৯০ এর দশকে এর অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক সংযোগ বর্ণনা করার জন্য জনপ্রিয় ব্যবহারে আসে।

অধ্যাপক জেমস রসনু বিশ্বায়নের কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বায়নের কতকগুলো ঐক্যসাধনকারী সূত্র আছে যেমন- মুক্ত বাজার, তথ্য-প্রযুক্তি ও মূলধনের বিশ্বব্যাপী সচলতা, জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকতাকরণ, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রসার। আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্বায়ন কী, বিশ্বায়নের উপাদান, বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হবে। এর পাশাপাশি বিশ্বায়নের প্রভাবে মাছ চাষে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, উন্নত যন্ত্রপাতি, ট্রলার ব্যবহারে মালোদের জীবনযাত্রার বদল, তাদের

বর্তমান পরিস্থিতি, দেশীয় মৎস্য সম্পদ রক্ষা, হ্যাচারিতে কৃত্রিম উপায়ে মাছ চাষ, বিভিন্ন ধরনের আইন ইত্যাদি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মাছ ধরার পেশার অবলুপ্তি প্রভৃতি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

বিশ্বায়নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়, যেমন-

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রভাবে পৃথিবীর বহু দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রসারিত হয়েছে।

খ) বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বেড়েছে।

গ) মূলধনের চলাচল বেড়েছে।

ঘ) মুদ্রা-বিনিময় হারের ক্ষেত্রে নমনীয়তা এসেছে।

ঙ) বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারের সচলতা বেড়েছে।

চ) বেসরকারী উদ্যোগ ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের কাজকর্ম ও প্রভাব বেড়েছে।

ছ) জ্ঞানভিত্তিক সেবামূলক কাজ বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে।

জ) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থার কাজকর্ম প্রসারিত হয়েছে।

ঝ) বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক রেজিম বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে।

ঞ) বিশ্বের বহু দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ট) বিশ্বায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য বাড়িয়েছে। প্রত্যেক দেশেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য বাড়ছে।

ঠ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা পরিবেশ দূষণ সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে।

রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কমেছে।

খ) বিভিন্ন বিশ্বজনীন সংগঠন, আঞ্চলিক সংগঠন, আন্তঃসরকারি সংগঠন, বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত সামাজিক আন্দোলন ও নাগরিক সমাজ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারাকে প্রভাবিত করছে।

গ) বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি ও পররাষ্ট্র নীতির ওপর বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রভাব বাড়ছে।

ঘ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, আঞ্চলিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক রেজিম ও আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি ও কার্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

ঙ) বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান অনেক বেড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে।

চ) বহু রাষ্ট্র ও এলাকায় বিশ্বায়নের কুফল ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন, উপজাতীয় আন্দোলন, এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে।

ছ) বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি, সহাবস্থানের নীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জ) যুদ্ধের বদলে শান্তিরক্ষার জন্য সর্বস্তরে আগ্রহ বেড়েছে।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) তথ্য ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিশ্বময় এক ধরনের সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছে।

খ) বিশ্বায়ন বহুমুখী সংস্কৃতির প্রসারে সাহায্য করেছে।

গ) সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে।

ঘ) নতুন টেলি-ইলেকট্রিক সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে।

ঙ) তথ্য-চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানের মুক্ত বাজার প্রসারিত হয়েছে।

চ) যুক্তিবাদী জ্ঞান ও গবেষণার বিকাশ হচ্ছে।

ছ) শিক্ষা, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা পরিচালন সংক্রান্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন এসেছে।

জ) বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলছে।

বৃহত্তর বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশের বাজার ও উৎপাদনে আরও সংযুক্তি ঘটেছে। বিশ্বায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেশসমূহের মধ্যে দ্রুত সংযুক্তি বা আন্তঃ যোগাযোগ ঘটে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির চলাচল হচ্ছে। বিগত কয়েক দশকের তুলনায় বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলই একে অপরের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। পণ্যদ্রব্য, সেবা, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত

আদান প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্তিকরণের আরও একটি উপায় রয়েছে। এটা হল, বিভিন্ন দেশে মানুষের চলাচল। মানুষ সাধারণত ভাল আয়, ভাল একটি চাকরি বা উচ্চ শিক্ষার খোঁজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষের এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা খুব একটা বাড়ছিল না।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি। বিগত ৫০ বছরে পরিবহণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু উন্নতি দেখা গেছে। এর ফলে অনেক কম খরচে দূর দূরান্তে পণ্য সামগ্রী দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এর থেকেও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ। সাম্প্রতিককালে টেলি যোগাযোগ, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। দূর সঞ্চার সুবিধাগুলো (টেলিগ্রাফ, টেলফোন, মোবাইল ফোন এবং ফ্যাক্স) পৃথিবীর এক প্রান্তের সাথে অপর প্রান্তের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে, তৎক্ষণাৎ তথ্য উপলব্ধি করতে এবং প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। এই সুবিধাগুলো স্যাটেলাইট যোগাযোগ যন্ত্রের মাধ্যমে উপলব্ধ হয়। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে কম্পিউটারের অর্ন্তভুক্তি ঘটেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের সর্বত্র যৎসামান্য খরচে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রনিক মেইল পাঠাতে পারি এবং কথা চালাচালি করতে পারি।

বিগত কুড়ি বছরে ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। মানুষের জীবনেও এর অনেক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বায়ন এবং উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণে, স্থানীয় ও বিদেশি উভয় অংশের উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে ভোক্তারা লাভবান হয়েছে। বিশেষ করে শহুরে অঞ্চলের অবস্থাপন্ন ভোক্তারা লাভবান হয়েছে। এই অংশের ভোক্তাদের কাছে এখন আগের থেকে অনেক বেশি বিকল্প পছন্দের সুযোগ রয়েছে এবং তারা এখন অনেক কম দামে অধিক গুণমান সম্পন্ন বিভিন্ন দ্রব্য কিনতে পারছে। ফলস্বরূপ বর্তমানে এই সমস্ত ভোক্তাদের জীবনযাত্রার মান আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে। উৎপাদক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিশ্বায়নের প্রভাব এরূপ হয়নি।

প্রথম, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিগত ২০ বছরে ভারতে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে, যার অর্থ হল, ভারতে বিনিয়োগ করা তাদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্পে, যেমন- মোবাইল ফোন, অটোমোবাইলস, ইলেকট্রনিক্স, নরম পানীয়, ফাস্ট ফুড এবং শহরাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং এর মতো পরিষেবাতে। এই দ্রব্যগুলোর অধিকাংশ ক্রেতাই বিত্তবান শ্রেণির লোক। এই সকল শিল্প সংস্থায় ও সেবাগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও এই শিল্পগুলোতে কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহকারী স্থানীয় কোম্পানিগুলো ফুলেফেঁপে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের দৌলতে যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মহল তৈরি হয় তার জন্য অনেক প্রথম সারির ভারতীয় কোম্পানি লাভবান হয়। তারা নতুন প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিসাধনে লগ্নি করে উৎপন্নের গুণমান বৃদ্ধি করে। কিছু ভারতীয় কোম্পানি বিদেশি কোম্পানির সাথে সফল গাঁটছড়া বেঁধে লাভবান হয়েছে।

এছাড়াও বিশ্বায়ন কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানিকে বহুজাতিক কোম্পানি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। টাটা মোটরস, ইনফোসিস, রেনেবেক্সি, এশিয়ান পেইন্টস, সুন্দরম ফাসটিনার্স হল এমন কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানি যারা সারা পৃথিবীতে তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্বায়ন সেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলোর, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির জন্য অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। লণ্ডনে অবস্থিত কোম্পানির জন্য ভারতীয় কোম্পানির ম্যাগাজিনের প্রকাশনা এবং কলসেন্টারগুলো হল এই ধরনের সুযোগের উদাহরণ। এছাড়াও আরও অগণিত সেবা, যেমন তথ্য নথিভুক্ত করা, হিসাব-নিকাশ, প্রশাসনিক কাজ, প্রকৌশলীর কাজকর্ম ভারতের ন্যায় বিভিন্ন দেশে সস্তায় করানো যায় এবং এগুলো উন্নত দেশগুলোতে রপ্তানি করা যায়।

আমাদের দেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বায়নের পথ ধরার কথা প্রথম ঘোষণা করা হয় রাজীব গান্ধির আমলে, ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে। সেই প্রথম আমরা উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণ এইসব ধারণার কথা শুনেছিলাম। বিশ্বায়নের মানে হল উদার শিল্পনীতি আর মুক্ত বাজারের পথে চলা, এ পথেই উন্নত দেশগুলো চলে আরো আরো উন্নত হচ্ছে। বিশ্ববাজারে আমাদের অংশগ্রহণের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, কারণ আমাদের দেশে একটা বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণি আছে, যাদের মন ও পকেট জয় করার জন্য বিশ্ব বাজার খুব আগ্রহী। নানারকম ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে দেশে বিনিয়োগ করার, পুঁজিতে আরো বেশি বেশি অংশ

নেওয়ার দরজা খুলে গেল, হু হু করে বিদেশি গাড়ি, বিদেশি জিনিসে বাজার ছেয়ে গেল। আজ দেখা যাচ্ছে কলে, কারখানায়, চাষের ক্ষেতে, সর্বত্র দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে।

১৯৮০-র দশকে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলো বিশ্ব জুড়ে সংগঠন গড়ে তুলে বাজারকে ছড়িয়ে দিয়ে লাভ বাড়ানোর জন্য প্রায় মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফল হিসেবে ধীরে ধীরে আমরা অনেকগুলো নতুন নতুন প্রক্রিয়া, ঝোঁক এবং ফলাফল দেখতে পাই। ধনতন্ত্রের আসল লক্ষ্য ছিল নানান দেশের নানান অর্থনীতিকে একটা আন্তর্জাতিক খোলা বাজারে এনে ফেলা।

- বিভিন্ন দেশে স্থানীয় প্রয়োজনের জন্য জিনিস বা পরিষেবা উৎপাদন করার চেয়ে বিশ্ব বাজারের জন্য জিনিস বা পরিষেবা উৎপাদন করাটা বেশি লোভনীয়, সে কথা সে দেশের সরকার এবং উদ্যোগপতিদের ছলে, কৌশলে এবং বলের মাধ্যমে বোঝানো।

- কারিগরি কুশলতা, পুঁজি, কিছুটা বাজারের খোঁজ ধার দিয়ে দেশগুলোকে এই বিশ্ববাণিজ্যে, দ্বিতীয় শ্রেণির এবং সস্তা জোগানদার হিসেবে হলেও অংশগ্রহণ করার জন্য তৈরি করা (বলা বাহুল্য, এই দেশগুলোর স্বার্থে নয়)।

- বিভিন্ন দেশের নানান ইতিহাস থেকে উঠে আসা রাষ্ট্রগুলো অনেক সময় নিজেদের অর্থনীতি নিয়ে সংরক্ষণশীল ছিল। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের প্রভাবের ফলে অনেক দেশেই শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের আরোপিত কড়াকড়ি ছিল। দেশের অর্থনীতিতে যাতে বিদেশি পুঁজি বা বাজার বেশি প্রভাব ফেলতে না পারে সেইজন্য কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছিল। ধনতন্ত্রের কাজ হল এক এবং কবচগুলোকে খুলে ফেলে সেই দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব বাজারের টানাপোড়েনের কাছে পুরোপুরি খুলে দেওয়া।

  এই কাজগুলো করার জন্য কিছু সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া হল।

সরকারগুলোকে চাপ দিয়ে একটা দেশের বাজারে বিশ্বপুঁজি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অবাধ যাতায়াত সুনিশ্চিত করা হল। এর ফলে আমরা দেখছি আমাদের দেশের সংস্থা মালিকানায় বিদেশি পুঁজির অংশগ্রহণের ওপর যে বাধা নিষেধ ছিল, তা অনেক কমে গেছে, আমাদের বাজারকে বিদেশি জিনিস বিক্রির জন্য অনেক বেশি খুলে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের কিছু সংস্থার শেয়ার আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেটে নথিভুক্ত হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ম কানুন আলাপ আলোচনাকে সংগঠিত করে, সালে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস্ অ্যাণ্ড ট্রেড চালু করা হয়েছিল। তারই উত্তরসূরি হিসেবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থাপন করা হল।

বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপক উপস্থিতির ফলে পছন্দ মতো ক্রয়ের ব্যাপারটা তুলনামূলকভাবে প্রসারিত হয়েছে। এটি ইদানিংকালের বাজার চিত্র। দুই দশক আগেও ভারতের বাজারে দ্রব্য সমূহের এত বিকল্প পাওয়া যেত না।

ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের গোড়ার কথাটাই হল ফ্লেক্সিবল অ্যাকিউমুলেশন বা যেখান থেকে যখন সম্ভব সেখান থেকে তখন ধন আহরণ। এই আদর্শ অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থাকেও যেখানে উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি সুবিধা সেখানেই উৎপাদন, এই নীতি অনুযায়ী সাজানো হচ্ছে। এই সুবিধের হিসেব অনেক রকমের হতে পারে- কাঁচামালের সুবিধে, বিভিন্ন সরকারি কর ছাড়ের সুবিধে, সস্তায় ঠিকে শ্রমিককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার সুবিধে। আবার অনেক উন্নত দেশে পরিবেশকে বাঁচানোর নিয়মকানুন মানতে হলে উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি হয়ে যায়, গরিব দেশে এইসব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লাভজনক উৎপাদন করা যায়। এই কারণে আজকে একটা গাড়ির, এমনকী একটা জুতোরও বিভিন্ন অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরি হতে পারে, কারণ এতেই সেই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের লাভ বাড়বে, এবং তাদের লাভ বাড়লে, তারা খুশি হলে, পেশাদার পরিচালকরা লক্ষ লক্ষ ডলার মাইনে পাবেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোন দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়া মূলত সেই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কেবলমাত্র কাঁচামাল, খাদ্যদ্রব্য ও চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যই এক দেশ থেকে অন্য দেশে আদান প্রদান হত। ভারতের মত উপনিবেশ হতে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হত এবং চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানি হত। একমাত্র বাণিজ্যই হল দূরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী মাধ্যম। এটা তখনকার ঘটনা যখন বহুজাতিক সংস্থার উদ্ভব হয়নি। বহুজাতিক সংস্থা হল সেই সংস্থা যা একাধিক দেশে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালায় বা মালিকানা স্থাপন করে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো, দেশের সেই সব অঞ্চলে কারখানা, বহু শ্রমিক বিদ্রোহ, দাস বিদ্রোহের কথা পড়ি। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ধনতান্ত্রিক বা দফতর স্থাপন করে যেখানে সস্তায় শ্রমিক ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সহজে পাওয়া

যায়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে ও বেশি পরিমাণে মুনাফা অর্জন করতে বহুজাতিক সংস্থাগুলো এমনটি করে।

মানুষের ইতিহাসে আমরা উৎপাদন একটা সংগঠিত রূপ নিল, শ্রমিকরাও সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে অনেক দূর সক্ষম হলেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অন্তত সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে মালিকরা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া কিছুদূর মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮০-র দশক থেকে ইংল্যাণ্ডে থ্যাচার জমানা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেগান জমানায় শ্রমিকদের অধিকারের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ নেমে এল। আজকে বিশ্ব জুড়ে ধনতন্ত্র শ্রমিকদের অধিকারগুলোকে ক্রমাগত লঙ্ঘন করে তাদের আরো আরো বেশি শোষণ করার চেষ্টা করে চলেছে। উৎপাদন ব্যবস্থাগুলোকে দেশ থেকে সরিয়ে গরিব দেশে নিয়ে আসছে। কারণ উন্নত দেশে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেটাতে হলে খরচ অনেক বেশি হয়। গরিব দেশেও বহুজাতিক সংস্থাগুলো নিজেরা কারখানা না খুলে ঠিকাদারদের হাতে দিয়ে দিচ্ছে, ফলে কোন দায়িত্বই তাদের নিজেদের নিতে হচ্ছে না, ঠিকাদার ঠিকা শ্রমিকদের ঘাড় ভেঙে কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

বিশ্বায়ন আর কর্মসংস্থানের আবার অন্য কয়েক রকম চেহারাও আমরা দেখতে পাই। গত কয়েক বছরে সাইবার-স্পেস বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পন্থায় যোগাযোগ বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে কিছু চাকরি তৈরি হচ্ছে। এই সাইবার-স্পেসে ঢুকতে যেহেতু কোন বিশেষ দেশে বাস করার দরকার নেই, কম্পিউটার আর নেটে ঢোকার সুযোগ থাকলে যে কোন জায়গায় বসে কাজ করা সম্ভব, সেইজন্য আমাদের মতো দেশে কিছু কাজ তৈরি হচ্ছে। যেমন কলকাতায় বসে অনেকেই এখন আমেরিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য প্রতিদিন সংকলন করার কাজ বা মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন করে থাকেন। ওখানে যখন দিন শেষ হয় এখানে তখন দিন শুরু হয়, কাজেই ওদের রাতের মধ্যে এখানে কাজ হয়ে থাকে, ওরা আবার সকালেই পেয়ে যান। অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভারত অনেক সুবিধেজনক জায়গায়, কারণ ব্রিটিশ উপনবেশ ছিলাম বলে আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার চল থেকেই গেছে। এই কাজের সুযোগ ভালো হলেও এর বিপদ সম্পর্কে জেনে রাখা দরকার। প্রথম কথা, এই কাজটা সম্পূর্ণভাবে শ্রমের সস্তা দর নির্ভর, যে দেশে সস্তায় শ্রম পাওয়া যাবে, সে দেশে কাজ চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই কাজে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আমাদের দেশের মোট কাজের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, কাজেই এইভাবে বিশ্বায়ন আমাদের বেকার সমস্যা দূর করবে ভাবা মূর্খামি ছাড়া আর কিছু

নয়। তৃতীয়ত, এ কাজের জন্য কম্পিউটার জানতে হয় এবং ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, সেই শিক্ষা আমাদের দেশে দুর্লভ ও দামি, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

একদিকে সমাজতাত্ত্বিক রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা এবং অন্যদিকে একটু সুস্থতার খোঁজে জীবনের পথে সব আদর্শের সংজ্ঞা অতিক্রম করে এক সমকালীন সংজ্ঞাশূন্যতার পথ বেছে নেওয়ার এই আপাত প্রবণতার স্রোতকে মূলস্রোত বলে প্রতিষ্ঠা দানের এই নয়া প্রক্রিয়ায় বিশ্বে যে নয়া মেরুকরণ ঘটে চলেছে তাতে কিন্তু বিপরীত মেরুর কোনও স্থান নেই, আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বে অভূতপূর্ব উত্তর আধুনিক রাজতন্ত্রের নতুন ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। যেখানে পৃথিবীজোড়া রাজ্যপাটে পণ্যীভবন ঘটছে, আঞ্চলিকতা আর আন্তর্জাতিকের নবভ্রাতৃত্ব, জাতিরাষ্ট্রের বিলোপ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্ব উত্তীর্ণপ্রায়, সেখানে তথাকথিত ধনতন্ত্র আপন অস্তিত্বই হারাতে বসেছে, অনেকাংশে হারিয়েও ফেলছে। আবার আপনসৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের বর্তমান বিস্ফোরণের মুখে পড়ে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। তবু ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটাতে ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা এই ব্যবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এখন গোটা বিশ্বে এক-মেরুকরণ কায়েম করে এই তত্ত্বকেই ঝেড়ে ফেলেছেন বা ফেলতে চাইছেন। গোটা বিশ্বে যুদ্ধের অনিবার্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যে এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দূরে থাক, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিপন্নতা, মানবতার আজ আর কোনও যেন মূল্যই থাকছে না। সত্যিই এ এক সভ্যতার নতুন এবং চূড়ান্ত সংকটের অধ্যায় যা ইতিহাসের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মানবতা এবং মানব অস্তিত্বেরই হঠকারী সমাপ্তি ঘটাবে কি না অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হবে। যেমন ধরা যাক শুধু তেলের দখলদারির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এতদিন বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজের স্বার্থসিদ্ধি সত্ত্বেও এখন সরাসরি খনি দখলের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। আর এই পরিস্থিতির অনিবার্যতা এতটাই যে তড়িঘড়ি যুদ্ধের দ্বারা একে সমাপ্ত করতে তাদের দানবীয় উৎসাহ আরও একটি সংকটের দিক উন্মোচন করল বলে আশংকা করা যায়, যার ফল হয়ত খুব শীঘ্রই পৃথিবীবাসীকে ভুগতে হবে।

পুঁজির স্বল্পমেয়াদী এবং চটজলদি বিনিয়োগ বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এক ভয়াবহ অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেখানে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে শ্রমের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। দেশীয় ক্ষেত্রে স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত কমছে যার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে তৃতীয়

বিশ্বজুড়েই। এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক অসাম্য, তৎসংশ্লিষ্ট হিংসা এবং যাবতীয় অমানবিক ব্যাধিগুলি ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলিতে এক অভূতপূর্ব সংকট, ভাঙনের সৃষ্টি করছে। এই ভাঙনের সুযোগ নিয়েই তৃতীয় বিশ্বে প্রবেশ করছে মার্কিন সংস্কৃতি তথা খোলাবাজারি সংস্কৃতি। সমাজতত্ত্ববিদ নোয়াম চমস্কি একে মার্কিনি মূল্যবোধের বিপণন বলে অভিহিত করেছেন। এই মূল্যবোধের বিপণনই পৃথিবীর বুকে খোলা বাজারের ক্ষেত্রে সমাজে সার্বিক নিয়ন্ত্রণহীনতা তৈরি করছে। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ তথা সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক অমিয় বাগচীর মন্তব্য শিক্ষণীয়। তিনি বলেছিলেন যে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা সবসময়ই বৈষম্যের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, এমনকি পুরনো কিছু কাঠামো ধ্বংসও করে দেয়। তিনি আরও বলেছেন যে বেশ কিছুকাল ধরে গণতন্ত্রের নামে অসাম্যের নীতি আর প্রক্রিয়াই আন্তর্জাতিক প্রবণতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নানা ধরনের মৌলবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এলিট বহুত্ববাদ পাল্টে যাচ্ছে এলিট স্বৈরাচার কিংবা ফ্যাসিবাদে। নতুন পথে, নতুন কায়দায় বহু খণ্ডের সমাহারে পুরনো গণতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যেই শাসকশ্রেণি নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে সমর্থ হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে নয়া ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের বিশ্বায়ন প্রতিক্রিয়াও সংগঠিত হচ্ছে। কারণ যে গণতন্ত্রের সুরক্ষার কথা বিশ্বায়নপন্থীরা বলেছেন তা গণতন্ত্র তথা দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া তথা মহাজাগতিক শিল্প-কর্পোরেশন দ্বারা সংগঠিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া তথাকথিত দেশ, জাতির ঊর্ধ্বে শুধুমাত্র খোলাবাজারের উপর আধিপত্য কায়েম করার পরিকল্পনা রূপায়ন করে চলেছে তাতে ধনতন্ত্র এবং দেশীয় গণতন্ত্রের প্রাথমিক সম্পর্কই নষ্ট হতে বসেছে। আর এই পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদ দেশ, জাতির সীমানা টপকে দীর্ঘস্থায়ী সমাজ ব্যবস্থাগুলিকে ধ্বংস করে চলেছে একের পর এক। আর তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ বাজারভুক্ত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ সমাজক্ষেত্রগুলিতে দ্বীপের মতো ক্ষেত্রবিশেষে yuppification. প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন এলিটের জন্ম হচ্ছে যাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্রের এমনকি প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক কাঠামোর আর কোনোই সম্বন্ধ থাকছে না। সেখানে জাতীয় গণতন্ত্র বা জাতীয় ধনতান্ত্রিক কাঠামোই ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে। সেখানকার জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব মুছে যাবে না, সার্বিক বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে সরকার ক্রমশ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে সেই দেশগুলিতে যেখানে দেশের জনকল্যাণের আর কোনও দায়িত্বই থাকছে না। এই অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিল্পোন্নত বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকানোর মতো সামাজিক বোধোদয় তীব্র হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে বামপন্থীরা অবশ্য বিশ্বায়নবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। পুঁজির বিশ্বপ্রবাহ বিশ্বব্যাপী বিশেষত তৃতীয় বা অনুন্নত বিশ্বে সামাজিক পুনর্বিন্যাস

ঘটিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। লাতিন আমেরিকাতে মাদকদ্রব্যের বিরূদ্ধে অভিযান, আসলে সেখানকার অর্থনীতির উপরে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আর কিছুই নয়, কারণ মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি থেকে পুঁজিস্রোত এই দেশগুলিতে মাদক চোরাকারবারের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। আর সেই দেশগুলিতেই মার্কিনি সামরিক অভিযান গোটা লাতিন আমেরিকার অর্থনীতিতেই প্রভুত্বের সর্বোচ্চ নমুনা। বর্তমানে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ তথা ইরাক ধ্বংস ও শান্তির বাণী প্রচারের আড়ালে ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনে পরিকল্পিত। বিশ্বায়নের যুগে এও এক নয়া সাম্রাজ্যবাদ। একদিকে গোটা তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে সমাজ পুনর্বিন্যাস অন্যদিকে লাগামছাড়া সামরিক প্রভুত্ব এই দুইয়ের চাপে মানবজাতির অস্তিত্বের বৈচিত্র্য দূরে থাক বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে। তাই এই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। ফলে প্রতিরোধের বিশ্বায়নের মূল কথাই হল এই সামাজিক পুনর্বিন্যাসের পাল্টা এবং সমাজতান্ত্রিক বিন্যাস।

বর্তমান উত্তর-ধনতান্ত্রিক সন্ধিক্ষণে অধুনা বিশ্বায়ন পর্বে পুঁজিসঞ্চয়ের নেতিবাচক প্রবাহ এবং মুষ্টিমেয়র হাতে সঞ্চিত সিংহভাগ পুঁজি সমাজক্ষেত্রে স্বাভাবিক-সমকালীন-বিবর্তনের পাশাপাশি যে সব নেতিবাচক পুনর্বিন্যাস ঘটাচ্ছে তার কোনও নির্দিষ্ট অভিমুখ রচনা করা প্রায় কোনওভাবেই যাচ্ছে না। আর তাই ভারতবর্ষীয় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের বলতে হয় যে সমাজে এলিটদের উত্তরোত্তর উন্নতিতে মধ্যবিত্ত সহ গরিব নন্-এলিটদের গাত্রদাহের কোনও মূল্য নেই। তাই বর্ণবিদ্বেষ-ক্লিষ্ট ভারতবর্ষে ‘এলিট’ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমান্তরাল সামাজিক প্রথা বিধিনিয়মগুলিকে পর্যন্ত হাতিয়ার করে তোলার নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যেমন সোভিয়েত ভাঙার পরে চার্চ, তান্ত্রিকতন্ত্র, সামাজিক বুজরুকদের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ফ্যাসিস্টগোষ্ঠী, জ্যোতিষশাস্ত্র, তন্ত্রচর্চা ও অন্যান্য ধর্মীয় বুজরুকি সহ জাতিগত উন্মাদনা, রাজনীতি-ধর্মের অভূতপূর্ব মিশেলে সর্বপ্রকার সামাজিক অসাম্যকে এড়িয়ে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ জাতিগত সংহতিকে প্রায় ধ্বংসের মুখে টেনে নামিয়েছে। তাই আজ ভারতবর্ষে ধর্মীয় এলিট, জাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক এলিট প্রভৃতি বিভিন্ন সমান্তরাল গোষ্ঠীর পৃথক অবস্থানকে প্রায় বাজারি প্রতিযোগিতার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বা তারও আগে থেকে জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান হিসেবে গণমাধ্যম সমূহের চলন এবং ব্যবহার শুরু হওয়ার সময় থেকেই সমাজের যাবতীয় উত্তরণ, উত্থানপতনের সদাপ্রতিফলক এবং সমাজে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবিদার হিসেবে

গোটা বিশ্বের সমাজব্যবস্থাগুলিতে গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা ঘটল সহজাতভাবেই। সারা বিশ্বের রাজনীতিক এবং সংস্কারকগণ তাদের প্রয়োজনে গণমাধ্যমের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক সন্দেহাতীত যাত্রা শুরু করেছিলেন। শুধু তথ্য সরবরাহই নয়, সমাজসংস্কারের প্রশ্নে নতুন আদর্শ এবং দিশার সন্ধানে জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার উপাদান হিসেবে গণমাধ্যমসমূহ চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিশ্বে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতির ধারাবাহিকতার নিরীখে সমাজবিজ্ঞানী জন ডাউনিং প্রণীত যে তিন ধারার সমাজপ্রেক্ষিত জ্ঞাপনতত্ত্বের অবতারণা ইতিপূর্বে করা হয়েছে সেগুলি হল Totalist, fragmented এবং segmented। গণজ্ঞাপন গবেষণার পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণে যে বিষয়গুলি অনুধাবনযোগ্য তা হলঃ

ক) গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বর্তমান স্থিতি এবং ভবিষ্যত উন্নতির দিশা।
খ) সমাজের বর্তমান ঘটনাক্রম।
গ) বিশেষ প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের অবস্থান ও ভূমিকার প্রত্যক্ষ পর্যায়ে।
ঘ) সমাজের সার্বিক বিবর্তন ও উন্নতির প্রেক্ষাপটে গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং গণমাধ্যমের প্রভাব।
ঙ) গণমাধ্যমের বিভিন্ন আঙ্গিক এবং তার সামাজিক প্রভাব।
চ) গণমাধ্যমবাহিত সমাজের গর্ভে জন্মানো সংস্কৃতির ক্রমআধুনিকতার পর্ব বা পর্যায় বিশ্লেষণ।
ছ) একবিংশ শতকে বিশ্বায়নতত্ত্বের সার্বিকতা এবং সমাজে উত্তর আধুনিকতার নিরীখে গণমাধ্যমের সার্বিক বিবর্তনের সঙ্গে গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিবর্তনের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ।
জ) তথ্যসমাজ না সমাজতন্ত্র না কি শুধুই ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন?

সমাজের পক্ষে গণমাধ্যম উপযাচক হয়ে বিষয়সূচির প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করে দেয় খবর বাছাইয়ের মাধ্যমে। বিশেষত, তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ সংবাদপত্র সংস্থাগুলির গ্রহীতার প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করা দূরে থাক, এটা ধরে নেওয়া হয় যে জনমানস একটি বিষয়ে একমত হবেই যে খবরের কাগজে যখন খবরটি লেখা হয়েছে তখন সেটা গুরুত্বপূর্ণ হতেই হবে। যাইহোক পরবর্তী পর্যায়ে গণমাধ্যমের এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিমার্জিত এবং পরিশোধিত হয়েছে উপরোক্ত সামাজিক বিষয়সূচির বহুমাত্রিকতার প্রভাবে। বিশ্বায়নের দাপটে দেশ, রাজনীতি, সীমা টপকে যেভাবে মানুষকে গণমাধ্যম নির্ভর করে তোলার অসম্ভব প্রক্রিয়া চলছে তার আরও অন্যান্য শর্তাবলী থাকলেও এই প্রসঙ্গে বিশ্বায়ন তত্ত্বটির ভ্রূকুটি ভেবে দেখবার মতো। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মার্কসের শ্রেণিতত্ত্বের উন্নত প্রয়োগই

একমাত্র গণমাধ্যমের বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করতে পারে। গোটা গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া প্রভাবশালী আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মার্কসীয় দর্শনেও শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বপর্বে আদর্শগত একনায়কত্বের কথা বলা হয়েছে, তার ভিত্তি সমাজবাদ, মুষ্টিমেয়র স্বার্থ নয়, সর্বস্তরে শোষণের অবসানের কথা বলা হয়েছে। আবার শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রসঙ্গেও এক সুস্থ, সর্বস্তরীয়, গঠনমূলক, সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির গণমাধ্যমবাহিত প্রসারও মার্কসীয় দর্শনের সীমার অভ্যন্তরেই ভাবা হয়েছে। তাই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বেও পুঁজির নয়াপ্রভুত্ববাদ, নয়া কর্তৃত্ববাদের মাত্রা বিশ্লেষণের মূল অস্ত্র হল মার্কসবাদ। এর প্রাসঙ্গিকতা মুছে যাবার নয়।

বিশ্বায়ন পর্বে এবং এর প্রাক্কালে গোটা বিশ্বে এই বিশ্বায়নকে সামনে রেখে যে একবগ্গা অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির নামে উদারীকরণ প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে, তাতে মূলত তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোরই উদারীকরণ চলছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির প্রচারে এবং সেই লক্ষ্যে বিশ্বে অভিন্ন সমাজ গঠনে গণমাধ্যম তথা গণজ্ঞাপন ব্যবস্থায় এক কঠোর dominance বা আধিপত্যের সূচনা এক নয়ারূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমি বিশ্বের উদ্যোগে এই পর্বে তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখলের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক নতুন আধিপত্যবাদ। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই গণমাধ্যমের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সামগ্রিক উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমি বিশ্ব। ফলত তৈরি হয়েছে এক নতুন media-power যার পূর্ণ ধনতান্ত্রিক সত্তা, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। আরও বিশদভাবে বললে তৃতীয় বিশ্বের সমাজকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণে শুধু পশ্চিমি গণমাধ্যমই নয়, এগিয়ে এসেছে অতি শক্তিশালী Transnational Corporation গুলিও, যারা নতুন বাজার দখলের লক্ষ্যে তাদের পরিকল্পনাপ্রসূত বার্তার এক বিষম প্রবাহের সৃষ্টি করেছে বেসরকারি মালিকাধীন গণমাধ্যমগুলির দ্বারা। আর সেই প্রবাহে ভেসে চলেছে ঐতিহ্যশালী, স্বকীয়, সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজগুলি। তাদের পক্ষে ক্ষুদ্র ও সীমিত শক্তি নিয়ে লড়াই ক্রমাগত অসম হয়ে উঠেছে। এর একমাত্র সমাধান হল বিকল্প সমাজমুখী গণমাধ্যমের সূচনা এবং এর নেপথ্যে বিকল্প অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে জাতিরাষ্ট্রের সমূলে বিনাশের কালেও গণমাধ্যমবাহিত প্রচার এবং প্রচার-সংস্কৃতিই মূল হাতিয়ার। এখানে গণজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র আন্তঃব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জনগণ-এই তিন চিরাচরিত আধারে সীমাবদ্ধ নয়। প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ গণজ্ঞাপনের হাতিয়ার হিসেবে গণমাধ্যমকে এমনভাবে যাবতীয় সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেছে যে তৃতীয় বিশ্ব সহ সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে উন্নতি নামের প্রবল

এবং অবশ্যই চোরা স্রোতে। ফলে দেখা যাচ্ছে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে গোটা গণজ্ঞাপনের মাত্রা নিরূপিত হচ্ছে এবং তা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের চেহারা নিচ্ছে অচিরেই। এমতাবস্থায় একবিংশ শতকের বিশ্বায়নে এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলির তথাকথিত জাতিসত্তাকেই ভুলিয়ে দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। ফলে দেখা যাচ্ছে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে গোটা গণজ্ঞাপনের মাত্রা নিরূপিত হচ্ছে এবং তা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের চেহারা নিচ্ছে অচিরেই। এমতাবস্থায় একবিংশ শতকের বিশ্বায়নে এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলির তথাকথিত জাতিসত্তাকেই ভুলিয়ে দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। ফলে একদিকে গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত সাফল্য যেমন যুগের গতিকে ছাড়িয়ে উন্নতি লাভ করেছে তেমনি অন্যদিকে সমাজ গঠনের প্রশ্নে যাবতীয় তথাকথিত সামাজিক বন্ধন রীতি প্রভৃতির স্থানে নয়া সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করছে। তবুও বামমনোভাবাপন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন হাবার্ট শিলার প্রমুখ গণজ্ঞাপনের প্রযুক্তি ও আধুনিকতা নির্ভর যাবতীয় উন্নতি ও আধুনিকতার পাশাপাশি চিরাচরিত সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের প্রাসঙ্গিকতায় গণমাধ্যম তথা গণজ্ঞাপনের উন্নতি ও আধুনিকতার পথে সাধারণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা, মূল্যবোধ, সুস্থ দেশীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি উপাদানের এক সফল কেন্দ্রিকতার প্রয়োজন অপরিসীম। বর্তমান একবিংশ শতকে বিশ্বায়নবিরোধী যাবতীয় কর্মসূচির মূল বিষয় হল এই কেন্দ্রিকতার সফল প্রতিষ্ঠা। কোন বিষয়ই জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার নীতি গণমাধ্যম নিতে পারে না। গণমাধ্যমে জনমতের এবং জনশিক্ষার এক সুযোগ্য মেলবন্ধনের সুযোগ প্রতিষ্ঠা করাই হবে তৃতীয় ও উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নতির একমাত্র পথ, যেখানে মানুষের সার্বিক উত্তরণের লক্ষ্যই হবে শেষ অধ্যায়।

বিশ্বায়ন কথাটি শুধু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অস্তিত্বের মেলবন্ধন নয়, বরং অস্তিত্বের প্রতিযোগিতা। দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি যে কোন সমাজের সংস্কৃতির ভিতও নড়বড়ে করে দেয়। এখানে indigenization বা স্বদেশীয়করণের কোন প্রসঙ্গই আসতে পারে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিলন কোন কোন পর্যায়ে আজও সম্ভব। কিন্তু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ানিবিষ্ট প্রভাবশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর আপন সংস্কৃতির তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে বলপ্রযুক্ত প্রবেশের ঘটনা ঘটছে তার ক্ষেত্রে বাজার সাফল্য এবং সমাজজীবনের সম্পৃক্তি একইভাবে আসার সম্ভাবনা কম, আবার সম্পৃক্তি ঘটলেও প্রাচ্য সংস্কৃতির বাজারীকরণের সুদে-আসলে মূল্য ধরে দিতে হবে আপাত শক্তিশালী অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থাগুলিকে যেখানে স্বদেশীকরণের সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকাশ প্রায় অসম্ভব।

ধনতন্ত্রের নেতৃত্বে ঘটে চলা বিশ্বায়নের যে রূপ আমরা দেখছি, তার একটা দিক তো অবশ্যই অর্থনৈতিক পুঁজি। উৎপাদন ও শ্রম সংগঠিত করার জন্য পৃথিবী জুড়ে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। উপনিবেশবাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বিশ্ব বাণিজ্য দখলের জন্য উপনিবেশবাদকেও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পথে যেতে হয়েছিল, তা না হলে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা বা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এর কারণ বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে গ্রামশির কথায়, যেখানে আমরা শুনেছিলাম আধিপত্য বজায় রাখতে হলে গায়ের জোরের পাশাপাশি সম্মতি তৈরি করতে হয়। সংস্কৃতি সেই সম্মতি তৈরি করার আঙিনা হয়ে ওঠে। সংস্কৃতিকে যদি একটা মানের মানচিত্র বা ম্যাপ হিসেবে আমরা দেখি, সে ম্যাপ তো সবকিছুকে জড়িয়ে ছড়িয়ে আছে, সেই সংস্কৃতিকে ধনতন্ত্র কী ভাবে ব্যবহার করতে চায়? মূলত দু-ভাবে :

- এমন একটা সংস্কৃতি বা জীবনবোধ তৈরি করা যাতে বাজার বেড়ে উঠতে পারে।
- এমন একটা সংস্কৃতি বা অভ্যাসবোধ তৈরি করা যাতে আমাদের সব সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানগুলোই কোন পণ্য বা সেবার মধ্যে দিয়ে যায়।

রাজনৈতিক বিশ্বায়নের আসল উদ্দেশ্য গোটা বিশ্বের ওপর মার্কিন ও ইহুদী ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এছাড়াও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে তাদের আরো কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এখন সেটাকে গ্লোবালাইজেশনের প্রতিক্রিয়াও নাম দেওয়া যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেলায় এটা নিশ্চিত যে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র ও জনগণের ওপর জোরপূর্বক পশ্চিমা পলিসি চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমেরিকা ও তার রাজনৈতিক 'কুন ফায়াকুন'-এর মত শক্তির অধিকারী ইহুদী শক্তির স্বার্থের খাতিরে সকল দেশের রাজনৈতিক পলিসি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ অধিকার এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। চায় তা সে সমস্ত দেশের জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাদের ধর্ম বিশ্বাস আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের পলিসির সাথে সংঘর্ষপূর্ণই হোক না কেন? ইহুদী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার প্রভাবেই পেনসেলভেনিয়া ব্যাংকের চেয়ারম্যান জোনবুটিং-এর একথা বলার দুঃসাহস হয়েছিল যে, বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব, কার বেঁচে থাকার অধিকার আছে আর কার মরে যাওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেলায় আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক পার্টি ও দলের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হবে এবং তাদেরকে বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় ও শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। নিম্নবর্ণিত সংগঠনগুলো বিশ্বায়নের নেতৃত্বের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে:

ক) আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন খ) আফ্রিকী ঐক্য গ) আরব লীগ ঘ) ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইত্যাদি।

অথচ এই সংগঠনগুলো চলমান বিশ্ব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এমন কোন অবস্থান গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে যা মার্কিন জায়নবাদী শক্তির পরিকল্পনার মুখে লাগাম কষতে পারে। তবে ভবিষ্যতে এই সংগঠনগুলো মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এজন্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র এই সংগঠনগুলো ও এ ধরনের আরো যত সংগঠন রয়েছে সবকটিকে বিশ্ব মানচিত্র হতে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশ ইহুদী-খৃস্ট ইউনিয়নের এক অধিবেশনে ২০০২ সালের জানুয়ারীতে এক বক্তৃতাকালে বলেন, যে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন মার্কিন ও ইসলাইলী স্বার্থের বিরোধিতা করবে, আমরা তাদের কোন পরওয়া করব না চায় তা জাতিসংঘ হোক, আফ্রিকান ইউনিয়ন হোক, আরব লীগ হোক রেডক্রসের আন্তর্জাতিক সংগঠন হোক কিংবা অন্যান্য ইসলামী সংগঠন হোক।

ইসলামী বিশ্বের শক্তিশালী নেতৃত্বকে হটিয়ে দুর্বল ও অযোগ্য নেতৃত্বকে ক্ষমতার মসনদে বসানো এবং মার্কিন স্বার্থের পক্ষে কর্মরত সকল নেতৃত্বকে শক্তিশালী ও রক্ষা করাও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের কর্মকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব যদি পাশ্চাত্যের গোলামী করে তাহলে সেখানকার জনগণ ও তাদের সকল সম্পদের ওপর আমেরিকারই দখল থাকবে এবং ইসলামী বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যা ইহুদী জাতির জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, খুব সহজেই মার্কিন পলিসি ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে পরিপূর্ণভাবে ইহুদীদের হাতে চলে আসবে।

আঞ্চলিক ক্ষমতাকে দুর্বল করা, তার প্রভাব খর্ব করা কিংবা শিকড় থেকেই তাকে নির্মূল করে দেওয়া এবং জনগণের হৃদয় হতে জাতীয়তার চেতনা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়াও বিশ্বায়নের এজেণ্ডার অন্তর্ভুক্ত।

গ্লোবালাইজেশন এমন একটি ব্যবস্থা যা রাষ্ট্র, সরকার, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার ওপর আক্রমণ করে এবং এগুলোর পরিবর্তে মানবতার স্লোগান দেয়। বিশ্বায়নের দৃষ্টিতে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা কোন জিনিস নয়, বরং এটা মানব সমাজের মাঝে অনৈক্য ও পার্থক্য করার একটি মাধ্যম। মানব হিসেবে সবাই বরাবর ও সমান। কারণ তার জীবন পদ্ধতি, চাল-চলনের ধরন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, এমন কি তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার মধ্যেও সামঞ্জস্য হওয়া উচিত, এ জন্য বিশ্বায়ন বহুজাতিক কোম্পানি ও প্রচার মাধ্যমের সামনে সকল সীমান্ত খুলে দেওয়া এবং সকল প্রকারের বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করার সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুনিয়া শুধু ব্যবস্থাপনার দিক দিয়েই সীমান্তে ভাগ হয়ে থাকবে। এছাড়া অন্য কোন জিনিস এক দেশকে অন্য দেশ হতে পৃথক করতে পারবে না। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানি ও প্রচার মাধ্যমের বিনা অনুমতিতে যে কোন স্থানে তার কারবার ও কর্মতৎপরতা চালানোর অনুমতি থাকবে।

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ –এই তিনটি শব্দ বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে অপরের নিকটবর্তী মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তিনটিরই ক্ষেত্র আলাদা আলাদা। সংস্কৃতির অর্থ ও তার বিষয়াবলী আলাদা। সভ্যতার অর্থ ও তার বিষয়াবলী আলাদা। আর সমাজের অর্থ ও তার বিষয়াবলীও আলাদা। বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা যখন মানব তৈরি করলেন তখন তার জন্য কিছু আইন-কানুনও নির্ধারণ করলেন, যা মেনে চলা তার জন্য অপরিহার্য। তাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার পরিবর্তে দাম্পত্য জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন যাতে একদিকে বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যও পূরণ হয়, অপর দিকে জীবনের নিঃসঙ্গতাও দূর হয় এবং তার একজন কল্যাণকামী জীবনসঙ্গীও সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দানকারিণী মিলে যায়। সুতরাং মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন থেকে দাম্পত্য জীবনে যখন পদার্পণ করে, তখন সে অনেক নতুন নতুন সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বিবাহের পূর্বে সে কারো সন্তান এবং কারো ভাই-ভাতিজা প্রভৃতি ছিল। এখনো বিবাহের পর সে কারো স্বামী, কারো পিতা এবং কারো জামাই হয়ে গেল। এভাবে একজন ব্যক্তি হতে একটি পরিবার গঠিত হয়। আর কয়েকটি পরিবার মিলে গঠিত হয় একটি সুশীল সমাজ। এজন্য আমরা বলতে পারি, পরিবার সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর ব্যক্তি পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যেমনিভাবে ব্যক্তি ছাড়া

পরিবারের কল্পনা অসম্ভব তেমনিভাবে পরিবার ছাড়াও একটি সমাজের পরিকল্পনা অসম্ভব। এই সাইন্টিফিক বিন্যাসের ফল হল যদি ব্যক্তির মধ্যে কোন অনিষ্ট ও রোগ-ব্যাধি ও অন্যায়-অপরাধ প্রবেশ করে তাহলে সমাজে তা সংক্রমিত হবেই।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে এভাবে বলা যেতে পারে, ব্যক্তি সৎ হলে পরিবার সৎ হবে এবং পরিবার সৎ হলে সমাজও সৎ ও সুশীল হবে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। মানব জীবনের জন্য এই তিনটি বস্তু অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা তথা বিশ্বায়ন আন্দোলন স্বীয় উদ্দেশ্যে তখনই পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করতে পারবে যখন মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার অনুপ্রবেশ ঘটবে। এজন্য বিশ্বায়ন সর্বপ্রথম রাজনীতিতে পা রাখে, তারপর অর্থনীতির রাস্তা ধরে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচারের প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করে। তারপর এক পর্যায়ে সমাজের ওপর আগ্রাসন চালায়। এভাবেই সে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশ্বায়নের পর সামাজিক বিশ্বায়নের দিকে পা বাড়ায়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এই সামাজিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য গোটা বিশ্বে পশ্চিমা সামাজিক রীতিনীতির বিকাশ ও বাস্তবায়ন করা এবং পশ্চিমা মূল্যবোধ ও পশ্চিমা চরিত্রের আধিপত্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তবতা এই যে, যখন সমাজের বিশ্বায়ন হয়ে যাবে তখন এর ফলে নৈতিকতার বিশ্বায়ন নিজে নিজেই হয়ে যাবে।

বিশ্বায়ন চায় নৈতিকতার পতন ও অবক্ষয়ের এই যুগে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নীতি-নৈতিকতাহীন জাতির অপবিত্র নীতি-নৈতিকতা গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে এবং জাতি যেন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একটি সৎ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে ব্যর্থ হয়ে যায়, বরং জাতি যেন কোন সমাজ বিনির্মাণের কষ্ট করতেও প্রস্তুত না হয়। কারণ তার সমাজ হবে পশ্চিমা দেশে বিনির্মিত ইম্পোর্টেড সমাজ।

'বিশ্বায়ন' কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির কথাই প্রথমে মনে আসে। অর্থনীতিবিদ্‌দের একাংশ মনে করেন যে বিশেষ একটি পণ্য বিশেষ একটি দেশে দিব্যি চলছিল রুগ্ন কিংবা সীমাবদ্ধ কাঠামো নিয়েও, বিশ্বায়নের সুবাদে তাকে মোকাবিলা করতে হবে বৃহত্তর পুঁজির সঙ্গে, উন্নততর পরিকাঠামোর সঙ্গে। স্বভাবতই এ হবে অসম প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় দুর্বল সংস্থা টিকবে না, চলবে না তার উৎপন্ন পণ্য। বৃহৎ পুঁজিবাদী সংগঠনের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না, থাকছে না।

Globalisation-কে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেভাবে দেখা গিয়েছে তা হল- এর আড়ম্বরপ্রিয়তা, যৌনতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, বাদ্যযন্ত্রাদির ব্যবহারে লাগামছাড়া প্রয়াস। মনোরঞ্জনকেই মুখ্য করা হয়েছে। উত্তেজনা সৃষ্টি করার সর্ববিধ আয়োজন থাকছে। ফলত ঐতিহ্য, পরম্পরার নাভিশ্বাস উঠেছে। প্রচণ্ড ধরনের গতি ও ছন্দকে যুক্ত করা হচ্ছে সংগীত ও নৃত্যাদির ক্ষেত্রে। বিরিয়ানির স্বাদ একবার পেলে সাদা ভাতের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। বড্ড জোলো মনে হয়। এক্ষেত্রে স্বাদগ্রহণেই যত গুরুত্ব, স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি অবহেলিত থাকে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা তাৎক্ষণিক লাভে, সময়সাপেক্ষ ফললাভে তার ধৈর্য কম। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলে স্বাস্থ্যের জন্য সাদা ভাতই আদর্শ, বিরিয়ানি মাঝেমধ্যে চলতে পারে, নিয়মিতভাবে, দৈনন্দিন আহার্য হিসাবে কখনই নয়।

বিশ্বায়ন আমাদের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করছে, বিকৃত করছে, এ যেমন সত্য, তেমনিই আবার তা কোন কোন দিক দিয়ে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে। লোকশিল্পীরা বিদেশে গিয়ে স্বীকৃতি পাচ্ছেন, দুটো পয়সারও মুখ দেখছেন। তা ছাড়া আমাদের লোকসংস্কৃতি যা নাকি অঞ্চলবিশেষে ছিল পরিচিত, সীমাবদ্ধ, জগৎব্যাপী তাদের পরিচিতি ঘটছে। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়োর ঘোড়া কিংবা পুরুলিয়ার চড়িদার মুখোশশিল্পের জগৎজোড়া খ্যাতি। বাংলার বাউল ভাটিয়ালি বিদেশি শ্রোতাকেও আকৃষ্ট করছে। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়ার ছৌ অবলীলায় প্রথম স্থান অধিকার করে দেশের মুখোজ্জ্বল করছে।

আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসছে লোকসংগীতের সুবাদে। এজন্য ও দেশের তরফে বিদেশে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সমন্বিত স্টুডিয়ো স্থাপিত হয়েছে উন্নতমানের রেকর্ডিং-এর স্বার্থে।

আমাদের টি.ভি. চ্যানেলগুলিতে যেসব নৃত্যশৈলী প্রদর্শিত হয় সেগুলি দেখলে মনে হয় না ভারতের বৈচিত্র্যময় এবং অতি উচ্চমানের সব classical নৃত্যশৈলী রয়েছে। চ্যানেলে কথক, মণিপুরি, ওডিসি, কুচিপুরি, কথাকলি, ভারতনাট্যম, প্রদর্শিত হয় না, হলেও হয় রাত এগারোটার পর। Prime time-এ, Peak hours-এ এসব মার্গীয় নৃত্যকলা প্রদর্শনের স্থান নেই। Prime time-এ যা প্রদর্শিত হয় তার সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরার কোন যোগ নেই। শিল্পীদের কাছে করার মত কিছুই নেই। ঐতিহ্য রক্ষার জন্য, পরিচিতিলাভে বঞ্চিত থাকবেন, অর্থসংকটের শিকার হবেন না যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাতারাতি celebrity হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পীরাও তো মানুষ। উপযুক্তভাবে বাঁচার অধিকার তো

তাদেরও আছে। যুগের সঙ্গে সমঝোতা, শিকড়কে ছিন্ন করা, না শত কৃচ্ছ্রতার মধ্যে নীরবে পরম্পরাকে রক্ষা করা।

আজকের তথাকথিত অত্যাধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিকতায় ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষ একটু বৈচিত্র্যের স্বাদগ্রহণের জন্য উন্মুখ। A.C কক্ষে অন্তরীণ মানুষ যেমন প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত আলোবাতাসের সংস্পর্শে আসতে উন্মুখ হয়, তেমনি লোকসংস্কৃতির উদার অঙ্গনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আজকের মানুষ ব্যাকুল। দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটিয়ে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর মানুষ উন্মুখ থাকে একান্ত পরিচিতজনের হাতে প্রস্তুত দুটো ডাল ভাত মাছের ঝোলের জন্য। যারা লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে যুগোপযোগী করার নামে অশালীন বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে Fakelore তৈরিতে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তারা তাৎক্ষণিক লাভের সুবন্দোবস্ত করলেও সমূহ ক্ষতিসাধন করছেন আমাদের শিকড় সংস্কৃতির।

ভূপৃষ্ঠের তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। এই জলের মাত্র তিনভাগ মিষ্টি জল। মানুষের ব্যবহারযোগ্য মাত্র ০.৬৯ অংশ। এত জল, অথচ বিশ্বে আজ মিষ্টি জলের অভাব প্রকট। এই সংকট শুরু হয় সত্তরের দশকে। ভৌম জল ব্যবহার করে গ্রীষ্মে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের সময় থেকে। যাকে বাংলায় সবুজ বিপ্লব বলে। ভৌম জলের পরিকল্পনাহীন যথেচ্ছ ব্যবহারে ভূগর্ভের জলস্তর হু হু করে নেমে যেতে থাকে। শুধুমাত্র চাষের ক্ষেত্রেই নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলেও ব্যবহার্য ভৌম জলের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। পরিকল্পনাহীন ভৌমজলের ব্যবহারের ফলে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

গ্রামাঞ্চলে বিশেষ সুবিধাভোগী কৃষকেরা অন্যের কথা না ভেবে পরের ক্ষতি করে যথেচ্ছভাবে ভৌমজল সেচ কাজে লাগিয়ে স্বীয় স্বার্থ সাধন করে যা অন্যের সেচকাজ এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পানীয় জল থেকেও বঞ্চিত করে। জলস্তর শূন্য করে তোলা এই মহার্ঘ জলের বিপুল অংশ নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে ভৌম জলের মাত্র ৩৪% সেচে ব্যবহৃত হয়। পরিকল্পনার অভাবে অনেক জল নষ্ট হয়ে যায়।

বর্ষায় বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির গভীরে গিয়ে সঞ্চিত হয়। ফলে শুখা মরসুমে নদী-নালা, খাল-বিল সজীব থাকে। ভূগর্ভের জলস্তর নামতে থাকায় নদী জলাশয়গুলি সংকটে পড়েছে। তাই ভূ-উপরিস্থিত এবং ভূ-নিম্নস্থ জল সংকট আজ প্রবল আকার ধারণ করেছে। এখন অনিয়মিত বর্ষা। একটানা বৃষ্টি এখন আর দেখা যায় না; হয় অতিবৃষ্টি নয় অনাবৃষ্টি।

অল্প সময়ে অতিবৃষ্টির ফলে যথেষ্ট পরিমাণ জল চুঁইয়ে মাটির ভিতর ঢুকতে পারছে না। পাতাল পিপাসা না মিটিয়ে জলেই যাচ্ছে বৃষ্টির জল। বিশ্বজুড়ে নদীরা বিপন্ন, যার শীর্ষে রয়েছে গঙ্গা, সিন্ধু। শুকিয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী, জলঙ্গী। অনেক নদী অবলুপ্ত প্রায়।

নদী কোন রাজ্য বা দেশের নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলে না। আমাদের দেশে নদী সমস্যা আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। বিল-বাওড়গুলি প্রকৃতপক্ষে নদী খাতের পরিত্যক্ত অংশ, যেগুলি একদিন নদী বা ক্যানেলের সাথে যুক্ত ছিল। যার নিয়মিত জলোচ্ছ্বাস সঞ্চিত পলি ও ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে এবং ডিমপোনা প্রবেশ করতে সাহায্য করত। কিন্তু বছরের পর বছর অবহেলা-উপেক্ষার ফলে এই সংযোগকারী নালিপথগুলি পলি জমে যাওয়ায় জলের মুক্ত প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ডিমপোনা আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বড়ো নদীগুলি প্রস্থে সংকুচিত হয়। জলে লবণের পরিমাণ বেড়ে যায় যা মাছেদের বংশ বিস্তারে প্রতিকূল।

এখন নদীর অববাহিকায় অগভীর অঞ্চলগুলি হয় খরায় শুকিয়ে গেছে, নয় অতি প্লাবনে দীর্ঘ সময় ডুবে থাকছে। এভাবে প্রজনন ক্ষেত্রগুলি নষ্ট হওয়ায় উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে মাছেরা ডিম ছাড়তে পারছে না। ঐ একই কারণে ডিমপোনা ও চারাপোনার বিচরণ ক্ষেত্রগুলি হারিয়ে যাওয়ায় মাছেরা যে স্বল্প পরিমাণ ডিম ছাড়ছে তার অধিকাংশ নিষিক্ত হওয়ার আগে বা পরে মারা যাচ্ছে। যে অল্প সংখ্যক বেঁচে থাকছে তারাও অনুকূল পরিবেশের অভাবে খুব কম সংখ্যক মাছে পরিণত হয়ে প্রজননের উপযোগী হতে পারছে। তাই যেখানেই জল সেখানেই মাছ আজ আর দেখা যায় না। ১৮৯৭ সালের ইণ্ডিয়ান ফিশারিজ অ্যাক্ট IV, ১৮৮২ সালের বেঙ্গল অ্যাক্ট এবং ১৯২৭ সালের ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট XV, যার দ্বারা মাছ এবং ফিশারি রক্ষা পেতে পারত। কিন্তু আইন কার্যকরী না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও ১৯৮৪ সালের দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারিজ অ্যাক্ট-এ মাছ সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তারে গুরুত্ব দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। একথা উল্লেখ্য যে, চারাগাছ রক্ষার্থে বনদপ্তর-মৎস্যদপ্তরের লড়াই দীর্ঘদিনের। সমুদ্র উপকূলে মৎস্যজীবীদের মাছ সংগ্রহ এবং শুকানোর সময় বনদপ্তরের চারাগাছ নষ্ট হলে এই দ্বন্দ্ব লাগে। আগে মে থেকে জুলাই মাসে দেশি কার্প, রুই, কাতলা, মৃগেল জাতীয় মাছ স্রোতযুক্ত জলে ডিম ছাড়ত। সেখানে স্ত্রী মাছের ডিমগুলি পুরুষ মাছের শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয়ে নির্দিষ্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে ডিম ফুটে বাচ্চা হত। এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদের লালগোলা-ধুলিয়ানা এবং মালদহের মানিকচক অঞ্চলের গঙ্গা থেকে ব্যাপক হারে মাছেদের ডিমপোনা সংগ্রহ করা হত। প্রাকৃতিকভাবে এই পদ্ধতিতে মাছ উৎপন্ন

হত। বর্তমানে পরিবেশের অবক্ষয়, বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস এবং জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ায় এখন প্রাকৃতিকভাবে ডিম উৎপন্ন হয় না বললেই চলে। ডিম উৎপাদনের অসুবিধা দূর করার জন্য কৃত্রিম উপায়ে মাছেদের প্রজননের দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর ১৯৫৭ সালে এবিষয়ে সাফল্য আসে। এই পদ্ধতিতে রুই, কাতলা, সিলভারকার্প মাছেদের আবদ্ধ জলে ডিম ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

প্রজননের উপযোগী সুস্থ-পরিণত বাছাই মাছেদের নিয়ে দুবার ইনজেকশন দেওয়ার পর স্ত্রী ও পুরুষ মাছেদের একত্রে প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ব্রিডিং হাপায় রাখা হয়। এখানে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ মাছের নিক্ষিপ্ত শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। ব্রিডিং হাপা থেকে ডিম ফোটানোর জন্য হ্যাচিং হাপায় ছাড়া হয়। এখানে ১৫-১৬ দিন ডিমপোনা লালিতপালিত হয়ে ধানী পোনায় পরিণত হলে তা পালন পুকুরে ছাড়া হয়। মাছেদের ডিম ফোটানো এবং তাদের খাবার যোগান আগে প্রাকৃতিকভাবে হত। এখন মৎস্যজীবীদের উৎপাদকেরা বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে একাজ করছে। তাই কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎপন্ন মাছ আজ মহার্ঘ। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন মাছ স্বাদে-গন্ধে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন মাছেদের ধারে কাছে আসতে পারে না। কিছু সংখ্যক দেশি এবং বিদেশি কার্পের ক্ষেত্রেই কৃত্রিম উৎপাদন সম্ভব। যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস ইত্যাদি দেশি কার্প এবং সিলভার কার্প, রুপালি রুই, ঘেসোরুই, আমেরিকান রুই, তেলাপিয়া ইত্যাদি বিদেশি কার্প। সকল মাছেদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজনন এখনও সম্ভব হয়নি। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন পুকুর ও জলাশয়ের সংখ্যাও সীমিত। এই কারণেও মাছ মহার্ঘ।

আগেকার দিনে স্বাভাবিক প্রজননের কাজে প্রজনন পুকুরে বড় বড় আকারের কার্প মাছগুলি ওজনে প্রায় ৫ থেকে ১০ কেজি ব্যবহারের জন্য রাখা হত। যে সব মাছ ৫ কেজি ওজনের না হতো সেই সব মাছ ব্যবহার করা হতো না। এখন জলাশয়ে কার্প মাছগুলি গাদাগাদি করে রাখা হচ্ছে। তার ফলে খোলামেলা স্থানের অভাবে এবং খাদ্যের অভাবে মাছের বৃদ্ধিতে বাধা পড়ে। ঠিকমত স্থান ও পরিপূরক খাদ্যের অভাবের জন্যেই ঝিকড়ে অর্থাৎ (Stunted Growth) হয়ে যায়। এই রকম ব্যবস্থাপনায় ৩ বছরের বেশি বয়সের মাছের ওজন মাত্র আড়াইশো গ্রাম থেকে ১.৪-১.৫ কেজি হতে দেখা যায়। পরিবেশজনিত কারণে সাময়িকভাবে পাওয়া বৈশিষ্ট্য এখানে সবার ওপর অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না বটে, কিন্তু ঐ একই পরিবেশ আর খাদ্যের যদি একনাগাড়ে ১০/১৫ বছর ধরে চলে এবং সেই পরিবেশের মধ্যে প্রজননকারী পিতা-মাতাদের ৩/৪ টি প্রজন্ম

অতিবাহিত হয়, তবে সেই পরিবেশজনিত সাময়িক বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ বেঁটে ভাব বা বামনত্ব পরবর্তী প্রজন্মের দেহকোষের ক্রোমোজোমের জিন-এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

এই অবস্থায় বেঁটে আকৃতির স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় মাছের উৎপাদিত ডিম থেকে তৈরি চারা পোনা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। সেই সময় উত্তম পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যেও কোনো ফল হয় না। ঐ নিষিক্ত ডিম থেকে উৎপন্ন চারা পোনা বড় হলে বেঁটে হয়, এই সব বেঁটে মাছের ওজন কোনক্রমেই ১০/১৫ বছরের আগেকার মাছগুলির মতো সমান হয় না। বলাই বাহুল্য ডিমের এবং শুক্রাণুর সংখ্যাও একই সময়ে মারাত্মকভাবে কমে যাবে। বর্তমানে চাষের জন্য বেশি সংখ্যক হারে ডিম পোনা, ধাড়ী পোনা অথবা চারাপোনা ব্যবহার করতে হচ্ছে। তার ফলেই বীজের ঘাটতি পড়ছে।

এখন আমাদের দেশে হ্যাচারিতে মাগুর, শিঙ্গি এবং পাবদা মাছের চাষ হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে। ফলে সারাবছরই এইসব মাছ সহজলভ্য। কিন্তু বিভিন্ন মাছে ফর্ম্যালিন দেওয়ার ফলে মানুষের শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে। নিবিড় চাষাবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের চাষ হচ্ছে। এসব পদ্ধতিতে চাষাবাদ স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক পোনা মজুত করে অধিক উৎপাদন ও অধিক মুনাফা অর্জন হলেও পরিবেশের ওপর কিছু বিরূপ প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন-

পুকুরে অধিক পরিমাণ মাছ মজুত থাকার জন্য বেশি পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োগকৃত খাবারের একটা অংশ বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মাছের বর্জ্য পুকুরে জমা হতে থাকে। এর ফলে পচন ক্রিয়ার প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় ও অধিক পরিমাণে অ্যামোনিয়া জমা হয়। এ জন্য পুকুরের জল দুর্গন্ধ হয়ে যায় এবং মাছ মারা যায়। তাছাড়া আরো অনেক রাসায়নিক দ্রব্য তলায় জমা হয় এবং প্রচুর গ্যাসও উৎপন্ন হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুকুরের পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় জলের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে বা কোনো রাসায়নিক প্রয়োগ প্রয়োজন হয়।

কোনো কোনো স্থানে শামুক/ঝিনুক প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে আহরণ করে মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয় সমূহের পরিবেশ (Ecosystem) বিঘ্নিত হয়। এটা এক ধরনের সুস্থ পরিবেশের বিরূদ্ধ কাজ।

পুকুরে নিবিড় ও আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাগুর মাছ চাষের ফলে ঔষধ/বিষ ব্যবহার করে অন্যান্য সব মাছ ও জলজ প্রাণীসমূহ মেরে ফেলার ফলে এক্ষেত্রে প্রজাতিগুলোর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়।

বিভিন্ন ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি পুকুরে প্রয়োগের ফলে এগুলোর একটি অংশ মাছের শরীরে সঞ্চিত হয়। এসব Residual effect মাছের ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর।

একবার আধানিবিড়/নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হলে জলজ পরিবেশের মারাত্মক পরিবর্তনের কারণে পুকুর না শুকিয়ে এবং তলার কাদার উপরের অংশ না সরিয়ে পরবর্তীতে মাছ চাষ করা হলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে তলার কাদা কৃষিকাজে ব্যবহার করে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

আধানিবিড়/নিবিড় মাছ চাষে প্রচুর পচন ক্রিয়ার ফলে জল দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী বাতাসও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে এবং বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনেক খামারি ব্যয় সমন্বয়ের জন্য পুকুরে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

অপরিকল্পিতভাবে এধরনের খামার স্থাপনের ফলে উপরের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যা কৃষি ফসল ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

‘জল’ ও ‘মাছ’ সংকটের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যজীবী শব্দটির অর্থও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু মৎস্যজীবী এখন কেবলমাত্র মৎস্য সংগ্রাহক বা জেলেতে সীমাবদ্ধ নয়। এখন ব্যাপক অর্থে মৎস্যজীবী বলতে বোঝায়, মৎস্যশিল্পের যে কোন ধাপের সাথে যুক্ত থেকে জীবন-জীবিকার সিংহভাগ উপার্জন করে যারা তারাই মৎস্যজীবী। মৎস্যজীবী একটি সম্প্রদায়। জাতিগতভাবে উদ্ভূত কেবলমাত্র জেলেরাই নয়।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে এই পরিবর্তন প্রায় স্বাভাবিক। এমন এক সময় ছিল যখন মৎস্যজীবী বলতে শুধু মৎস্য

সংগ্রাহকদের বোঝাত যার মধ্যে মালোরাও ছিল যারা বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তারা চিনত শুধুমাত্র তাদের মহাজনকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে তারা বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়। এদিকে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রে বিরাট অবক্ষয় ঘটে- দেখা দেয় জল ও মাছ সংকট। মৎস্যজীবীদের সমাজ গঠনের মধ্যেও ফাটল ধরে। আর্থিক দিক থেকে সম্পন্ন মৎস্যজীবীরা, যারা জাতিগতভাবে জেলে নাও হতে পারে, পরিবেশের অবক্ষয়ে প্রাকৃতিকভাবে মাছ উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় বিপুল টাকা লগ্নি করে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদন করে মৎস্যশিল্পে চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সব মিলিয়ে 'শ্রেণির মধ্যে শ্রেণির' উদ্ভব ঘটে।

মালোদের মাছ ধরার সরঞ্জাম কেনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রাপ্যতা প্রায়শই খুব কঠিন প্রমাণিত হয়েছে, এবং প্রত্যাবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির ফলে অনেক মৎস্যজীবী বেসরকারী এবং মহাজনদের ঋণের জালে পড়েছে। এই পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য, সরকার ফিশারদেরকে উদার শর্তাদি ও শর্তাবলী দিয়ে সরকারী অর্থ সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনা করে। একইভাবে, নীতিটি গিয়ার/জাল এবং নৌকা/ট্রলারের মতো সম্পদগুলিকে বিমার আওতায় আনার লক্ষ্য রাখে। এটি ফিশারদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্যান্য কাজের সময়ে লোকসানগুলি পূরণ করতে সহায়তা করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পনাহীন অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার এবং তার উপযুক্ত পুনঃস্থাপনের অভাবে সমগ্র দেশ আজ এক বিরাট অবক্ষয়ের মুখোমুখি। সংরক্ষণ তাই আজ অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ক্ষয়রোধ করতে সম্পদগুলি নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং পরিবেশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনস্থাপন করে সুরক্ষিত করা যায়। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা মাছ সংরক্ষণ সম্ভব। কারণ সংরক্ষণ হল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা। যাতে দেশি মাছসহ বিরল প্রজাতির মাছেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব। যার দ্বারা দেশ ও দশের কল্যাণ সাধিত হয়। যতই মাছের সংকট দেখা দিয়েছিল ততই মাছ ধরার সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিকে আরও আধুনিক করে চলল মাছ সন্ধানের কাজ। তাতে মাছ সংকট আরও বেড়ে গেল। প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ ও মাছ সংকট বেড়েই চলেছে।

> 'বাংলার বিল-বাওড়গুলি প্রকৃতপক্ষে নদীখাতের পরিত্যক্ত অংশ, যেগুলি একসময় নদী-ক্যানেলের সাথে যুক্ত ছিল। যার নিয়মিত জলোচ্ছ্বাস সঞ্চিত পলি ও ময়লা-

আবর্জনা পরিষ্কার করতে আর ডিমপোনা ঢুকতে সাহায্য করত। কিন্তু বছরের পর বছর অবহেলা-উপেক্ষার ফলে এই সংযোগকারী নালিপথগুলিতে পলি জমে যাওয়ায় জলের মুক্ত প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডিমপোনা আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বড়ো নদীগুলি প্রস্থে সংকুচিত হয়। জলে লবণের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে মাছেদের বংশবৃদ্ধি কমায়। বর্তমানে নদীর অববাহিকার অগভীর অঞ্চলগুলি হয় খরায় শুকিয়ে গেছে নয় অতিপ্লাবনে দীর্ঘ সময় ডুবে থাকছে। এভাবে প্রজনন ক্ষেত্রগুলি নষ্ট হওয়ায় উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে মাছেরা বংশবৃদ্ধি করতে পারছে না।'[১]

নগরায়ণ, কলকারখানা নির্মাণ, সড়ক ও রেলপথের উন্নয়ন বাস্তুতন্ত্রে বিরাট এক পরিবর্তন এনেছে। দ্রুত নগরায়ণে শহর এলাকার জলাভূমির বিপন্নতা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, হাইকোর্টের নির্দেশে সরকার সব জলাশয় ভরাট নিষিদ্ধ করে। কলকারখানা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণের ফলে যেখানে খোলা মাছ চাষ হত সেখানে প্রকৃত জলাভূমির পরিমাণ কমে গিয়েছে।

'নদীবাঁধ নির্মাণ দীর্ঘদিন থেকে ইলিশ উৎপাদন ব্যাহত করছে। ময়ূরাক্ষী-দামোদরের উপর বাঁধ নির্মাণ মাছেদের মুক্তবিচরণ ভীষণভাবে ব্যাহত করেছে। এ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ইলিশ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি উচ্চনদীতে আজ বন্ধ্যা। ফলে হাজার হাজার জেলেদের কর্মচ্যুতি ঘটেছে। ফরাক্কা ব্যারেজ হওয়ার পর ডিম পাড়ার সময় ইলিশ ফারাক্কা পর্যন্ত যায়, কিন্তু আগে কানপুর-দিল্লি পর্যন্ত উজানে যেত। এতদিন সমুদ্রের নোনা জল উলুবেড়িয়া পর্যন্ত আসত, এখন তা আসছে নূরপুর পর্যন্ত। মাছ উৎপাদনের বাস্তুতন্ত্রে বিরাট পরিবর্তন এসেছে।'[২]

'কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীন মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক-ছত্রাকনাশক-রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ধানের জমির মাছ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক-ছত্রাকনাশক অবশেষে কাছাকাছি জলাশয়ে যেটুকু জল অবশিষ্ট থাকে তাতে পড়ে ভীষণ দূষিত করছে। এতে দেশি মাছ অবলুপ্ত প্রায়। ব্যর্থ হতে চলেছে 'নীলবিপ্লব'। সম্পন্ন কৃষকের নিজের পুকুরে রুই, কাতলা পোষা থাকে। তাই তারা কীটনাশক প্রয়োগ করে কৃষিতে সর্বোচ্চ ফলন পেতে চায়। জমির চুনো-চিংড়ির কী হল সে বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। অনেক সময় এ বিষয়ে অজ্ঞতাও কাজ করে।'[৩]

সরকারি রিপোর্টগুলি মাছ রক্ষার্থে সময়োপযোগী যথার্থ সুপারিশ করেছে। তার সাথে সেগুলি কার্যকর করার আইনও রচিত হয়েছে। তবুও সব আয়োজন নিষ্ফলা। বন্যপ্রাণীদের 'বন্যপ্রাণী রক্ষা আইনে' অবলুপ্তি থেকে বাঁচানো গেলেও মৎস্যরক্ষার বিষয়ে কোন পক্ষ থেকে কোন সদিচ্ছা না থাকায় মাছেদের অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে একের পর এক আন্দোলন দেখা গেছে। যার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কৃষকদের 'তেভাগা আন্দোলন'। যার মূল কথা 'লাঙল যার জমি তার'। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে এই আন্দোলন অনেকাংশে সফল হয়েছে। যার ফলশ্রুতি ভূমি সংস্কার ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা বন্টন। অন্যদিকে আজ পর্যন্ত কোন সরকার জলাভূমি নিয়ে কোন সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। তাই 'জাল যার জলা তার' আজও দূর অস্ত। মাছ-জল-মৎস্যজীবীদের অবক্ষয় অব্যাহত।

ভবিষ্যৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে যাতে সব ধরনের দেশীয় মৎস্য সম্পদ সুরক্ষিতভাবে থাকতে পারে সে জন্য কিছু কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মৎস্যসম্পদ শুধুমাত্র খাদ্য জোগানদার নয়, সে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের একটি হাতিয়ার। সংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলি হল-

ক) কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

খ) নির্বিচারে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারা বন্ধ করতে হবে।

গ) নদীবক্ষে কলকারখানা ও শহরের বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। উপযুক্ত পরিশোধন করার পরই বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলতে হবে।

ঘ) নদীর পলি উত্তোলন করে জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

ঙ) বিপন্ন প্রজাতির মাছেদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রজনন ছাড়াও কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করে বংশবৃদ্ধি করতে হবে।

চ) হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছের বীজ প্রাকৃতিক জলাশয়ে নিয়মিত ছাড়তে হবে

ছ) ছোট ছোট পুকুরগুলিতে দেশীয় মাছ করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে পোনা মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন বিষ প্রয়োগ করে আমাছা ও অবাঞ্ছিত মাছেদের

মেরে না ফেলে সেগুলিকে যতদূর সম্ভব জাল দিয়ে তুলে ছোট বা অব্যবহৃত পুকুরে চাষ করতে হবে।

প্রযুক্তিবিদ্যা হল বিভিন্ন ধরনের কৌশলের যোগফল। যার দ্বারা মানুষ তার প্রভুত্বের জায়গাটি দখল করে রেখেছে। নিশ্চিত করেছে তার খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, আরাম-সাচ্ছন্দ্য। অনুন্নত উপজাতি ও সম্প্রদায় থেকে শুরু করে উন্নত সমাজ পর্যন্ত প্রযুক্তি হল একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মাছ ধরার জন্য সুতো, হারপুন উদ্ভাবন করেছে। যাতায়াতের জন্য নৌকা বা চাকা উদ্ভাবন করেছে। ধীরে ধীরে আদিম মানুষ পাথর থেকে ব্রোঞ্জ এবং ব্রোঞ্জ থেকে লোহার ব্যবহার শিখেছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাগত উন্নত অতীত উদ্ভাবনের ধারাতেই বয়ে চলেছে। নৌকা থেকে মেশিন বোট বা ট্রলার একই উদ্ভাবনের পরিবর্তিত উন্নত ও জটিল রূপ। এখানে অতীতের সাধারণ যন্ত্রপাতিগুলিকে আধুনিক কালের জটিল মেশিনে পরিণত করা হয়েছে। বর্তমান সভ্যতা এই মেশিনের উপর গড়ে উঠেছে।

মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্যই প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ করা হয়। একে ভালো বা খারাপ দুই কাজেই লাগানো যেতে পারে। ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করলেও এর ফল খারাপ হতে পারে। মানুষের প্রতিটি অগ্রগতির সাথে চলে আসে নতুন দায়িত্ববোধের কথা। বিরাট দক্ষতার সম্ভাব্য অপব্যবহারের মধ্যে যে বিপদ লুকিয়ে আছে, সে বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হয়। যদি আমরা যথাযথভাবে এই জ্ঞানকে ব্যবহার করি তবে ওই দক্ষতা মানবজাতিকে একটি পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে সক্ষম করে।

যতই মাছ সংকট বাড়ছে, ততই আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত করা হচ্ছে মাছধরা সরঞ্জামগুলি। এসেছে জালের সর্বাধুনিক সংস্করণ ‘বিনতি জাল’ যা থেকে কোন মাছ গলে পালাতে পারে না। দেশি নৌকার বদলে এসেছে মোটরবোট, যা আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত। তাতে থাকছে মাছের ঝাঁক খোঁজা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা। মাছের উপযুক্ত সংরক্ষণ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত না করে অবশিষ্ট মাছ ধরতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগালে মাছ সংকট আরও বাড়বে।

সবুজ বিপ্লব আমাদের জীবনে অভিশাপ না আশীর্বাদ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সময় এসেছে। যে অমৃতের সন্ধানে ‘সবুজ বিপ্লব’ করা হয়েছিল তাতে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার পিছনের দরজায় যে গরল ঢুকে পড়েছে তা জেনে বা না জেনে আমরা

সকলেই কণ্ঠে ধারণ করছি। সবুজ বিপ্লবের সময়কালে উচ্চফলনশীল ধানের উৎপাদন বাড়াতে পরিকল্পনাহীন যথেচ্ছ কীটনাশক, আগাছানাশক ব্যবহারের ফল, সর্বগ্রাসী দূষণ। অন্যদিকে ভৌমজলের পরিকল্পনাহীন যথেচ্ছ ব্যবহার এনেছে জল সংকট। ভূ উপরিস্থিত অবশিষ্ট জলে মিশেছে কীটনাশক-আগাছানাশক, কারখানার বর্জ্য পদার্থ যা, জলকে করেছে বিষতুল্য। একদিকে জল সংকট অন্যদিকে অবশিষ্ট জলে বিষ। সব দেশি মাছেদের অবলুপ্তি। সনাতন পদ্ধতিতে মাছধরা সরঞ্জামগুলিও অবলুপ্ত প্রায়।

মাছ দ্রুত পচনশীল খাদ্যবস্তু, তাই এর পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। মাছ ধরার পর চালান ব্যবহারকারী বা প্রসেসিং কারখানায় পৌঁছানো মাছের গুণাগুণ নির্ভর করে মাছটি ধরার পর কিভাবে পরিচর্যা, সংরক্ষণ, বাক্সবন্দী ও বওয়া হয়েছে তার ওপর। উৎপাদিত বস্তুর ভালো গুণ বজায় রাখতে মাছ ধরার পর নৌকাতেই বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যার মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। নাহলে কোষের মধ্যে যে উৎসেচক থাকে তা কোষকেই নষ্ট করতে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া কোষের পতন ঘটায়। এছাড়া কোষে অসমোসিস পদ্ধতিতে জল ঢুকে পড়ে। এই সব মিলে মাছের শরীরে পচন ঘটায়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ক্লসস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম, মরগানেলা মারগানি, এন্টারোব্যাক্টেরিয়াসি ভিব্রিও ইত্যাদিরা পচনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। তাই মাছকে জল থেকে তোলবার পর সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে না পারলে তার অর্থমূল্য নষ্ট হয়ে যায়। সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি আছে। বরফে মাছ সংরক্ষণ সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ পদ্ধতি। বরফে মাছ রেখে দিলে বেশ কয়েক ঘন্টা টাটকা থাকে কারণ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কম হওয়ার জন্য জীবাণু উৎসেচকের কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ফলে পচনক্রিয়া হয় না। পর্যায়ক্রমে মাছ ও বরফের স্তর দিয়ে অবশেষে ৫-৬ ইঞ্চির বরফ দিয়ে প্যাকিং করতে হবে অর্থাৎ বাক্স বা ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সাধারণত বরফ ও মাছ আধাআধি ওজন হলেই চলবে। তবে মাছ ধরার পরে পরেই বরফে রাখা অত্যন্ত জরুরি। ব্যবসাভিত্তিক মাছ সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজে মাছ রাখা যায়। বরফের থেকে কম খরচে ও একসঙ্গে অনেক মাছ বহুদিন হিমঘরে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া লবণে মাছ সংরক্ষণ, রোদে মাছ শুকিয়ে সংরক্ষণ, ধোঁয়ার সাহায্যে সংরক্ষণ, টিনের কৌটায় সংরক্ষণ, জীবন্ত অবস্থার জলে সংরক্ষণ, মৃত অথচ টাটকা মাছের সংরক্ষণ করা যায়।

বর্তমান শতাব্দীতে প্রত্যেক মানুষকে পর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভারে পুষ্ট করাই শুধুমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভার সম্পর্কে সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত মাছচাষ তথাকথিত মাছচাষের পরিবর্তে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু অব্যাহত অতিরিক্ত মাছ ধরা, নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচুর নিবিড় চাষ, জলাশয়ের পরিবেশ নষ্ট, মাছ চাষকে ব্যাহত করবে। সেক্ষেত্রে সুস্থিত মাছচাষ পদ্ধতির উপর মৌলিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বয়েডের মতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মাছচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ফ্যাক্টর এবং সেটি বাস্তবিক সুস্থিত হবে না কারণ সেটি বহিরাগত খাবার, রাসায়নিক উপাদান ও সৌরশক্তির উপর নির্ভরশীল।

> ‘মাছ চাষ হল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত জলজপ্রাণীদের সংগ্রহ, পালন ও সংরক্ষণ করা। সুস্থিত মাছ চাষ ব্যবস্থা নির্ভর করে কোন ধরনের মাছ চাষ হচ্ছে এবং কোথায় হচ্ছে তার উপর। সব ধরনের চাষের ক্ষেত্রেই সুস্থিত ব্যবস্থার ভাবনা একই। প্রথমত পুকুরের ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং সেই নির্ণয়ন বলে দেবে পুকুরটিতে চাষ কতটা সুস্থিত হবে। যদি পুকুরের ধারণক্ষমতা নির্ণয় করা যায়, তাহলে সঠিক মানের প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমানো যাবে।’[৪]

> ‘সুস্থিত মাছচাষের জন্য মিশ্র মাছচাষ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। এই ধরনের চাষে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পুকুরের জলের বিভিন্ন স্তরে থাকে এবং বিভিন্ন স্তরের খাদ্যকণিকা ও পুষ্টিকর মৌলিক উপাদান গ্রহণ করে, যাতে মৌলিক উপাদান নষ্ট হবার সম্ভাবনা কমে এবং দূষণও হবে না।’[৫]

পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে খাদ্য খেতে অভ্যস্ত, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এমন মাছেদের নির্বাচন করা হয়। ফলে পুকুরের সমস্ত খাদ্যভাণ্ডার সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। সুস্থিত মাছচাষে ছয় ধরনের মাছচাষ করা জরুরি কারণ ওই মাছেদের খাদ্যাভাস ও খাদ্য ভিন্ন এবং পুকুরের সব স্তরের খাদ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়।

জাতীয় মৎস্য নীতি, ২০২০ পঞ্চম খসড়ায় বলা হয়েছে যে, দেশে রপ্তানি বাজারে সর্বাধিক আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ অবকাঠামো সরবরাহ রয়েছে, তবে দেশীয় বিপণনের ক্ষেত্রে এটি একই নয়। অবতরণকারী স্থানগুলিতে বা পাইকারি/খুচরা বাজারে মাছটি সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে বিক্রি করা হয়। এফএইচএস এবং এফএলসি এবং মৎস্য বাজার

স্থাপন/উন্নয়নের জন্য সরকার পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদানের পরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যাণ্ডের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় ভারতে মাছ বিক্রি ও ক্রমবর্ধমান হারের অন্যতম কারণ এটিও। রপ্তানি বাজার বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে, উৎপাদকরা দেশীয় বাজারগুলি উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যাতে রপ্তানির উপর নির্ভরতা হ্রাস পেতে পারে। এক্ষেত্রে নীতিগত উদ্যোগগুলি, ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি, দেশীয় সরবরাহ শৃঙ্খলাটিকে আরও জোরদার করা এবং মাছের পণ্যগুলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য খুচরো চেইনগুলিকে উৎসাহ প্রদান করা হবে...একইভাবে নীতিগত উৎসাহগুলি ছোট প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠার দিকেও নির্দেশিত হবে যারা মাছ চাষের সাথে এবং মৌলিক মূল্য সংযোজন বাজারের সাথে সরাসরি রেস্তোঁরা বা অন্যান্য আউটলেটের সাথে পণ্য সংযোগ স্থাপন করবে। এই দিকনির্দেশে, নীতিটি ব্যবসায়ের সচেতনতা তৈরি এবং বিপণনের এই বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-প্রক্রিয়াকরণ এবং খুচরা বিপণনে মহিলাদের ভূমিকা জোরদার করাও লক্ষ্য করবে।

অবশেষে, অনলাইন মাছ-বিপণনের ব্যবস্থাপনা লাভজনকভাবে বিপুল সংখ্যক ভোক্তাকে প্রক্রিয়াজাত মাছ সরবরাহের পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করেছে। ভ্যালু চেইনের এই সংক্ষিপ্তকরণটি মৎস্যজীবীদের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করবে কারণ তাতে ভোক্তার রুপির ক্রমবর্ধমান অংশ থাকবে। প্রসেসর ফিশারদের সাথে সরাসরি সংযোগের কারণে আরও ভাল মান-শৃঙ্খলা প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে পারে। সময়ের সাথে সাথে, যদি মৎস্যজীবীরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশ করতে পারে তবে তারা শুরু থেকে শেষের সংযোগের সাথে মানের চেইন স্থাপন করতে পারে। এই নীতি জাতীয় উদ্যোগকে সমর্থন করবে ও প্রচার করবে।

ভারতের মাছের বাণিজ্য চিংড়ির উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। এটি পরিমাণের শর্তে রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশ এবং মান শর্তে ৬৮ শতাংশ নিয়ে গঠিত। এই পরিস্থিতিতে, উদ্বেগের বিষয়টি হল গত ২৪ বছরে যখন বাণিজ্যের মূল্য ১৩ গুণ এবং পরিমাণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন ভারতে রপ্তানির প্রকৃতি একই রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য ভারতের রপ্তানি সম্ভাবনা বৈচিত্র্যযুক্ত এবং মৎস্যচাষের সংস্কৃতি পুরোপুরি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি, ভারতীয় বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে ভারতীয় প্রক্রিয়াকরণ খাতকে উচ্চতর অর্ডার মূল্য সংযোজনে স্থানান্তর করাও প্রয়োজনীয়। বিশ্ব বাণিজ্য ক্রমশ বিভিন্ন বাধা এবং ফিল্টারগুলির শিকার হচ্ছে। বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং

জাপানের উচ্চ-মূল্যমানের বাজারগুলি মূলত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এর কারণে ক্রমবর্ধমান বাধা। অতএব, নীতিগত হস্তক্ষেপগুলি প্রতিযোগিতামূলকতা নিশ্চিতকরণের জন্য সরবরাহ চেইন জুড়ে গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং চিহ্নিতকরণ বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করবে।

ভারত, তার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অন্যান্য কারণগুলির সাথে বেশিরভাগ পছন্দসই শুল্ক চুক্তি পুনরায় অর্জনের/হারানোর/ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, নীতিগত দিকনির্দেশগুলিও ভারতকে নতুন উন্নয়নশীল দেশের উত্থানের প্রতিপাদ্য প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে, অগ্রাধিকারের মর্যাদা হারাতে বা অন্য কথায়, একটি বৈশ্বিক অসহযোগিতামূলক বাণিজ্য পরিবেশের দিকে লক্ষ রাখবে।

কৃষিপ্রধান আমাদের দেশে বহু মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য মাছচাষের ওপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মাছ উৎপাদনশীলতার ক্রমবর্ধমান ও ক্রমান্বয় ধারাকে সঠিকভাবে ধরে রাখা একান্ত জরুরী। যাতে দেশীয় মাছচাষিরা উন্নত মাছ উৎপাদনের সাথে অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হয়, সেজন্য মাছচাষিদের কাছে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত কৃষি তথ্য পৌঁছে দিতে হবে কম সময়ে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে গতানুগতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাইবার সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় মাছচাষিদের তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ ও সুপ্রশিক্ষিত হতে হবে যাতে সঠিকভাবে মৎস্য সম্পদের ব্যবহার করতে এবং উৎকৃষ্ট মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শী হতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি বিস্ফোরণের যুগে যেখানে বিশ্বায়ন এক অনিবার্য বাস্তবতা সেখানে উন্নত দেশে মাছচাষিদের সঙ্গে সমানতালে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা প্রয়োজন। সেজন্য সাইবার সম্প্রসারণের প্রসার ঘটানো জরুরী। মাছচাষিরা অনেক সময় রোগ সংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পান না, কারণ মৎস্যবিজ্ঞানী, মৎস্য অধিকারিক ও মাছ চাষিদের মধ্যে রয়েছে যোগাযোগের অভাব। এই অভাব দূর করার জন্য সাইবার সম্প্রসারণ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সাইবার সম্প্রসারণ হল একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা বা বিস্তৃতির মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান, সংগ্রহণ, সঞ্চয় ও সঞ্চার। নিম্নলিখিতভাবে এই ধারণাটিকে বর্ণনা করা যেতে পারে-

(ক) সম্প্রসারণের পরিকাঠামো ও কার্যক্রমকে প্রথমে একটি সুনির্দিষ্ট প্রথার মধ্যে নিয়ে আসা যেমন- প্রশিক্ষণ, গবেষণার ফলাফল, পুকুরের বিভিন্ন সমস্যা (মাছের রোগ), বিপণন সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি বিষয়ে একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা।

(খ) বিভিন্ন বিষয়ে ওয়েবসাইট খোলা যেমন- মাছচাষ, আবহাওয়া, মাছ সংরক্ষণ, বিদেশের বাজারে মাছের চাহিদা প্রভৃতি।

(গ) জেলা, ব্লক, এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা গড়ে তোলা। টেলিযোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নয়নের পর গ্রামে এটা কোনও সমস্যা নয়।

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতানির্ভর প্রশিক্ষণগুলির উপরে ভিডিও ক্লিপিংস, বৈদ্যুতিন বই, আকর্ষণীয় স্বর, ও দৃশ্যপ্রক্ষেপণ ইত্যাদি সহযোগে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তোলা যায়।

(ঙ) সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির উদ্যোগে গ্রামোন্নয়নে যে কর্মযজ্ঞ চলছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত খতিয়ান তৈরি করা।

(চ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক সংকট থেকে সমুদ্রে মাছ ধরা বিষয়েও আগাম খবর পৌঁছে দেওয়া যায়।

সাইবার সম্প্রসারণ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যায়। নিরপেক্ষ বস্তুভিত্তিক তথ্যই প্রকৃত উন্নয়নে কাজে লাগে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ও কম্পিউটার স্বাক্ষর যুবক-যুবতীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। এর ফলে সাইবার সংক্রান্ত সম্প্রসারণ ঘাটতি হবে না। বিকেন্দ্রিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগত সুবিধা এনে দিয়েছে। বেকারত্ব বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য, গ্রাম স্তর পর্যন্ত সাইবার সম্প্রসারণ প্রসারিত হলে কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, শিল্প প্রসার ও আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্যোগ ও উৎসাহের সৃষ্টি হবে।

আমাদের যন্ত্রনির্ভরতা যতই বেড়ে যাক একথা অনস্বীকার্য যে মানবিক উদ্যোগ ও প্রক্রিয়া সমাজ বিকাশে এক অনিবার্য শাশ্বত সত্য। যন্ত্র মানুষের পরিপূরক, পরিপন্থী নয়, তাই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মানবিক উদ্যোগ মেলবন্ধন ঘটানো এক আবশ্যক সত্য। এখন সাইবার সম্প্রসারণে নিম্নলিখিত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত হয়েছে-

ক) মাত্রাতিরিক্ত তথ্যের সমাবেশ বিভ্রান্তি ঘটায়।

খ) তথ্যের সঙ্গে মূল্যের যোগ না ঘটালে তার চাহিদা থাকে না।

গ) কম্পিউটার স্বাক্ষরতার ঘাটতি থাকলে সাইবার সম্প্রসারণ পরিচালনায় সমস্যা দেখা দেবে।

ঘ) ভুল তথ্য বা বিকৃত তথ্য পরিবেশনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি হয়।

ঙ) প্রারম্ভিক ব্যয় সাধ্যের বাইরে থাকলে এর গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে।

আজকের তথ্যপ্রযুক্তি বিস্ফোরণের যুগে বিশ্বায়ন যেখানে অনিবার্য বাস্তবতা সেখানে মৎস্য চাষের উন্নয়নে সাইবার সম্প্রসারণকে গ্রামস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। আজ মাছচাষিরা চাইছে নতুন ও সুনির্দিষ্ট তথ্য সেজন্য সাইবার সম্প্রসারণের প্রসারের মাধ্যমে মাছচাষিরা সমৃদ্ধ হবেন।

মৎস্যজীবীরা রোদে জলে শীতে গ্রীষ্মে দিনে রাতে মাছচাষ ও মাছ ধরার কাজ করে চলেছেন এবং তাদের পরিশ্রমের জন্য দেশে এত মাছ উৎপাদন হচ্ছে অথচ তাদেরই দৌলতে মুনাফা হয় ব্যবসায়ী, আড়তদার, ভেড়িমালিক প্রভৃতিদের। ফলে তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দরকার মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক উন্নতি। মৎস্যচাষের কাজ একার দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করা সম্ভব নয়। সেজন্য মৎস্যজীবীরা সংঘবদ্ধ হয়ে একটি সমিতি গঠন করে যাতে সব সদস্যদের সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় এবং যেখানে সব সদস্যের অধিকার সমান থাকে। এই ব্যবস্থার নাম মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি।

মৎস্যজীবীদের সংঘবদ্ধ হতে হয় নানা কারণে, জলাশয় জোগাড় করা, পালন পুকুরে চারাপোনা তৈরি করা, মাছচাষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা ইত্যাদি। মৎস্যজীবীদের অবস্থার উন্নতি, পতিত জলার ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ, সংঘবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো, শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, পরিবেশ দূষণ রোধ, সঠিক দামে মাছ বিক্রি, সামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমে সমাজসেবা।

রাজ্যের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কার্যক্রম তিনটি ধারায় পরিচালিত হয়। গ্রামস্তরে প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, জেলাস্তরে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমিতি এবং রাজ্যস্তরে

শীর্ষসমিতি। গতানুগতিক পদ্ধতিতে শুধুমাত্র মাছ ধরার কাজ ছেড়ে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষে উদ্যোগী হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি জাতীয় উৎপাদনশীলতায় অনেকবার প্রথম স্থান লাভ করেছে।

সমবায় সমিতিগুলির প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন স্কিম করেছে। প্রাথমিক সমিতিগুলি তাদের সভ্যদের দেওয়া অংশগত মূলধনের দ্বিগুণ বা দশহাজার টাকা যেটি কম সেই টাকা রাজ্য সরকারের অংশগত মূলধন হিসাবে পায়। তাছাড়া প্রয়োজনীয় জাল ও নৌকা কেনার জন্য যে টাকার দরকার সেই টাকা সরকারের কাছ থেকে ৭৫% কর্জ এবং ২৫% অনুদান হিসাবে পায়। প্রয়োজনবোধে ম্যানেজারের বেতন অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়, এছাড়া মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির বিপণন, সরবরাহ ও বিতরণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিকে দেয়।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভ্যরা যেহেতু গরিব- তাদের নিজস্ব কোনও জলাশয় নেই। সরকার তাই তার নিজস্ব জলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে বন্দোবস্ত করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল ১৯৭৭-এ বিধান রেখেছে। এই অনুসারে সরকারের জলা বন্দোবস্তের ব্যাপারে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। অনেকক্ষেত্রে সমিতিগুলি সরকারের জলা পেয়ে সেখানে মাছচাষ করছে এবং তাতে মাছের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। সমিতির রেজিস্ট্রেশন হলে ইনকামট্যাক্স ডিউটি লাগে না। সমবায় সমিতি গঠিত হলে ব্যাঙ্কের ঋণ বা অনুদান পাওয়া যাবে। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় সমবায়ের অধীনে স্কুল, ইয়ুথ ক্লাব, সম্প্রসারণ শিক্ষা, সমবায় মাসিক পত্রিকা গড়ে ওঠে। মৎস্য সমবায় সমিতির কাজকর্মের মধ্যে ধার দেওয়া, ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগান দেওয়া, জিনিসপত্রকে বাজারজাত করা, উপদেশমূলক কাজকর্ম।

আড়তদারদের কাছ থেকেও মালোরা আজকাল টাকা ধার নেয়। অনেকে পুকুর লিজ নেয় । লাভ হলে হয়তো সেই টাকা ফেরত দিতে পারে। আর লোকসান হলে ঋণের দায়বদ্ধতায় জড়িয়ে পড়ে। সমবায় সমিতি মালো বা জেলেদের বর্তমানে নানারকমভাবে সাহায্য করে কিন্তু অনেকসময় মালোদের জন্য মাছের পোনা, সাইকেল, হাড়ি, মাছচাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এলেও তারা সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

মাছ বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে প্রাচীনকাল থেকে মিশে আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭ কোটি মানুষের অধিকাংশ প্রতিদিন খাবারের পাতে মাছ পেলে যার পর নাই খুশি হবেন এ বলার আর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্দেশীয় মৎস্য উৎপাদনের জন্য বিশাল জলসম্পদের অধিকারী। জল সম্পদের মাত্র ৪০-৪৫ শতাংশ এখনও পর্যন্ত মাছচাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বাকি সম্পদকে মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসার সময় এসে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতর এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কারণ বিগত ৩৩ বছরে মোট খাবার যোগ্য মাছ ও মৎস্য বীজের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যথাক্রমে ৩.৭০ লক্ষ টন থেকে ১১ লক্ষ টনের কিছু বেশি এবং ২৩০০ মিলিয়ন মৎস্যবীজ থেকে ১৯০০ মিলিয়ন, তাছাড়া মাছ, চিংড়ি ও মাছজাত দ্রব্য বিদেশে বিক্রি করে প্রায় ৬৫০ কোটির বেশি টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে দেশের চাহিদার শতকরা আশি ভাগ মৎস্যবীজই পশ্চিমবঙ্গ মিটিয়ে থাকে এবং ক্রমাগত মৎস্য উৎপাদনে জাতীয় সর্বোচ্চ শিরোপা পশ্চিমবঙ্গের দখলে। কিন্তু খাবার যোগ্য মাছ উৎপাদনে এ-রাজ্য এখনও চাহিদা অনুযায়ী পিছিয়ে আছে। এখনও আমাদের অন্যান্য রাজ্য যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও গুজরাটের মাছের উপর নির্ভর করতে হয়। তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের তৎপরতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য, কারণ ভারতবর্ষের যে কোনও রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের গড় মাছ উৎপাদন অনেক বেশি। কিন্তু চাহিদাও ততোধিক বেশি হওয়ায় অন্য রাজ্যের উপর এখনও নির্ভরশীল। তবে এরূপ অবস্থা থাকবে না যদি চাষিভাইরা তাদের জলাশয়গুলিকে মাছচাষের উপযুক্ত করে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষে ব্রতী হন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেলেদের সংখ্যা কত তার সঠিক হিসেব জানা নেই। ১৯৮১ সালের গণণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকার্জন করে এরকম জেলে পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৪১৬৯, জেলে-গ্রামের সংখ্যা ৩০৩ এবং জেলেদের সংখ্যা ৮৩৫৬১। বর্তমানে এই নানা কারণে যে ঢের বেড়েছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। প্রথমত, ১৯৮১ সাল থেকে লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশী জেলেদের পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ। তৃতীয়ত, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের এই পেশায় ক্রমশ যোগদান।

নদীতে দূষণ বেড়েছে। পরিবেশ কলুষিত হয়েছে। মাছ কমে গেছে। জেলেদের মাথায় হাত। ছয়-সিলিণ্ডার ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সামর্থ্য খুব অল্পজনের আছে। সমুদ্রে মৎস্যব্যবসা এখন বিত্তবানদের দখলে। অজাত-জেলেরা এখন জাত-জেলেদের বৃত্তি

ছিনতাই করে নিচ্ছে। বংশ পরম্পরায় জাল বেয়ে, মাছ ধরে, যাদের পেট চলত, জলের রং দেখে যারা মাছের ঝাঁক চিনত, আকাশের চেহারা দেখে আবহাওয়ার অবস্থা বুঝত, তারা এখন অন্নের সন্ধানে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নৌকো, জাল, দড়ি বিক্রি করে দিয়ে ভ্যান চালাচ্ছে। মজুরের কাজ করছে। গাঙে মাছ কমতে শুরু করলে জেলেদের সংসার আর চলে না। নৌকা, জাল, দড়ি বিক্রি করে সংসার চালায়। জেলে সম্প্রদায়ের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। যন্ত্রচালিত নৌকোর আবির্ভাব ঘটলো। মালিক হল শ্রমিক। হাতে বোনা জাল উঠে গেল। মেয়েরা হল কর্মহীন। দুর্দশা চরমে উঠল। কাকদ্বীপ, নামখানা, কুলপি, সুলতানপুর, দীঘা প্রভৃতি অঞ্চলে জেলেরা মাস মাইনে নয়, ভাগে কাজ করে। নদীতে মাছ ধরার সময় থাকা-খাওয়ার সমস্ত খরচ মালিকের। মাছ বিক্রির পর খাওয়া দাওয়ার খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যা থাকে তার ৬০ ভাগ পায় মালিক। ৪০ ভাগ জেলেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়। এরা বছরে আট মাস কাজ পায়। কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই। মালিক কাজে নিতে পারে, নাও নিতে পারে। যে কোনও সময় ছাড়িয়েও দিতে পারে। তাছাড়া আয়ও অত্যন্ত অনিশ্চিত। যে-সমস্ত জেলেরা ট্রলারে যায় আট মাসে তাদের গড় আয় ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা।

যারা ট্রলারে যেতে পারে না অথবা যাওয়ার সামর্থ্য নেই তারা হুগলী নদীতে হাতে-বাওয়া নৌকায় মাছ ধরে। এদের রোজগার যারা ট্রলারে যায় তাদের অর্ধেকেরও কম। মালিক শ্রমিকের মধ্যে ভাগাভাগির হার একই অর্থাৎ ৬০:৪০। একটা নৌকায় ৮/১০ জন যায়। নদীতে মাছ না থাকায় যে-কয়খানা হাতে-বাওয়া নৌকো আছে তাও বসে যাওয়ার যোগাড়। কারণ, নৌকো বের করলে লাভ না হোক, যদি খরচ না পোষায় তা হলে কেমন করে চলে। বাকিরা ভ্যান চালায়, চারাপোনার ব্যবসা করে। এছাড়া বাকিরা ক্ষুদ্রাকারে ভুসিমালের দোকান করেছে। কিছু বাড়তি রোজগারের আশায়। পুরুষমানুষের অবর্তমানে বাড়ির মেয়েরা ছেলেমেয়েদের সাহায্যে এই সমস্ত দোকানপাট চালায়। যাদের পুকুর আছে এবং যারা সেই পুকুরে মাছ চাষ করে, তারা প্রায় সকলেই পুকুরে জাল খাওয়ায়। এতে মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। জাল খাওয়ানোর সময় বৈশাখ মাস থেকে কার্তিক মাস। সকাল বেলায় জেলেরা জাল ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে গ্রামে ঘোরে। যেখানে কাজ পায় কাজ করে। সন্ধ্যেতে বাড়ি ফেরে। পুকুরের আয়তনের উপর মজুরি নির্ধারিত হয়। মোট যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা জাল ও মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। যদি একটা পুকুরে জাল খাওয়াতে দুটো জাল ও ৪ জন জেলের দরকার হয়। জাল এবং মানুষের সমান সমান ভাগ।

আজকের এই জেলে সম্প্রদায় পেশাগত দক্ষতা ও বংশানুক্রমে অর্জিত অভিজ্ঞতা জলাঞ্জলি দিয়ে যে কোনও পেশায় যুক্ত হচ্ছে শুধু প্রাণে বাঁচার জন্যে। এইভাবে নিঃস্ব জাত-জেলেরা একদিন নিজেদের পেশা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বর্তমানে নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। মাছ ধরে তাদের সংসার চলছে না। ফলে তাদের অন্য পেশা বেছে নিতে হচ্ছে। বর্তমানে মালোরা শিক্ষিত হচ্ছে। তাই তারা বংশানুক্রমে মাছধরাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে না। ফলে ধীরে ধীরে এই পেশা হারিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বায়ন কী, এর বৈশিষ্ট্য, উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে এই বিশ্বায়নের একটি সঠিক দিক সুফল ও তার কুফল মালো জাতির ওপরে কীভাবে পড়েছে তা দেখানো হয়েছে। পুকুর, নদী, খাল ভরাট করা হলে আইন প্রণয়ন করে সেগুলিকে বাঁচানোর জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করা হয়েছে যাতে সহজে পুকুর বা খাদকে ভরাট না করা যায়। সবুজ বিপ্লবের ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গিয়ে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে জল দূষিত হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জল বিনষ্ট হচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবসাদাররা মুনাফা লাভের জন্য অসৎ উপায়ে মাছের কারবার করছে। সেগুলোকে বন্ধ করা দরকার। মাছ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বায়ন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।

তথ্যসূত্র

১। Dey, Surjendu : *Fishermen of the Coastal Districts of Bengal : A Study in Socio Cultural Transformation,* Purusottam Publishers, Kolkata, 2012, p. 163

২। দে, সূর্য্যেন্দু : *জলসংকট ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়,* ইতিহাস অনুসন্ধান, পৃ. ২৯

৩। দে, সূর্য্যেন্দু : *কৃষিজীবী মৎস্যজীবী : একটি আর্থসামাজিক পর্যবেক্ষণ,* ইতিহাস অনুসন্ধান, ২৮, পৃ. ৩৩৭

৪। গোস্বামী, বিশ্বজিৎ : *সহজ কথায় মাছচাষ,* কলকাতা ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ২০৫-২০৬

৫। তদেব : পৃ. ২০৬

উপসংহার

উপসংহার

সেচ প্রকল্পে নদী বাঁধ, সড়কপথ, রেলপথের জন্য নদীতে সেতু নির্মাণ, নদীর পাশ থেকে জলধারাকে অন্যদিকে অন্যকাজে প্রবাহিত করার ফলে নদীর জলধারার গতি কমে যাচ্ছে, নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীতে জল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীর জলকেন্দ্রিক জীবন, জলকেন্দ্রিক সভ্যতা আজ বিপন্ন। নদীর বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে মাছ সহ সকল জলজ প্রাণী বিপন্ন।

মালোদের জীবন জীবিকা ও সভ্যতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে বংশ পরম্পরায় যারা জলের বুকে জীবন রেখে সভ্যতার ধারায় প্রবাহিত, তারা আজ জলের অভাবে মৃত নদীর মত। ডাঙায় জীবন যুদ্ধ চালিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের কূটকৌশল রপ্ত করতে শেখেনি বলে আজ জলে স্থলে সর্বত্রই মালো জেলে বিপন্ন। তাই এই নিশ্চিহ্ন হতে বসা মালো জাতির ইতিহাস, জীবনধারা, সমাজজীবন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও তাদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এই গবেষণাকর্ম। সামগ্রিক অভিসন্দর্ভটিতে যা যা আলোচিত হয়েছে এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে শেষপর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছি, তা প্রতিটি অধ্যায় ধরে এখানে দু'এক কথায় তুলে ধরা হল।

এছাড়া মালো জাতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সবশেষে এই গবেষণাকর্মটিতে অনুসৃত গবেষণা-পদ্ধতি (Research-Method) সম্পর্কে উল্লেখ করে 'ভূমিকা' সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে মালো জাতির উৎপত্তির ইতিহাস ও বিকাশ সংক্রান্ত তথ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ কীভাবে জীবনধারণ করত, অনার্য জাতির শ্রেণিবিভাগ ও ইতিহাস, আদিপর্যায়ে জাতিভেদ কেমন ছিল সেই সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা এই অধ্যায়ে আমরা পাই। কৈবর্ত, মালো, মৎস্যজীবী একই নাকি এদের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে তা বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত অবলম্বনে আলোচনা করা হয়েছে। মালো আর ঝালো মালো সম্প্রদায় কি এক না আলাদা, তাদের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, ঝালো মালোরা মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, মালোদের নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত পরিচয় কী তা তুলে ধরা হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে। মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণের 'ঝাল-মাল তত্ত্ব' গ্রন্থটির পাঁচটি প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে 'ঝাল-মাল তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে নিম্নবর্ণীয় জাতি

হিসেবে সংজ্ঞায়িত ঝাল-মালগণকে বর্ণসংকর জাতির মধ্যে তালিকাভুক্ত না করে ‘ক্ষত্রিয়’ অভিধায় অভিহিত করেছেন। সেই প্রসঙ্গগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাজ কী বা সমাজ কীভাবে গঠিত হয় তার সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসে মালোদের বৃত্তিজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি সামাজিক সত্য স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মালোদের অর্থনৈতিক জীবনের কথা। মালোদের দুরাবস্থা ও মহাজনী শোষণের কথাও জানা যায়। মালোদের শ্রেণিবৈষম্য, বৃত্তিবদল, শিক্ষা ইত্যাদিও সমাজজীবনের অঙ্গ। তার পরিচয়ও এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। মালোদের বাল্যবিবাহরীতি, উপভাষা, বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্যে প্রান্তবর্গীয়দের কথা কীভাবে এসেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। প্রাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, কথাসাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধসাহিত্যে এবং জীবনীগ্রন্থে মালো জাতির প্রসঙ্গ, জীবনযাত্রা, জীবনসংগ্রামের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃতি কাকে বলে, সংস্কৃতির অর্থ কী, লোকসংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়, ক্ষেত্রসমীক্ষা কাকে বলে, দক্ষিণ দিনাজপুরের ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে দুটি উপ অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে- বাংলা সংস্কৃতি ও মালো সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এবং মালোদের লোকসংস্কৃতি। বহুকাল ধরে বহু জনজাতির সাংস্কৃতিক প্রভাব বাঙালি জাতির ওপর পড়েছে। প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকেই মালোরা বিদ্যমান ছিল। তারা শিবের গাজন, বিষ্ণুর গান, রাম সীতার গান, মনসার পালাগান করতো। তাদের হাত ধরেই বাঙালি সংস্কৃতিতে এগুলি বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন রকমের গান, উৎসবের পাশাপাশি মালোদের ব্যবহৃত লোকসঙ্গীত, লোকদেবতা, লোকউৎসব, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন কী, ভারতে কবে থেকে বিশ্বায়ন শুরু হয়েছে, ধনতন্ত্র, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থা, শ্রম, মূলধন, অর্থনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা, সাইবার সম্প্রসারণ, বিশ্বায়নের সুফল, কুফল, মাছ চাষের বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, অনলাইন মাছ বিপণন ব্যবস্থাপনা, মালোদের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে।

সবশেষে প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলিকে তুলে ধরা হল এই উপসংহারে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা করতে গিয়ে এই বিষয় সংলগ্ন পরবর্তী গবেষণার সূত্র-নির্দেশও করা হল উপসংহারের শেষে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানচিত্র 'পরিশিষ্ট-ক' অংশে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার প্রচ্ছদ, মালোদের ব্যবহৃত নৌকা, জাল, মাছ ধরার সরঞ্জাম, গঙ্গাপুজো, জাল বোনার ছবি ও তথ্য 'পরিশিষ্ট-ক' অংশে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদনদী, বিল বাওড়, জেলা অনুযায়ী মাছের উৎপাদন, মৎস্যজীবীদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য এই 'পরিশিষ্ট খ' অংশে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

সর্বোপরি বলার, গবেষকের ব্যক্তিগত পাঠপ্রতিক্রিয়া জানানো এই গবেষণার লক্ষ্য নয়। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিষয়টিকে দেখার ওপরেই মূলত জোর দেওয়া হয়েছে। সেই আলোচনার সূত্রে অন্যান্য বিবিধ দিকও উঠে এসেছে এই গবেষণায়, যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তবে যে সব বিষয়-সূত্র নিয়ে বিস্তারিত ও পৃথক গবেষণার প্রয়োজন বোধ করেছি, সেগুলির প্রতি পরবর্তী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়-সূত্রগুলি নিম্নলিখিত-

- এই গবেষণায় চর্যাপদ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময়কালের বাংলা সাহিত্য এবং মালোদের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করা হয়েছে। মালোদের ভাষা নিয়ে আলোচনা হলেও ভাষা নিয়ে কাজ করার অবকাশ রয়েছে।

- বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ এসেছে সেই ধরনের গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রভাব বা গুরুত্ব কতটা তা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে একটি মাত্র অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে, এই আলোচনাটি নিয়েই একটি পৃথক গবেষণা হতে পারে। সাহিত্য নিয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা হতে পারে।

- কেবলমাত্র সাহিত্য আর ভাষাই নয় এই সময়ে দাঁড়িয়ে মালোদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত কাজের পরিসর রয়েছে।

- এই গবেষণা কাজটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। পৃথকভাবে ব্যক্তি লেখকদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আগামী দিনে অনেক সাহিত্য লেখক যারা মালো জাতি নিয়ে লিখছেন কিংবা নিজেরাও জাতিতে মালো তাদের মধ্যে অনেককেই নিয়ে পৃথকভাবে গবেষণা করা যেতে পারে, এবিষয়ে পরবর্তী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

- মালো জাতির উৎস ও বিকাশ নামক একটি অধ্যায়ে মালো জাতির ইতিহাস আলোচনা করা হলেও মালো জাতির ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-ক

পরিশিষ্ট-খ

পরিশিষ্ট-ক

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানচিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত মালোদের তথ্যাদি, ব্যবহৃত জাল, নৌকা, ঘরবাড়ি, দেবতা (দঃ দিনাজপুর), ভাসমান পত্রিকা (মালোদের পত্রিকা)র প্রচ্ছদ, প্রকাশকাল ও সূচিপত্রের চিত্রাদি

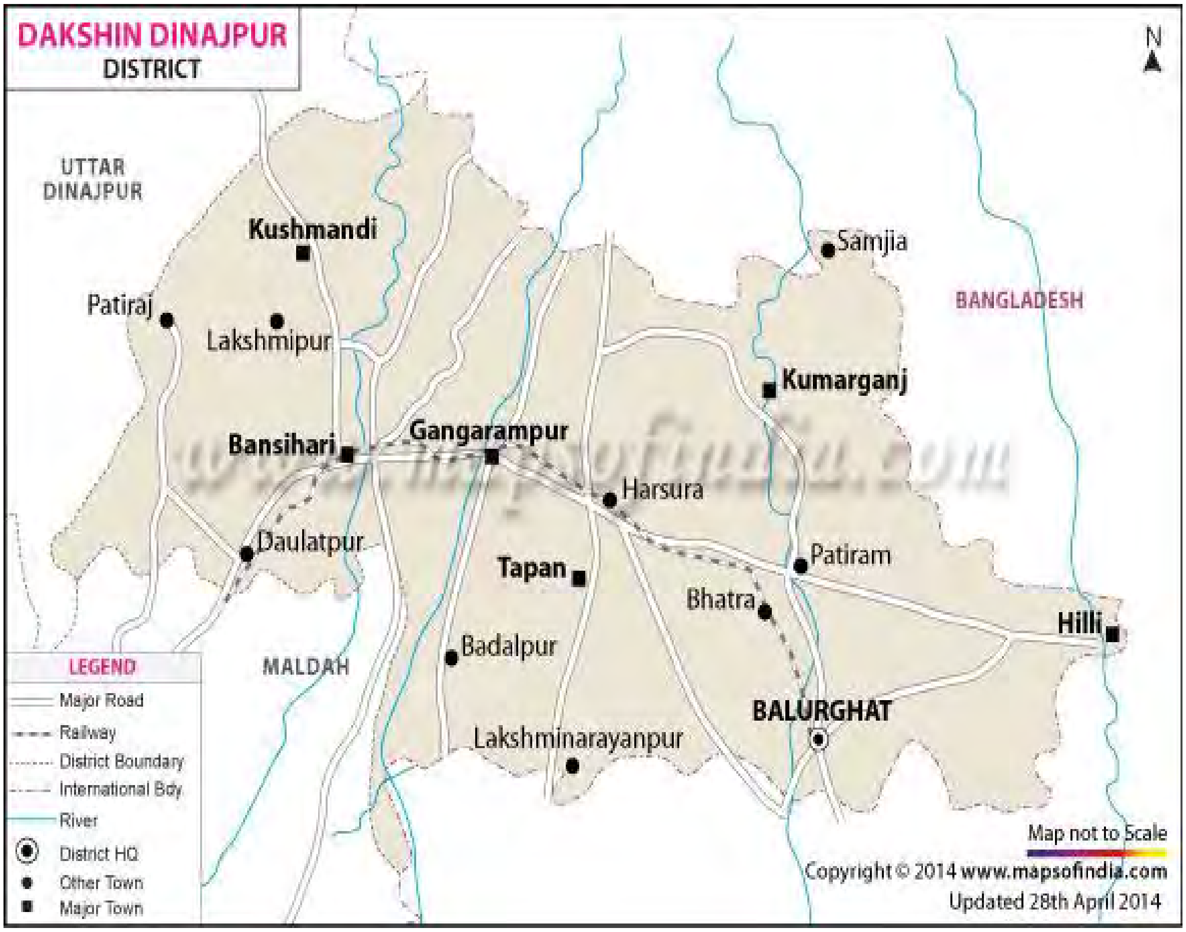

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানচিত্র

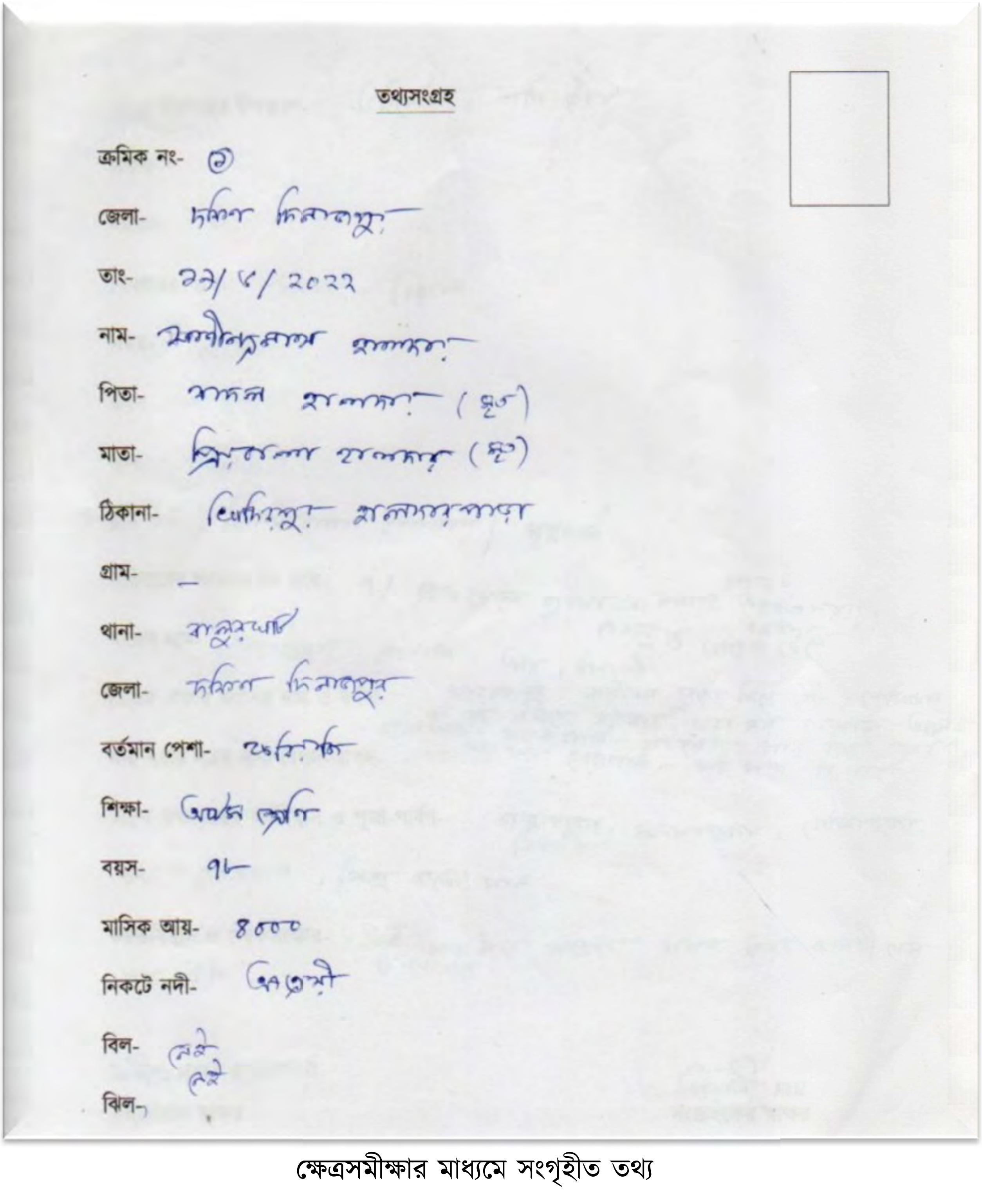

তথ্যসংগ্রহ

ক্রমিক নং- ৩

জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর

তাং- ২২/৪/২০২২

নাম- যতীন্দ্রনাথ হালদার

পিতা- মদন হালদার (মৃত)

মাতা- প্রিয়বালা হালদার (মৃ)

ঠিকানা- খিদিরপুর হালদারপাড়া

গ্রাম- —

থানা- বালুরঘাট

জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর

বর্তমান পেশা- অবসরপ্রাপ্ত

শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি

বয়স- ৭৮

মাসিক আয়- ৪০০০

নিকটে নদী- আত্রেয়ী

বিল- নেই

ঝিল- নেই

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য

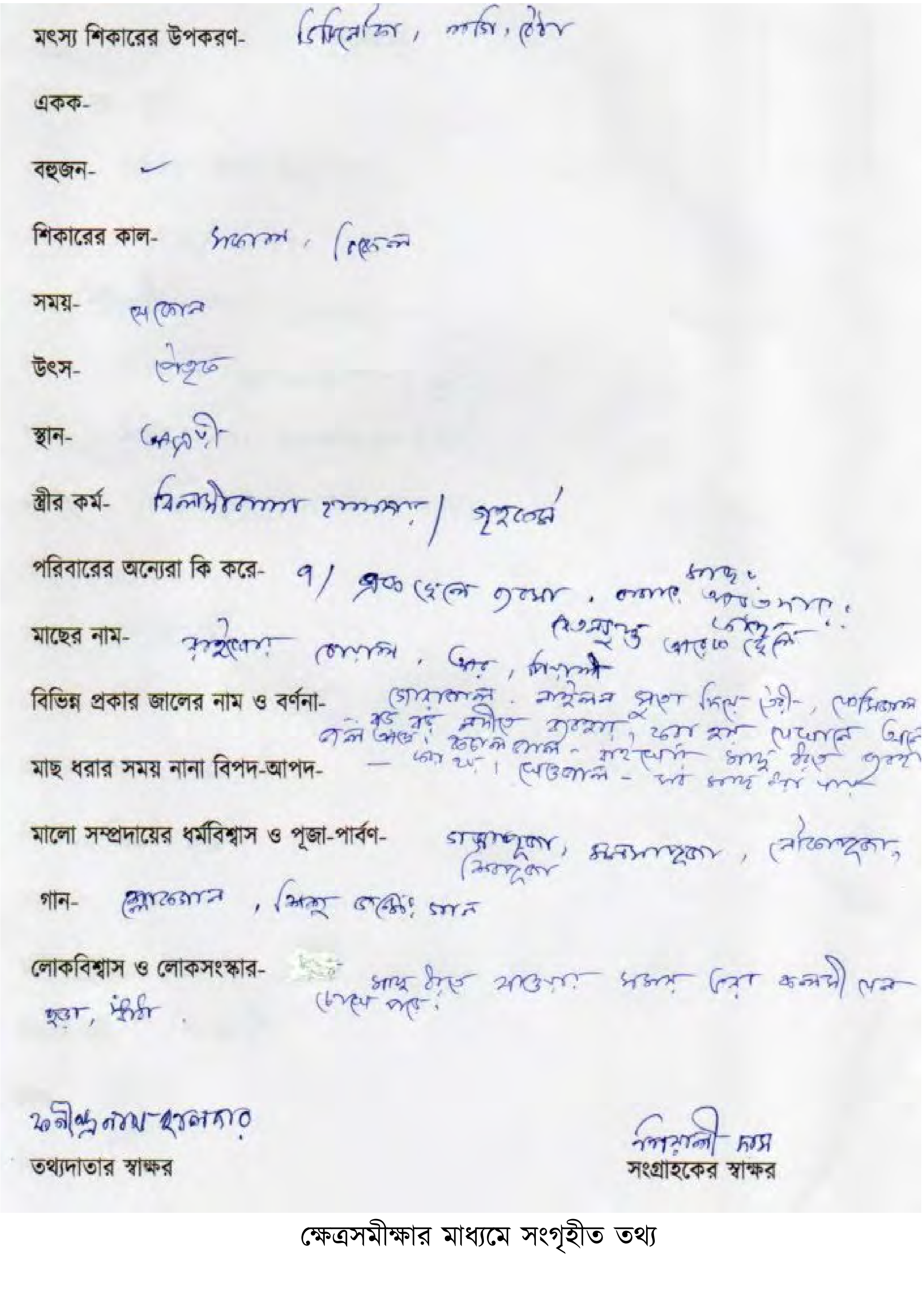

মৎস্য শিকারের উপকরণ- [illegible]

একক-

বহুজন- ✓

শিকারের কাল- [illegible]

সময়- যে কোন

উৎস- পৈতৃক

স্থান- [illegible]

স্ত্রীর কর্ম- [illegible] / গৃহকর্ম

পরিবারের অন্যেরা কি করে- ৭/ [illegible]

মাছের নাম- [illegible]

বিভিন্ন প্রকার জালের নাম ও বর্ণনা- [illegible]

মাছ ধরার সময় নানা বিপদ-আপদ- [illegible]

মালো সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ- [illegible]

গান- [illegible] গান

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার- [illegible]

[illegible]
তথ্যদাতার স্বাক্ষর

[illegible]
সংগ্রাহকের স্বাক্ষর

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য

তথ্যসংগ্রহ

ক্রমিক নং- ২

জেলা- দ. দিনাজপুর

তাং- ৫ই জুলাই ২০২২

নাম- কানাই হালদার

পিতা- রামচরণ হালদার (মৃত)

মাতা- কালিদাসী হালদার (মৃত)

ঠিকানা- ঐ

গ্রাম- দ: বালুপাড়া

থানা- কুমারগঞ্জ

বর্তমান পেশা- মাছ ধরা

শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি

বয়স- ৫২

মাসিক আয়- ৫০০০

নিকটে নদী- আত্রাই

বিল- কাকলা বিল

ঝিল- নেই

মৎস্য শিকারের উপকরণ- খেয়া জাল, ভেড়া জাল (ঘুঁটিয়ে জাল / বেড় জাল), ঝাঁকি জাল, ফাঁসি জাল।

১

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য

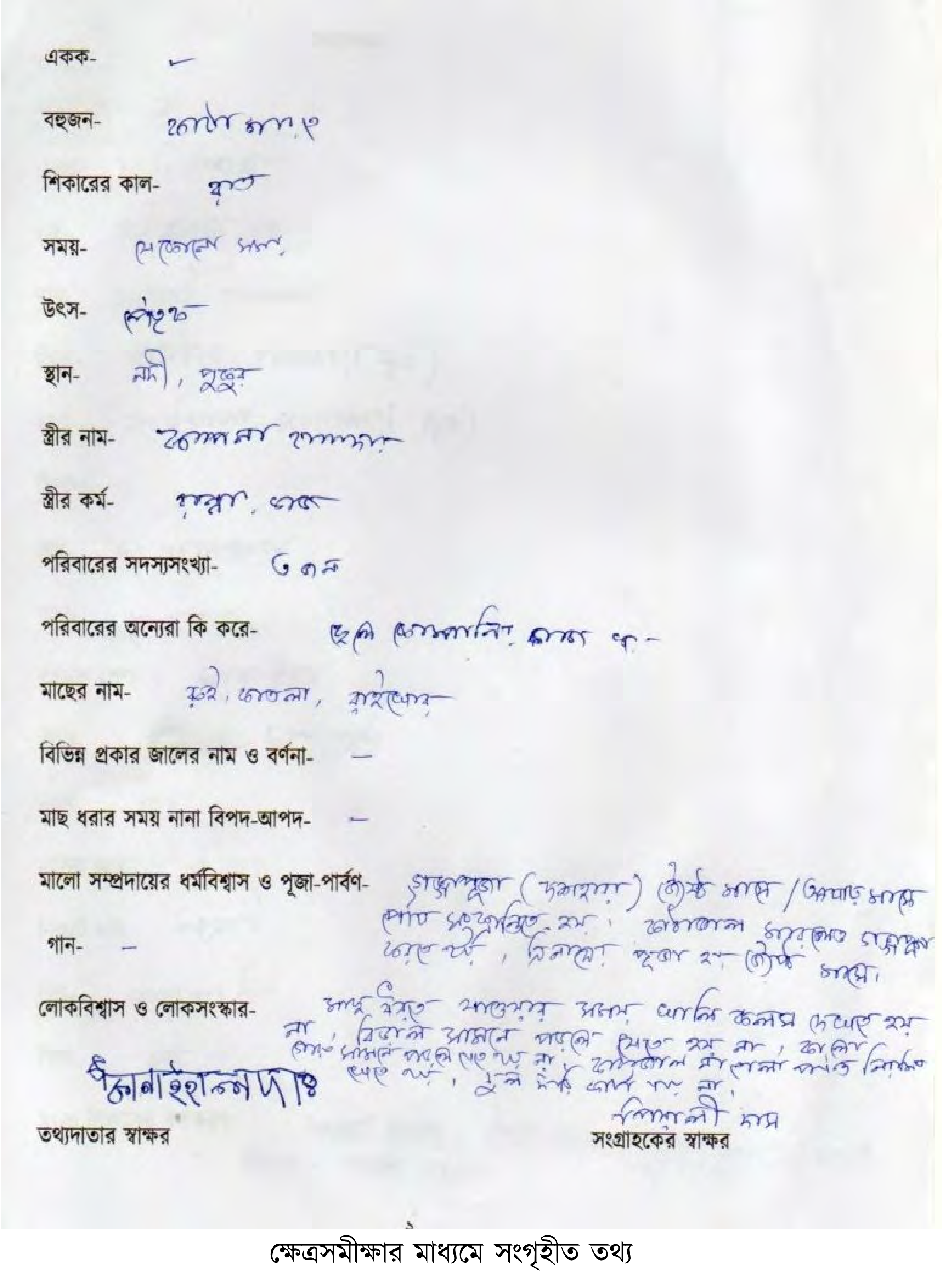

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য

ফণীন্দ্রনাথ হালদার

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দক্ষিণ বালুপাড়ার মালো কানাই হালদারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক

ঘের জাল

টাঙ্গন নদী

গঙ্গাপুজো

ছিপনৌকা

কোষা নৌকা

ডিঙি নৌকা

মালোদের ঘরবাড়ি

কচাল জাল

ভেসাল জাল

ভেসাল জাল বা খরা জাল

জাল বোনা

মাছ রাখার জায়গা

খলসেনি

মাছ রাখার পাত্র

পুনর্ভবা নদী

আত্রেয়ী নদী

জালে চেলা মাছ ধরা হয়েছে

রিং জাল

বল্লভপুরের মালো ফান্দি জাল দিয়ে মাছ ধরছে

ফান্দি জাল

শিব, পার্বতী ও মনসার মূর্তি

হিলির মালো পরিবার

হ্যাচারি

ডিম নিষিক্ত হওয়ার পর চৌবাচ্চায় রাখা হয়েছে

ডিমপোনা

ডিমপোনা সংগ্রহ করা হচ্ছে

সংগৃহীত ডিম পোনা

পালন পুকুর

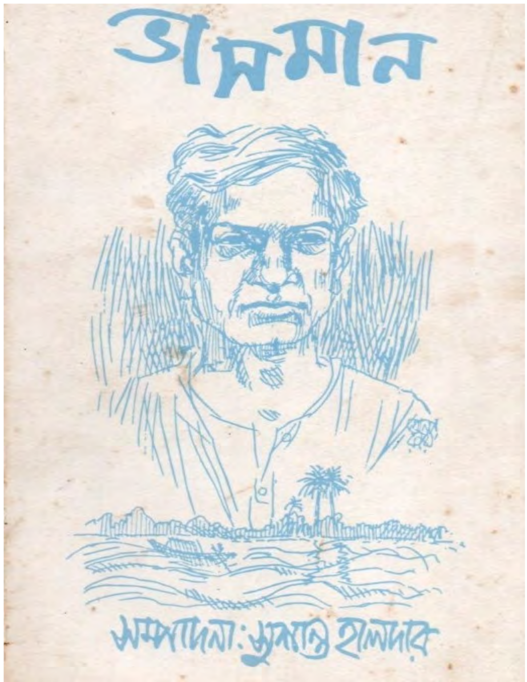

ভাসমান পত্রিকার প্রচ্ছদ

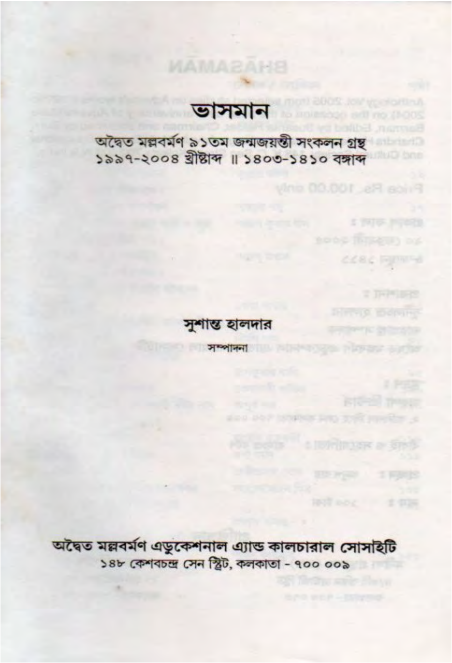

ভাসমান

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৯১তম জন্মজয়ন্তী সংকলন গ্রন্থ
১৯৯৭-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ ॥ ১৪০৩-১৪১০ বঙ্গাব্দ

সুশান্ত হালদার
সম্পাদনা

অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি
১৪৮ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভাসমান পত্রিকার প্রথম পাতা

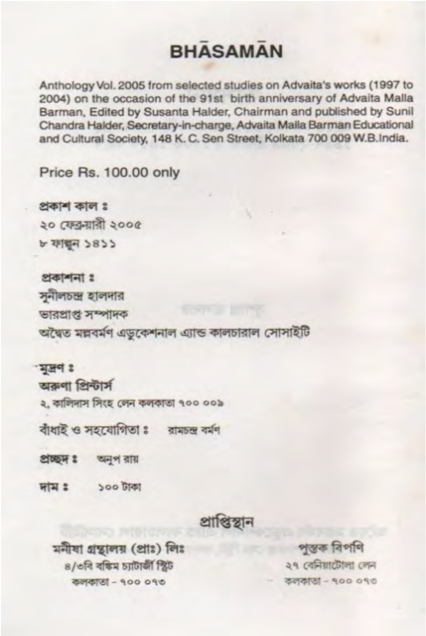

BHĀSAMĀN

Anthology Vol. 2005 from selected studies on Advaita's works (1997 to 2004) on the occasion of the 91st birth anniversary of Advaita Malla Barman, Edited by Susanta Halder, Chairman and published by Sunil Chandra Halder, Secretary-in-charge, Advaita Malla Barman Educational and Cultural Society, 148 K. C. Sen Street, Kolkata 700 009 W.B.India.

Price Rs. 100.00 only

প্রকাশ কাল :
২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
৮ ফাল্গুন ১৪১১

প্রকাশনা :
সুনীলচন্দ্র হালদার
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি

মুদ্রণ :
অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

বাঁধাই ও সহযোগিতা : রামচন্দ্র বর্মণ

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

দাম : ১০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ভাসমান পত্রিকার দ্বিতীয় পাতা

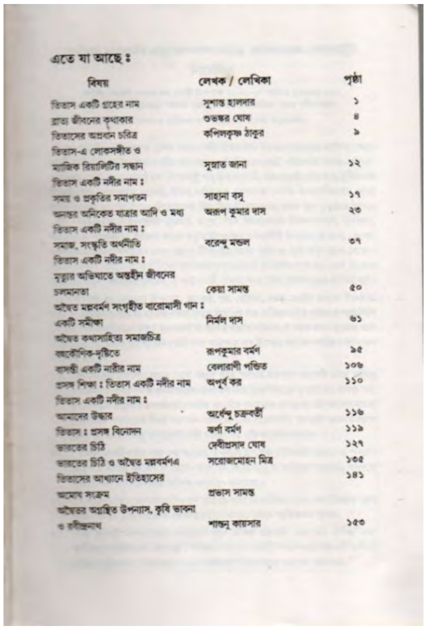

এতে যা আছে :

বিষয়	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা
তিতাস একটি গ্রহের নাম	সুশান্ত হালদার	১
ব্রাত্য জীবনের কথাকার	শুভঙ্কর ঘোষ	৪
তিতাসের অপ্রধান চরিত্র	কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর	৯
তিতাস-এ লোকসঙ্গীত ও ম্যাজিক রিয়ালিটির সন্ধান	সুস্নাত জানা	১২
তিতাস একটি নদীর নাম : সময় ও প্রকৃতির সমাপতন	সাহানা বসু	১৭
অনন্তর অনিকেত যাত্রার আদি ও মধ্য	অরূপ কুমার দাস	২৩
তিতাস একটি নদীর নাম : সমাজ, সংস্কৃতি অর্থনীতি	বরেন্দু মন্ডল	৩৭
তিতাস একটি নদীর নাম : মৃত্যুর অভিঘাতে অন্তহীন জীবনের চলমানতা	কেয়া সামন্ত	৫০
অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংগৃহীত বারোমাসী গান : একটি সমীক্ষা	নির্মল দাস	৬১
অদ্বৈত কথাসাহিত্যে সমাজচিত্র বহুকৌণিক-দৃষ্টিতে	রূপকুমার বর্মণ	৯৫
বাসন্তী একটি নারীর নাম	বেলারাণী পন্ডিত	১০৬
প্রসঙ্গ শিক্ষা : তিতাস একটি নদীর নাম	অপূর্ব কর	১১০
তিতাস একটি নদীর নাম : আমাদের উত্তর	অর্ধেন্দু চক্রবর্তী	১১৬
তিতাস : প্রসঙ্গ বিনোদন	স্বর্ণা বর্মণ	১১৯
ভারতের চিঠি	দেবীপ্রসাদ ঘোষ	১২৭
ভারতের চিঠি ও অদ্বৈত মল্লবর্মণএ	সরোজমোহন মিত্র	১৩৫
তিতাসের আখ্যানে ইতিহাসের অমোঘ সংক্রম	প্রভাস সামন্ত	১৪১
অদ্বৈতর অগ্রন্থিত উপন্যাস, কৃষি ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ	শান্তনু কায়সার	১৫৩

ভাসমান পত্রিকার তৃতীয় পাতা

পরিশিষ্ট – খ

মৎস্য বিভাগের ২০১৬ -২০১৭ সালের মৎস্য পরিসংখ্যানের হাতের বই থেকে সংগৃহীত মৎস্য ও মৎস্যজীবী সংক্রান্ত তথ্য

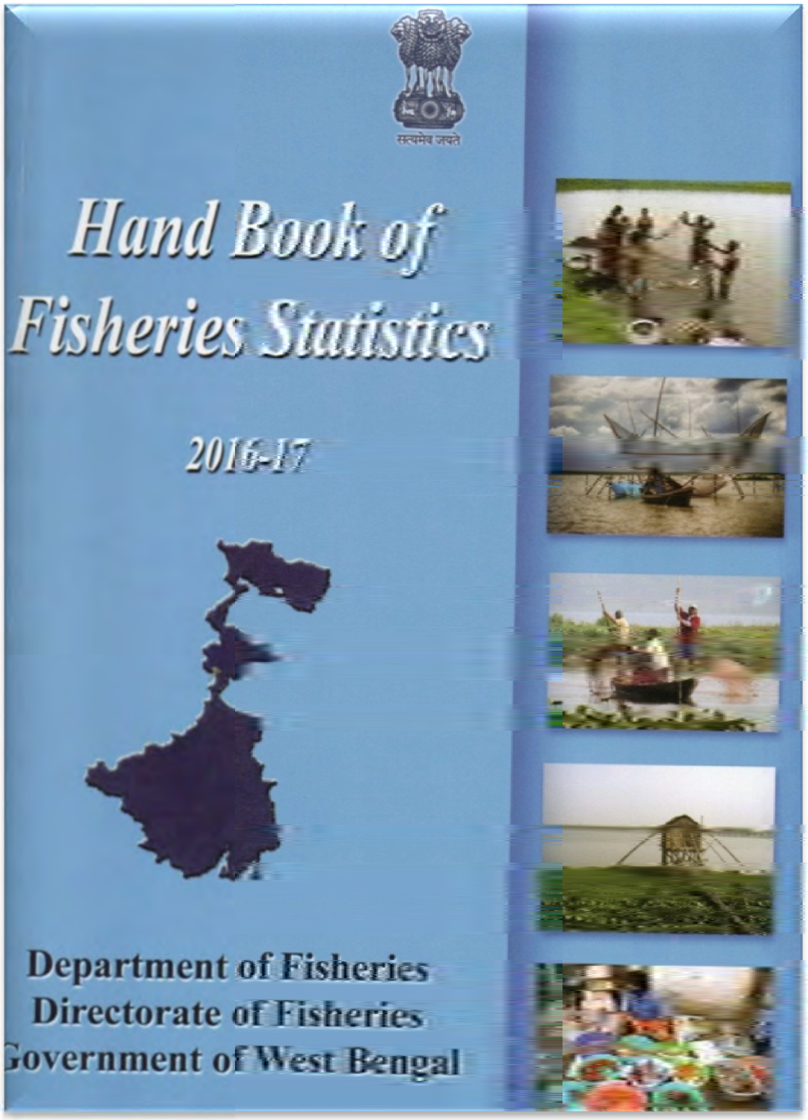

Hand Book of Fisheries Statistics (2016-2017)

Fishery resources

1. Inland sector

Sl. No	Type of Fishery Resource	Area (In lakh ha)
a. Impounded water System		
1.	Ponds/Tanks	2.88
2.	Beel & Boar	0.42
3.	Brackish water fishery	0.91
4.	Sewage fed fishery	0.04
	Total	4.25

Sl. No.	Type of Fishery Resource	Area (In lakh ha)
b. Open water System		
1.	Reservoir	0.28
2.	River	1.64
3.	Canal	0.80
4.	Estuarine	1.50
	Total	4.22

2. Marine sector

Sl. No.	Marine environment	Area
1.	Inshore area (Up to 10 fathom depth):	777 Sq. Km
2.	Offshore area (10-40 fathom depth):	1813 Sq. Km
3.	Continental shelf (Up to 100-fathom depth):	17049Sq. Km
4.	Coast line	158 km

Districtwise Impounded Fresh Water Area (Including Beel & Baor)

Sl.No.	Name of the District	Area (in ha)
01	Darjeeling	215
02	Kalimpong	12

03	Jalpaiguri	2025
04	Alipurduar	1037
05	Cooch Bihar	6118
06	Uttar Dinajpur	5157
07	Dakshin Dinajpur	9001
08	Malda	15325
09	Murshidabad	28348
10	Birbhum	21377
11	Purba Bardhaman	25038
12	Paschim Bardhaman	6142
13	Nadia	17895
14	North 24 Parganas	26008
15	Hooghly	23095
16	Bankura	22655
17	Purulia	18576
18	Howrah	6006
19	South 24 Parganas	49237
20	Paschim Medinipur	19961
21	Jhargram	3189
22	Purba Medinipur	25323
23	Kolkata	639
	Total	332379

Length of Some Important Rivers in West Bengal

Sl. No.	Name of River	Length (in Km)
1	Teesta	411

2	Torsha	145
3	Jaldhaka	186
4	Mahananda	360
5	Atrai	390
6	Mayurakshi	250
7	Bhagirathi	260
8	Ajoy	276
9	Damodar	542
10	Barakar	225
11	Punarbhaba	160
12	Subarnarekha	477
13	Keleghai	121
14	Rupnarayan	254
15	Haldi	24
16	Raidak	370
17	Churni	56

District wise Proposed Target of Inland (using all kinds of fishery) & Marine Fish Production during the year 2017-18 to 2020-21

Sl. NO.	District	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	Darjeeling(GTA)	252	256	261	266
2.	Kalimpong	202	205	209	213
3.	Darjeeling (Silliguri)	1258	1281	1304	1328
4.	Jalpaiguri	12733	12967	13203	13440

5.	Alipurdhuar	9015	9180	9348	9516
6.	Cooch Bihar	23402	23833	24267	24703
7.	Uttar Dinajpur	31775	32360	32949	33542
8.	Dakshin Dinajpur	54827	55836	56852	57876
9.	Malda	66144	67361	68587	69821
10.	Murshidabad	129861	132251	134658	137082
11.	Nadia	105417	107357	109311	111278
12.	Birbhum	76098	77498	78908	80329
13.	Paschim Bardhaman	18335	18672	19012	19354
14.	Purba Bardhaman	128292	130652	133030	135425
15.	Hooghly	106491	108450	110424	112411
16.	Howrah	46847	47709	48578	49452
17.	North 24-Parganas	206983	210791	214627	218491
18.	South 24-Parganas	194849	198434	202046	205683
19.	Purulia	47569	48444	49326	50213
20.	Bankura	48201	49088	49981	50881
21.	Paschim Midnapore	62613	63765	64926	66095
22.	Jhargram	8841	9006	9173	9344
23.	Purba Midnapore	173656	176851	180070	183311

Total		1553659	1582249	1611049	1640054
Marine					
1.	Purba Midnapore	135000	135000	135000	135000
2.	South 24 Parganas	65000	65000	65000	65000
Grand Total		1753659	1782249	1811049	1840054
Grand Total (in lakh ton)		17.54	17.82	18.11	18.40

Year wise Demand and Production of Fish in West Bengal (unit in lakh ton)

Year	Demand	Production	Deficit or Surplus
2010-2011	15.85	14.43	(-)1.42
2011-2012	16.06	14.72	(-)1.34
2012-2013	16.29	14.90	(-)1.39
2013-2014	16.51	15.80	(-)0.71
2014-2015	16.72	16.17	(-)0.55
2015-2016	16.95	16.71	(-)0.24
2016-2017	17.19	17.02	(-)0.17

District wise Number of Hatcheries in West Bengal

Sl. No.	District	No of Hatchery/Farm
1	Alipurduar	4
2	Jalpaiguri	3
3	Cooch Behar	17
4	Uttar Dinajpur	9
5	Dakshin Dinajpur	16
6	Malda	2
7	Murshidabad	18
8	Nadia	17
9	Birbhum	13
10	Burdwan	25
11	North 24 Parganas	119
12	South 24 Parganas	14
13	Hooghly	15
14	Howrah	4
15	Purulia	1
16	Bankura	141
17	Purba Medinipur	13
18	Paschim Medinipur	21
19	Govt. Hatchery- Under Directorate	5
	Under SFDC Ltd	8

Category Wise Fishermen Population 2016-2017

Sl. No.	District	SC	ST	General	OBC	Total	Male	Female
1	Darjeeling	592	741	1655	458	3446	1898	1548
2	Jalpaiguri	60287	4520	3017	7536	75360	49750	25610
3	CoochBehar	119984	305	1928	42362	164579	82499	82080
4	Uttar Dinajpur	40300	8121	22510	79069	150000	95000	55000
5	Dakshin Dinajpur	37057	10218	11904	10774	69953	55377	14576
6	Malda	23805	11807	46830	31220	113662	64374	49288
7	Murshidabad	252191	18012	58040	39761	368004	193860	174144
8	Nadia	179104	28117	68909	22735	298865	179322	119543
9	Birbhum	86800	3859	66860	59660	217179	123094	94085
10	Burdawn	45549	10131	61887	38585	156152	82909	73243
11	North 24 Parganas	202960	40800	203803	51000	498563	259253	239310
12	South 24 Parganas	172432	3248	231558	7827	415065	219984	195081
13	Hooghly	78902	12667	18767	35988	146324	76477	69847
14	Howrah	79441	817	12364	10161	102783	53490	49293

15	Purulia	61608	36914	13668	14484	126674	85874	40800
16	Bankura	28625	9638	32127	58118	128508	65552	62956
17	Purba Medinipur	95890	4433	34688	14757	149768	103264	46504
18	Paschim Medinipur	34500	1014	31645	4855	72014	37010	35004
Total		1600027	205362	922160	529350	3256899	1828987	1427912

Total, Rural & Urban Population as per Population Census 2011

Name	Total/Rural/Urban	Total Household	Total Population
WEST BENGAL	**Total**	**20380315**	**91276115**
WEST BENGAL	Rural	13813165	62183113
WEST BENGAL	Urban	6567150	29093002
Uttar Dinajpur	**Total**	**605674**	**3007134**
Uttar Dinajpur	Rural	532383	2644906
Uttar Dinajpur	Urban	73291	362228
Dakshin Dinajpur	**Total**	**396406**	**1676276**
Dakshin Dinajpur	Rural	339231	1439981
Dakshin Dinajpur	Urban	57175	236295

(উপরোক্ত তথ্যগুলি Hand Book of Fisheries Statistics 2016-17 Department of Fisheries Directorate Of Fisheries Government of West Bengal MEEN BHAWAN 31, GN Block, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata- 700091)

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১। উদ্‌দীন, জসীম : *জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা ৭৩, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০

২। উদ্‌দীন, জসীম : *রাখালী,* ঢাকা-১২১৭, পলাশ প্রকাশনী, পঞ্চদশ প্রকাশ জুন ২০১৬

৩। ওঝা, কৃত্তিবাস : *সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ,* কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৩৫৩

৪। ওসমান, শওকত : *শ্রেষ্ঠ গল্প শওকত ওসমান,* ঢাকা, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

৫। কর, সন্তোষ : *মুক্তামাছ,* পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪০১, দিঘলপত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ ২১ এপ্রিল ২০১৮

৬। গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন : *গল্প সমগ্র (অখণ্ড),* কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ আগস্ট ২০১২

৭। চৌধুরী, ঘনশ্যাম : *অবগাহন,* কলকাতা-১২, বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৯

৮। চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম : *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* কলিকাতা, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস, তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৮

৯। চক্রবর্তী, নটবর : *মৎস্যপুরাণম্ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীতম্,* কলিকাতা, ১৩১৬ সাল

১০। চক্রবর্ত্তি, মুকুন্দরাম : *সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী,* এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২১

১১। চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ জুন ২০১৯

১২। চট্টোপাধ্যায়, সাধন : *উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড),* কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮

১৩। জাহাঙ্গীর, নূরুদ্দিন : *জাল থেকে জালে,* ঢাকা-১১০০, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

১৪। জববার, আবদুল : *বাংলার চালচিত্র,* কলিকাতা ১২, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৩৭১

১৫। জলদাস, হরিশংকর : *জলদাসীর গল্প,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশকাল ৪ ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১১

১৬। জলদাস, হরিশংকর : *জলপুত্র,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

১৭। জলদাস, হরিশংকর : *দহনকাল,* ঢাকা ১১০০, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৫

১৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *খাপছাড়া,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৪৩

১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড সংস্করণ), কলিকাতা-৯, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি-২০০২।

২০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *ছড়া,* কলিকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৮০

২১। তর্করত্ন, পঞ্চানন : *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্,* কলিকাতা, ১৮২৭ শকাব্দ

২২। দাস, কাশীরাম : *সচিত্র কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত,* কলিকাতা, ১৩৩২

২৩। দাস, দিলীপ : *বিপিন মাঝির নাও,* ত্রিপুরা, ভাষা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

২৪। দাস, রেবতীমোহন : *অব্যক্ত কথাগুলি,* ত্রিপুরা, বর্ণমালা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৮

২৫। নটরাজন : *ইলিশজোড়,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭

২৬। বিশ্বাস, অচিন্ত্য : *বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল,* কলকাতা ০৯, অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

২৭। বিশ্বাস, পরিতোষ : *ঠিকানার খোঁজে,* শিমুরালী, নদীয়া, উদাসীন, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২৭ শে আষাঢ় ১৪০৯

২৮। বসু, রাজশেখর : *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত (সারানুবাদ),* কলকাতা-৭৩, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৪১৮

২৯। বসু, সমরেশ : *গঙ্গা,* কলকাতা-৯, মৌসুমী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭৪

৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ দাস, সজনীকান্ত : *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* কলিকাতা-০৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৩৫৭

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : *পদ্মানদীর মাঝি,* কলকাতা-৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৬ জুলাই ১৯৩৬

৩২। বর্মন, সুকুমার : *রুদিজলার মানুষ,* আগরতলা ত্রিপুরা, একলব্য প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৩৩। বসাক, ভুবনচন্দ্র : *বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ অষ্টম অধ্যায়,* কলিকাতা, ৮নং নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট, ১৮৮৬

৩৪। ভট্টাচার্য্য, রামেশ্বর : *শিবায়ন,* কলিকাতা, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেস ১৯৯৩

৩৫। মাহমুদ, আল : *গল্পসমগ্র/১,* ঢাকা-১১০০, অনন্যা, পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১

৩৬। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) : *বৃহৎ মনুসংহিতা,* কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৩২

৩৭। মৃধা, প্রশান্ত : *জল ও জালের তরঙ্গ,* ঢাকা-১১০০, রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম রোদেলা সংস্করণ একুশে বইমেলা ২০১৭

৩৮। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : *তিতাস একটি নদীর নাম,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুন ২০১৩

৩৯। রায়, বিধান : *অমাবস্যায় জ্যোৎস্নার আল্পনা,* আগরতলা ৭৯৯০০১, বুক ওয়ার্ল্ড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯

৪০। রায়, প্রফুল্ল : *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ নভেম্বর ২০১৬

৪১। রায়, বলরাম : *মৎস্যগন্ধা,* কলকাতা ৭৩, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লি, প্রথম প্রকাশ দোল পূর্ণিমা, ১৩৯৩

৪২। রায়, সঞ্জয় : *কৈবর্ত পদাবলি,* বাঁকুড়া-৭২২১৫৭, ঈশপ, প্রথম প্রকাশ ১ লা অক্টোবর ২০২০

৪৩। সেন, সুকুমার : *চর্যাগীতি পদাবলী,* কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫

৪৪। স্বামী, প্রভুপাদ : *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* যথাযথ, শ্রীমায়াপুর ৭৪১৩১৩, নদীয়া, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০

৪৫। সরকার, বিপদ ভঞ্জন : *জলঙ্গির পদ্মা,* কলকাতা- ০৭, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২১

৪৬। হালদার, বেবী : *কবে আমি বাহির হলেম,* কলকাতা ৭৩ দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৯

৪৭। হালদার, লিলি : *গহীন জলে মৎস্যকন্যা,* কলকাতা ৯৫ শব্দহরিণ, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১২

সহায়ক গ্রন্থ

১। আহমদ, ওয়াকিল : *জারি গান,* ঢাকা ১১০০, বইপত্র, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২

২। আহমদ, ওয়াকিল : *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ঢাকা-২, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬৫

৩। ইসলাম, শেখ মকবুল : *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব,* পদ্ধতি ও প্রয়োগ কলকাতা-০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১১

৪। ইসহাক, আবু : *সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান,* ২য় খণ্ড ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮

৫। ওদুদ, আব্দুল : *ব্যবহারিক শব্দকোষ,* কলিকাতা-৭৩, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, নূতন সংস্করণ ৩ রা আশ্বিন ১৩৬৯

৬। কর, পরিমল ভূষণ : *সমাজতত্ত্ব,* কলিকাতা-৭৩, দে বুক স্টোর, প্রথম প্রকাশ ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

৭। কায়সার, শান্তনু : *জন্মতবর্ষে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন,* সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা ০৬, সোপান, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০১৪

৮। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ : *মাছ আর বাঙালি,* কলকাতা ৯, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৮৯

৯। গোস্বামী, বিশ্বজিৎ : *রোজগারমুখী জিওল মাছের চাষ,* হুগলি-৭১২৩০৬, দেবী বুক স্টল, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৮

১০। গোস্বামী, বিশ্বজিৎ : *সহজ কথায় মাছচাষ,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৩

১১। গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ : *লোক সঙ্গীত বিভাকর,* কলিকাতা ১২, ফার্মা কে-এল প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৭ এপ্রিল ১৯৯৮

১২। ঘোষ, অজিতকুমার : *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ রথযাত্রা, ১৩৬২

১৩। ঘোষ, আলপনা : *মছলিশ,* কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

১৪। ঘোষ, প্রদ্যোত : *শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা ০৬, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২

১৫। ঘোষ, বিনয় : *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* কলিকাতা ১২, পুস্তক প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০

১৬। ঘোষ, বিনয় : *বাংলার নবজাগৃতি,* নয়াদিল্লী ১১০০০২, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৫

১৭। ঘোষ, বিনয় : *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব,* কলকাতা ০৬, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৮৬

১৮। ঘোষ, বিনয় : *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* ১৮০০-১৯০০, কলিকাতা-১২, পাঠভবন, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬০

১৯। ঘোষ, সমিত : *দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস,* কলকাতা ০৯, অমর ভারতী, দ্বিতীয় সংস্করণ মে, ২০২২

২০। ঘোষাল, ইন্দ্রাণী : *বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস,* দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-৭৪৩৬১৩, গ্রথন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৪

২১। ঘোষাল, ইন্দ্রাণী : *সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন,* তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোক সাহিত্য, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-৭৪৩৬১৩, গ্রথন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৬

২২। চৌধুরী, অমলভূষণ : *মাছ নিয়ে,* কলকাতা-৪০, এ. বি. চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৩

২৩। চৌধুরী, দুলাল, সেনগুপ্ত পল্লব : *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* কলকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩

২৪। চৌধুরী, নারায়ণ : *কথা-সাহিত্য,* কলিকাতা-১, কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

২৫। চৌধুরী, শীতল : *লোকসঙ্গীত চর্চা,* কলকাতা ০৯, রূপা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

২৬। চক্রবর্তী, এস : *আধুনিক মাছের চাষ ও মাছের যত্ন,* কোলকাতা-০১, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, পুনঃপ্রকাশ নভেম্বর ২০২১

২৭। চক্রবর্তী, বরুণকুমার : *গীতিকা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য,* কলকাতা-০৯, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৩

২৮। চক্রবর্তী, বরুণকুমার : *বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র,* কলিকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯৫৯

২৯। চক্রবর্তী, বরুণকুমার : *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* কলকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৯

৩০। চক্রবর্তী, বরুণকুমার : *লোককথার সাতকাহন,* কলকাতা ০৯, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯৮৪

৩১। চক্রবর্তী, বরুণকুমার : *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে,* কলকাতা ০৯, বুক ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

৩২। চক্রবর্তী, রংগন : আলাপ ১ বিষয় বিশ্বায়ন, কলকাতা ৪৫, এবং আলাপ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

৩৩। চক্রবর্তী, সুধীর : *সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ,* কলকাতা ০৯, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ২০১৩

৩৪। চক্রবর্তী, সুমিতা : *উপন্যাসের বর্ণমালা,* কলকাতা- ০৯, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৩

৩৫। চক্রবর্তী, সুমিতা : *শিল্পভাষার প্রবণতা : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস,* নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২

৩৬। চট্টোপাধ্যায়, আবীর : *বিশ্বায়ন গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি,* কলকাতা-৭৩, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৫

৩৭। চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি : *বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি* প্রথম খণ্ড, কলকাতা ০৯, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশণ, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০০

৩৮। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : *সাংস্কৃতিকী প্রথম খণ্ড,* কলিকাতা ০৯, বাক্ সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৩৬৭

৩৯। চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র : *মিশ্র মাছের চাষ বারোমাস,* কলকাতা ৭৩, দে’জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৬

৪০। জলদাস, হরিশংকর : *কৈবর্তকথা,* ঢাকা ১১০০, মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১৯

৪১। জলদাস, হরিশংকর : *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন,* ঢাকা ১০০০, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৮

৪২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রাশিয়ার চিঠি, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী শতবর্ষপূর্তি মুদ্রণ ১৩৭৬

৪৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : লোকসাহিত্য : রবীন্দ্র মননে ও সৃষ্টিতে, কলকাতা ৭৩, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৫

৪৪। দাশ, নির্মল : প্রসঙ্গ : লোকসংস্কৃতি ও ত্রিপুরা, কলকাতা-১২, অক্ষর পাবলিকেশনস, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩

৪৫। দাস, গোপালমণি : অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক গ্রন্থ ২০০৭, ত্রিপুরা, তফশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

৪৬। দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন : *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* প্রথম ভাগ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৮

৪৭। দাস, নরেন্দ্রনাথ : *রাণী রাসমণি (জীবন-চরিত),* কলিকাতা, ললিত প্রেস, প্রথম সংস্করণ ১৩২০ বঙ্গাব্দ

৪৮। দে, সূর্য্যেন্দু : *মাছ জল মৎস্যজীবী ১ম খণ্ড,* খাঁটুরা-৭৪৩২৭৩, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৪২৪

৪৯। দত্ত, গুরুসদয় : *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য,* কলকাতা ১৬, ছাতিম বুক্স, প্রথম প্রকাশ মে ২০০০

৫০। দত্ত, গৌরীপদ : *গহিন গাঙ : পাঠ ও প্রতিক্রিয়া,* নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২

৫১। দত্ত, শুভেন্দু বিশ্বাস, শুভ্রাংশু : *অ্যাকোরিয়াম ও রঙিন মাছ চাষ,* হুগলী-৭১২৩০৬, মেহনতি প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৫

৫২। দত্তগুপ্ত, শর্মিষ্ঠা : *বিষয় বিশ্বায়ন,* কলকাতা ৪৫, এবং আলাপ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

৫৩। ধর, প্রশান্ত কুমার : *চাষ ও পালনযোগ্য মাছের প্রজনন রীতি,* হুগলি- ৭১২৩০৬, দেবী বুক স্টল, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৯

৫৪। ধর, প্রশান্ত কুমার : *মাছ চাষের কথা,* হুগলি- ৭১২৩০৬, মেহনতি প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০১৮

৫৫। পাল, অমর চৌধুরী, দুলাল : *বাঙলার লোকসঙ্গীত স্বরলিপিসহ লোকসঙ্গীত সংকলন ও পর্যালোচনা,* কলিকাতা ২৯, আকাদেমি অব ফোকলোর, প্রথম প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৪৮

৫৬। প্রামাণিক, শঙ্করকুমার : *সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন,* কলিকাতা ৩৪, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

৫৭। ফারুকী, শহীদুল ইসলাম : *বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি,* ঢাকা, প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৮

৫৮। বাগচী, অমিয় কুমার : *সংস্কৃতি সমাজ ও অর্থনীতি,* কলকাতা ০৯, অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৫

৫৯। বালা, হীরালাল : *বাংলা পিডিয়া, চতুর্থ খণ্ড,* ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৩

৬০। বিশ্বাস, রণজিৎ কুমার : *লোক ঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ,* কোলকাতা ০৬, ইন্দিরা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৯৯৮

৬১। বিশ্বাস, রতন (সম্পাদনা) : *উত্তরবঙ্গের মেলা ও উৎসব,* কলকাতা ১০, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

৬২। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : *বাংলার লৌকিক দেবতা,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮

৬৩। বসু, নির্মলকুমার : *হিন্দুসমাজের গড়ন,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬

৬৪। বসু, রাজশেখর : *চলন্তিকা,* কলিকাতা-৭৩, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯

৬৫। বসু, লোকেশ্বর : *আমাদের পদবীর ইতিহাস,* কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৯১

৬৬। বসু, সুব্রত : *মাছ মেরি চ্যাণ্ডি (অনুবাদ),* নয়াদিল্লি ১১০০১৬, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

৬৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* কলকাতা-১২, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮০

৬৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* কলিকাতা-৯, সাহিত্যশ্রী, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭১

৬৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সাহিত্য আকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮

৭০। বর্মণ, দিগেন : *ছড়ায় মোড়া লোকায়ত জীবন,* কলকাতা ১২, ইতিকথা পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২১

৭১। বর্মণ, দিগেন বর্মণ, শ্রবণা : *নদীয়া নগর নৃসিংহপুর,* কলকাতা ১২, ইতিকথা পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০২২

৭২। বর্মণ, দিগেন : *মীনমঙ্গল,* কলকাতা-৯, প্রান্তর, প্রথম প্রকাশ মে ২০১০

৭৩। বর্মণ, দিগেন : *মল্ল-গীতিমাল্য,* পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩৮৬, যোধন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮

৭৪। বর্মণ, রূপ কুমার সরকার, কৃষ্ণ : *মালো জাতির ইতিহাস ও আকরগ্রন্থ,* কলকাতা ৭০০০৫১, কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২০

৭৫। বর্মণ, রেবতী : *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ,* কলিকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৫২

৭৬। বসাক, কমল : *মালদহের সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্য,* কলকাতা ০৯, অণিমা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪২২

৭৭। বসাক, শীলা : *বাংলার ব্রতপার্বণ,* কলকাতা-০৯, আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারী ২০০০

৭৮। ভৌমিক, খগেন্দ্রনাথ : *পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস,* কলিকাতা-৪২, মিত্রলোক, প্রথম সংকলন অক্ষয়তৃতীয়া ১৩৮৯

৭৯। ভৌমিক, নির্মলেন্দু : *প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত,* কলকাতা-৩৬, অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১

৮০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : *বাংলার লোক-শ্রুতি,* কলিকাতা-৪, পুরোগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৭

৮১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : *বাংলার লোক-সাহিত্য প্রথম : আলোচনা,* কলিকাতা- ১২ ক্যালকাটা বুক হাউস তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২

৮২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : *বাংলার লোক-সাহিত্য তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য,* কলিকাতা-৩৪, প্রদ্যোৎ কুটীর, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪

৮৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর : *অদ্বৈত মল্লবর্মণ,* কলকাতা ২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ২০০০

৮৪। ভট্টাচার্য, সুচন্দ্রা : *রাজবংশী ব্রতকথা,* কলকাতা- ৭০০১১১, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১২

৮৫। ভট্টাচার্য, হরশঙ্কর : *বাণিজ্যধারা অর্থনীতি ও পৌরনীতি,* কলিকাতা-১২, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯২৯

৮৬। মাইতি, চিত্তরঞ্জন : *লোকজগৎ ও লোকমানস,* কলিকাতা-০৬, সুমন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ রাসপূর্ণিমা ১৩৯৯

৮৭। মিত্র, অমরেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার সেন, সুকুমার প্রমুখ (সম্পাদনা) : *ভারতকোষ,* চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা-০৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৮৮। মিস্ত্রী, সুভাষ : *দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র,* কলকাতা-১৫০, লোক প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০০

৮৯। মুখার্জী, ঈশিতা দত্তগুপ্ত, দেবু ভট্টাচার্য, সোমনাথ : *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা* দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ৭ নভেম্বর, ২০০০

৯০। মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা : *অর্থনীতি, সমাজ ও*
খাসনবিশ, রতন *সংস্কৃতি অশোক রুদ্র*
সিংহরায়, প্রবীর *স্মরণে,* কলকাতা-৭৩,
পিপলস্ বুক সোসাইটি
প্রথম প্রকাশ বইমেলা
২০০৭

৯১। মুখোপাধ্যায়, সুশোভন : *প্রাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন,* কলকাতা ০৯, করুণা প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪১৩

৯২। মুরশিদ, গোলাম : *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* ঢাকা ১১০০, অবসর, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৯৩। মজুমদার, দিব্যজ্যোতি : *লোককথার ঐতিহ্য,* কলকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৮ এপ্রিল ১৯৫১

৯৪। মজুমদার, রমেশচন্দ্র : *বাংলাদেশের ইতিহাস,* কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৫২

৯৫। মজুমদার, সমরেশ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি,* কলকাতা ০৯, রত্নাবলী, ১৯৯০

৯৬। মণ্ডল, উৎপল মোদক, রীতা (সম্পাদিত) : *বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধচর্যা ১৯০১-১৯৪৭,* কলকাতা ০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৪

৯৭। মণ্ডল, কিরীটিভূষণ : *শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মালো জাতির জীবন প্রবাহ,* কলকাতা ১২, সোহিনী মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৯

৯৮। মল্লিক, শ্রীহর্ষ : *প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা,* কলিকাতা-০৯,পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৫

৯৯। মল্লবর্মণ, মহেন্দ্রনাথ : *দ্বিতীয় বর্ণ (ক্ষত্রিয়) বা ঝাল-মাল তত্ত্ব,* ময়মনসিংহ, সেন ব্রাদার্স প্রেস, ১৩২১

১০০। রায়, অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী : *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* কলকাতা ১২, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

১০১। রায়, গিরিজাশংকর : *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ,* আসাম, এন এল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫ শে বৈশাখ ১৯৯৯

১০২। রায়, ধনঞ্জয় : *উত্তরবঙ্গের লোকজীবন চর্যা,* কলিকাতা- ০৯, ভোলানাথ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬২

১০৩। রায়, নীহাররঞ্জন : *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, অষ্টম সংস্করণ বৈশাখ ১৪২০

১০৪। রায়, নরেন্দ্রনাথ : *সভ্যতা – সংস্কৃতির সন্ধানে উত্তরবঙ্গের লোকদেবদেবী ও লোকাচার,* কলকাতা-৭৩, ছায়া পাবলিকেশন্, প্রথম প্রকাশ উত্তরবঙ্গ বইমেলা ২০১২

১০৫। রায়, প্রহ্লাদ দত্ত, অভিষেক : *অভিব্যক্তি : শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ,* সোলাপুর মহারাষ্ট্র, লক্ষী পুস্তক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৩

১০৬। রায়, বিধান (সম্পাদিত) : *অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্ম শতবার্ষিকী স্মারকগরন্থ,* ত্রিপুরা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

১০৭। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪

১০৮। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার* অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০০০

১০৯। সাত্তার, মুহাম্মদ আবদুস : *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* কলকাতা ০২, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯

১১০। সান্যাল, মালা : *পশ্চিম দিনাজপুর সেকাল ও একাল,* কলকাতা-০৯, অণিমা প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪২৫

১১১। সামন্ত, প্রভাসচন্দ্র : *নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস,* কলকাতা ৭৩, প্রভা প্রকাশনী, ২০০৪

১১২। সুর, অতুল : *ভারতের বিবাহের ইতিহাস,* কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম পরিবর্ধিত আনন্দ সংস্করণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

১১৩। সেন, ক্ষিতিমোহন : *জাতিভেদ,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫৩

১১৪। সেন, ক্ষিতিমোহন : *ভারত পরিক্রমা,* কলকাতা-০৯, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৪

১১৫। সেন, ক্ষিতিমোহন : *ভারতের সংস্কৃতি,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ ১ লা কার্তিক ১৩৫০

১১৬। সেন, ক্ষিতিমোহন : *হিন্দুধর্ম,* কলকাতা ০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮

১১৭। সেন, সৌমেন : *লোকসংস্কৃতি : তত্ত্ব-পদ্ধতি,* কলকাতা ০৯, অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮

১১৮। সেনগুপ্ত, পল্লব : *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ২০১০

১১৯। সোম, সুস্মিতা : *মালদহ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোক উৎসব,* কলকাতা-০৬, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৩

১২০। সোম, সুস্মিতা : *মালদহ ভাষা-শিক্ষা* সাহিত্য-সংস্কৃতি, কলকাতা ০৬, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬

১২১। সম্রাট, খন্দকার মোহাম্মদ আলী : *প্রাণের সুর ভাওয়াইয়া,* ঢাকা ১১০০, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১২২। সরকার, পবিত্র : *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি,* কলকাতা- ৭৩, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩

১২৩। সরকার, সঞ্জীব রায়, অরুণকুমার : *লোকায়ত সংস্কৃতি পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা,* কলকাতা ১৬, উইলিয়ম কেরী স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬০

১২৪। হাই, শাহ্ মো. আব্দুল : *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি,* ঢাকা, বিদ্যাধন প্রকাশনী, ১৪ তম প্রকাশ মে-২০২১

১২৫। হালদার, গোপাল : *সংস্কৃতির বিশ্বরূপ,* কলিকাতা ০৬, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৬০

১২৬। হালদার, গোপাল : *সংস্কৃতির রূপান্তর,* কলিকাতা, পুথিঘর, তৃতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৫৬

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

১। Barman, Rup kumar : *CASTE, CLASS AND CULTURE,* New Delhi 110002, Ambika Bawan, First Published 2020

২। Barman, Rup kumar : *Fisheries and Fishermen (A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal)* Delhi 110094, ABHIJEET PUBLICATIONS, First Published 2008

৩। BLACK, ADAM BLACK, *CHARLES* : *THE ENCYCLO-PAEDIA BRITANNNICA* VOL.XIII EDINBURG, EIGHTH EDITION

৪। Dey, Surjendu : *FISHERMEN OF THE COASTAL DISTRICTS OF BENGAL,* Kolkata 35, Purushottam Publishers, First Published October 2012

৫। Hunter, William Wilson : *Imperial Gazetter Of India,* Vol. VII, LONDON, TRUBNER & CO, SECOND EDITION 1886

৬। Risley, H.H : *The Tribes and Castes Of Bengal,* Vol. II Calcutta Firma Mukho-padhyay, Reprint edn, 1981

৭। Wise, James : *Notes on the Races, Castes And Trades of Eastern Bengal,* London, Harrison And Sons 1833

সহায়ক পত্রিকা

১। বাগচী, আনন্দ : *সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া,* দেশ, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা ১৯৮৮

২। ঘোষ, শুভঙ্কর : *নদী : বাংলা উপন্যাস নীল-লোহিত,* বিশেষ নদী সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০১

৩। চক্রবর্তী, মনোনীতা (সম্পাদনা) : *চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে,* ইসলামপুর-উত্তর দিনাজপুর, দাগ উৎসব সংখ্যা ২০১৭

৪। দত্ত, উৎপল : *এপিক থিয়েটার সংখ্যা ৩,* কলকাতা- ৯১, নাট্য শোধ সংস্থান, ১৯৮৩

৫। মিত্র, সনৎকুমার : *লোকসংস্কৃতি গবেষণা (ত্রৈমাসিক পত্রিকা),* কলকাতা ৩৪, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল মে জুন ২০০৬

৬। মণ্ডল, কল্যাণী : *নীরাজনা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা (মৎস্য সংখ্যা),* কলকাতা ১০, শারদীয়া- ১৪২২

৭। হালদার, সুশান্ত (সম্পাদনা) : *ভাসমান-১,* কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৭

৮। তদেব : *ভাসমান-২,* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৮৬ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ১৪০৬ বঙ্গাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ৩০ জানুয়ারি ২০০০

৯। তদেব : *ভাসমান-৩* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৮৭ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ১৪০৭ বঙ্গাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ২৮ জানুয়ারি ২০০১

১০। তদেব : *ভাসমান-৪* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৮৮ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ২৭ জানুয়ারি ২০০২

১১। তদেব : *ভাসমান-৫* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৮৯ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ১৯ জানুয়ারি ২০০৩

১২। তদেব : *ভাসমান-৬* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৯০ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

১৩। তদেব : *ভাসমান* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৯১ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন গ্রন্থ ১৯৯৭-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

১৪। তদেব : *ভাসমান-৮* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৯২ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ২৯ জানুয়ারি ২০০৬

১৫। তদেব : *ভাসমান (তিতাস* একটি নদীর নাম প্রকাশনার সুবর্ণ জয়ন্তী ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৯৩ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ২০০৭), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ২০০৭

১৬। হালদার, খগেন্দ্রনাথ : *ভাসমান ১০* (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৯৬ তম জন্মজয়ন্তী সংকলন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

১৭। বর্মণ, দিগেন : ভাসমান (অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মশতবর্ষ স্মারক সংখ্যা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা ০৯, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ১ লা জানুয়ারি ২০১৪

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯
অতুল সুর ১৭
অমিত গুহ ১৮৫
অন্নদামঙ্গল ১২১
অম্বালিকা ৩৯
অম্বিকা ৩৯
অম্বুবাচী ২৫২
অম্বষ্ঠ ১৮, ৩২
অসমোসিস ২৯৫
অ্যাকিউমুলেশন ২৭৩
অ্যাজিটেশনাল প্লে ১৮০, ১৮১, ১৮২
আখড়া ১১৭
আত্রেয়ী ২০৯
আদিমল্ল ৪১
আদ্রিকা ৩৮
আধানিবিড় ২৯০
আনন্দবাবু ৭৯
আনন্দ বাগচী ১৩০
আবু ইসহাক ২৭
আব্দুল বারি ১৮২
আর্যাবর্ত ১৬
ইচাখালি ৯৬, ২২১, ২২২
ইলিশজোড় ৭৬, ৮৬, ১৪৩, ২২০
উদয়তারা ২১৯, ২৬০
একাঙ্ক নাটক ১৮৩
এণ্টারোব্যাক্টেরিয়াসি ভিব্রিও ২৯৫
এলিট ২৭৬, ২৭৭
ঐতরেয় ১৭
ঐতরেয় আরণ্যক ১৪
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৪
কাঁটাজাল ২৫৬, ২৫৭
কাথিয়াওয়াড় ৪২
কালুমল্ল ৪১
কালোবরণ ৮০
কুশপুত্তলি ১৩৬
কৈবর্ত ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৫, ৬৬, ৮৭, ৮৮, ৯৬, ৯৭, ১০১, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৪৩, ১৪৪, ২০৮
কমিউনিস্ট ১৮১, ১৮২
করণ ১৮, ৩২, ৪২, ৫৬, ৬৬
ক্ষেত্রসমীক্ষা ২০৭, ২১০, ২৩৪, ২৫৬
খিদিরপুর ২৩৪, ২৪০, ২৫৬
গাজন ২২৩, ২৪০, ২৫৮
গলুই ২৪৬, ২৪৮, ২৫৭
গলুই পুজো ২৪৮

গহিন গাঙ ৭৬, ৮৮, ৯০, ৯৫
৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১৩৩
১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ২১৯, ২৫৩
গঙ্গা ৭৬, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৮,
৯০, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯,
১০০, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২,
২৪৩, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৫৮
গঙ্গাপূজা ১৭২, ২৫০, ২৫৭
গম্ভীরা ২২৫, ২২৬
চটকা ২৩০-২৩১
চিত্রাঙ্গদ ৩৯
চলন্তিকা ২৭
চড়ক ২০৯, ২২৩, ২২৪, ২৩৯,
২৪০
ছড়া ২০৯, ২৫৯
জাতীয় মৎস্যনীতি ২৯৬-২৯৮
জারি গান ২৩১, ২৩৫
জাল থেকে জালে ৮৮, ৯২, ১৫০
জল ও জালের তরঙ্গ ৭৬, ৮৮, ৯২,
১৪৬
জলপুত্র ৭৬, ৯১, ২২১, ২২৩,
২২৪, ২৫০, ২৫৬
জসীম উদ্‌দীন ১৬২-১৬৪
ঝালো মালো ৩৩, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৬,
৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৪
ঝালমাল বান্ধব ৫০, ৬৪
ঝর্ণা বর্মণ ১৬৮, ১৮৯
ডালা পুজো ২৪৬
তিতাস একটি নদীর নাম ৭৫, ৭৮, ৮৭,
৮৮, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১২৫,
১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯,
২১৮, ২৩৪, ২৩৬, ২৫০,
২৫১, ২৫৮, ২৬০, ২৬১
ত্রিনাথের গান ২২৭
ত্রিনাথের পুজো ২৪৬-
২৪৭
দিগেন বর্মণ ১৯১
দিনাজপুর ২০৭-২০৮
দক্ষিণ দিনাজপুর ২০৮,
২০৯, ২৩৪, ২৫৬
দক্ষিণরায় ৪৬, ৪৭,
২৪২, ২৪৩, ২৫৩
দহনকাল ৭৬, ৯১, ২২১,
২৫৬
ধাঁধা ২০৯, ২৬০
নাটাই ব্রত ২৩৭-২৩৮
নিষাদ ১৫, ২৮-২৯, ৩১,
৬৫, ৬৬
নৌকা বাইচের গান
২২৬-২২৭
নৌকাবরণ ২৪৫-২৪৬
নকশাল- আন্দোলন
১৩৩
পরিতোষ বিশ্বাস ১৫৮,
১৬৫-১৬৭, ১৮৮-১৮৯
প্রবাদ ২০৯, ২৬০-২৬১
বারোমাসি গান ২৩৩
বিজয় নদী ৭৮, ১২৬,
১২৭
বিধান রায় ১৬৭

বিশ্বায়ন ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ৩০৪
বেবী হালদার ১৯৩-১৯৮
বোলান ২১১-২১৩
বৃহদ্ধর্মপুরাণ ১৭, ১৮, ৩১
ব্রাত্য ২৩, ২৪, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৯৩, ১০৩
ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ৪২, ৫৩, ৫৬, ৫৯
বর্ণসংকর ৫০, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৬
বর্ত ২৮, ২৯
বল্লাল সেন ১৭
ভাওয়াইয়া ২৩২
ভাটিয়ালি ২০৯, ২৩২-২৩৩
ভাসমান ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫, ৩২২
মাকাল ২৪১, ২৪২
মাকাল ব্রত ২৩৭
মালো পাড়ার মা ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫
মাহিষ্য ৩৭, ৩৮, ৬২, ৬৭
মঙ্গলা ২৪৩
মল্লযুদ্ধ ৪৩, ৬৬, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১২০
মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণ ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৭
মৎস্যগন্ধা ৩৮, ৫৯, ৬০, ৮৫, ১০৩, ১৩৭
মৎস্য দশ ৮২
রুদিজলার মানুষ ৮৬-৮৭, ১৮৬-১৮৭
রূপকুমার বর্মণ ৪৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৫, ১৫৯-১৬২
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩৬
লিলি হালদার ১৬৮
শিবায়ন ১১৯
শফরাধিপ ২২১
সাঁইদার ৯৯
সাইবার ২৯৮, ২৯৯, ৩০০
সোঁতি ১৫৪
সোনা রায় ২২৭-২২৮
সাবাড় জাল- ১৪১, ১৪২
সবুজবিপ্লব ২৮৬, ২৯৪, ২৯৫, ৩০৪
হাজরা পূজা ২৩৯-২৪০
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
Colonel Tod ৪২
Residual effect ২৯০
Zalim Singh Jhala ৪৩

আলোচনাসভায় গবেষণাকর্মের বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ উপস্থাপনের শংসাপত্র এবং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিলিপি

আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

শিকড়ের খোঁজে : বিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি

আয়োজক ঃ বাংলা বিভাগ, বহরমপুর গার্লস কলেজ

সহযোগিতায় ঃ মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

International Seminar

SHIKORER KHOJE : BISH SHATOKER SAHITYA-SANSKRITI

23 AND 24 MARCH, 2023

This is to certify that Dr. / Mr. / Ms. পিয়ালী দাস, গবেষক (পি. এইচ. ডি) *of* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় *actively participated as Speaker / Chairperson / Paper Presenter / Deligate in International Seminar on "Shikorer Khoje : Bish Shatoker Sahitya-Sanskriti" at Berhampore Girls' College held on 23 and 24 March, 2023*

He / She also presented a paper entitled বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ *in this seminar.*

Dr. Hena Sinha	**Dr. Madhu Mitra**	**Dr. Subhajit Ghosh**
Principal, Berhampore Girls' College & Chairperson	Head, Dept of Bengali & Convener	Coordinator, Dept of Pol.Sc Murshidabad University & Convener
Seminar Organizing Committee	Seminar Organizing Committee	Seminar Organizing Committee

· विश्वभारती · शान्तिनिकेतन

Azadi Ka Amrit Mahotsav

GLOBAL SANSKRIT FORUM वैश्विक संस्कृत मञ्च

A THREE-DAY
ALL INDIA SANSKRIT CONFERENCE
ON
SANSKRIT: THE PERENNIAL SOURCE OF ETERNAL WISDOM

ON THE OCCASION OF "AZADI KA AMRIT MAHAOTSAV" FOR REJUVENATING CULTURAL HERITAGE OF INDIA

DATE – 5th, 6th & 7th OF MAY 2023

ORGANIZED BY
DEPARTMENT OF SANSKRIT, PALI & PRAKRIT
BHASHA BHAVANA, VISVA-BHARATI, SANTINIKETAN
IN COLLABORATION WITH
GLOBAL SANSKRIT FORUM, DELHI

This is to certify that Sri/Miss/Smt./Dr./Prof. Pryali Das *of the institution* Dept. of Bengali, N.B.U. *at* Bhasha Bhavana *has given an invited talk/presided/participated/ presented a paper on the title* Maloder Samaj Jiban *in the said National Conference.*

Prohlad Roy
Chair Person of the Academic Session

संस्कृत, पालि और प्राकृत विभाग · भाषाभवन · Bhasha-Bhavana · विश्वभारती · Visva-Bharati · Department of Sanskrit, Pali & Prakrit

Prof. (Dr.) Niranjan Jena
Director of Conference,
H.O.D. of Sanskrit, Pali & Prakrit
Visva-Bharati, Santiniketan.

ISSN : 0976-9463

Volume 27 • Issue 4 • Number 47

TABU EKALAVYA

তবু একলব্য

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

সমাজ

সংস্কৃতি

সাহিত্য

ISSN 0976-9463

তবুএকলব্য

৪৭

বর্ষ ২৭ • সংখ্যা ৪ | Volume 27, Issue 4
ক্রমিক ৪৭ | Number 47

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী রেফার্ড ও পিয়ার-রিভিউড পত্রিকা

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য

সম্পাদনা ও সংকলন

ড. দেবারতি মল্লিক

ড. দীপঙ্কর মল্লিক

আমন্ত্রিত সম্পাদক

ড. লিপিকা সরকার

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

(47)

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research
Journal on Arts & Humanities
Volume 27, Issue 4
Number 47
Published : January 2022
First Edition : July 2022
ISSN : 0976-9463
ISBN : 978-93-92110-02-3

TABU EKALAVYA

Chief Advisor : Swami Shastrajnananda
Selina Hossin
Ramkumar Mukhopadhyay
Soma Bandyopadhyay
Sadhan Chattopadhyay
Ashis Chattopadhyay

President : Biplab Majee
Vice-President : Tapan Mondal
Executive Editor : Sushil Saha
Editor : Debarati Mallik
Working Editor : Tapas Pal
Editor-in-Chief : Dipankar Mallik
e-mail : tabuekalavya@gmail.com
Website : www.tabuekalavya.in
facebook : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
group : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৭০০ টাকা

সূচিপত্র

❖ সৃজনশীল সাহিত্য

১৩ টান কথা ‖ হাসান আজিজুল হক

❖ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

২২ 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' : গল্পের বুননে মহাকাব্যধর্মী আখ্যান ‖ দীপঙ্কর মল্লিক

৩৩ উদয়কুমার চক্রবর্তীর 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' : মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের পুনর্নির্মাণ ‖ সেবারতি মল্লিক

৬৮ চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস : পিতৃপরিচয়ের সংশয় ‖ সন্ধ্যা মন্ডল

৭৩ কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণের ইতিবৃত্ত ‖ সুমন দাস

❖ লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি

৮৫ সাম্প্রতিক সময়ে লোকভাষা চর্চার পরিসর ও সম্ভাবনা : একটি পর্যালোচনা ‖ অর্কপ্রভ ব্যানার্জী

৯৩ করম পরব—জাতিয়া করম ‖ উৎপল ডোম

৯৮ সামাজিক সংরক্ষণশীলতা ও বাংলার কাঁসারি সমাজ ‖ অলোক কুমার বিশ্বাস

১০৪ মালোদের সংস্কৃতি ‖ পিয়ালী দাস

১০৯ শ্রীহট্টের লৌকিক সংস্কৃতির আখ্যান : বারো মাসের তেরো পার্বণ ‖ শিল্পা বিশ্বাস

১১৮ যমপুষ্করিণী ব্রত : লোক-সংস্কৃতিতে শিষ্ট-সংস্কৃতির প্রতিফলন ‖ স্বাগত ভট্টাচার্য্য

১২৪ বাংলার পির ঐতিহ্য ও পির সংস্কৃতি : হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়বাদী চেতনার লোকাখ্যান ‖ গৌতম দাস

১৩২ সাঁওতালি গান : বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল সমাজের বহুমাত্রিক ছবি ‖ অনুপকুমার মাজি

১৩৯ 'পণ্য' দুনিয়ায় বিপন্ন 'লোক'-'সংস্কৃতি' ‖ সন্দীপন পাল

১৪৫ বর্ধমান জেলার নদীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কৃতি : সাহিত্যে ও জনমানসে ‖ জয়দীপ ঘোষ

❖ কবি, কবিতা ও কাব্য

১৫২ 'অজ্ঞানে যে বীর', সেই সময় ও মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' : একটি ব্যক্তিগত টহলদারি ‖ অভিষেক ঘোষাল

১৫৯ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নিরিখে সমর সেন ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ‖ সীমা পুরকাইত

১৬৮ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতায় বহুমাত্রিক চেতনা ‖ রোমিও সরকার
১৭৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কবিতা : শঙ্খ ঘোষ ‖ সঙ্ঘিতা বসু
১৮১ আল মাহমুদের কবিতায় ধর্মভাবনা ‖ প্রদীপকুমার পাত্র
১৮৮ শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কলমে 'আদরের মতো পাগল' : নিবিড় পাঠে নিজস্বতার সন্ধান ‖ শতাব্দী কুন্ডু
১৯৬ কবিতা-বিশ্ব : আটের দশক ‖ রিয়া ঢোল

❖ ঔপন্যাসিক, উপন্যাস ও পাঠ-প্রতিক্রিয়া - - - - - -

২০৫ উপন্যাসতত্ত্ব : বাখ্‌তিন, প্রপ্‌ ইত্যাদি ‖ পবিত্র সরকার
২১৫ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি ‖ অনির্বাণ সাহু
২৩২ সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' : জীবন-জীবিকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ‖ শুভজিত চক্রবর্তী
২৩৯ অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়': বিকল্প বাস্তবতার কাঠামোয় এক যাযাবর জনগোষ্ঠীর আত্ম-অন্বেষণের আখ্যান ‖ চিত্তদীপ চ্যাটার্জী
২৪৬ বাঙালির যৌনতা ও নারীর পণ্যায়ন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‖ মধুরিমা ভট্টাচার্য্য
২৫৪ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'আমি কান পেতে রই' : নাগরিক সমাজ-সংস্কৃতির কথকতা ‖ প্রিয়মিতা ঘোষ
২৬১ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস : ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও উত্তরণ ‖ মো. নুর আমিন
২৬৮ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন সংকট ‖ গোপীনাথ দাস
২৭৭ 'জলপুত্র' উপন্যাসে লোকাচার ‖ লিপিকা সরকার
২৮২ মতি নন্দীর কিশোর উপন্যাস : মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন-জীবিকার সন্ধান ‖ নির্মাল্য মণ্ডল
২৯০ ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষ ‖ দীপঙ্কর দে
২৯৫ প্রসঙ্গ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : দীপক চন্দ্রের 'লঙ্কেশ রাবণ' ও 'রামের অজ্ঞাতবাস' ‖ অর্পিতা দাস
৩০১ গ্রাম-জীবন ও জীবিকার সংকট : ভগীরথ মিশ্রের দুটি উপন্যাসের প্রেক্ষিতে ‖ সুখেন মণ্ডল

❖ ছোটোগল্পকার, ছোটোগল্প ও পাঠ-প্রতিক্রিয়া - - - - - -

৩১০ সোমেন চন্দের গল্পে মেয়েরা ‖ সত্যবতী গিরি
৩১৮ মৃত্যুর মনস্তত্ত্ব ও তার আকস্মিকতা : জীবনানন্দের তিনটি গল্প ‖ দেবরূপা দাস
৩৩০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে জীবনদর্শন ‖ শিরীণ মুস্তাফি
৩৪২ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মানুষের মর্মচারী সৌন্দর্যপিপাসা, হিংস্রতা ও নির্মমতা ‖ সৌমিলি দেবনাথ
৩৪৫ দেবেশ রায়ের আখ্যান ভাবনা : প্রসঙ্গ ছোটোগল্প ‖ দিব্যেন্দু দে
৩৫১ শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার রমানাথ রায়ের বিচিত্র ভাবনার আলোকে বাংলা ছোটোগল্প ‖ বিকি দাস
৩৫৭ গল্পকার আল মাহমুদ—ফ্রয়েড, মনস্তত্ত্ব ও যৌনতার সংক্ষিপ্ত পাঠ ‖ বিতান দে
৩৬৩ তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটোগল্পে স্বনির্ভর নারী ‖ সীমা মণ্ডল

৩৬৯ 'তিনতলা'র মনকাহন ‖ অঙ্কিতা মুখার্জী
৩৭৩ বাংলা নির্বাচিত গল্পে জীবনের সংকট : পরিবেশ বিপন্নতার কথকতায় মৃত্যুর ইশারা ‖ অরিত্রী দে
৩৭৯ স্বাধীনতা-পরবর্তী ও বাংলা ছোটোগল্প : সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা ‖ কুশল চ্যাটার্জী

❖ নাটককার-নাটক-যাত্রা নিয়ে আলোচনা

৩৮৭ বাংলা নাটকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‖ অনিমেষ গোলদার
৩৯৫ কর্মই আসলে ধর্ম—আলোচনায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে : 'সমাজের বলি' পালা ‖ অনুদাত্ত মল্লিক
৪০২ উৎপল দত্তের গদ্য : সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি ‖ উত্তম কুমার মণ্ডল
৪১০ প্রসঙ্গ দেশবিভাগ : নির্বাচিত বাংলা নাটকে তার সামাজিক প্রভাব ‖ সন্দীপ ঘোষাল
৪২১ সংলাপে সমকাল : তৃপ্তি মিত্রের নাটক ‖ তনয়া আফরোজ
৪২৬ বাংলা অণুনাটক : স্বরূপ সন্ধান ও সাম্প্রতিক প্রবণতা ‖ সুদীপ মণ্ডল

❖ গদ্য-প্রবন্ধ-রম্যরচনা-সমালোচনা

৪৩৫ প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ : নৈরাত্ম্যসিদ্ধির প্রমিথিউস ‖ আনন্দময় ভট্টাচার্য
৪৪২ বিদ্যাসাগরের 'ব্রজবিলাস' : অন্তরঙ্গ ভাষাপাঠ ‖ শ্রীজীব তপস্বী
৪৪৭ রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত ও পরিকল্পনা : পত্রাবলীর নিরিখে ‖ সৌমিত্র কুন্ডু
৪৫৪ স্বামীজির সমাজভাবনা : প্রসঙ্গ 'বর্তমান ভারত' ‖ লতিকা রায় পোদ্দার
৪৫৮ সুধীর চক্রবর্তীর সদর-মফস্বল : বৈচিত্র্যময় জীবন-জীবিকার আখ্যান ‖ কৌশিক কর্মকার

❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৃষ্টির বহুমুখী বর্ণ প্রতিভাস

৪৬৫ বীতশোকের রবীন্দ্রনাথ এবং কিছু কথা ‖ দীপঙ্কর দেবনাথ
৪৭২ রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' : বিলেতি সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ‖ সুদীপ কোলে
৪৭৭ বাংলার নয়া হিন্দু আন্দোলনের সমাজ চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ ভাবনা ‖ সৌম্য বোস
৪৮৩ সূচনাকাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার ধারা: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ‖ প্রাপ্তি চক্রবর্তী
৪৯১ রবীন্দ্রনাথ ও মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ ‖ অরিজিৎ চক্রবর্তী
৪৯৬ রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর : চিঠি থেকে কবিতা ‖ শুভঙ্কর দে
৫০৪ রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ : বৌদ্ধ আলোকে ‖ সোমা ঘোষ
৫১০ নব চেতনার উল্লাসে রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র ‖ সুভাষ চন্দ্র দাস
৫১৭ স্ত্রীর পত্র ও রবীন্দ্রনাথ ‖ সুস্মিতা সাহা

❖ তুলনামূলক পাঠ - - - - - -

৫২২ মার্কস্ ও বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা : কিছু তুলনামূলক আলোচনা ‖ ভানুমতি রায়

৫৩৯ The Village as a Representative of the Real India: A Comparative Study of Bibhutibhusan Bandyopadhyay's 'Pather Panchali' and Anita 'Desai's The Village by the Sea' ‖ Indrajit Mukherjee

❖ সমাজ ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার - - - - - -

৫৪৪ সেকালে বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক অভিঘাত ‖ মুগ্ধ মজুমদার

৫৫৩ ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমাজ ও সাহিত্যের মেলবন্ধন ‖ কাঞ্চন বারিক

৫৫৮ প্রাচীন ইতিহাস নির্মাণ প্রসঙ্গে পুরাণ ও মহাকাব্য ‖ অয়ন দাস

৫৬২ মহাভারতে সনাতন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সংস্কৃতিতত্ত্ব ‖ ইন্দ্রানী মণ্ডল

❖ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ - - - - - -

৫৭০ রাজনৈতিক আবর্তে নজরুলের ভাবনা ‖ আশিস রায়

❖ কিশোর সাহিত্য - - - - - -

৫৭৬ বাংলা কিশোর সাহিত্যের স্বতন্ত্রসত্ত্বা বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদা' ‖ প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য

❖ রসতত্ত্ব, সংগীত ও অন্যান্য প্রবন্ধ - - - - - -

৫৮৩ 'ভারতপ্রেমকথা'র ভাষাশৈলী ‖ পাঞ্চালী মুখার্জী

৫৯৩ প্রাচ্য রসতত্ত্বের সহজ পাঠ : লালমোহন ভট্টাচার্যের 'কাব্যনির্ণয়' : একটি গবেষণাধর্মী অনুসন্ধান ‖ নীলকমল বাগুই

৬০০ ব্রহ্মসংগীত রচনায় নারীদের অবদান ‖ চন্দ্রাণী দাস

৬০৮ বাংলা গানের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথ ‖ মধুমিতা সরকার

৬১৪ ভাষা, সংস্কৃতি ও উইটগেনস্টাইনের দর্শন ‖ তৃপ্তি ধর ও মৌমিতা ব্যানার্জি

৬২০ দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্র সংঘের ভূমিকা ‖ কাকলি কুণ্ডু

৬২৭ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নারী জাগরণে কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা ‖ রত্না পাল

৬৩৩ ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে ভক্তিরসের স্থান ‖ দেবব্রত বৈদ্য

৬৪০ নিপীড়ন ও বিচারব্যবস্থা : সাহিত্য ও সমাজপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রাম ও শহর ‖ তুষার কান্তি সাহা

৬৪৭ শরৎচন্দ্রের লেখনীতে মহামারীর আবহে পরিবেশ প্রকৃতি ও মানবজীবনের টানাপোড়েনের চিত্র ‖ কাজল মাল

৬৫৪ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

মালোদের সংস্কৃতি
পিয়ালী দাস

বাঙালির মৎস্য প্রীতি, আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অবজ্ঞার বিষয় ছিল। মাছ খাওয়া বাঙালিকে নিরামিষাশী মানুষ প্রীতির চোখে দেখে না। প্রীতির চোখে দেখে না বাঙালির মাংস ভক্ষণকে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকেই খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যা নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর্য-ব্রাহ্মণ ধর্মে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে। বাঙালি নিরামিষাহারকে কোনোদিন বরদাস্ত করেনি। ভট্টভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করে বাঙালির আমিষাহার সমর্থন করেন। শ্রীনাথাচার্যও মৎস্য-মাংসাদির খাওয়ার পক্ষে রায় দেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে—রোহিত, পুঁটি, শোল প্রভৃতি শ্বেতবর্ণ মাছ এবং আঁশযুক্ত মাছই ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য। সব মাছ ব্রাহ্মণ খেতে পারে না। যেমন বান বা বানজাতীয় মাছ। ইলিশ মাছ সমস্ত বাঙালির অন্যতম প্রিয় খাদ্য। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, পচা ও শুকনো মাছ, গোরু, শুকর, পক্ষী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে অভক্ষ্য। তবে নিম্নতর সমাজস্তরে ও আদিবাসী সমাজে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, বানমাছ, শশক, সজারু, কচ্ছপ প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল ও আছে।

সংস্কৃতি হল প্রবহমান জাতিসত্তা যা আসলে মানুষের সমগ্র সৃষ্টিশীলতা ও আত্মপ্রকাশকে ব্যক্ত করে। সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক গোপাল হালদার লিখেছেন—

> সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি-কর্ম, তার জীবনযাত্রায় আর্থিক ও সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্প সৃষ্টি-সমস্ত কারুকলা ও চারুকলা—এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ।[১] (সংস্কৃতির বিশ্বরূপ : গোপাল হালদার, পৃ. ২০৫)

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অদ্বৈত মালো সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির সামগ্রিকতাকে ধরতে চাইলে মালো সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে তিনি এখানে আশ্চর্য রকমের নীরব। তাই এই উপন্যাসে চরিত্রের তিন প্রজন্মের সংস্কৃতির আলোকে তিতাস পারের মালোদের সংস্কৃতির সামগ্রিকতাকে বুঝে নিতে হয়। আর সেখানে তিতাসের স্রষ্টাই আমাদের পথ প্রদর্শক, কেননা, মালো ভিন্ন অপর কারও পক্ষে সে সংস্কৃতির রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। অদ্বৈত নিজেই ছিলেন মালো সম্প্রদায়ের মানুষ। আর তাই নাগরিক সংস্কৃতি থেকে দূরে প্রান্তিক এই মালো সমাজ-সংস্কৃতি অর্থনীতির অনুপুঙ্খ পরিচয় তিনি শৈল্পিক নিপুণতায় তুলে আনতে পেরেছেন তাঁর উপন্যাসে।

গানে-গল্পে-প্রবাদে, পুজায়-পার্বণে, হাসি-ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের জগতে মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি সত্যিই স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কুমারী মেয়েদের মাঘমণ্ডলের ব্রত মালো সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মাঘ সংক্রান্তির দিনে ঢোল ও সানাইয়ের সুরে কুমারীদের 'ও সখি ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো, কই কালাচাঁদ আইলো' এই গানের মধ্যে দিয়ে মালো কুমারীরা চৌয়ারি ছেড়ে দেয় তিতাসের জলে—রীতি অনুযায়ী যে মালো যুবক যার চৌয়ারি ধরবে সে কুমারী তারই বাগদত্তা বধূ হয়ে যাবে। এখানে চৌয়ারি প্রেমের প্রতীক। বাসন্তীর ভাসানো চৌয়ারি ঘিরে সুবল ও কিশোরের দ্বন্দ্ব মারামারি, শেষপর্যন্ত কিশোরের প্রেমের ত্যাগ ও সুবলের কাঙ্ক্ষিত বাসনা প্রাপ্তি এই দৃশ্য বাসন্তীর কিশোরী মনকেও দুলিয়ে দেয়। এই ঘটনা উপন্যাসের পরবর্তী অংশে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারত, কিন্তু সে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বিন্যাসের দিকে না গিয়ে অদ্বৈত তাঁর অভিপ্রেত মালোদের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির সামগ্রিক ছবি ফুটিয়ে তোলায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

শুধু মাঘমণ্ডলের ব্রত নয়, অসংখ্য সামাজিক উৎসব, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, মনসাপূজা ও পদ্মাপুরাণ গান, হোলি, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা, ভাইফোঁটা, সারি গান, ভাটিয়ালী গান, হরিবংশ, নামগান, মুর্শিদা-বাউল, নৌকা বাইচকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মালো সংস্কৃতি এবং তাই-ই মালো সংস্কৃতিকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য।

মালোদের চিন্তায়-আচরণে বৈষ্ণবীয়বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষণীয়। বারোমাসি গান, ভাটিয়ালি গান, সারিগান, মাঘমণ্ডলের গান কিংবা জাতকর্মাদির অনুষ্ঠানগুলোতেও কৃষ্ণলীলার অনুভূতির বিস্তার ঘটেছে। দোললীলা কৃষ্ণসংশ্লিষ্ট একটি পার্বণ। দোলযাত্রার ফাগের রঙে মালোরা রঞ্জিত হয়েছে, রাঙিয়েছে তিতাসের জলকে। প্রবাসজীবনে এই হোলির অনুষ্ঠানেই কিশোর প্রেমে পড়েছিল একজন কিশোরীর। আবার বহুদিন পরে, সেই নারী পাগল-কিশোরের সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল—সেও এক হোলির দিনে।

নদী হল একাধারে মালোদের পূজ্য দেবতা এবং জীবিকা সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র। ফলে নদীকে ঘিরে তাদের মধ্যে নানারকম সংস্কার ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। এই সংস্কার ও বিশ্বাস জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। পবিত্র উপকরণ হিসেবে তিতাস নদীর জলকে মালোরা নানা ব্রত ও অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেছে। প্রতিদিনের জালিক-কাজকর্মে তারা নদীকে নমস্কার করে এবং তার জলে হাত-পা ধুয়ে নৌকায় ওঠে। নদীযাত্রায় তারা গঙ্গামায়ের নাম স্মরণ করে, কখনো কখনো নদীর বুকে নৌকা ভাসানোর সময় পাঁচপিরের ধ্বনি দেয়—"পাঁচপির বদরের ধ্বনি দিয়া প্রথম লগি ঠেলা দিল তিলক।"[১]

তিতাসপাড়ের মালোদের দৃঢ় বিশ্বাস—"গাঙের ডর মাঝ গাঙে না, গাঙের বিপদ পারের কাছে।/বা'র গাঙে মা-গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে।"[২] নদী-নৌকা-জাল—এই তিন নিয়েই মালোজীবন। নদীর মতো নৌকাও জেলে জীবনের অপরিহার্য উপাদান। সেজন্য নৌকা ধুয়ে মুছে তারা পরিষ্কার রাখে, তাকে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করে। দূরদেশে নৌকাযাত্রার সময় মালো নারীরা জোকার দেয়। শুকদেবপুর যাত্রার সময় কিশোরকে নদীর জল দিয়ে নৌকাকে প্রণাম করতে দেখা যায়—"তিলককে ভাত চাপাইতে বলিয়া কিশোর গলুইয়ে একটু জল দিয়া প্রণাম করিল।"[৩]

উপন্যাসটির 'নয়াবসত' অংশেও গৌরাঙ্গসুন্দরকে নৌকার গলুই ধুতে দেখা যায়। সংগীতে মধ্যে দিয়ে মালোসমাজের বিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতির এক বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছে অদ্বৈত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথম দিকে তিতাসের ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর (তিতাস নদী) ইতিহাসে নাই সত্য, পি মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বউ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁ রহিয়াছে।[৮]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ পাত্র-পাত্রীদের মুখে চল্লিশটির বেশি প্রবাদ প্রবচনকে স্থান দিয়েছেন। তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

উপন্যাসে রয়েছে—গ্রাম্যসভা বসেছে। কিন্তু গ্রাম্যলোকের সভাকে বলা হয়েছে দশজনে সভা। দশজন কোনো বিষয়ে যা মতামত দেন সেই রায় ঈশ্বরের রায়ের সমান। তাই উপন্যাসে বলা হয়েছে দশজন পরমেশ্বর। সুশীল কুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে তুলনীয় দুটি প্রবা হল—"দশের কথা যেখানে, মরণ ভালো সেখানে" এবং "দশজন রাজি যেখানে খোদা রাজি সেখানে।" দুর্ভাগা মানুষের দুঃখের সময় অতিক্রান্ত হতে চায় না। সুবলের বউ ঝগড়া করতে গিয়ে তার দুঃখময় পরিস্থিতিকে ধরতে চেয়েছে একটি প্রবাদের মাধ্যমে। প্রবাদটি হল— "দুঃখের গাঙ কত গহীন"। এর সঙ্গে একটি তুলনীয় প্রবাদ হল—"দুঃখের রাত পোহায় না" 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা মন্ত্রের উপর অগাধ আস্থা রাখে। জলজীবনে প্রকৃতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্যই অধিক। তাই তারা পাঁচ পিরের ধ্বনি দিয়ে নৌকা জলে ভাসায় তিলকের মতো মানুষ কৃষ্ণমন্ত্র বা বীজমন্ত্রে দেহ শুদ্ধ রাখে। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে চালান মন্ত্রে, ঝাঁপান মন্ত্রে।

জীবনের রসে মাখামাখি নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার বর্ণময় জগৎ তিতাস পারের গ্রাম। সেখানকার মানুষেরা সেই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। নাগরিক সংস্কৃতি নিরন্তর আক্রমণ ও উচ্চবর্গীয় মানুষদের অপমান ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মালো সমাজ যে শেষপর্যন্ত প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল তাও এই সংস্কৃতির ঐক্যবদ্ধতার জন্য। খুব স্বাভাবিকভাবেই মালো সমাজ এড়িয়ে চলত নাগরিক সংস্কৃতিকে। শিক্ষা থেকে দূরে অশিক্ষার অন্ধকারে মালো সমাজ বাঁচতে চায় নিজেদের সরলতা ও বিশ্বাসটুকু নিয়ে। শিক্ষিত নাগরিক সংস্কৃতির মিথ্যা বাগাড়ম্বর ও চাটুকারিতাকে তাই তারা গ্রহণ করতে চায়নি। এর মধ্যে দিয়েও আসলে প্রকাশ পেয়েছে মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা। সমরেশ বসু তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে বার্ষিক গঙ্গাপুজো সম্পর্কে বলেছেন—

> 'সাজার' হল মাছমারাদের সর্বজনীন গঙ্গাপূজা। সবাই মিলে চাঁদা দেয়। হাতে ধরে কেউ টাকাপয়সা দেয় না। মাছ ধরার একটি ভাটার পাওয়া মাছ সব দিয়ে দেয়। যাদের ওপর সাজারের ভার থাকে তাকে বলে 'সাজাভাটা' সেই মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তাতেই সর্বজনীন গঙ্গাপূজা হয়। তাতে কে কত বেশি দিয়েছে, কম দিয়েছে, সেটা কোন কথা নয়। যে যা পায়, তাই দেয়। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বৈকি। যে যত বেশি গড়ান মাছ মারতে পারে সে তত বেশি দিতে পারে। তার নাম হয় মান বাড়ে।[৯]

[illegible] উপত্যকার লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে অন্যতম কল্কিনারায়ণ। এই ব্রতের মূল আকর্ষণ এর কিচ্ছা। বরাক উপত্যকায় কল্কিনারায়ণ ব্রতের দুটি কিচ্ছা প্রচলিত। একটি মৎস্যজীবী শম্ভু-[illegible] কিচ্ছা, অন্যটি কৃষিজীবী রাখাল বালকদের কিচ্ছা। অর্থাৎ মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী সমাজ নিজেদের প্রয়োজনানুসারে এই ব্রতের কিচ্ছা রচনা করেছে যেগুলিতে রয়েছে তাদের [illegible] স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা। পূজা পদ্ধতি হল—

> ব্রত করতে হবে সন্ধ্যাবেলা। সপ্তাহের শনিবার অথবা মঙ্গলবার। ব্রতী হবে পুরুষেরা। সংখ্যা বেজোড় হতে হবে—তিন থেকে একুশ পর্যন্ত। কোনো মূর্তি নেই, কোনো পুরোহিত লাগে না। কল্কিনারায়ণের নামে একটি জলভরতি ঘট রেখে এর সামনে মোম-ধূপকাঠি জ্বালাতে হবে। একটি কল্কিতে বেজোড় ছিলিম তামাক ও বেজোড় টিকি জ্বালিয়ে দিতে হবে। আর সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য একটু প্রসাদ। এই হল ব্রতের উপকরণ। তারপর 'নিমাত' হয়ে বসে বর্তুলাকারে একে একে ক্রমান্বয়ে এক থেকে সাত দম দিয়ে কল্কি নামিয়ে 'বল বল কল্কি নারায়ণ ঠাকুর, বল হরি' বলে সমবেত জয়ধ্বনি দিয়ে ব্রত শেষ করতে হবে। তারপর সবার উপরে ঘটের জল ছিটিয়ে দিতে হবে, কপালে লাগাতে হবে কল্কির ভূষা। আর নিমাত হয়ে কল্কি টানার সময় যদি কেউ কথা বলে ফেলে তাহলে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাকে ব্রত করতে হবে।

বরাক উপত্যকার কৈবর্ত-পাটনি-নমঃশূদ্র-মালো-মাহীমালদের আর্থসামাজিক জীবনে নদী-নালা-খাল-বিলের প্রভাব অপরিসীম। মন্ত্রবর্জিত এইসব অনার্যদের এক অংশের পেশা মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা, মাছ শুকানো, শুকনো মাছ বিক্রি করা, খেয়া পারাপার করা। সমগ্র বাংলায় এদের জীবন নির্বাহে জলাশয় ও মাছ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলার সর্বত্র তাই দেখা যায় মাছকেন্দ্রিক স্থাননামের প্রাচুর্য। বরাক উপত্যকার মাছকেন্দ্রিক স্থাননামগুলি হল—মাছপাড়া, মাছুঘাট, মাছখাল, চেংজুর, পুঁটিখাল, ইচাছড়া, বোয়ালিপার, শিঙুরপার, মাগুরা, শৌলমারা, গজারদিঙ্গি, কান্দলা আলা, কৈয়াজানি ইত্যাদি।

মালো সমাজ বা সম্প্রদায়ের সব অনুষ্ঠানেই গান থাকে। এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকসংগীতে ভারতীয় পরম্পরার সংস্কৃতিই বহমান। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানের গানে পাওয়া যায়।

নৌকা বানানোর পর, জলে ভাসানোর সময়, মাছ ধরতে যাওয়ার সময় মালোদের গৃহবধূরা নৌকাকে এবং নৌকার প্রধানকে নৌকায় বসিয়ে বরণ করার মতো করে গান ও নৃত্য করে। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'নাউবরণ্যা'। নাউবরণ্যা একটি গীত এরকম—

> কাষ্টের দেশে থাকো কানাই কাষ্টের কিবা দুখ।
> নয়া নাউয়ের খেয়া দিয়া কানাই কত পাইলা সুখ॥
> নয়া নাউয়ের চুড়া নয়রে সেমুলের (শিমুলের) সাড়।
> কত হস্তী কত ঘুড়া কর পার, রাধার বেলায় কউ ভাড়॥
> তুমাগ সকলরে পার করিতে নিব আনা আনা।
> শ্রী রাধিকারে পার করিতে শুন নিব কানের সুনা॥
> মধ্য গাঙে নিয়া রে কানাই নাউয়েরে মারে লাচা। (নৌকা দোলায়)
> চমকে ওঠে রাধার পরাণ নাউয়ের ভাঙে পাছা॥

কানাই, নাউ ভাসিয়া থাকেরে। (কানাই)
সাতসমুদ্দর তেরো নদি পাড়ি দেয়া রে।[৮]

নদীতে মাছ ধরতে ধরতে যখন কয়েকদিন ধরে জাল ফেলা হচ্ছে অথচ জালে একদমই আশানুরূপ মাছ বাঁধছে না, সেই সময় কুমিল্লা নোয়াখালি জেলার মালোরা যে ধরনের গান করে থাকে, সে গানটি হল—

হায়! হায়! পোড়া কপাল রে ভাই।
নাঙ্গাল গরু বেচইয়া—
বিয়া করলাম, দেখইয়া (রে ভাই)
আমার কর্মে, আমার কপালে (সুখ নাই)
(বিয়া করছি) কানা মাইয়ারে ভাই
হায়! হায়! পোড়া কপাল আমার রে ভাই।
(অহন) বাঁচইয়া আছি পরের নাও এ
মাছ ধইরা রে ভাই। আমার পোড়া কপাল রে ভাই।[৮]

লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য হল যে তার ভাষা অত্যন্ত সরল। গানের আবেগের তীব্রতাই গানের গতিকে সঞ্চার করে থাকে, আর সুরের অদ্ভুত মাদকতাই গানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে, তাই গান শুনতে কখনও ক্লান্তি আসে না।

উৎসের সন্ধানে

১. গোপাল হালদার : 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৬০, পৃ. ২০৫
২. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : অদ্বৈত মল্লবর্মণ : 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৪১৬
৩. তদেব : পৃ. ৪১৮
৪. তদেব : পৃ. ৪১৭
৫. তদেব : পৃ. ৪১০
৬. সমরেশ বসু : গঙ্গা, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ২১৪-২১৫
৭. ক্ষেত্রসমীক্ষা : শান্তি বর্মণ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।
৮. ক্ষেত্রসমীক্ষা : বিভাস বর্মণ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।

নিবোধত

৩৭ বর্ষ * ১ম সংখ্যা
মে-জুন ২০২৩

৩৭ তম বর্ষ • ১ম সংখ্যা

নিবোধত

মে-জুন ২০২৩

'যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব'—যা কিছু কল্যাণকর ও শুভ তা-ই আমাদের নিকট উপস্থিত হোক।
(শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র ৩)

সূচিপত্র

অন্বেষা......৩ পরিক্রমা.....৪

দৈব ও পুরুষকার......স্বামী সুহিতানন্দ......৯

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত.....স্বামী চেতনানন্দ.....১২

শ্রীশ্রীমা প্রসঙ্গে গোলাপ-মার অপ্রকাশিত স্মৃতি .....তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়......২৩

ভজনানন্দে ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ .....স্বরাজ মজুমদার......১৮

উভয়ভারতী .....স্বামী একরূপানন্দ......৬১

রথযাত্রা.....প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা......৫০

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম.....মণিকুন্তলা হালদার দে......৫৫

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম.....কুণাল চট্টোপাধ্যায়......৫৮

ষোড়শীপূজা.....অভিষেক উজান......২৬

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি ..... প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা......৭৮

মাতঙ্গিনী হাজরা ও তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন.....নন্দগোপাল পাত্র.....৬৫

বিদ্যাসাগর সমীপে শ্রীরামকৃষ্ণ : কিছু ভাবনা.....অভিজিৎ মাইতি......২৯

রবীন্দ্রমানসে আলো ও অন্ধকার.....কর্ণিকা সেন......৩৫

লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ.....মিতা মজুমদার......৪২

ব্যক্তিমনের সংকটে প্রকৃতির আশ্রয় : জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি ছোটগল্প
দেবরূপা দাস......৬৮

বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ.....পিয়ালী দাস......৭৩

কবিতাবলি.....৪৭ *গ্রন্থসমালোচনা*.....৮১ *সঙ্ঘসংবাদ*.....৮২

প্রচ্ছদ : মৈত্রী ধর মজুমদার

সম্পাদিকা : **প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা** ব্যবস্থাপক সম্পাদিকা : **প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা**

দোলতলা, লোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-১৩২ স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ থেকে শ্রীসারদা মঠ ট্রাস্টিদের পক্ষে প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬ থেকে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য : ২৫ টাকা, বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : ১৩০ টাকা, সডাক : ১৮০ টাকা

বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ

পিয়ালী দাস

সাহিত্যে বস্তুধর্মিতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গরূপে প্রান্তবর্গীয় জীবনের সন্ধান আধুনিকতার এক বিশেষ লক্ষণ। গত শতাব্দীর জনবিস্ফোরণ, মহাযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মন্দা সাহিত্যকে বিশেষভাবে বস্তুধর্মী করে তোলে এবং রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশবিদেশের সাহিত্যে প্রান্তবর্গীয়দের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলায় এই প্রান্তবর্গীয়দের অন্যতম উল্লেখ্য জনগোষ্ঠী হল মালো বা জেলে।

প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে বারিবহুল, নদনদী-খালবিলবহুল প্রশান্ত মহাসাগরীয় সভ্যতা প্রভাবিত এবং আদি অস্ট্রেলীয় মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তুরূপে পরিগণিত হবে, এটা কিছু আশ্চর্য নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিতে এলে সঙ্গে করে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, ফলমূল এবং ভাল মাছ—রুই, চিতল ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। মালোদের আকৃতি, শারীরিক গঠন দেখে অনেকে বলেন তারা মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, তাদের মল্লযোদ্ধা বা মল্লবীর বলা হত। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডে মল্লযোদ্ধার সংবাদ পাওয়া যায়। তখন রাজায় রাজায় মল্লযুদ্ধ হত, যেমন বালি ও সুগ্রীবের ক্ষেত্রে দেখা যায়। 'পদ্মপুরাণ' কাব্যে চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন অংশে কৈবর্ত অর্থাৎ জেলেদের প্রসঙ্গ আছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মল্লযোদ্ধার কথা আছে। এরা ছিল অসাধারণ শক্তিশালী। চেহারা ও ক্ষমতায় এদের সঙ্গে যমদূতের মিল ছিল বলে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে বলেছেন,

"দোসর যমের দূত, বৈসে যত রাজপুত,
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্তী।"

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'ঢেকুর পালায়' কেওট-এর পরিচয় পাওয়া যায়। বীরভূমের কথ্যভাষায় এই কেওট শব্দের অর্থ জেলে। ইছাই ঘোষ ঢেকুর গড় প্রতিষ্ঠা করলে কেওট বা কৈবর্তরা এসে বসতি স্থাপন করে। এদের বৃত্তি ছিল মাছ ধরা।

গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে একটি প্রান্তিক সমাজের সকল বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে চেয়েছেন। জেলেদের দারিদ্র্য, চিন্তা, পাশবিকতা, বিশ্বাস, সরলতা, নীচতা—এককথায় সামগ্রিক জীবনাচরণ এতে স্থান পেয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণিঅধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতি-বোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলোর ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ। এই ধীবরপল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই।... ইহার অধিবাসীদের ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রীতি-সমবেদনা, চক্রান্ত-দলাদলি সমস্তই বাহিরের মধ্যবর্তিতা ছাড়া নিজ-প্রকৃতি-নির্ধারিত, সংকীর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে।''[৮]

জেলেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সামান্য, অল্পেই তারা তুষ্ট, তবু সেটুকুই তাদের ভাগ্যে জোটে না। তাদের ওপর আছে অপেক্ষাকৃত ধনীদের বঞ্চনা, পদ্মার উদাসীনতা আর প্রকৃতির অমোঘ অভিসম্পাত। সারাবছর পদ্মা তার তীরবর্তী অধিবাসীদের সুখে রাখতে পারে না। বিশেষ করে ইলিশের মরসুম ফুরিয়ে গেলে জীবনধারণ তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পদ্মার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে জেলেপল্লীর জীবনপদ্ধতি। কেউ পদ্মার বুকে জাল ফেলে বেড়ায়, কেউ মাঝিগিরি করে, কেউ কুঁড়োজাল নিয়ে খালে দিন কাটায়। বর্ষায় পদ্মাপাড়ের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

'পদ্মানদীর মাঝি'তে মূলত সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলেও সর্বনামপদের ক্ষেত্রে লেখক প্রায়ই চলিত রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন—''এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে।''[৯] এভাবে প্রায়ই এ-উপন্যাসে সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটেছে।

উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাদির ব্যবহারে নদী ও তার পারিপার্শ্ব নানাভাবে ছায়া ফেলে জেলে-মাঝিদের সংলাপে। 'পদ্মানদীর মাঝি'র অধিকাংশ চরিত্র যেহেতু জেলে, সেহেতু তাদের সংলাপে নদী ও তার অনুষঙ্গ এসেছে। কপিলাকে দেখে কুবেরের মনে জেগেছে বর্ষায় ভরা-পদ্মার ছবি। কপিলার নির্মম দুর্বোধ্য আচরণ তার চোখে উপমিত হয়েছে পদ্মার রহস্যকুটিল আচরণের সঙ্গে।

তিতাসপাড়ের মালোদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শোষণ-বিড়ম্বনা, দুঃখ-উল্লাস-দ্রোহ—এককথায় মালোসমাজের অতীত ও বর্তমান প্রাণস্পন্দনের হদিস মেলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। মালোজীবনের অতল থেকে লেখক বহুমূল্যবান অরূপরতন তুলে এনেছেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দৈবনির্ভরতা তাদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। মালোরা সম্পূর্ণভাবে শোষিত এক সম্প্রদায়। মাছধরার মতো আদিম উপজীবিকার ওপর নির্ভরশীল মালোগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক শক্তির পাশাপাশি দাদনদার মহাজন, আড়তদার থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতা পর্যন্ত সকলের মিলিত শোষণচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। মালোরা মাছ ধরতে গিয়ে প্রকৃতির দুর্বিপাকে পড়ে মরে গিয়েও মরে না, তারা শুধু নিখোঁজ হয়। আর তাদের স্ত্রীদের তখন দুর্গতির শেষ থাকে না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিপুল ভালবাসা দিয়ে মালো জনজীবনের সীমাহীন দুঃখ ও বুকভরা আর্তিকে

সাজিয়েছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-উপন্যাসকে যতই 'নদীর পাঁচালি' বলুন না কেন, লেখকের নৈপুণ্যে এ গ্রন্থ উঠেছে মালোজীবনের মহাকাব্য।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস নদী থেকে সমুদ্রে যাওয়ার আখ্যান। যাদের জীবনের অধিকাংশই কাটে জলে, তাদেরই জীবন ও সমাজব্যবস্থা এখানে চিত্রিত। শুভঙ্কর ঘোষ লিখেছেন, "সমরেশ বসু 'গঙ্গা'য় মাছমারাদের বাঁচার লড়াই চিত্রিত করেছেন।... অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মাছমারাদের সঙ্গে গঙ্গায় ঘুরে বেরিয়েছেন। এটি কেবল জীবনচিত্রণ নয়, জীবনবোধের কথাশিল্প।"[২]

এই উপন্যাসে দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মাছমারা গঙ্গায় এসে ভিড় করেছে। গঙ্গার সঙ্গেই তাদের টিকে থাকার সম্পর্ক। তাদের ভাত-কাপড় বাঁধা আছে গঙ্গার কাছে। গঙ্গাও তার বুকে সবাইকে ঠাঁই দিয়েছে। মাছের মরসুমে ওপার অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকেও জেলেরা এসেছে। গঙ্গার মতো সরকার ও সুদখোর মহাজনের কাছেও মালোজীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মালোদের জালে মাছ না পড়লে দারিদ্র্যের কশাঘাত, আর পড়লে মহাজন-আড়তদার থেকে শুরু করে ছোট পাইকার-ফড়েদেরও প্রতারণা।

নিবারণের চেহারায় মালো জনগোষ্ঠীর আদিম শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট করেছেন লেখক। কালো কুচকুচে রং, পেটানো শরীর নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিমকাঠের কালো রংমাখা চকচকে মূর্তি। কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। ভেড়ার লোমের মতো কালো কোঁকড়ানো চুল। যেন জাতসাপের ডিম ফোটা শালুই কিলবিল করছে মাথায়। হাসতে গেলে চোখ ঢেকে যায়। দেখে মনে হয় চোখ নেই, নাক নেই, খালি এক মুখ হাসি। বাদার মালোদের প্রথম পুরুষের গায়ের রঙও ছিল কালো কুচকুচে। এই প্রথম পুরুষেরই গাত্রবর্ণ ধারণ করে আছে পরবর্তী মালোরা। প্রথম পুরুষের দ্রোহী মনোভাব বর্তমান মালোদের রক্তেও বইছে।

দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যের ভেতরও জেলেদের জীবনে উৎসবের ছোঁয়া লাগে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে জেলেদের নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। তার একটি হল 'বাচখেলা'—নদীতে বাছাড়ি নৌকার প্রতিযোগিতা। নদীনির্ভর জীবনে এ এক বিশিষ্ট আনন্দানুষ্ঠান।

জেলেদের জীবিকা ও জীবনবিশ্বাসের মধ্যে বার বার মৃত্যুবোধ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। প্রতিপদে মৃত্যুভয় আছে জেনেও তারা বৃত্তিবদল করেনি, নদীকে ত্যাগ করেনি। মরণের ভয় তাদের নেই। মরণ ও মারণই তাদের প্রত্যক্ষ জীবনের পথ। এই জীবনবোধের নিরিখে মালো জনজীবন স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত হয়ে 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' ছোটমাপের একটি উপন্যাস। সুন্দরবন অঞ্চলের মালোদের জীবন, স্বপ্ন ও সংগ্রাম এখানে সংহত ভাষায় বিবৃত। মহাজনের কাছ থেকে দাদন-নেওয়া গরিব মালোরা তাদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। ঋণ দেওয়ার অজুহাতে খটিদাররা তাদের ধৃত জলশস্য জলের দরে নিয়ে নেয়। খটি অর্থাৎ মাছের আড়ত। খটিদাররাই মালোদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক। 'গহিন গাঙ'-এ মালোসমাজের প্রবল প্রতিপক্ষ প্রকৃতি নয়, এইসব মানুষ। এদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয় মালোদের আশা-অভীপ্সা। এদের অঙ্গুলি সংকেতে তাদের জীবনে ঝড় ওঠে, এদের ষড়যন্ত্রে নিরপরাধ মালো খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। ঋণ নিয়ে এরা নৌকা-জাল কেনে। বছর বছর সুদে আসলে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ বাড়ে। মালোরা এই ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না কখনও। তাদের দীনতার ছাপ শুধু আহারে নয়, পোশাকেও। অপঘাতে ললিতের মৃত্যুর পর মধু, হারান ও শ্রীপদ নৌকা নিয়ে বেতনা নদী বেয়ে বাড়ি ফিরছে। ছইয়ের ভেতরে পিতৃহারা অবসন্ন

শ্রীপদ বসে আছে। মধু আর হারান দাঁড় টানছে। তাদের পরনে ছেঁড়া নেকড়া, খালি গা।

উপন্যাসটির শেষে কোনও আশাবাদের ইঙ্গিত নেই। শ্রীপদর সংগ্রামী মানসিকতাকেই লেখক পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন মাত্র।

শওকত ওসমানের লেখা 'সৌদামিনী মালো' গল্পে সৌদামিনী মালো নামে চার্চের সিস্টার মারা যাওয়ার পর চার্চ তার সম্পত্তি নিলাম করছে। তার স্বামী জগদীশ মারা যাওয়ার পর তার জেঠতুতো দাদা মনোরঞ্জন এই নিঃসন্তান দম্পতির বিপুল সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সৌদামিনীর তেজের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর সৌদামিনী বছর দুয়েকের একটি শিশুকে নিয়ে আসে। তার নাম হরিদাস। মনোরঞ্জনের চক্রান্তে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে হরিদাস ব্রাহ্মণ, তার জাত মেরেছে শূদ্রাণী সৌদামিনী। সৌদামিনী হলফ করে বলে হরিদাস শূদ্র। পরে কয়েকজন তার বাড়িতে হামলা করলে সে জানায় যে হরিদাস শূদ্র বা ব্রাহ্মণ কিছুই নয়, সে আসলে মুসলমান। এরপর হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলে সৌদামিনী খ্রিস্টান হয়ে যায়, সব সম্পত্তি মিশনের নামে লিখে দেয়। কিন্তু হরিদাসকে হারানোর যন্ত্রণায় সে পাগল হয়ে যায়।

কাব্যে

জসীম উদ্দীনের 'মাটির কান্না' কাব্যগ্রন্থের 'জলের কন্যা' কবিতায় আছে জেলেবউয়ের কথা : "পুরাতন জালে তালি দিতে দিতে ঢলিয়া জেলের গায়,/ জেলে বৌ'র মন মিহিসুরি গানে উজানীর বাঁকে ধায়।" ঝর্ণা বর্মণ তাঁর 'স্বপ্নের তিতাস' কবিতায় বলেছেন যে তিতাস জীবনের ছবি আঁকে। অকূল গাঙে যারা নৌকা ভাসায়, বাড়িঘর প্রিয়জন ছেড়ে নতুন করে ঘর তৈরি করে জলের ভিতে, সেইসব খেটে-খাওয়া মানুষ তিতাসের পাড়ে একে একে ভিড় করে। ঘাটে ঘাটে অকথিত জীবনের কত গাথা তৈরি হয়। তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাও বলেছেন। তাঁর শরীরে রাজরোগ, তবু অকুতোভয়ে দৃঢ়হাতে লিখে গিয়েছিলেন নিপীড়িত মানুষের কথা। তিতাস শুকিয়ে গেলেও তার বুকভরা জল, তিতাসকে কেন্দ্র করে রঙিন মিষ্টি স্বপ্নেরা ঘুরে ঘুরে আসে, জলের মতো কলকলিয়ে কথা বলে।

লক্ষ্মণ কুমার হালদার 'রাজমুকুট' কবিতায় অদ্বৈত মল্লবর্মণকে উদ্দেশ করে লিখেছেন,

"মল্লবীরের জয়গান গাহিয়াছ তুমি আজ নাই।
তবু এত নাম তিতাস নদীর নামে আমরা অমর।
তুমিও রেখেছ কৃতি কৃত্তিবাস সম হে বন্ধু মহান;
তুমি যে অজেয় তাই তোমারে স্মরিয়া
ভরে ওঠে প্রাণ।"

নাটকে

উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত নাট্যদল 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ করার পর বিভিন্ন মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ থেকে টানা সাতদিন নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। অভিনেতারা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। এ-নাটকে মালোদের নাচগান, বেশভূষা, ভাষা, আঞ্চলিক কথার টান সবই আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। তাছাড়া মঞ্চ উপস্থাপনা ছিল উৎপল দত্তের এক অভিনব কীর্তি। অভিনয়ের আসর ছিল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। প্রেক্ষাগৃহের মাঝের পথের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে অন্তত দু-ফুট চওড়া বেদি মঞ্চের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে নির্মিত হয়েছিল। সেখানে অভিনেতাদের আনাগোনা, রামকেশবের বাড়ি, ব্রতপালনের গান গেয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কোথাও যেন দর্শক ও নটনটীদের ব্যবধান কমে গিয়েছিল। দর্শক অনুভব করত সে তিতাস নদীর পাড়েই বসে আছে। মালোজীবনের সঙ্গেও সে একাত্মতা অনুভব করত।

১৯৮৩ সালে উৎপল দত্ত রচনা করেছিলেন একটি দলিল নাটক—'মালোপাড়ার মা'। রতুয়া থানার মালোপাড়ায় বীভৎস কমিউনিস্ট হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে এই নাটক। এ-নাটক কোনও কাল্পনিক ঘটনা বা সংবাদপত্রের প্রতিবেদনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। উৎপল দত্ত নিজে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গ্রামে গিয়ে আক্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেছেন, সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিয়েছেন, পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট ও আদালতে সাক্ষীদের প্রদত্ত বয়ান সংগ্রহ করেছেন। 'মালোপাড়ার মা' প্রযোজনা মালদহ তো বটেই, সারা বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

প্রবন্ধসাহিত্যে এবং জীবনীগ্রন্থে

'গঙ্গার ইলিশ ও নদনদীর ইতিকথা' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত রচনায় লক্ষ্মণ কুমার হালদার ইলিশ মাছের জন্মকথা, গতিবিধি ও জন্মস্থানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ইলিশ সমুদ্রের মাছ। বর্ষাকালে ইলিশ মিষ্টি জলের খোঁজে বড় বড় নদী যেমন গঙ্গা বা পদ্মা ও তার উপনদীতে ছড়িয়ে পড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে ইলিশ দলবদ্ধভাবে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ইলিশ ছিল বাংলার মৎস্যজীবীদের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু নানান বাঁধ নির্মাণ ও নদীর নাব্যতা হ্রাস হেতু এবং জলদূষণের কারণে ইলিশের আনাগোনা গঙ্গা বা তার উপনদীতে নেই বললেই চলে। গঙ্গার ইলিশের অপ্রতুলতা ও প্রতিবন্ধকতার দিকগুলি লেখক তুলে ধরেছেন। নদীর স্রোত বন্ধ করে দিয়ে এখন বিল, জলাশয়গুলোয় ইলিশ ছাড়া অন্যান্য মাছের উৎপাদন হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। বাংলার নদীগুলি হেজে মজে গিয়ে, নাব্যতা হারিয়ে যেমন মৃতপ্রায় তেমনই নদীর সন্তান মৎস্যজীবীরাও মৃতপ্রায়।

'আলো-আঁধারি' (২০০৪) এবং 'ঈষৎ রূপান্তর' (২০০৮) বই দুটির লেখিকা বেবী হালদারের নাম আজ সচেতন পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। তিনি নিজেও মালো। মেধা পাটেকর তাঁকে বলেছেন 'মেহনতি সমাজের প্রতিনিধি'। অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত, নির্যাতিত 'কাজের মেয়ে' বেবী আজ নিজেকে ছাপিয়ে উঠেছেন এমন একটা জগতে, যে-জগতের কথা তিনি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এ যেন ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়ের রাজরানি হওয়ার গল্প। প্রথম গ্রন্থের তুলনায় দ্বিতীয় গ্রন্থটি সাবলীল। এইসময় বেবী সফল লেখিকা।

অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর 'আমরা বেবীর পথ চলার সঙ্গী' রচনায় বলেছেন, বেবীর 'ঘরে ফেরার পথ' বইটি পাঠকের অপেক্ষাকৃত বেশি চেনা। ২০০২-তে 'আলো-আঁধারি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বেবীর যে-আত্মপ্রকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০১৪-তে এসে তা প্রায় পূর্ণ। দেশবিদেশ ঘুরে বিশ্বপরিচয়ের আলো মুকুটে নিয়ে বেবী এসেছেন ছোটবেলার পাড়া জলঙ্গি এবং দুর্গাপুরে। চেনা মানুষদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে দু-দশক পর। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, মানুষজনের কথা নতুন করে লিখছেন এমন একজন মেয়ে, যাঁর মানুষের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর আগ্রহ একটুও বদলায়নি। তাঁর পাড়ার ছেলেমেয়েরা বেবীর জীবনকাহিনি পড়ছে পাঠ্যবইতে, অথচ বেবী তাদের বাবা-মায়েদের অনেক দিনের চেনা মানুষ।

এই আলোচনা থেকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মালো জাতির প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে। ✤

তথ্যসূত্র

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ৭৭০

২। শুভঙ্কর ঘোষ, *নদী : বাংলা উপন্যাস* *'নীললোহিত'* বিশেষ নদীসংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃঃ ১৪১

Nivodhata Patrika: 9903491929
Email: nibodhatapatrika@gmail.com

Vol. 37, No. 1, May-June 2023
Publishing Date: 1 May 2023

ISSN 0972-4877
R.N.I. 44112/87

Printed and published by Pravrajika Aptakamaprana on behalf of the Board of Trustees of Sri Sarada Math, Dakshineswar, Kolkata-76. Printed at Swapna Printing Works Pvt. Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, 24 Parganas (N), Kolkata 700132. Published from Sri Sarada Math, Dakshineswar, Kolkata-76.

PRICE: Rs. 25